পরিষদ্ গ্রন্থাবলী
২৫

বিক্রমপুরের ইতিহাস।

শ্রীযোগেন্দ্র নাথ গুপ্ত প্রণীত

বহু ভাষাবিদ্ পণ্ডিত, অধ্যাপক,

শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ কৃত

ভূমিকার সহিত,

—:o:—

কলিকাতা।

৬৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট,

ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্স এর পুস্তকালয় হইতে

শ্রীদেবেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

সন ১৩১৬ সাল।

মুল্য ২॥০ আড়াই টাকা মাত্র।

প্রাচীন বিক্রমপুর।
১৭৮১ খৃষ্টাব্দে সার্ব্বেয়ার জেনারেল্ জেমস্ রেনেল এফ.আর.এস
কর্ত্তৃক অঙ্কিত বিক্রমপুরের প্রাচীন মানচিত্র হইতে-
শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র নাথ গুপ্ত - প্রণীত
বিক্রমপুরের ইতিহাসের নিমিত্ত সঙ্কলিত
চাঁদপুর
জয়পুর
সাদকপুর
ভমরা
বামনগাঁও
কার্ত্তিকপুর
জিরামপুর
সোণারগাঁ
মীরগঞ্জ
বালিগাঁ
দাগদিয়া
রাজনগর
রাজাবাড়ী
সেরাজাবাদ
মাকোয়াটি
আবদুল্লাপুর
নবীপুর
জপসা
করাতীকল
শ্যামপুর
দোলাইকেরি
ধানকুনিয়া
নুনকিশর
সমকোট
রাধানগর
মহম্মদপুর
জাফরাবাদ
গোপালগঞ্জ
ঢাকা
ফতুল্লা

উৎসর্গ।

যাঁহার মৃত্যুতে সমগ্র সংসার আমার
নিকট ভীষণ অন্ধকারময় বোধ
হইতেছে,

যিনি আমার একটী নগণ্য ক্ষুদ্র কবিতা পাঠেও
কত না আনন্দ প্রকাশ করিতেন

এবং

যাঁহার আদেশেই মাতৃভূমির এ প্রাচীন
ইতিহাস সংকলনে প্রবৃত্ত হই

আমার সেই সরল হৃদয়, উদার ও পরোপকারী
স্বর্গীয় পিতৃদেব

৺মহেন্দ্র চন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের পুণ্য-নামে

মাতৃভূমির এ পুণ্য ইতিহাস

উৎসৃষ্ট করিয়া

কৃতার্থ হইলাম।

ভূমিকা।

প্রীতিভাজন বন্ধুবর শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত "বিক্রমপুরের ইতিহাস" লিখিয়া আমায় তাহার ভূমিকা লিখিতে অনুরোধ করেন। একের গ্রন্থের ভূমিকা অপরের দ্বারা লেখান বোধ হয়, মাইকেল মধুসূদনের গ্রন্থাবলী প্রথম-প্রকাশের সময় (১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে) আরম্ভ হয়। তাহার পর দীনবন্ধুর গ্রন্থাবলী প্রকাশের সময় বঙ্কিম বাবু ভূমিকা লেখেন। তাহার পর প্রথা এইরূপ দাঁড়ায় যে, কোন মৃত কবির গ্রন্থপ্রকাশকালে প্রকাশক কোন খ্যাতনামা লেখককে দিয়া ভূমিকাদি লেখাইয়া লইতেন। শেষে যখন শ্রদ্ধাস্পদা শ্রীমতী মানকুমারী দাসীর গ্রন্থের পরিচয় পূজ্যপাদ পণ্ডিত তারাকুমার কবিরত্ন মহাশয় লিখিয়া পুস্তকের অঙ্গীভূত করিয়া দিলেন, তখন হইতে ইহা একটি রীতিতে গণ্য হইল। অনেকেই আপন হইতে শ্রেষ্ঠ-তর ব্যক্তিদ্বারা স্বরচনার পরিচয় পত্র স্বীয় গ্রন্থের বক্ষে আঁটিয়া দিয়া পাঠকের হাতে তুলিয়া দিতে লাগিলেন। যোগেন্দ্র বাবুর অনুরোধ আমি অক্ষমতা প্রযুক্ত অনেক দিন পর্য্যন্ত রক্ষা করিতে পারি নাই, কিন্তু অবশেষে আমাকে নানা কারণে বাধ্য হইয়া এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেই হইল।

যোগেন্দ্র বাবু নিজে তাঁহার গ্রন্থকে সাধারণের সম্মুখে অবতারিত করিতে হইলে, কি বলিয়া করিতেন, তাহা আমি জানি না। বিক্রমপুরের ন্যায় বাঙ্গালার প্রাচীন গৌরব-ভূমির ইতিহাসকে কি বলিয়া পরিচিত করিয়া দিলে, পাঠকেরা বন্ধুবরের ইতিহাস-প্রিয়তা, দেশভক্তি এবং ঐতিহাসিক-তথ্য সংগ্রহের কৌশল এবং পটুতা সম্যক্ বুঝিতে পারিবেন, তাহা আমার পক্ষে একটা সমস্যার বিষয়। আমি তাঁহার

গ্রন্থের সমালোচক নহি। তাঁহার রচনার প্রশংসা করিতে বা তাঁহার রচনার ভুল দেখাইতে আমার অধিকার নাই অথচ তাঁহারই গ্রন্থকে পাঠকের নিকট আমায় পরিচিত করিয়া দিতে হইবে! পাঠকেরা বুঝিতে পারিতেছেন, আমাকে কি কঠিন কার্য্য নিষ্পন্ন করিতে হইবে।

একটা আক্ষেপবাণী—আমাদের ইতিহাস নাই—এই কথাটা দেশে এতটা প্রচলিত হইয়া গিয়াছে,—ইহা স্বীকার করিতে আমরা এতটা অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছি যে, আজকালকার এই শিক্ষার সুলভ দিনে, এই উচ্চতর শিক্ষার প্রভাবের দিনে ঐ আক্ষেপের পশ্চাতে যে একটা তীব্র-লজ্জা লুক্কায়িত আছে, তাহা আমরা বুঝিতে পারিলেও অনুভব করি না বা সে লজ্জা নিবারণের কল্পনাও করি না। ইতিহাস নাই বলিয়া ক্ষুণ্ণ হইতে বেশ শিখিয়াছি, কিন্তু লজ্জিত হইয়া উহার জ্বালা অনুভব করিতে শিখি নাই। যতদিন না এই লজ্জাটুকু—এই লজ্জার জ্বালাটুকু আমাদের অভ্যস্ত হইবে, ততদিন আমাদের দ্বারা ইতিহাসের অভাব-মোচনের কোন চেষ্টাও হইবে না। ইতিহাস ছিল না,—কেন? আমাদের দোষে। এখনও ইতিহাস হইতেছে না,—কেন? আমরা লিখিতেছি না। আমরা ইতিহাসকে আদর করিতে জানি না। তাই প্রতিদিন ইতিহাসের উপযুক্ত উপকরণ চোখের সাম্‌নে দৃষ্টিপথ হইতে বিলুপ্ত হইতেছে,—আমরা কিছুই সংগ্রহ করিয়া রাখিতে পারিতেছি না। সুতরাং ইতিহাস নাই—কেন?—আমরা লিখি না, সেই জন্যই নাই।

বিক্রমপুরের ইতিহাস অর্থে—ঢাকা-জেলা সম্বন্ধীয় গভর্মেণ্টের কতকগুলি রিপোর্ট ও প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের কতকগুলি গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধের অনুবাদ-মাত্র নহে। আজ যে ইতিহাসখানির ভূমিকার ভার লইয়াছি, সৌভাগ্যক্রমে এখানিও সেরূপ নহে।

আমাদের দেশের এক একটী জেলার ইতিহাস, এক একটী প্রাদেশিক ইতিহাসের সমান। যাঁহারা কিছুমাত্র ইতিহাস আলোচনা

করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন, বাঙ্গালার ইতিহাসে বিক্রমপুরের স্থান কোথায়? কিংবদন্তী অনুসারে বিক্রমপুরের কথা, আমরা যত প্রাচীন কাল হইতে জানিতে পারি, তাহা হইতে ইহার ইতিহাস আরম্ভ করা অপেক্ষা অপরের লিখিত-পঠিত বিবরণে কত প্রাচীন কাল হইতে উহা জানিতে পারা যায়,—তাহার একটা বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল।

প্রাচীন সংস্কৃত-সাহিত্যে বিক্রমপুরের নাম পাওয়া যায় না। ইহার বিশেষ কারণ এই যে, বিক্রমপুর প্রাচীন নাম নহে। পূর্ব্বে বিক্রমপুর সমতট নামে প্রখ্যাত ছিল। সেন-রাজগণের সময়ে এই সমতট 'বিক্রমপুর' আখ্যায় অভিহিত হয়। যোগেন্দ্রবাবু তাঁহার পুস্তকে এসম্বন্ধে যথেষ্টই আলোচনা করিয়াছেন। ফাহিয়েনের সময় সমতট সমুদ্রতটে অবস্থিত ছিল। ফাহিয়েন বলেন, সমতটের পরিধি ৩০০০ লি এবং ইহার রাজধানী ২০লি বিস্তৃত, এখানে ৩০টীরও অধিক বৌদ্ধমঠ ছিল এবং এগুলিতে দ্বিসহস্রাধিক বৌদ্ধ স্থবির বাস করিতেন। সমতটে একশত দেবমন্দির ছিল। এখানে বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী লোকেরা থাকিত। তবে, দিগম্বর-নির্গ্রন্থের সংখ্যাই কিছু বেশী। ফার্গুসন সমতট বলিতে বর্ত্তমান ঢাকা-জেলা বুঝিয়াছেন (Op. C. P. 242)।

ইৎ-চিঙের মতে সমতট পূর্ব্বভারতে অবস্থিত (Hsi yu-Chin, Ch. 2, and Chavannes, Memoires, P.. 128 and note). ওয়াটার্সের মতে ইহা ঢাকার দক্ষিণে ও ফরিদপুরের পূর্ব্বভাগে অবস্থিত ছিল।

এই শেষোক্ত মতটীই সমীচীন। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে, বঙ্গ (১) পুণ্ড্রবর্দ্ধন (২), গৌড় (৩), সুহ্ম (৪), রাঢ় (৫), বরেন্দ্র (৬), তাম্রলিপ্ত (৭),

(১) সংস্কৃত সাহিত্যে বঙ্গের উল্লেখ সম্বন্ধে শ্রীনিখিলনাথ রায়-সম্পাদিত 'ঐতিহাসিক চিত্রে' (১৩১৪ কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ)—আমার "প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সাহিত্যে বঙ্গের উল্লেখ" নামক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

(২) পুণ্ড্র, পৌণ্ড্র, পুণ্ড্রক, পৌণ্ড্রক, ও পৌণ্ড্রিক—এই কয়টী নাম প্রাচীন সাহিত্যে

ও সমতটের (৮) উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। উৎকীর্ণ লিপিতে নিম্ন-লিখিত কয়টী স্থানে বঙ্গের উল্লেখ আছে।

(ক) ১। "আলোকয় মহারাজ জয় জীবেতি বাদিভিঃ। অংগবংগ-কলিংগাদ্যৈ রাজভিঃ। সেব্যতে চ যঃ।......" Hampe

---

পাওয়া যায়। মহাভাষ্য—৪।২।৫২; রামায়ণ কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড, অধ্যায় ৪০, শ্লোক ২৩; অধ্যায় ৪১, শ্লোক ১২।

মহাভারত—

আদিপর্ব্ব, ১০৪।৫৩।৫৫; ১১৩,২৯; ১৮৭।১৬।

সভাপর্ব্ব, ১৪।২০; ৩০,২২; ৫২।১৬, ৩৪।১১; ৮৮।১৬; ৪,২৪; ৫২।১৮।

ভীষ্মপর্ব্ব, ৩১।৩৪-৫৮; ১৬,৩।

কর্ণপর্ব্ব, ৮,১৯; ২২।২,১৪।

বনপর্ব্ব, ৫১।২২। দ্রোণপর্ব্ব, ৪।৮ ১০ ১৫। অনুশাঃ, ৩৫।১৭।

হরিবংশ ১০১।১। হরিবংশপর্ব্ব ৩১ ৩৪-৪২।

ভবিষ্যপর্ব্ব, ৪৬।৫৬; ৯১।১; ৯২।১,৭; ৯৩।১,৬; ৯৭।২৫; ১০১।১, ২-১৮।

বিষ্ণুপর্ব্ব, ৩৪।১৪; ৫৯।৪-৫৩-৮।

বৃহৎসংহিতা, ৫।৭০; ৯।১৫; ১০।১৪; ১১।৫৮; ১৬।৩; ৫।৭৪, ৮০; ১৪।৭।

বিষ্ণুপুরাণ, ২।৩-১৫।

গরুড়পুরাণ, ৫৫।১৩; ৬৮।১৭-৮।

বায়ুপুরাণ, ৯৯।৩৮৫।

ভাগবতপুরাণ, ১০।৬৬,১-২৩।

দশকুমারচরিত-উচ্ছ্বাস ৩, পৃঃ ১২৫-১২৬ [নির্ণয় সাগর সংস্করণ]।

ভারতনাট্যশাস্ত্র—১৩।৩২।

(৩) গৌড়-শব্দ—কাব্যাদর্শ, পরিচ্ছেদ ১।৪০,৪২,৪৪,৩৬,৫৪,৯৪; হর্ষচরিত—৭ম শ্লোক। বামনের কাব্যালঙ্কার সূত্র ৯,১০; রুদ্রটের কাব্যালঙ্কার, অধ্যায় ২।৪।৫; সরস্বতী-কণ্ঠাভরণ, ২।২৮,৩১; সোমদেবসূরির যশস্তিলকম্—আশ্বাস ৩, পৃঃ ৪৬৬ [নির্ণয়সাগর প্রেসসং]; ক্ষেমেন্দ্রের বৃহৎকথামঞ্জরী লম্বক ১৬, আখ্যায়িকা ৩৮, শ্লোক ৫৫০ পৃঃ ৫৮৬; সোমেন্দ্রের

Inscription of Krishnaraya, Dated Sak 1430. Epigraphia Indica, Vol. I. P. 369.

২। "অংগেনাপি কলিংগেন বংগেন চ
পরৈস্তপতৈ......"
মদ্রংভিত্যাপনিভ্রং সমধিগতমহাশৈল-শৃঙ্গকলিঙ্গং
সাতঙ্কং বঙ্গমঙ্গং সহ করোশ্ছোর্যা ভঙ্গাঙ্গুসঙ্গং..."

Unamanjari plates of Achyutaraya—Saka-Samvat 1462—Epi : Ind : Vol. iii. P. 153.

৩। "লট কর্ণাট-কবহট-কলিঙ্গ (কো (?) গ—বঙ্গি (ঙ)—বেঙ্গি দেশত্রিমদো..."—Kelawadi Inscription of the time of Someswar I. A. D. 1053—Epi. Ind.

কথাসরিৎসাগর, লম্বক ১৮, তরঙ্গ ৩, শ্লোক ৩; বিলহ্লনের বিক্রমাঙ্ক কাব্য ৩।৭১; মুরারির অনর্ঘরাঘব ৭।১২৪, পৃঃ ৩১০।

(৪) সুহ্ম—মহাভাষ্য, ৪।২।৫২।

মহাভারত—

আদিপর্ব্ব, ১০৪।৫৩,৫৫ ; ১১৩,২৯।

সভাপর্ব্ব, ২৭.২১ ; ৩০।১৬,২৫।

কর্ণপর্ব্ব, ৮।১৯।

হরিবংশ—

হরিবংশপর্ব্ব, ৩১।৩৪, ৪২।

ভবিষ্যপর্ব্ব, ৪৬.৪৯।

রঘুবংশ, ৪।৩৫।

(৫) রাঢ়	J. A. S. B. 1905.	
(৬) বরেন্দ্র	J. A. S. B. 1908	
(৭) তাম্রলিপ্ত	দ্রষ্টব্য।	
(৮) সমতট		

৪। "দুরাদংগ-কলিঙ্গ-বংগ-মগধশ্চোলতথ......" Gadag inscrition of Vira Vallela II, Saka Samvat 1114. Epi. Ind.

৫। "বংগ-অংগ-মগধ-মালব বেংগিসে (সৈ) রর্চ্চিতো······" Nilgund Inscription of the time of Amogha Varsha I. A. D. 866. Epi. : Ind.

৬। "যো বংগরাজরাজ্যশ্রীবিশ্রামসচিবঃ শুচি :—Bhuvanesvar inscriptions. Epi. : Ind. :

৭। "বঙ্গালদেশমু——" South Indian Inscriptioun Vol. I. Nos. 67&68, P. 99—Two Tirumalai Tamil Rock inscriptions of the 12th Year of the reign of Para Kesari Varman alias the Lord the Glorious Rajendra Chola [1] and Govinda Chandra.

সেন-রাজবংশের লক্ষ্মণ সেন, কেশব সেন, বিশ্বরূপ সেন, মাধব সেন প্রভৃতির তাম্রফলকে বিক্রমপুরের বহুল উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

(খ) পুণ্ড্র বা পৌণ্ড্রবর্দ্ধনকে উৎকীর্ণ অনুশাসনে ভুক্তি নামে আখ্যাত করা হইয়াছে। ইহা 'বিষয়,' 'মণ্ডল' ও 'গ্রামে' বিভক্ত ছিল। পাল ও সেন-রাজাদের তাম্রশাসনে পুণ্ড্র বিভাগের নিম্নলিখিত নামগুলি পাওয়া যায় :—

১। 'মহন্তাপ্রকাশ-বিষয়' ও 'ব্যাঘ্রতটি মণ্ডল।'

২। 'স্থালিক্কট-বিষয়' ও 'আম্রষণ্ডিকা মণ্ডল।'

৩। 'কোটিবর্ষ-বিষয়' 'হলাবর্ত্তমণ্ডল, 'গোকলিকামণ্ডল।'

কোটিবর্ষ—পুনর্ভবা নদীর দক্ষিণতীরস্থ একটী নগর। একটী অনুশাসন অনুসারে বঙ্গ ও বিক্রমপুর 'ভাগ'কে পুণ্ড্রবর্দ্ধনের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লওয়া হইয়াছে (Journal, Asiatic Society of Bengal, 1896, p. 13, l. 42.)

(গ) মগধরাজ আদিত্যসেনের অপ্‌সড্‌ স্তম্ভোপরি যে লিপি উৎকীর্ণ আছে, তাহাতেই সর্ব্ব প্রথমে 'গৌড়-নামের উল্লেখ দেখা যায়। বানি, রাধনপুর প্রভৃতি স্থানের লিপিতে গৌড়ের উল্লেখ আছে। 'গৌড়েশ্বর' এই আখ্যা সর্ব্বপ্রথম গুরব মিশ্রের বুদল স্তম্ভলিপিতে পাওয়া যায়। এই লিপিতে 'দেবপালকে' গৌড়েশ্বর বলা হইয়াছে। * তৎপরে বিদেশীয় ঐতিহাসিক গ্রন্থকারগণের রচনা মধ্যেও আমরা বিক্রমপুরের যে সকল উল্লেখ পাইয়াছি তাহারও একটী নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

১। Jao De Barros তাঁহার "Da Asia" নামক পর্ত্তুগীজ পুস্তকে (Decade IV. Pt.II) বঙ্গের উল্লেখ করিয়াছেন (পৃঃ ৪৫৩)। ইহাতে তিনি প্রসঙ্গতঃ বিক্রমপুরেরও উল্লেখ করেন। এই গ্রন্থে খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে বঙ্গদেশ, বিক্রমপুর, শ্রীপুর ও চট্টগ্রামের অবস্থা লিপিবদ্ধ আছে। গ্রন্থকার বিক্রমপুরের বাঙ্গালীদিগকে বীর ও সাহসী বলিয়া বিবৃত করিয়াছেন। শ্রীপুরের উন্নতিশীল বাণিজ্যের কথা, অধিবাসীদিগের অহঙ্কার ও স্পর্দ্ধার কথা, সুন্দর অট্টালিকার কথা, বস্ত্রশিল্প প্রভৃতির কথা এই গ্রন্থের কয়েক পৃষ্ঠা অধিকার করিয়াছে। বিশেষতঃ এই গ্রন্থে যে একখানি বাঙ্গালার মানচিত্র আছে, তাহা হইতে

---

* Karhad and Deoli plates of Krisna III (Ep. Indica V. 193, line 20 and Ep. Ind. IV. 283, line 22) ; The Bilhari stone incription (Ep. Ind. I., 256) ; Bhuvanesvara stone inscription of Brahmesvara temple (I. A. S. B. VII, 5584) ; Kahla plate of the Kalacuri Sodhadeva (Ep. Ind. VII. 89) ; Nagpur stone inscription of the Malava ruler Naravarmadeva (Ep. I nd. II, 186) ; Bhuvanesvara stone inscription of Vasudeva Temple (Ep. Ind. VI. 205) ; Govindapur stone inscription of Gangadhara (Ep. Ind. II, 337) ; Deopara stone inscription of Vijayasena Ep, Ind. I. 339) ; Pithapam pillar inscription of Prithvisvara (Ep. Ind. IV, 40.)—এই লিপিগুলিতে "গোড়ের উল্লেখ আছে।

ব্যারসের সমকালীন বঙ্গের বিভিন্ন অংশের ভৌগোলিক সংস্থান নির্ণয় করিতে পারা যায়। এই মানচিত্রখানি ১৫৫৩ খৃষ্টাব্দে প্রস্তুত।

২। ১৫৯৯ খৃষ্টাব্দে Nicolas Pimenta তাঁহার "Relatio Historica de Rebus in India Orientali" নামক গ্রন্থে বিক্রমপুরের উল্লেখ করিয়াছেন। এই গ্রন্থে বিক্রমপুরের প্রাচীন অবস্থা সম্বন্ধে কিছু আভাস পাওয়া যায়। এই জেস্যুইট পাদরী নয়জন ভূঁইয়ার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। পিমেণ্টা বলেন যে দ্বাদশ ভৌমিকদিগের মধ্যে নয়জন মুসলমান ছিলেন। ইহার গ্রন্থে কেদার রায়ের নাম ও কিঞ্চিৎ বিবরণ পাওয়া যায়। কেদার রায় যে শ্রীপুরের অধীশ্বর ছিলেন, এই গ্রন্থে তাহার স্পষ্ট উল্লেখ আছে। ইনি বলেন, কেদার রায়ের লোকদিগকে একজন ক্ষুদ্র রাজা (সম্ভবতঃ পর্ত্তুগীজ) খৃষ্ট ধর্ম্মে দীক্ষিত করে। কেদার রায় যে চাঁদ রায়ের পুত্র নয় তাহা এই গ্রন্থপাঠে অবগত হওয়া যায়। ইহার বর্ণনা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে তাঁহার সময়ে বিক্রমপুর শ্রীপুর ও তৎ সম্মুখবর্ত্তী সনদ্বীপও সমৃদ্ধিশালী দেশ ছিল।

৩। ১৬১০ খৃষ্টাব্দে Peirre Du Jarricএর "Histoire des Indes Orintales" (IV-Partie) নামক পুস্তকে দ্বাদশ ভৌমিকদিগের একটী বিস্তৃত বিবরণ আছে। ইহা হইতে জানা যায় যে, ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে ভূঁইয়াদিগের ক্ষমতা অত্যন্ত প্রবল ছিল। ইঁহাদের মধ্যে তিনজন হিন্দু ও নয়জন মুসলমান। হিন্দুগণ শ্রীপুর, চ্যাণ্ডিকান ও বাকলার অধীশ্বর ছিলেন। ফার্ণাণ্ডেজের বিবরণে লিখিত আছে যে তিনি গুডফ্রাইডে ও রবিবারে শ্রীপুরে ধর্ম্মপ্রচার করেন। শ্রীপুর বন্দর হইতে ৬লীগ বা ৯ ক্রোশ অন্তরে সনদ্বীপ অবস্থিত। প্রকৃতি ইহাকে এরূপ সুরক্ষিত করিয়া রাখিয়াছে যে এখানকার অধিবাসীদিগের অজ্ঞাতে ইহার মধ্যে প্রবেশ লাভে কেহ সমর্থ হয় না। সনদ্বীপে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে লবণ উৎপন্ন হইত এবং লবণের ব্যবসায়ে ইহা ভারতে শ্রেষ্ঠ ছিল।

পর্ত্তুগীজেরা ইহা অধিকার করিবে বুঝিতে পারিয়া কেদার রায় তাহা-দিগকে স্বীয় স্বত্ব প্রদান করেন। ১৬০২ খ্রীষ্টাব্দে কেদার রায়ের অধীন একজন নির্ভীক সেনাপতি কার্ভালো, পুরস্কারস্বরূপ এই সনদ্বীপের অধিকার প্রাপ্ত হয়। এই গ্রন্থে বিক্রমপুর ও শ্রীপুরের শস্তশালিতার একটী ক্ষুদ্র বিবরণও প্রদত্ত হইয়াছে; তদ্ভিন্ন বিক্রমপুরে খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচার ও দেশবাসীদের আর্থিক অবস্থা ও বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় এই গ্রন্থে পাওয়া যায়।

৪। এতদ্ভিন্ন De Fariay Souza বিক্রমপুর সম্বন্ধে স্পষ্টতঃ কোন কথা না লিখিলেও তাঁহার Portuguese Asia নামকগ্রন্থে বিক্রম-পুর সম্বন্ধে কতকগুলি বিশেষ জ্ঞাতব্য ভৌগোলিক বিষয় স্থির করিতে পারা যায়।

৫। ফার্ণাণ্ডেজের বিবরণে ভুঁইয়াদিগের একটী বিস্তৃত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। তাঁহার বর্ণনা হইতে বাদসাদ দিয়া লইলে ভৌমিকদের একটী ছোট বিবরণ সংগ্রহ করা যাইতে পারে।

৬। Raph Fich এর গ্রন্থ Hurton Ryley প্রকাশ করেন। টাঁড়া, শ্রীপুর-সোণার গাঁ প্রভৃতি স্থানের কার্পাস বস্ত্র ও রেশমের ফিচ্ বহু প্রশংসা করিয়াছেন।

৭। ১৬২৫ খ্রীষ্টাব্দে Purchas তাঁহার His Pilgrimes (BK. V. Part IV) নামক গ্রন্থের দুএক স্থানে বিক্রম-পুরের নাম মাত্র করিয়াছেন। ইহাতে লিখিত আছে যে, পর্ত্তুগীজ নৌবাহিনী বিধ্বস্ত হইলে পর, নৌবাহিনীর অধিনেতা যথাসর্ব্বস্ব শ্রীপুরে প্রেরণ করিয়াছিলেন; এবং তিনি স্বয়ং শ্রীপুরাধিপতি কেদার রায়ের আশ্রয়ে শ্রীপুরে বাস করিতে লাগিলেন। মানসিংহ শ্রীপুর আক্রমণ করিয়া মোগলসাম্রাজ্যাধীন করেন এবং কেদার রায়ের বিরুদ্ধে নৌবাহিনী প্রেরণ করেন। মানসিংহ ও কেদার রায় সম্বন্ধে ইহাতে অনেক কথা

আছে। শ্রীপুরের বাণিজ্যাদির বিবরণ বিষয়ে এ গ্রন্থ কতক উপকরণ প্রদান করিতে পারে।

৮। Mandelso যদিও কখন বাঙ্গালা দেশে আসেন নাই বা বাঙ্গালা দেশ সম্বন্ধে কিছুই অবগত ছিলেন না, তথাপি তিনি ঢাকা ও টাঁড়ার নাম করিতে ছাড়েন নাই।

তদ্ভিন্ন নিম্নলিখিত পুস্তক ও প্রবন্ধে বিক্রমপুর সম্বন্ধীয় অনেক জ্ঞাতব্য বিষয়ের বিবরণ পাওয়া যায়—

1. J. Taylor—A sketch of the Topography and statistics of Dacca. 1840.
2. A descriptive and historical account of the cotton manufacture of Dacca in Bengal. By a former resident of Dacca.
3. Hunter's Statistical Account of Dacca.
4. Hamilton's Hindustan.
5. Notes on the Antiquities of Dacca by Aulad Hasan.
6. Stewart's History of Bengal.
7. Riaz-us-Salatin.
8. Mratin's "Eastern India"
9. Gastrell's report of the districts of Jessore, Farrid. pure and Bakergange,
10. Wilford's Ancient Geography of India. Asiatic Researches. vol XIV.
11. Dalton's Ethnology of Bengal.
12. Beveridge's District of Bakargunge.
13. Elliot's History of India, vol VI.

14. F. E. Pargiter's Ancient Countries in Eastern India, J. A. S. B. 1897, part I (pp. 85-112)
15. H. Blochman's Geographical and Historicai notes on the Burdwan and Presidency Divisions, Bengal, Appendix to the statistical account of Bengal vol I
16. Contributions to the Geography and history of Bengal, part I. J. A. S. B, 1873, pt. I. pp 299-310, part II, 1874 ; part III. 1875.
17. Notes on Akbar's Subhas, J. R. A. S. 1896, p 83-136—John Beames.
11. Notes on the Geography of old Bengal—1008. May pp 269-298.

এদিকে ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র-প্রমুখ অনেক বাঙ্গালী ঐতিহাসিকও বিক্রমপুর সম্বন্ধে অনেক নাড়াচাড়া যে না করিয়াছেন, তাহা নহে। যে কয়জন বাঙ্গালী লেখক বিক্রমপুর সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন তন্মধ্যে জন কয়েকের নাম উল্লেখ যোগ্য। প্রথমতঃ শ্রীযুক্ত কৈলাস-চন্দ্র সিংহ মহাশয়ের লিখিত প্রবন্ধের মধ্যে চারিটী প্রবন্ধের উল্লেখ প্রয়োজন ;—

ভারতী	১২৮৭	৪৫৬ পৃঃ	
„	১২৯১	পৌষ	সেনরাজগণ
„	১২৯১	চৈত্র	বাঙ্গালার দ্বাদশ ভৌমিকের ইতিহাস
সাহিত্য	১৩০১	বৈশাখ	বঙ্গের আদি গৌরব শীলভদ্র।

শ্রীযুক্ত আনন্দনাথ রায় মহাশয়ের বারভূঞা শীর্ষক কয়টী প্রবন্ধের মধ্যে নব্যভারতে (১৩০৮ অগ্রহায়ণ) ও 'জাহ্নবী'তে (১৩১৫ বৈশাখ) প্রকাশিত দুইটী প্রবন্ধ বিশেষভাবে উল্লেখ্য।

ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় মহাশয় 'সাহিত্য' ও 'ঐতিহাসিক চিত্রে' তিনটি প্রবন্ধে বিক্রমপুরের যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছেন।

[সাহিত্য　　১৩১১ আশ্বিন　চাঁদরায় ও কেদার রায়

১৩১৪ কার্ত্তিক　ফিরিঙ্গীদস্যু

ঐতিহাসিক চিত্র ১৩১৪ বৈশাখ　কেদার রায়]

পণ্ডিত ৺ত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় নব্যভারতে কতকগুলি গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধে বিক্রমপুরের আলোচনা করিয়াছেন। প্রত্নতত্ত্ববিদ্ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় ১৩১৩ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের 'সাহিত্যে' 'প্রাচীন বাঙ্গালা' নামক প্রবন্ধে অনেক গবেষণার পরিচয় দিয়াছেন।

প্রত্নতত্ত্ববিদ্ ৺আশুতোষ গুপ্ত মহাশয় ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের এসিয়াটিক সোসাইটির জর্ণালে "রামপাল" সম্বন্ধে একটী বিশেষ পাণ্ডিত্য-পূর্ণ প্রবন্ধ লেখেন। জর্ণালের সম্পাদক মহাশয়ও এই প্রবন্ধে অনেক টিপ্পনী সংযোগ করিয়া দিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত রসিকলাল গুপ্ত মহাশয় ১৩১১সালের ভাদ্রমাসের 'ভারতী'তে 'মহারাজ রাজবল্লভ ও তাঁহার সমকালবর্ত্তী বঙ্গীয় হিন্দুসমাজ' নামক এক প্রবন্ধ লেখেন। ইহাতে তিনি অনেক কথার অবতারণা করেন। ইহাতে তিনি একটী নূতন ঐতিহাসিক সংবাদ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি বলেন মহারাজ রাজবল্লভের সময়ে বৈদিক যজ্ঞ-অনুষ্ঠান পারদর্শী কোন ব্রাহ্মণ সমগ্র বঙ্গদেশে বিদ্যমান না থাকায় রাজবল্লভ গোবিন্দদেব চক্রবর্ত্তিনামক স্বীয় বৈদিক পুরোহিতকে কাশীধামে প্রেরণ করেন। গোবিন্দদেব কাশী হইতে যজ্ঞ-প্রকরণ ও মন্ত্র সংগ্রহ করিয়া আগমন করেন। গোবিন্দদেবের বৃদ্ধ প্রপৌত্র শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার স্মৃতিভূষণের (বর্ত্তমান বিক্রমপুর, মাগুরা গ্রামনিবাসী) নিকট গোবিন্দদেবের স্বহস্তলিখিত পূর্ব্বোক্ত পদ্ধতি অদ্যাপি বিদ্যমান। পূর্ব্ব বাঙ্গালায় বেদসম্মত যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান এই গ্রন্থলিখিত বিধানেই অনুষ্ঠিত হইতেছে।

এতদ্ব্যতীত বান্ধবপত্রের প্রথমখণ্ডে 'রাজা রাজবল্লভ সেনের জীবন চরিত, ৮ম খণ্ডে সম্বন্ধ-নির্ণয় সমালোচনায়, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় এবং

কুঞ্জলালভূতি প্রণীত 'সুবর্ণ বণিক' নামক গ্রন্থে বিক্রমপুর সম্বন্ধীয় কিছু কিছু বিবরণ সন্নিবেশিত আছে। ভূতি মহাশয়ের গ্রন্থে পূর্ব্ববাঙ্গালার একটী সুন্দর মানচিত্র আছে। উল্লিখিত প্রবন্ধ ব্যতীত 'বিক্রমপুরের ইতিহাস' নামক একখানি গ্রন্থও ১২৭৩ বঙ্গাব্দে মুদ্রিত হইয়াছিল। ১২৯১ সালের চৈত্রমাসের ভারতীতে ৫৪০ পৃষ্ঠায় এই পুস্তকের নাম উল্লিখিত আছে। বিক্রমপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ ঘোষ এই গ্রন্থের প্রণেতা। অম্বিকাবাবুই সর্ব্বপ্রথমে বিক্রমপুরের ইতিহাস প্রণয়ন করেন। ইহার পর আমাদের আলোচ্য এই বিক্রমপুরের ইতিহাস দ্বিতীয় গ্রন্থ।

এইরূপে বহুস্থান হইতে আমরা বিক্রমপুরের অনেক কথা বিক্ষিপ্তভাবে পাইতে পারি, কিন্তু তাহাকেতো আর ইতিহাস বলে না। এই সকল উপকরণ গুছাইয়া ভাষায় গাঁথিয়া গেলেই যে ইতিহাস হয়, তাহাও নয়। ইহার উপরও যাহা কিছু চাই, তাহাই লেখকের মৌলিকত্ব লেখকের রচনাপটুত্ব এবং ইতিহাস বিষয়ে অভিজ্ঞতার পরিচায়ক। যোগেন্দ্রবাবু এই ইতিহাসখানিতে তাহার যে পরিচয় দিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা পাঠকগণের বিচার্য্য। তিনি যে প্রণালীতে যে সকল কথা, তথ্য, প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন, সে প্রণালী বা তিনি যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, সে সিদ্ধান্ত সর্ব্বত্র বিশুদ্ধ বা ভ্রমশূন্য না হইতে পারে; কিন্তু তিনি যে সকল বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন, যে সকল বিষয়ের সংগ্রহ করিয়াছেন, যে সকল তথ্য প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, সে গুলিদ্বারা এই ইতিহাস খানি সুসজ্জিত এবং সুখপাঠ্য হইয়াছে। তিনি রামপালকে গৌড়রাজ্যের চিরন্তন (পাল-রাজত্ব হইতে সেন-রাজত্ব পর্য্যন্ত) রাজধানীরূপে প্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন, সেন-রাজগণকে বৈদ্য জাতীয় প্রমাণ করিতে যে চেষ্টা পাইয়াছেন, কান্যকুব্জীয় ব্রাহ্মণাগমন স্থানই যে রামপাল, তাহার নির্ণয়ে

যে পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন, সেই সমস্ত সফল হইয়াছে কি না, তাহার মীমাংসক আমি নহি। তাহার জন্য সমালোচক মহাশয়রা আছেন। ঐ সকল বিষয়ে আমার হয়তো স্বতন্ত্র মত আছে, কিন্তু তাহা প্রকাশের জন্য এখানে কোন অবকাশ আমার নাই। যোগেন্দ্রবাবু অল্প-বয়সে, অদম্য-চেষ্টা, অপরিমিত অধ্যবসায় লইয়া মাতৃভূমির যে ভূমির প্রাচীন চিহ্নাদির নৈসর্গিক পরিবর্ত্তনে দশবৎসর একরূপ থাকে না, সেই ভূমির প্রাচীন ও নবীন ইতিহাস সঙ্কলনে যে উৎসাহ প্রদর্শন করিয়াছেন, আমার আশা, তাহাই আমাদের দেশের অপর সুধীজনের পথ-প্রদর্শক হইবে।

অনেকে বলিবেন, 'বিক্রমপুর-ঢাকা' যার কথা বাঁকা-বাঁকা সেই বাঙ্গালদেশের আবার ইতিহাস, তাহাও আবার লেখ্য এবং "তদপি চ পাঠ্যং" এরূপ মনে করিবার কোন কারণ নাই। আমরা যে বঙ্গ দেশ হইতে আমাদের বর্ত্তমান 'বেঙ্গল প্রভিন্স-এর' নাম পাইয়াছি, আমরা রাঢ়, বরেন্দ্র মিথিলা, বগড়ীতে বাস করিয়াও সাধারণতঃ আপনাদিগকে বাঙ্গালী বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকি, যেখানকার ভাষার মূলসূত্র লইয়া আমাদের মাতৃভাষায় সাধুভাষার রূপ স্থির করিয়া তাহাকে বঙ্গভাষা বলিয়া নাম দিয়াছি, সে বঙ্গদেশেকে 'বাঙ্গাল দেশ' বলিয়া দূরে ফেলিয়া দিলে চলিবে না। তাহারই কথা বরং সর্ব্বাগ্রে জানিতে চেষ্টা করাই আমাদের কর্ত্তব্য হওয়া উচিত। সেই বঙ্গদেশ সুপ্রাচীনকাল হইতে ভারতের ইতিহাসে স্থান পাইয়া আসিতেছে।

অনেকে এই পুস্তকে বিক্রমপুরের পণ্ডিতবর্গের ও কবিরাজবর্গের নাম-তালিকা দেখিয়া বিস্মিত হইবেন; ভাবিবেন এ শ্রাদ্ধবাড়ীর ব্রাহ্মণ-বিদায়ের ফর্দ্দ নকল করিয়া ছাপিয়া দিবার সার্থকতা কি?—আছে। ঐ সকল অগাধপাণ্ডিত্যে পূর্ণ, বঙ্গদেশের গৌরবসূচক পণ্ডিতকুলের নাম ও তাঁহাদের পবিত্রস্মৃতি ব্যতীত আর আমাদের আছেই বা কি?—নামগুলি

ছাপা হইল। এখন যদি উঁহাদের উত্তর পুরুষদিগের মধ্যে কেহ কাহারও বিবরণ পাঠাইয়া দেন, তাহা হইলে ভবিষ্যৎ-সংস্করণে এই ইতিহাসে তাহা সন্নিবেসিত করিয়া ইতিহাসের সার্থকতা রক্ষিত হইবে না কি ?—আর তদ্ভিন্ন, আমাদের যখন 'কানুছাড়া গীত নাই' দেশের এক তৃতীয়াংশ ইতিহাসই যখন ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের ইতিহাস, তখন তাঁহাদের বিবরণ কে বাদ দিতে পারে ?

গ্রাম্য খেলাধুলা, আচার-ব্যবহার পোষাক পরিচ্ছদ এবং যোষিদ্‌ব্রতাদি সংগ্রহ করিয়া যোগেন্দ্র বাবু ইতিহাস-রচনার এক বিশেষ পন্থা নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে বাঙ্গালা দেশে বৌদ্ধধর্ম্ম আপনার আধিপত্য বেশ স্থাপন করিয়াছিল। শত শত বৌদ্ধবিহার, সঙ্ঘারাম ও চৈত্য হইতে বাঙ্গালী-মুখ-নিস্থত বুদ্ধদেবের অমিয় বাণী প্রত্যহ মুখরিত হইত। এই সকল স্থানে যে কেবল পণ্ডিতদিগের ধর্ম্ম, শাস্ত্র, ও নীতির আলোচনা হইত তাহা নহে—শরীর-তত্ত্বেরও আলোচনা হইত। বৌদ্ধভিক্ষু ও শ্রমণগণের সহিত হিন্দু পণ্ডিতদিগের তর্ক যুদ্ধে বাঙ্গালীরা আপনাদের কুশাগ্রবুদ্ধি ও অগাধ পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিত। অষ্টম শতাব্দীতে দুইজন বাঙ্গালী বৌদ্ধ পণ্ডিত তিব্বত দেশীয় নৃপতি Thisrong-dentsan কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া তথায় গমন করেন। গৌড়বাসী শান্তরক্ষিত নালন্দার মহাস্থবির ও মগধ-রাজের গুরু ছিলেন। তিনি তিব্বতে গিয়া আচার্য্য বোধিসত্ত্ব আখ্যায় অভিহিত হইয়াছিলেন। তাঁহার অশেষ পাণ্ডিত্য দর্শনে ও তাঁহার সহযোগী উদয়নবাসী পদ্মসম্ভবের অক্লান্ত পরিশ্রমে তিব্বতবাসীরা দলে দলে বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল। এই সময়ে বৌদ্ধ ধর্ম্ম তিব্বতীয় রাজধর্ম্মে পরিণত হয়। খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে বাঙ্গালা দেশ হইতে অনেক বৌদ্ধ পণ্ডিত তিব্বতীয় নৃপতি Ralpuchan কর্ত্তৃক আহূত ও নিমন্ত্রিত হইয়া তিব্বত দেশে গমন

করেন। তাঁহারা সংস্কৃত শাস্ত্র সমূহ তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদ করেন। তিব্বত দেশে বৌদ্ধ ধর্ম্মের বিস্তৃতি বাঙ্গালী বৌদ্ধদিগের দ্বারা যে সাধিত হইয়াছিল তাহা নিঃসংশয়ে বলিতে পারা যায়।

বাঙ্গালা দেশের প্রধান প্রধান নগর-সমূহে শত শত কীর্ত্তি বিদ্যমান ছিল, কাল-গতিতে সে সকলের চিহ্ন পর্য্যন্ত কোন কোন স্থান হইতে একেবারে বিলুপ্ত হইয়াছে আবার কোন কোন স্থান সেই সকল নিদর্শনের কিয়দংশ বক্ষে ধারণ করিয়া অতীত গৌরবের সাক্ষ্য দিতেছে। বিক্রমপুরে অনেক বৌদ্ধ স্তূপ, বিহার ও চৈত্যের ভগ্নাবশেষ এখনও বিদ্যমান আছে—বৌদ্ধ-কীর্ত্তির শত শত নিদর্শন এখনও পথিকের নয়ন পথে পতিত হয়, কিন্তু এগুলিকে কালের কবল হইতে রক্ষা করা নিতান্ত আবশ্যক। এই চিহ্নগুলির অধিকাংশই প্রবল-স্রোতা পদ্মার কুক্ষিগত হইলেও ইতিহাস বিক্রমপুরের অতীত গৌরব-কাহিনী চিরকাল বহন করিয়া থাকিবে। ঐ সকল লুপ্ত-রত্নের উদ্ধার আমাদের ঐতিহাসিকদিগের কি কর্ত্তব্য নয়? বিক্রমপুর অদ্বিতীয় বৌদ্ধ-পণ্ডিত দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের জন্মভূমি। তাঁহার ন্যায় ধীশক্তিসম্পন্ন মনীষী তখন ভারতবর্ষে ও তিব্বতে ছিলনা; তিনি ৯৮০ খৃষ্টাব্দে গৌড়ীয় রাজবংশে বিক্রমপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম কল্যাণশ্রী ছিল। তিব্বত হইতে সময় সময় বৌদ্ধগণ দীপঙ্করের জন্মভূমি দর্শনেচ্ছায় বিক্রমপুরে আসিয়া থাকেন। কিন্তু বিক্রমপুরের কোন্ স্থানটী তাঁহার জন্মস্থান তাঁহারা তাহার মীমাংসা বিষয়ে বড়ই গোলযোগে পড়েন। সম্প্রতি আমাদের যোগেন্দ্র বাবু বজ্রযোগিনীকেই দীপঙ্করের জন্মস্থান বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের এবিষয়ের যাথার্থ্য নির্ণয়ে সচেষ্ট হওয়া উচিত।

ধনে, মানে, পাণ্ডিত্যে ও জ্ঞান-গৌরবে একদিন যে দেশ বাঙ্গালার মুকুটমণি ছিল, যে পুণ্যপীঠে একদিন বঙ্গবীর কেদার রায়ের অপূর্ব্ব

রণলীলা ও দেশ-হিতৈষিতা, পূর্ণবিকসিত হইয়া বাঙ্গালীর বাহুবলের পরিচয় প্রদান করিয়াছিল,—যাহার অঙ্কে পাল-বংশীয় রাজগণের রাজধানী গৌরবময় রামপাল নগর শোভা পাইত, অতীতের সেই "বিক্রমে বিক্রমপুর" সকল সম্পদ্ হারাইয়া গৌরবের স্মৃতিমাত্র লইয়া দণ্ডায়মান! বিক্রমপুরের কথা মনে হইলে, এখনও আমাদের কত কথা মনে পড়িয়া অতীতের কত সুবর্ণময় ছবি মানসপটে অঙ্কিত করিয়া দেয়। চাঁদ ও কেদার রায়ের আত্মত্যাগের লীলাভূমি, বঙ্গীয় সেন ও পালরাজগণের গৌরবময় সমৃদ্ধিশালী রাজধানী, বল্লাল দীঘী, চাঁদ ও কেদার রায়ের মাতার শ্মশানোপরি প্রতিষ্ঠিত রাজাবাড়ীর মঠ, বাবা আদমের মস্জিদ্, কেদার বাড়ী প্রভৃতি প্রাচীন কীর্ত্তিস্থান-সমূহ আজিও অতীতের স্মৃতির কতই না গৌরব সূচিত করিয়া দেয়! সমৃদ্ধিশালী রাজনগরের সে "নবরত্ন "পঞ্চরত্ন" "সপ্তদশরত্ন" বা 'শতরত্ন" ও "একবিংশরত্ন" প্রভৃতি সে সৌন্দর্য্যবিশিষ্ট, কারুকার্য্যময়ী সৌধাবলী একদিন বঙ্গদেশে স্থাপত্য কৌশলের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিয়াছিল, কালের কুটিল গতিতে সে সমস্ত পদ্মার কুক্ষিগত হইয়াছে।

স্নেহাস্পদ বন্ধুবর আজ অতীত-স্মৃতির অপূর্ব্ব লীলাস্থল সেই বিক্রমপুরের ইতিহাস প্রণয়ন করিয়া কেবল যে বঙ্গীয় ইতিহাস-সঙ্কলনে কতকটা সাহায্য করিলেন, তাহা নহে, বঙ্গের শেষবীর কেদার রায়ের পূত স্মৃতি-বিজড়িত তীর্থস্থানের পরিচয় প্রদানে বাঙ্গালীর জাতীয়-জীবন গঠনের পথ সুগম করিয়া দিলেন। বঙ্গভাষা বলিয়া নয়, সমগ্র বঙ্গদেশ ও বাঙ্গালীজাতি এজন্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ।

আশা করি, বঙ্গীয় পাঠক পাঠিকাগণের নিকট বাঙ্গালীর এই জাতীয় ইতিহাস সম্যক্ আদৃত হইবে। এই পূত নির্ম্মাল্য গ্রহণে তাঁহারা নবীন গ্রন্থকারকে আরও ঐতিহাসিক অনুসন্ধান ও রচনার জন্য অধিকতর উৎসাহিত করিবেন। আর যাঁহারা স্বদেশের ইতিহাস খানিকে

ভবিষ্যতে আরও পূর্ণাবয়ব করিবার জন্য বিক্রমপুর অঞ্চলের প্রাচীন বংশের বিবরণ, প্রাচীন কিম্বদন্তী সংগ্রহ এবং অন্যান্য জ্ঞাতব্য কথার আরও নূতন নূতন বিষয় সংগ্রহ করিয়া দিয়া গ্রন্থকারকে সাহায্য করিবেন তাঁহারাই ধন্য হইবেন, তাঁহারাই সমগ্র দেশের ধন্যবাদ লাভ করিবেন এবং জননী জন্মভূমির প্রতি যথার্থ ভক্তি ও প্রীতি প্রকাশ করিয়া স্বদেশের গৌরব আরও বর্দ্ধিত করিবেন। অলমিতি বিস্তরেণ।

১৩১৬ সাল।
৩০ এ আশ্বিন।
কলিকাতা।

শ্রীঅমূল্যচরণ ঘোষ।
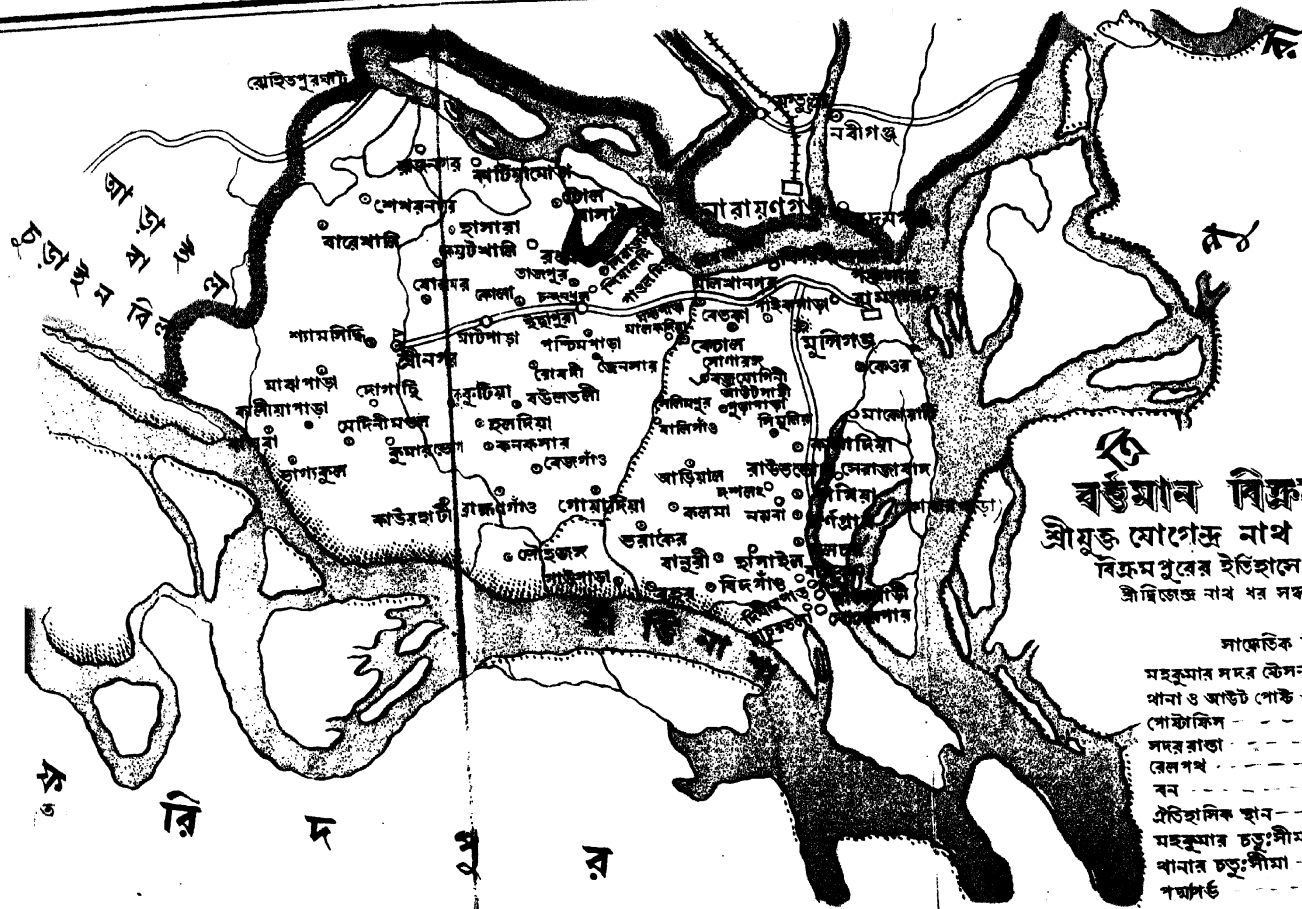
বর্ত্তমান বিক্রমপুর
শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র নাথ গুপ্ত-প্রণীত
বিক্রমপুরের ইতিহাসের জন্য
শ্রীদ্বিজেন্দ্র নাথ ধর সঙ্কলিত।
সাঙ্কেতিক চিহ্ন
মহকুমার সদর ষ্টেসন
থানা ও আউট পোষ্ট
পোষ্টাফিস
সদর রাস্তা
রেলপথ
বন
ঐতিহাসিক স্থান
মহকুমার চতুঃসীমা
থানার চতুঃসীমা
পদ্মাপাড়
নারায়ণগঞ্জ
নবীগঞ্জ
মুন্সিগঞ্জ
শ্রীনগর
শ্যামসিদ্ধি
মাঝপাড়া
দোগাছি
হাসারা
বারেখালি
শেখরনগর
মাচপাড়া
পশ্চিমপাড়া
কেওর
কনকসার
বেজগাঁও
আড়িয়াল
কলমা
ভরাকর
মেদিনীমণ্ডল
ভাগ্যকুল
কাউরহাটী
গোয়ালদিয়া
লৌহজঙ্গ
বাসুরী

গ্রন্থকারের নিবেদন।

সোণার শৈশবে মা ও দিদিমার মুখে যখন রামপালের কাহিনী শুনিতাম, সে গজারী বৃক্ষের কথা, রামপাল দীঘির কথা, বল্লাল রাজার যুদ্ধ, রাণীদের অগ্নিকুণ্ডে আত্মবিসর্জ্জন, কেদার রায়ের জীবনোৎসর্গ সে কাহিনী শুনিতে শুনিতে আত্মহারা হইয়া যাইতাম আরও শুনিতে সাধ যাইত, কিন্তু তাঁহারা আমার সেই সাধ পূর্ণ করিতে পারিতেন না; সেই শৈশবেই বিক্রমপুরের অতীত গৌরবের পুণ্য ইতিহাস আমার হৃদয়ে গাঢ়রূপে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল। তারপর বয়ঃবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সে সুপ্ত বাসনা জাগরিত হইয়া আমাকে দেশের ইতিহাস রচনায় উদ্বুদ্ধ করে, তাহারি ফলে সাত আটবৎসরের পরিশ্রমের পর নানা বাধা বিঘ্ন ও শোক-ঝঞ্ঝার ভিতর দিয়া এতদিনে বিক্রমপুরের ইতিহাস জন সাধারণের নিকট উপস্থিত করিতে সমর্থ হইয়াছি।

আমার ন্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তির পক্ষে বিক্রমপুরের ন্যায় প্রাচীন ও ইতিহাস-বিখ্যাত প্রসিদ্ধ স্থানের ইতিহাস রচনা করিতে যাওয়া যে ধৃষ্টতা, তাহা বুঝিয়াও যে কেন আমি এমন গুরুতর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, তাহার উত্তর দিতে আমি অক্ষম। ছেলে মাকে ভালবাসে, মায়ের কথা শুনিতে ও বলিতে তাহার ভাল লাগে, তার শৈশব-সুলভ সরলতা-পূর্ণ বাক্য-বিন্যাসে সে মায়ের কতই না গুণ বর্ণনা করে এবং তাহাতেই তাহার তৃপ্তি হয়; তেমনি আমার মাতৃভূমির প্রতি তরু, প্রতি লতা, প্রতি মসজিদ, প্রতি মঠ, প্রতি দেবালয় ও প্রতি মৃত্তিকা কণার মধ্য হইতে বিশ্বজননীর যে চেতনাময় আহ্বান আমাকে তাঁহারি গুণগানে হৃদয়ে প্রেরণা জাগাইয়া দিয়াছিল,—ইহা কেবল তাহারি বিকাশ।

এরূপ বিরাট ব্যাপার আমার দ্বারা সুচারুরূপে সম্পাদিত হই
এরূপ অন্ধ বিশ্বাস আমার নাই এবং তাহা থাকিতেও পারেনা।
দেশের প্রাচীন ইতিহাস অন্ধতমসাচ্ছন্ন, সে দেশের ইতিহাসালো
করা যে কিরূপ দুরূহ ব্যাপার তাহা ভুক্তভোগী ব্যতীত অপরের
অনুধাবনা করা অসম্ভব। কাজেই গ্রন্থ মধ্যে বহু ত্রুটি বিচ্যুতি প
লক্ষিত হইবে তাহা আমি বিশেষরূপেই জ্ঞাত আছি, তবে এ অ
করাও বোধ হয় অসঙ্গত নহে যে উদার হৃদয় পাঠকবর্গের দৃষ্টি সে দি
ধাবিত হইবে না।

প্রথমে ময়মনসিংহ হইতে প্রকাশিত 'আরতি' নামক মাসি
পত্রিকাতে 'বিক্রমপুরের ইতিবৃত্ত' নামে বিক্রমপুরের ইতিহাসের কতক
প্রকাশিত হয়, তৎপরে 'প্রবাসী' 'জাহ্নবী' 'নব্যভারত' 'সুপ্রভা
'মানসী', 'ঐতিহাসিক চিত্র' ও 'সাহিত্য' প্রভৃতি মাসিক পত্রিকাদিতে
এতদ্ সম্পর্কিত বহুপ্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইয়াছিল। এখন সে সব
প্রবন্ধাদি সংশোধিত, পরিবর্ত্তিত ও বহু নূতন নূতন বিষয় সন্নিবিষ্ট করি
বিক্রমপুরের ইতিহাস প্রকাশ করিলাম। অতি প্রাচীনকাল হই
বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত বিক্রমপুরের সমগ্র ইতিহাস যথাসাধ্য আলোচ
করিয়াছি, প্রাচীন কিম্বদন্তী সমূহও উপেক্ষা করি নাই। নানা প্রক
প্রাকৃতিক বিপ্লব হেতু ও সময়ের পরিবর্ত্তনে বিক্রমপুরের এতদূ
পরিবর্ত্তন হইয়াছে যে প্রকৃত প্রাচীন ইতিহাস অনেকস্থলে যথার্থরূ
জ্ঞাত হওয়া অসম্ভব; দিন দিন ইতিহাসানুশীলনের সঙ্গে সঙ্গে ব
নূতন নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হওয়ায় বহু প্রাচীন সিদ্ধান্ত ভ্রান্ত ও নবী
সিদ্ধান্ত সত্য বলিয়া গৃহীত হওয়ায় ইতিহাসের প্রকৃত সত্য এখ
পর্য্যন্ত ও সম্পূর্ণরূপে উদ্ঘাটিত হইয়াছে বলিয়া মনে করি না। আ
ইতিহাসের পক্ষে তাহা কখনই সম্ভবপর নহে। কাজেই আমরা যা
লিপিবদ্ধ করিয়াছি তাহাই যে অভ্রান্ত সত্য এমন কথা কেমন করিয়

বলিব ? বঙ্গ-গৌরব প্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিদ্ স্বর্গীয় রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়ের ন্যায় মহৎ ব্যক্তির ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তসমূহই যখন দিন দিন ভ্রান্ত বলিয়া প্রমাণিত হইতেছে, তখন আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তির পক্ষে কোন কথা জোর করিয়া বলিতে যাওয়া ধৃষ্টতা নহে কি ?

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, এই গ্রন্থ সংকলনে যাঁহারা আমাকে সাহায্য করিয়াছেন তাঁহাদের প্রত্যেকের নিকট আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। বিক্রমপুরের অধিবাসিবৃন্দের মধ্যে যাঁহারা সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদের নামোল্লেখ না করিলেও বোধ হয় বিশেষ ত্রুটী বলিয়া বিবেচিত হইবে না। তাঁহাদের সংখ্যাও অনেক। কেবল নামের তালিকাই দিতে গেলে, দুই তিন পৃষ্ঠা হইয়া পড়িবে। তাহা পাঠে তাঁহাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা অপেক্ষা, পাঠকের প্রতি অত্যাচার করা হইবে। কাজেই আমার তাহাতে নিরস্ত হইতে হইল, এবং আমার স্বদেশী বন্ধুবর্গও সেজন্য আমায় অকৃতজ্ঞ ভাবিয়া ক্ষুব্ধ হইবেন তাহাও আমার মনে হয় না।

এতদতিরিক্ত যাঁহারা আমাকে সাহায্য করিরাছেন তন্মধ্যে বিখ্যাত 'প্রবাসী' ও 'মডার্ণ রিভিউর', সম্পাদক শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এম, এ, মহোদয়ও, ময়মনসিংহের ইতিহাস প্রণেতা, বন্ধুবর শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মজুমদার এম, আর, এ, এস্, মহোদয়ের নাম উল্লেখ যোগ্য। শ্রদ্ধাভাজন রামানন্দ বাবু আমাকে কয়েক খানা হাফটোন্ ব্লক প্রদান করিয়া এবং কেদার বাবু ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের এসিয়াটিক সোসাইটীর জার্ণেলে প্রকাশিত রাজাবাড়ীর মঠের একখানা লিথো-চিত্র সংগ্রহ করিয়া দিয়া উপকৃত করিয়াছেন। আর একজন মহাত্মার কথাও এখানে উল্লেখ না করিলে আমার পক্ষে অকৃতজ্ঞতা হয়, তিনি ময়মনসিংহ কালীপুরের প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী সাহিত্যসেবী বিখ্যাত পর্য্যটক শ্রীযুক্ত ধরণীকান্ত লাহিড়ী চৌধুরী মহাশয়, ইঁহার স্নেহ-ঋণ আমার পক্ষে অপরিশোধনীয়।

যে সকল প্রাচীন ঐতিহাসিক গ্রন্থ আমার ন্যায় দরিদ্রের পক্ষে সংগ্রহ করা অসম্ভব হইত, তিনি আমার সাহায্যার্থ বহু অর্থ ব্যয় করিয়াও সে সকল গ্রন্থাদি ক্রয় করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার এ দয়া ও স্নেহ আমি জীবনে কখনও ভুলিতে পারিব না।

আজ বিক্রমপুরের ইতিহাস প্রকাশিত হইল, কিন্তু আমার হৃদয় শোকভারে নত হইয়া আসিতেছে। দু'জনের শোক-স্মৃতি আমাকে ব্যথিত করিতেছে, একজন আমার পরম পূজ্যপাদ স্বর্গগত পিতৃদেব, অপর আমাদের গ্রামবাসী আমার পরম স্নেহভাজন স্বর্গীয় প্রভাতচন্দ্র ভট্টাচার্য্য। আমার দুর্ভাগ্য—পিতৃদেবের জীবিতাবস্থায় তাঁহার আদেশে রচিত এই পুণ্য-ইতিহাস তাঁহার চরণকমলে অর্পণ করিতে পারিলাম না। আর প্রভাত, সে আমার ছাত্র ও সুহৃদ উভয়ই ছিল। এই বিক্রমপুরের ইতিহাসের জন্য তাহার কতই না আগ্রহ ছিল। যেদিন বিক্রমপুরের ইতিহাস প্রেসে দিই, সেদিন তাহার নয়নে যে উজ্জ্বল প্রফুল্লতার বিকাশ দেখিয়াছিলাম, মুদ্রিত গ্রন্থখানি তাহার হস্তে অর্পণ করিয়া আর সে আনন্দ লাভ করিতে পারিলাম না। প্রভাত, প্রভাতীতারার মত তাহার অপাপ-বিদ্ধ সরল সুন্দর হৃদয় লইয়া যৌবনের বসন্ত প্রভাতে সেফালীর ন্যায় ঝরিয়া গিয়াছে! আজ দু'বিন্দু অশ্রুর তীব্র-তাড়নায় আমার অন্তরের অন্তস্থল পর্য্যন্ত ব্যথিত হইতেছে!

বহু ভাষা এবং ইতিহাসবিৎ পণ্ডিত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ মহাশয় আমার এই সামান্য পুস্তকের ভূমিকা লিখিবার ভার লইয়া আমায় যে কৃতজ্ঞতা ও স্নেহ-পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা প্রকাশের ভাষা আমার নাই।

যদি গ্রন্থ মধ্যে কেহ কোনও ভ্রমপ্রমাদ দর্শন করেন, তাহা আমাকে জানাইলে ভবিষ্যৎ-সংস্করণে কৃতজ্ঞতার সহিত সংশোধন করিয়া দিব। দেশের লোকের নিকট আশা ও উৎসাহ পাইলে শীঘ্রই বিক্রমপুর

কাহিনী ও বিক্রমপুরের পল্লীবিবরণ লইয়া উপস্থিত হইবার বাসনা আছে।

বিক্রমপুরের ইতিহাসকে পরিষদ্ গ্রন্থাবলীভুক্ত করা হইল। ইতি

পোঃ মূলচর—মুন্সীবাড়ী
মহেন্দ্র-কুটীর—জিঃ ঢাকা
৩০শে আশ্বিন ১৩১৬।

বিনীত নিবেদক
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

সূচীপত্র।

——০——

প্রথম অধ্যায়।

প্রাচীন যুগ।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

বৌদ্ধযুগ।

তৃতীয় অধ্যায়।

হিন্দু শাসনকাল।

চতুর্থ অধ্যায়।

রামপাল।

পঞ্চম অধ্যায়।

পাল ও সেন রাজাদিগের সময়ে বিক্রমপুরের অবস্থা।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

পাঠান শাসনকাল।

সপ্তম অধ্যায়।

মোগল শাসনকাল।

অষ্টম অধ্যায়।

ইংরেজ শাসনকাল।

নবম অধ্যায়।

প্রাচীন সাহিত্য।

দশম অধ্যায়।

বর্ত্তমান সাহিত্য ও সাহিত্য সেবিগণ।

একাদশ অধ্যায়।

বিক্রমপুরের মৃত ও জীবিত প্রখ্যাতনামা পণ্ডিতগণের নাম ও প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের সংক্ষিপ্ত জীবনী।

দ্বাদশ অধ্যায়।

বিবিধ।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

প্রাচীন জমিদার বংশ।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

গ্রন্থ-মুদ্রাঙ্কণের ত্রস্ততা বশতঃ এবার বহু মুদ্রাকর-প্রমাদ রহিয়া গেল, আশা করি আমার এ অনিচ্ছা কৃত ত্রুটি সুধীবর্গ মার্জ্জনা করিবেন। আর একটী কথা এখানে বলা আবশ্যক যে বন্ধুবর শ্রীযুক্ত অমলেন্দু গুপ্ত মহাশয় এ গ্রন্থ রচনায় আমাকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন, স্বর্গীয় গুরুপ্রসাদ সেন মহাশয়ের জীবন চরিতটি তাঁহারি লিখিত, তাঁহার এ নিঃস্বার্থ উপকারের জন্য আমি চিরকৃতজ্ঞ। এ কথাকয়টি গ্রন্থকারের নিবেদনে সন্নিবেশিত হওয়াই উচিত ছিল, কিন্তু ত্রস্ততা বশতঃ তাহা হয় নাই।—বিনীত গ্রন্থকার।

চিত্র-সূচী।

———:০:———

রাজাবাড়ীর মঠ।

বিক্রমপুরের ইতিহাস।

প্রথম অধ্যায়।

—:o:—

প্রাচীন যুগ।

বৈদিকযুগ।

বৈদিকযুগে যখন আর্য্যগণ প্রথমে ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন, তখন তাঁহারা পশ্চিমে সুলেমান গিরিশ্রেণী এবং পূর্ব্বে পবিত্রসলিলা গঙ্গা যমুনার পুণ্য-সঙ্গম, উত্তরে তুষার-শুভ্র হিমালয় হইতে দক্ষিণে সিন্ধু সঙ্গম পর্য্যন্ত প্রকৃতির এই লীলানিকেতনের মধ্যেই তাঁহাদের বাসস্থান সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। আর্য্যগণের অধিকৃত এই ভূমিখণ্ডই আর্য্যাবর্ত্ত নামে অভিহিত। তাঁহাদের আগমনের পূর্ব্বে এই সকল স্থান অনার্য্য অধিবাসীদের দ্বারা অধিকৃত ছিল। আর্য্যগণকর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া অসভ্য প্রাচীন অধিবাসিবৃন্দ বন হইতে বনান্তরে আশ্রয় গ্রহণ করিতে লাগিল। বৈদিকযুগে আর্য্যগণ আর্য্যাবর্ত্তে বাস করিতেন বলিয়া যে ইহার বহির্ভূত অন্য কোনও প্রদেশের নাম অবগত ছিলেন না, তাহা নহে, কারণ ঋগ্বেদের ঐতরেয় আরণ্যকে (২।১।১) সর্ব্বপ্রথমে বঙ্গ নাম দেখিতে পাওয়া যায়। যথা :—

"ইমাঃ প্রজাস্তিস্রো অত্যায় মায়ংস্তানিমানি বয়াংসি।
বঙ্গাবগধাশ্চেরপাদানাঙ্গা অর্কমভিতো বিবিশ্র ইতি॥"

অর্থাৎ বঙ্গদেশবাসিগণ, মগধবাসিগণ এবং চেরজনপদবাসিগণ এই ত্রিবিধ প্রজাই কি দুর্ব্বলতা, কি দুরাহার ও কি বহু অপত্যতায় কাক, চটক ও পারাবতাদ সদৃশ।" ইহাদ্বারা সহজেই প্রতীয়মান হয় যে, বেদের সময় বাঙ্গলা দেশের অধিবাসিবৃন্দ অনার্য্য ছিল। বৈদিক প্রভাবের পর সংহিতার আবির্ভাব। মনুসংহিতায়ও বঙ্গদেশের উল্লেখ দৃষ্ট হয়, তখন বঙ্গদেশ অরণ্যানীসঙ্কুল ও অনার্য্যগণের আবাসভূমি। এতদতিরিক্ত বঙ্গদেশের বিষয় কিছুই লিখিত নাই। রামায়ণ ও মহাভারতে বঙ্গের বহুল উল্লেখ দৃষ্ট হয়। * কিন্তু রামায়ণ ও মহাভারতের বর্ণনা পাঠে যে ভৌগোলিক সিদ্ধান্তে উপনীত হই, তাহাদ্বারা প্রমাণিত হয় যে মহাভারতও পৌরাণিক সময় হইতে সেনবংশীয় নৃপতিগণের রাজত্বকাল পর্য্যন্ত বর্ত্তমান সময়ে যাহা পূর্ব্ববঙ্গ নামে অভিহিত কেবল তাহাকেই বঙ্গ বলিত। † বর্ত্তমান ঢাকা জেলার অনেকাংশ এবং ফরিদপুর জেলার কতকাংশ সেনরাজগণের রাজত্ব সময়ে বিক্রমপুর নামে অভিহিত ছিল. সেনবংশীয় বিশ্বরূপ সেনের তাম্রশাসন দ্বারা ইহা বিশিষ্টরূপে প্রমাণিত হয়। ‡ তবে এ কথা ঠিক্ যে বর্ত্তমান সময়ে যে শ্যামল বনরাজিনীলা শস্যসম্পৎশালিনী ভূমিখণ্ড বহু লোকের আবাস ভূমি, পূর্ব্বে যে তাহার কতকাংশ সাগরের অতল বারিরাশির মধ্যে নিমগ্ন ছিল তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। নবম শতাব্দীতে বঙ্গোপসাগরের তটব্যাপী কতকগুলি স্থান সমতট বলিয়া পরিচিত ছিল। চৈনিক পরিব্রাজক য়ুয়ন্ চয়ঙের ভ্রমণবৃত্তান্ত পাঠে জ্ঞাত হওয়া যায় যে তখন

মনুসংহিতা।

রামায়ণ ও মহাভারত।

নবম শতাব্দীতে বিক্রমপুর।

* রামায়ণ অযোধ্যাকাণ্ড দশম অধ্যায়। মহাভারত আদিপর্ব্ব ১০৪ অধ্যায়।

† বঙ্কিম বাবুর 'বিবিধ প্রবন্ধ' ও 'বিশ্বকোষ' প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।

‡ Journal of the Asiatic Society of Bengal for 1895.

বিক্রমপুর এই সমতটাখ্যা প্রাপ্ত স্থান সমূহের অন্তর্ভুক্ত ছিল। মিঃ বিভারেজ তৎপ্রণীত বাখরগঞ্জের ইতিহাসে লিখিয়াছেন যে সমতটাখ্যার পূর্ব্বে বিক্রমপুরের দক্ষিণভাগ পর্য্যন্ত সমুদ্র বিস্তৃত ছিল;* মধ্যে মধ্যে কেবল দুই একটী দ্বীপের ন্যায় স্থান লোকচক্ষুর দৃষ্টিগোচর হইত। ইদিলপুর, চন্দ্রদ্বীপ সাহাবাজপুর, হাতিয়া, সন্দ্বীপ প্রভৃতি স্থান যে এইরূপ চড়া পড়িয়া উৎপন্ন হইয়াছে তাহা নিঃসন্দেহ।

সনকট সাকাট ও সকাট।

মিনহাজ-ই-সিরাজ তৎপ্রণীত "তবকত-ই-নাশিরি" নামক পুস্তকে সমতটকে কোন স্থানে সনকট, কোথা বা সাকাট বা সকাট এইরূপ লিখিয়া গিয়াছেন।† বিক্রমপুর অতি প্রাচীন স্থান। যে সময়ে নবদ্বীপ, গৌড়, সোণার গাঁ, ঢাকা, সপ্তগ্রাম প্রভৃতি স্থানসমূহের নাম জনসাধারণের নিকট পরিচিত হয় নাই, তাহারও অতি পূর্ব্বে বিক্রমপুর শিক্ষায়, সভ্যতায় ও উন্নতিতে সর্ব্বজন-পরিচিত ছিল। মুর্শিদাবাদ, বর্দ্ধমান প্রভৃতি স্থান বিক্রমপুরের বহু পরে খ্যাতি লাভ

বিক্রমপুরের প্রাচীনত্ব।

---

* যুয়ন্-চয়ঙের সময়ে মেঘনাদ (মেঘনা) নদ রামপালের নিকটেই বোধ হয় সাগর দর্শন করিয়াছিলেন। সে সময়ে বঙ্গ ও ত্রিপুরার মধ্যে সাগর-শাখা বিস্তৃত ছিল। যুয়ন্-চয়ঙের অন্যূন এক শতাব্দী পরে যখন শ্রীহর্ষ আদিশূরের রাজবাটীতে উপস্থিত হন তখনও তিনি রাজধানীর নিকটেই সমুদ্র দর্শন করিয়াছিলেন। নচেৎ তিনি কখনই অর্ণব বর্ণনা করিতেন না। বান্ধব ষষ্ঠ খণ্ড, পঞ্চম সংখ্যা ১২৮৯।

† সমতটের স্থান নির্দ্দেশ সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত দেখিতে পাওয়া যায়, পুরাতত্ত্ববিদ্ কানিংহামের মতে "The delta of the Ganges and its chief city which occupied the site of the modern Jessore." [A. G. I. P. 50 &c] এই স্থানই সমতট। ফার্গুসনের মতে বর্ত্তমান ঢাকা জেলাই সমতট, আর ওয়াটার্সের মতে উহা ঢাকার দক্ষিণে এবং ফরিদপুর জেলার পূর্ব্বভাগে অবস্থিত ছিল, আমাদের নিকট ইহাই যথার্থ বলিয়া অনুমিত হয়।

করিতে সমর্থ হইয়াছে। "দিগ্বিজয় প্রকাশ" নামক প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে বিক্রমপুর সম্বন্ধে লিখিত আছে :—

"ঢক্কেশ্বরী পূর্ব্বভাগে যোজনদ্বয়ব্যত্যয়ে।
ইচ্ছামতীনদীপার্শ্বে স্বর্ণগ্রামো বিরাজতে॥
দিলপুরোত্তরে ভাগে ব্রহ্মপুত্রস্য পশ্চিমে।
বৃদ্ধগঙ্গা দক্ষিণে চ পূর্ব্বে পদ্মানদী বরাৎ॥
বিক্রমভূপবাসত্বাৎ বিক্রমপুরমতো বিদুঃ।
অর্দ্ধোদয়স্য যোগে চ অভূৎ কল্পতরুর্নৃপাঃ॥
ইচ্ছামতীনদীতীরে স্বর্ণমানঞ্চকার।
দরিদ্রেভ্যো দ্বিজেভ্যশ্চ দত্তবান্ বহুলং ধনম্॥
বিদ্বজ্জনানাং বাসশ্চ বিক্রমপুর্য্যাঞ্চ ভূরিশঃ।
পরতালভূমিপস্য তোষিস্থলং বিদুর্বুধাঃ॥"

(বঙ্গাল-পরতাল বর্ণনে ৮৮-৯২)।

অর্থাৎ ঢক্কেশরীর পূর্ব্বদিকে দুই যোজন দূরে ইচ্ছামতীনাম্নী স্রোতস্বিনীর তীরে সুবর্ণগ্রাম অবস্থিত। ইদিলপুরের উত্তরে ব্রহ্মপুত্র নদের পশ্চিমদিকে বুড়ীগঙ্গার দক্ষিণদিকেও পদ্মানদীর পূর্ব্বতীরে বিক্রমপুর অবস্থিত। বিক্রমনামক রাজার বাস হেতু এই স্থান বিক্রমপুর নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে, পূর্ব্বকালে অর্দ্ধোদয়-যোগের সময় রাজা কল্পতরু হইয়া ইচ্ছামতী নদীর তীরে স্বর্ণমান করিয়াছিলেন ও তাহাতে দরিদ্রদিগকে বহু ধনরত্ন দান করিয়াছিলেন। বিক্রমপুরে বহু বিদ্বান্ ব্যক্তির বাস, পরতাল রাজার প্রমোদ স্থান বলিয়া ইহা বিখ্যাত।

বিক্রমপুরের নামোৎপত্তির কারণ।

বিক্রমপুরের নামোৎপত্তি সম্বন্ধে যে সকল প্রবাদ-বাক্য প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে "বিক্রমভূপবাসত্বাৎ বিক্রম পুরমতোবিদুঃ" ইহাও অন্যতর। আমরা এখানে অনুসন্ধিৎসু পাঠক-পাঠিকা গণের

কৌতূহল-পরিতৃপ্তির জন্য আরও কয়েকটী জনপ্রবাদের উল্লেখ করিলাম। (১) বিক্রমপুরের সর্ব্বত্র এইরূপ একটী জনপ্রবাদ প্রচলিত আছে যে, ভ্রাতা ভর্ত্তৃহরির সহিত কোনও কারণে রাজা বিক্রমাদিত্যের মনোমালিন্য হয়, তাহাতে তিনি দুঃখিত হইয়া সহোদরের প্রতি রাজ্যভার অর্পণান্তর দেশ-ভ্রমণে বহির্গত হন, এবং সাগরতীরবর্ত্তী সমতট-প্রদেশের স্থান-বিশেষের নৈসর্গিক সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া কিছুদিনের জন্য তথায় অবস্থিতি করেন। তাঁহার নামানুসারে উহাই বিক্রমপুর আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। * এই বিষয়ের সত্যতা সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ সন্দেহ হয়, কারণ উজ্জয়িনীর বিখ্যাত রাজা বিক্রমাদিত্য যে কখনও পূর্ব্বাঞ্চলে আগমন করিয়াছিলেন তাহার কোনও ঐতিহাসিক প্রমাণ নাই, এমনকি তাঁহার নাম ও রাজত্ব সম্বন্ধে নানারূপ মতভেদ বিদ্যমান। (২) অতি প্রামাণিক 'বিপ্রকুল কল্পলতিকা' পাঠে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, সেনবংশীয় রাজন্যবর্গের পূর্ব্বপুরুষ অর্থাৎ নিভুজ সেন, বীরসেন প্রভৃতি দাক্ষিণাত্য হইতে বঙ্গদেশে আগমন করেন। তাঁহাদের বংশধর বিক্রমসেনই বিক্রমপুর নগরের স্থাপয়িতা। আমাদের মতেও ইহাই সমীচীন বলিয়া প্রতীয়মান হয়। পাঠকের কৌতূহল তৃপ্তির জন্য আমরা উক্ত গ্রন্থের স্থলবিশেষ এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম।

"দাক্ষিণাত্য বৈদ্যরাজশ্চৈকোঽশ্বপতিসেনকঃ।
তদ্বংশে জনিতশ্চন্দ্রকেতুসেনো মহাধনঃ॥
তস্য বংশে বীরসেনো ভূপঃ পরপুরঞ্জয়ঃ।
তদ্বংশে বিক্রমসেনোজাতঃ পরমধার্ম্মিকঃ॥
কৃতবান্ বিক্রমপুরীং স্বনাম্নাভিহিতাং সুধীঃ।"

* There is a tradition that the celebrated Hindu Raja Bickramaditya held his court in the southern portion of the District for some years, and gave his name to the Purguna of Bikrampur. Hunter's statistical account of Bengal p. 118.

কেহ কেহ আবার এই মতও প্রকাশ করেন যে, সেনবংশীয় নৃপতিগণ যে স্থানে বাস করিয়া রাজদণ্ড পরিচালনা করেন, সেই প্রিয়তম স্থানকেই "বিক্রমপুর" এই অতি গৌরবজনক নামে অভিহিত করিয়াছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ সেন-রাজগণ বঙ্গে রাজ্যস্থাপন করিয়া ভারতের বিভিন্নাংশে স্বকীয় আধিপত্য বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহাদের শাসন সময়ে বিক্রমপুর শিক্ষায়, সভ্যতায় ও ধনৈশ্বর্য্যে ভারতের গৌরবের সামগ্রী ছিল। যে বিক্রমপুর একদিন দেশে বিদেশে শিক্ষা ও জ্ঞান বিস্তার-পূর্ব্বক স্বাধীনতা ও বীরত্বের লীলাক্ষেত্ররূপে জগতের শ্রদ্ধাভক্তি আকর্ষণে সমর্থ হইয়াছিল; সেই বিক্রমপুর বর্ত্তমান সময়ে নিষ্প্রভ ও মলিন। হায়! যে মহিমমণ্ডিত সুরম্য ও সুবিশাল রাজপ্রাসাদ একদিন উন্নতশীর্ষে সেনরাজগণের ধন-গৌরব জগৎ সমক্ষে ঘোষণা করিয়াছিল, যে হর্ম্ম্যাবৃত আনন্দ-কোলাহল-মুখরিত রাজধানী একদিন সেনরাজত্বের সুখ-সমৃদ্ধির বার্ত্তা দেশ দেশান্তরে প্রচার করিয়াছিল, তাহা আজ কবি-কল্পনার বিষয়ীভূত হইয়া রহিয়াছে। সময়ের কি অচিন্তনীয় পরিবর্ত্তন।

সেনবংশীয় নৃপতিগণের সময়ে বিক্রমপুর।

বর্ত্তমান সময়ে পদ্মার ভীষণ আক্রমণে বিক্রমপুর যেমন হতশ্রী এবং পূর্ব্বগৌরব-বিভব-শূন্য হইয়াছে, পূর্ব্বে এইরূপ ছিল না। তখন প্রাকৃতিক বৈষম্য-হেতু বিক্রমপুর দুই ভাগে বিভক্ত হয় নাই। (১)

প্রাচীন সীমা।

(১) পূর্ব্বে পদ্মা একটী শীর্ণকলেবরা স্রোতধারা ছিল—এবং তখন উহা উত্তর ও দক্ষিণ বিক্রমপুরের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া মেহদীগঞ্জের নিকট মেঘনার সহিত মিলিত হইত। বর্ত্তমান সময়ে উহা দুইটী স্বতন্ত্র শাখায় প্রবাহিত হইয়া মেঘনার সহিত মিলিত হইতেছে। উহার একটী শাখার নাম কীর্ত্তিনাশা এবং অপরটির নাম নয়া ভাঙ্গনী।'

১৭৮১ সনে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধিকার সময়ে, বোর্ড অব ডাইরেক্টরগণের

থাকবস্ত জরিপ হওয়ার পূর্ব্বে অর্থাৎ যখন রণভাওয়াল হইতে সমুদ্রতীর পর্য্যন্ত একটা ম্যাপ প্রস্তুত হয়, তখন কীর্ত্তিনাশার (পদ্মা) কোনও উল্লেখ উহাতে ছিল না। পূর্ব্বে অল্প পরিসরা কালীগঙ্গানদী বিক্রমপুরের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতিকল্পে এবং খাদ্যদ্রব্যাদির প্রাচুর্য্য-বিধানে যথেষ্ট সহায়তা করিত। উহার তীরবর্ত্তী পল্লী সমূহের শ্যামল সৌন্দর্য্য ও শস্যশ্যামল ক্ষেত্রনিচয়ের মনোমোহন দৃশ্য বিক্রমপুরকে বিদেশী পর্য্যটকের নিকট স্বর্ণ-কিরীট-মণ্ডিতা কমলার আবাসভূমি বলিয়াই প্রতিপন্ন করিত। সে শোভা-সম্পদ সর্ব্বধ্বংসকারী পদ্মার তরঙ্গ-প্রহারে কবি কল্পনায় পর্যাবসিত হইয়াছে। তখন পশ্চিমে পদ্মা, পূর্ব্ব-উত্তরে ধলেশ্বরী, দক্ষিণদিকে আরিয়লনদী ও কৃষ্ণসলিল

অনুমত্যানুসারে তৎকালীন বঙ্গদেশের সার্ব্বেয়ার জেনারল জেমস রেনেল, এফ, আর, এস, সাহেব ঢাকার ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহের যে ম্যাপ অঙ্কিত করেন, তাহাতে কালীগঙ্গার উল্লেখ আছে। সে সময়ে কালীগঙ্গা ধলেশ্বরী নদীর দক্ষিণাংশ হইতে আরম্ভ করিয়া বিক্রমপুরের মধ্যাংশ দিয়া প্রবাহিত হইয়া পদ্মার সহিত মিলিত হইয়াছিল। তখন ১ ইদ্রাপুর, (মুন্সীগঞ্জ) ২ ফিরিঙ্গিবাজার, ৩ আবদুল্লাপুর, ৪ মীরগঞ্জ, ৫ মাঝহাটী, ৬ সেরাজদী, ৭ রাজাবাড়ী, ৮ সেকেরনগর, ৯ হাসারা, ১০ ষোলঘর, ১১ বারইখালি, ১২ সুরপুপর, ১৩ ঠাওদিয়া, ১৪ বালীগাঁ, ১৫ মুনকিশর, ১৬ রাজাবাড়ী, ১৭ চণ্ডীপুর প্রভৃতি স্থানগুলি কালীগঙ্গার উত্তর তীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

বর্ত্তমান আইরলবিল তৎসময়ে চুরাইন বিল নামে প্রসিদ্ধ ছিল।

কালীগঙ্গা নদীর দক্ষিণ তটবর্ত্তী স্থান—১ মুলফৎগঞ্জ, ২ করাতীকল, ৩ রূপসা, ৪ কান্দাপাড়া, ৫ শ্যামপুর ও খীলগাঁ, ৬ সারেঙ্গা, ৮ চিকন্দী, ৯ গঙ্গানগর, ১০ রাধানগর, ১১ ঘাগটিয়া, ১২ মনকোট, ১৩ রাজনগর, ১৪ লড়িকুল ইত্যাদি।

মেঘনাতটে, কালীগঙ্গার দক্ষিণ—১ বুহার, ২ স্নানঘাটা, ৩ কার্ত্তিকপুর, ৪ ডলুই, ৫ বামগাঁও, ৬ ভয়রা, ৭ সাদকপুর, ৮ শ্রীরামপুর, ৯ পাতলাভাঙ্গা, ১০ সিরাজী, ১১ হুহুলিয়া, ১২ মনদিয়া (মিলন্দীয়া), ১৩ লঙ্গারদিয়া, ১৪ ঢেউখালী, ১৫ ছোট বাখরগঞ্জ, ১৬ পাঙ্গরা।

মেঘনাদ নদের সম্মিলিত সাগরাংশ,—এই চতুঃসীমামধ্যবর্ত্তী স্থানই বিক্রমপুর নামে সর্ব্বজন-পরিচিত ছিল।

জপ্সানিবাসী বৈদ্যকুলোদ্ভব লালা রামগতি রায় তাঁহার রচিত 'মায়া তিমির চন্দ্রিকা' নামক পুস্তকে যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাতেও কীর্ত্তিনাশা নদীর কোন উল্লেখ নাই। এই 'মায়া তিমির চন্দ্রিকা' দেড়শত বৎসরের পূর্ব্বে রচিত হয় নাই, অতএব ইহাই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে সে সময়েও "কীর্ত্তিনাশা" নামক কোন নদীর অস্তিত্ব ছিল না। মোটের উপর চাঁদ কেদার রায়ের কীর্ত্তি সমূহ ধ্বংস করিয়াই যে পদ্মা এই অপনাম লাভ করিয়াছে তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। (১)

মায়া তিমির চন্দ্রিকা ও বিক্রমপুর।

পদ্মাতটে কালীগঙ্গার দক্ষিণে—১ দীঘারিপাড়া, ২ রাজাখালী, ৩ ভাঙ্গাবাড়ী, ৪ কলারগাঁ, ৫ বালীসার, ৬ বুদারশাপ (বদরাসন), ৭ মাছুয়াখালী, ৮ গজারিয়া, ৯ সোনাপাড়া, ১০ সনরপুর,, ১১ সলুয়ারহাট, ১২ বগাও, ১৩ কুশারিয়া, ১৪ ইসলাচর, ১৫ মেন্দিগঞ্জ, ১৬ আবদুল্লাপুর, ১৭ সুলতানী, ১৮ কন্দর্পপুর। এই কন্দর্পপুরের নিকটই, মেঘনা ও পদ্মা মিলিত হইয়াছিল। হায়! কালের অত্যাশ্চর্য্য পরিবর্ত্তনে এই প্রায় ১২৫ বৎসরের মধ্যে বিক্রমপুরের এমন পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে যে, তাহা ভাবিতে গেলে বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়। স্থলভাগ জলে এবং জলভাগ স্থলে পরিবর্ত্তিত এবং এক নদীর স্থানে অন্য নদীর প্রাদুর্ভাব হইয়া একটী সম্পূর্ণ নূতন প্রদেশ স্থাপিত হইয়াছে। এই সমুদয় বিষয় মানচিত্রের সাহায্য ব্যতীত অবগত হইতে পারা অসম্ভব। কালীগঙ্গার বর্ত্তমান নাম পড়া বা পোড়াগঙ্গা। অদ্যাপিও বিক্রমপুরে উহার সঙ্কীর্ণ খাত দেখিতে পাওয়া যায়। মধ্যপাড়া জৈনসার প্রভৃতি গ্রামের নিকট দিয়া এখনও উহা ক্ষুদ্র দেহে প্রবাহিত হইয়া বিশ্বপতির লীলাকৌশল প্রকটিত করিতেছে। বর্ষার সময় ভিন্ন ইহাতে নৌকা চলাচলের উপযুক্ত পরিমাণ জলও থাকে না। উত্তর বিক্রমপুরে যেমন ইহার নাম পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তিত হইয়া পোড়া গঙ্গায় পরিণত হইয়াছে, দক্ষিণ বিক্রমপুরে তদ্রূপ হয় নাই; এখনও সেখানে কালীগঙ্গার ক্ষুদ্র খাতকে কালীগঙ্গাই বলিয়া থাকে।

(১) অনেকের বিশ্বাস যে পদ্মার প্রবল তরঙ্গে রাজা রাজবল্লভের কীর্ত্তিধ্বংস হওয়ার

আইন-ই-আকবরী গ্রন্থ পাঠে জানিতে পারা যায় যে মোগল রাজত্বের সময়ে বিক্রমপুর সরকার সোনার গাঁয়ের অন্তর্গত একটী পরগণা ছিল;

পরগণে বিক্রমপুর।

যথা (১) অবতার সাহাপুর, (২) আনচাগ, (৩) অবতার ও সমানপুর, (৪) বিক্রমপুর, (৫) বেলাদেওয়ার, (৬) বলদাখাল, (৭) বোয়ালিয়া, (৮) পারচাঁদে, (৯) বাটখারা, (১০) পলাশবাড়ী, (১১) চরদিয়া, (১২) ফুলরী, (১৩) পানহাটী, (১৪) তাহরা, (১৫) তাজপুর, (১৬) তিরকী, (১৭) যোগীদিয়া, (১৮) জেওয়ার বন্দর, (১৯) চোকেন্দী, (২০) চণ্ডীহার, (২১) চাঁদপুর, (২২) হাবেলী সোনার গাঁ, (২৩) মরু সহর, (২৪) মিজিরপুর, (২৫) দোহার, (২৬) ভাগডেরা, (২৭) দেখান সাহপুর, (২৮) দেওয়ানপুর, (২৯) দেকান ও সমানপুর, (৩০) রায়পুর, (৩১) সুখারগঞ্জ, (৩১) সেলিমপুর, (৩৩) সেলিমেবি, (৩৪) সয়জলকর, (৩৫) সুকাণ্ডশা, (৩৬) সেবারচল, (৩৭) শমসপুর, (৩৮) বাড়াপুর, (৩৯) গবদী, (৪০) কার্ত্তিকপুর, (৪১) কাঁদী, (৪২) কোলহরি, (৪৩) খাটিচুলাই, (৪৪) মারকোর,

---

পর হইতেই পদ্মার নাম "কীর্ত্তিনাশা" হইয়াছে। কোন কোন সাহিত্যসেবীকেও এইরূপ লিখিতে দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে। কিন্তু ইহা ভুল—চাঁদ কেদার রায়ের কীর্ত্তিনাশ হেতুই ইহার নাম "কীর্ত্তিনাশা" হইয়াছে। পরে রাজবল্লভের কীর্ত্তিরাশি ধ্বংস করায় উহা আরও দৃঢ়ীভূত হইয়াছে। ১২৭৬ সনে রাজনগর কীর্ত্তিনাশায় প্রবিষ্ট হয়,কিন্তু গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের সার্ভে ম্যাপেও পদ্মার নামের পরিবর্ত্তে কীর্ত্তিনাশা লেখা আছে। ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত Surgeon James Taylor কৃত "A sketch of the topography and statistics of Dacca নামক গ্রন্থের একস্থানে লিখিত আছে যে "The first of these channels, which is represented as the Calligunga in Rennel's Maps, is now called the Kirtinessa, or Seripur river." অতএব বিক্রমপুরের সন্নিকটস্থ পদ্মার নাম "কীর্ত্তিনাশা" যে রাজবল্লভের রাজনগরের ধ্বংসের পূর্ব্বে চাঁদরায় কেদার রায়ের কীর্ত্তিগ্রাস করায় হইয়াছে ইহাই ঠিক্।

(৪৫) মজসপুর, (৪৬) মেহার, (৪৭) মনোহরপুর, (৪৮) সাহীজল, (৪৯) নারায়ণপুর, (৫০) লেপুয়া কোর্ট, (৫১) হিমতী বাজু, (৫২) হাট ঘাটী।

এই বায়ান্ন মহালের রাজস্ব ১০,৩৩,১৩,৩৩৩ দাম * ছিল। তন্মধ্যে এক বিক্রমপুরের রাজস্বই ছিল ৩৩,৩৫,০৫৩ দাম। বিক্রমপুরের রাজস্ব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ছিল।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পঞ্চম রিপোর্টেও বিক্রমপুর পরগণার বিষয় লিখিত আছে। প্রাচীন দলিলাদি দৃষ্টে অনুমিত হয় যে বল্লাল পৌত্র বিশ্বরূপ সেনের রাজত্বের শেষ সময়েই বিক্রমপুর 'শাসনের' (বর্ত্তমান পরগণার স্থায় বিভাগ) সৃষ্টি হয় এবং সে সময় হইতে উহার একটী স্বতন্ত্র সনও প্রচলিত হইতে থাকে, এ বিষয় যথাস্থানে লিপিবদ্ধ হইল। সেন রাজত্বের ও পাঠান শাসনের শেষে মোগল রাজত্বের প্রারম্ভেই যে বিক্রমপুর পরগণা বিশেষ খ্যাতিমান হইয়া উঠে তাহার বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায়। মহারাজা বল্লাল সেন সমুদয় বঙ্গ রাঢ়, বারেন্দ্র, বাগরী, বঙ্গ ও মিথিলা এই পাঁচভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন। †

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির রিপোর্ট।

---

* তাম্রমুদ্রা—চল্লিশ দামে এক টাকা হয়।

† During the Adisur dynasty, the following are said to have been the ancient geographical Divisions of Bengal.

1. Barendra—bounded by the Mahananda on the West; by Padma, or great branch of Ganges, on the South; by the Korotoya on the East by adjacent Governments on the North.

2. Banga—or the territory east from korotoya towards the Brahmaputra. The capital of Bengal both before &c. afterwards,

বর্ত্তমান সময়ে আমাদের লিখিত পরগণা সমূহের অধিকাংশই ঢাকা, ফরিদপুর, ত্রিপুরা, নোয়াখালি এই চারি জেলাতে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। পূর্ব্বে ইদিলপুর সরকার বাক্‌লার অন্তর্গত, সনদ্বীপ ও সাবাজপুর সরকার ফতেয়াবাদের মধ্যবর্ত্তী ও বিক্রমপুর, কার্ত্তিকপুর, চাঁদপুর ইত্যাদি পরগণাগুলি সরকার সোণারগাঁয়ের অন্তর্ব্বর্ত্তী ছিল। এখন বিক্রমপুরে বহু পরিবর্ত্তন হইয়াছে। পূর্ব্বে উত্তর বিক্রমপুর ও দক্ষিণ বিক্রমপুর একই সংলগ্ন ভূমিখণ্ড ছিল—কিন্তু এখন কীর্ত্তিনাশা, বিক্রমপুরকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছে; প্রায় দুইশত বৎসর পূর্ব্বে পশ্চিমে প্রায় ৩০ মাইল দীর্ঘ ও উত্তর দক্ষিণে যে ৩।৪ মাইল প্রশস্ত ভূমিখণ্ড ছিল তাহা রাক্ষসী পদ্মা নিজ কুক্ষিগত করিয়া বিক্রমপুরের ক্ষীণ কলেবরকে ক্ষীণতর করিয়া ফেলিয়াছে। এই দুইশত বৎসরের মধ্যে কত পল্লী, কত দেবমন্দির, মঠ ও প্রাচীন কীর্ত্তি যে রাক্ষসীর উদর-নিহিত হইয়াছে তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। চাঁদ কেদার রায়ের কীর্ত্তি, রাজবল্লভের প্রিয় নিবাস রাজনগর,

বর্ত্তমান সীমা।

---

aving long been near Dacca, in the province of Banga, the name is said to have been communicated to the whole.

3. Bagri—or the Delta called also Dwipa, or the island, bounded on the one side by the Padma, or the great branch of the Ganges; on another by sea and other bound by the Hughli River or Bhagirathi.

4. Rarhi—bounded by the Hugli and Padma on the north and east and by adjacent kingdoms on the west and south.

5. Maithila—bounded by the Mahananda and Gour on the east, the Hugli or Bhagirathi on the south and on the west.

Hamilton's Hindusthan Vol. No. 1. P. 114.

নপাড়ার চৌধুরিগণের কীর্ত্তি-নিকেতন নপাড়া গ্রাম, কালীপাড়ার জমিদারগণের বাসভবন, তারপাশার 'মশায়' প্রভৃতির কত কীর্ত্তিরাশি ধ্বংস করিয়া যে আপনার 'কীর্ত্তিনাশা' নামের সার্থকতা করিয়াছে, তাহা চিন্তা করিলেও হৃদয় বিষাদভরে ম্রিয়মাণ হইয়া পড়ে। বর্ত্তমান সময়ে বিক্রমপুরের উত্তরে ধলেশ্বরী বা ইছামতী নদী, পূর্ব্বে মেঘনা, দক্ষিণে ইদিলপুর ও পশ্চিমে পদ্মা এই চতুঃসীমান্তর্বর্ত্তী অনতি বিস্তীর্ণ ভূমিখণ্ডই বিক্রমপুর নামে পরিচিত। ইহার পরিমাণ ফল ৫০০ পাঁচ শত বর্গ মাইল।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

বৌদ্ধযুগ।

বৌদ্ধযুগ ভারতের বাহ্য সম্পদের উন্নতির যুগ। সে সময় সমগ্র ভারতব্যাপী মিলনের যে সুমহান্ মঙ্গলভেরী বাজিয়া উঠিয়াছিল, সেই সাম্যসংস্থাপক নীতি ও ধর্ম্মের পবিত্র গৌরব-গরিমা বর্ত্তমান সময়েও আমরা হৃদয়ে অনুভব করিয়া অপূর্ব্ব শান্তি ও প্রীতি বোধ করিয়া থাকি। যদিও বৌদ্ধধর্ম্মের প্রখর-তেজঃসূর্য্য, শ্রীশঙ্করের অভ্যুদয়ে নিষ্প্রভ হইয়া গিয়াছিল, তথাপি জগতের বক্ষ হইতে তাহা চিরদিনের জন্য মুছিয়া যায় নাই, বুদ্ধের ন্যায় এমন ত্যাগী সন্ন্যাসী জগতের ইতিহাসে অতি বিরল। রাজার ছেলের ভোগৈশ্বর্য্য পরিহার, জগতের সমুদয় মায়ার বন্ধন ছিন্ন করিয়া পরহিতার্থে আত্ম-বিসর্জ্জন কি অপূর্ব্ব মহিমা জ্ঞাপক! সংসার-যাতনা-ব্যথিত নরনারীর সমক্ষে ইনিই অমৃতের বাণী প্রচার করিয়াছিলেন,—গম্ভীর আরাবে ভারতবক্ষে "নির্ব্বাণ মুক্তির" অপূর্ব্ব সত্য সকলকে শুনাইয়াছিলেন—বলিয়াছিলেন, "এস, এস নরনারী, আমি অমৃত পাইয়াছি, সে অমৃত তোমাদিগকে দিব।" হায়! কোথায় সেই দিন? কল্পনালোকে অতীতের সেই সুন্দর কাহিনী ভাবিয়া হৃদয়ে ভক্তির উদয় না হয়, এমন নরনারী অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়।

বৌদ্ধযুগ।

পূর্ব্ববঙ্গে বিশেষতঃ বিক্রমপুরে কিরূপে বৌদ্ধধর্ম্ম বিস্তার লাভ করিয়াছিল, তাহা বিবৃতির জন্য আমরা বাধ্য হইয়াই এখানে একটু প্রাচীন ইতিহাস আলোচনা করিলাম।

চন্দ্র গুপ্ত।

চাণক্যের কৌশলে নন্দবংশ ধ্বংসের পর ৩৭২ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে চন্দ্র গুপ্ত ভদ্রবাহু নামক জনৈক জৈন যতির শিষ্যত্ব

গ্রহণ করেন। এ সময়ে বঙ্গদেশ হইতে ব্রাহ্মণাচার একপ্রকার বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। ইঁহার-অধিকার-সময়ে পাটলিপুত্র নগরে জৈনদিগের শ্রীসঙ্ঘ আহুত ও জৈন অঙ্গ শাস্ত্রগুলি সংগৃহীত হয়। চন্দ্র গুপ্ত ব্রাহ্মণবিরোধী ছিলেন বলিয়া ব্রাহ্মণগণ তাঁহাকে "বৃষল" বলিয়া লাঞ্ছিত করিয়া গিয়াছেন। চন্দ্র গুপ্তের পরে ৩১৬ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে তৎপুত্র বিন্দুসারের পতনের সঙ্গে সঙ্গেই মহারাজা অশোকের অভ্যুদয় হয়। ইঁহার সময়েই বৌদ্ধধর্ম্ম উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করে। ইনিও সর্ব্বপ্রথমে ব্রাহ্মণভক্ত ছিলেন এবং ইঁহার ভোজনশালায় শত শত পশু বধ হইত।

মহারাজা অশোক।

রাজা অশোক রাজ্যাভিষেকের সময়ে প্রথম জৈন, পরে বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করেন। অশোক প্রিয়দর্শী বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণের পরে উহার প্রচারের নিমিত্ত নানা দেশে প্রচারক প্রেরণ করিয়াছিলেন, এমন কি সুদূর ইউরোপ ও আফ্রিকা পর্য্যন্তও বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারার্থ তাঁহার প্রচারকগণ গমন করিয়াছিল। ইঁহার সহিত তৎকালীন প্রায় সমুদয় রাজন্যবৃন্দেরই মিত্রতা ছিল। অশোকের সময় বঙ্গদেশের অবস্থা তাদৃশ গৌরবজনক ছিল না। তাঁহার অধীনে বঙ্গদেশ নানা ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে বিভক্ত হইয়া এক একজন সামন্ত রাজার শাসনাধীনে ছিল।

এ সময় হইতেই পূর্ব্ব বঙ্গে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচার হইতে থাকে। মহারাজা অশোকের সময় ইহা পূর্ণরূপে আধিপত্যলাভ না করিলেও পাল রাজবংশের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে বিক্রমপুরে উহা বিশেষরূপে বস্তৃত হইয়া পড়ে। বৌদ্ধ ধর্ম্মের মহৎ আদর্শে দীক্ষিত হইয়া পালবংশীয় নৃপতিগণ বিক্রমপুরে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করেন। (১) খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীর আরম্ভ হইতে

পালবংশীয় নৃপতিগণ।

(১) The next rulers we hear of belonged to the Boonheahs or Bhuddist Rajahs. Three of the Boonheah Rajahs took of their

একাদশ শতাব্দীর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বঙ্গদেশে পালবংশীয় নৃপতিগণ শাসনদণ্ড পরিচালনা করিয়াছিলেন। ২য় শূর পালের পরে (১০৭৮—১০৯১) তদীয় সহোদর রামপাল সিংহাসনারোহণ করেন (১০৯১—১১০৩)। গৌড় ও বঙ্গের নানা স্থানে এই মহাত্মার কীর্ত্তি সমূহ অদ্যাপি দৃষ্ট হইয়া থাকে। কেহ কেহ বলেন যে বিক্রমপুরান্তর্গত রামপাল গ্রামও এই রাম পালের নামানুযায়ীই হইয়াছে। (২) ইহা কতদূর সত্য তাহা সুধী পাঠকবর্গই ভাল বিচার করিবেন; কারণ রামপালের নামোৎপত্তি সম্বন্ধে নানা প্রকার প্রবাদ প্রচলিত; উহাদের মধ্যে কোন্‌টী সত্য ও কোন্‌টী অসত্য তাহা অতীতের অন্ধ তমসাচ্ছন্ন গহ্বর হইতে উদ্ধার করা সুকঠিন।

পালবংশীয় নৃপতিগণের মধ্যে কোন্ কোন্ ব্যক্তি পূর্ব্ববঙ্গের কোন্ কোন্ প্রদেশের শাসনদণ্ড পরিচালনা করিতেন, তাহার কোনও ধারাবাহিক বিবরণ জানিতে পারা যায় না। বোধ হয় গৌড়ের মূল পাল-

---

abode in this district, (Dacca) and in that portion of it lying to the north of the Boorganga and Dulleserrywhere the sites ef their Capi tals are still to be secen. Just Pal resided at Moodabpore in the Pargunnah of Toolipabad. Haris Chander at Cotabarry near Sabar and Sesoopal at Copassia in Bhowal. * * * (Taylor's Topography of Dacca).

"The Bhuya or Buddist Rajas (founders of the Pal dynasty of the kings of Bengal) are the next rulers spoken of. Three of them took of their abode in this district, to the north of Boori-ganga and Dhaleswary, where the sites of their Capital are still to be seen." Hunters statistical Account of Dacca, P 118.

(২) বিশ্বকোষ ৩১০ পৃষ্ঠা পাল রাজবংশ। সাহিত্য ১১ বর্ষ ২য় সংখ্যা। 'প্রাচীন বাঙ্‌লা' শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু।

বংশীয় নৃপতিবৃন্দের কোন শাখাই পূর্ব্ব বঙ্গের স্থানে স্থানে শাসন কর্ত্তৃত্ব লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন তালিপাবাদ্ পরগণার মাধবপুরে যশোপাল, ভাওয়ালের অন্তর্গত কাপাসিয়ায় শিশুপাল, এবং সাভারের নিকটস্থ কাঠাবাড়ীতে হরিশ্চন্দ্র রাজত্ব করিতেন। এই হরিশ্চন্দ্রের রাজত্ব রঙ্গপুর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। বিক্রমপুরের রামপালে অদ্যাপি 'হরিশ পালের দীঘি' নামক একটী দীঘি বর্ত্তমান আছে। প্রবাদানুযায়ী এই হরিশ্চন্দ্রের বংশেই বৌদ্ধ নৃপতি মাণিক চন্দ্র ও গোবিন্দ চন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন, মাণিকচাঁদ ও গোপী চাঁদের মহত্ত্ব, স্বার্থত্যাগ ও নানাবিধ গুণাবলী আজও পূর্ব্ববঙ্গে যোগীজাতির মধ্যে গীত হইয়া থাকে। গোবিন্দ চন্দ্র বা গোপী চন্দ্র প্রাচীন বাঙ্লা সাহিত্যে গোপী পাল নামেও প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন।* মহারাজা গোবিন্দ চন্দ্রের রাজত্ব সময়ে (৯৮০ খ্রীঃ অঃ) বিক্রমপুরস্থ বজ্র-যোগিনী গ্রামে বৌদ্ধ মহাতান্ত্রিক ও পরম জ্ঞানী দীপঙ্কর শ্রী-জ্ঞান অতিশ জন্মগ্রহণ করেন, ইনি একজন বিখ্যাত বৌদ্ধ যতি। † ইঁহার পূর্ব্ব নাম আদিনাথ চন্দ্র গর্ভ ছিল। অবধূত জেতারি নামক জনৈক খ্যাতনামা পণ্ডিতের নিকট শিক্ষালাভ করিয়া পরিশেষে ইনি ত্রিপিটক, বৈশেষিক দর্শন ও যোগাচার সম্প্রদায় ভুক্ত বৌদ্ধ দিগের ন্যায় দর্শন ইত্যাদি পাঠ করিয়া বিশেষ জ্ঞানলাভ করিয়া একজন ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতকেও পরাস্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান বিক্রমপুরের গৌরব, কিন্তু, দুঃখের বিষয় এই যে বিক্রমপুরবাসী অনেকে তাঁহার নাম পর্য্যন্ত জানেন না।

দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান।

* যোগীপাল গোপীপাল মহীপাল গীত।
ইহা শুনিতে যে লোকে আনন্দিত। (চৈতন্যভাগবত, অন্ত্যখণ্ড)

† Indian pandits in lands of snow by Rai Sarat Chandra Das Bahadur c. i. e.

নানা শাস্ত্রে জ্ঞান লাভ করতঃ অবশেষে তিনি সর্ব্ব প্রকার পার্থিব সুখ ভোগে জলাঞ্জলি দিয়া, বৌদ্ধদিগের ত্রিশিক্ষা নামক তত্ত্বগ্রন্থে জ্ঞান লাভার্থ কৃষ্ণ গিরির বিহারস্থ রাহুল গুপ্তের নিকট গমন করেন, এস্থানে তিনি বৌদ্ধ দিগের গুহ্য মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া গুহ্যজ্ঞান বজ্র নামে অভিহিত হন, তৎপরে প্রায় ঊনবিংশ বর্ষ বয়সে দণ্ডপুরীর মহাসঙ্ঘিকাচার্য্যের শীল রক্ষিতের নিকট পবিত্র বৌদ্ধ মন্ত্রে দীক্ষিত হন এবং উক্ত মহাত্মার নিকটই তিনি দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান উপাধি লাভ করেন, দীপঙ্কর তৎকালীন সমুদয় বৌদ্ধ পণ্ডিতদের নিকট শিক্ষালাভ করিয়া, সুবর্ণদ্বীপস্থ বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রধান আচার্য্য চন্দ্রগিরির নিকট গমন করিয়া সে স্থানে দ্বাদশ বৎসর কাল অবস্থান করেন। তির্ব্বতের রাজধানী লাশা নগরের নিকট অদ্যাপি তাঁহার সমাধি বিদ্যমান আছে। রায় শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুর c. i. e. মহোদয়ের নিকট শুনিয়াছি যে তির্ব্বতে স্বয়ং বুদ্ধদেব হইতেও দীপঙ্করের প্রতি তদ্দেশ বাসী বৌদ্ধ লামাগণ অধিকতর সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকেন, দীপঙ্করের নামোচ্চারণ করিলেই তাঁহারা করযোড়ে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার মহান আত্মার উদ্দেশে হৃদয়-জাত ভক্তি ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়া থাকেন। দীপঙ্কর ১০৮খানা গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। দাক্ষিণাত্যপতি দিগ্বিজয়ী রাজেন্দ্র চোল কর্ত্তৃক আনুমানিক ১০১১ কি ১০১২ খ্রীষ্টাব্দে ইনি (গোবিন্দ চন্দ্র) পরাজিত হন। বৌদ্ধ ধর্ম্ম বিক্রমপুর হইতে পাল বংশীয় নৃপতি গণের অধঃপতনের সঙ্গে সঙ্গেই লয় প্রাপ্ত হইয়া গিয়াছে। এক সময়ে যে ইহা বিক্রমপুরের চতুর্দ্দিকে বিশেষরূপে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল, বর্ত্তমান সময়ে তাহা অনুমান করাও সুকঠিন। * পাল রাজগণ যে বিক্রমপুরে বৌদ্ধ ধর্ম্মের

বিক্রমপুরে বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ।

* As a state religion, Buddhism perished with the state. With the passing of the Pal dynasty it disappeared as completely from

বিস্তারের জন্য বিশেষ প্রয়াস পাইয়াছিলেন, তাহা বিক্রমপুরের প্রায় প্রতিগ্রাম হইতে প্রাপ্ত এবং পুকুর ও দীর্ঘিকা ইত্যাদি খননে উত্তোলিত নানা প্রকারের প্রস্তর গঠিত বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি সমূহ হইতেই বুঝিতে পারা যায়। পদ্মাসনোপবিষ্ট ধ্যানস্থ বৌদ্ধের সৌম্য মূর্ত্তিগুলি প্রকৃত পক্ষেই শিল্পীর অদ্ভুত শিল্প কৌশলের পরিচায়ক। দুঃখের বিষয় যে অধিকাংশ মূর্ত্তিই ছিন্ন নাসিকা, সে জন্য এ সকল মূর্ত্তিকে বিক্রমপুরবাসীগণ 'নাক কাটা বাসুদেব' মূর্ত্তি বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন। জন প্রবাদ এইরূপ যে ওড়িষ্যা প্রদেশের পাঠান রাজগণের দুর্দ্দান্ত হিন্দু বিদ্বেষী সেনাপতি কালাপাহাড় কর্ত্তৃক হিন্দু দেবদেবীর মূর্ত্তির সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধমূর্ত্তিগুলিরও এইরূপ অঙ্গহীন হইতে হইয়াছিল। বিক্রমপুরে এমন পল্লী অতি বিরল যেখানে ঈদৃশ মূর্ত্তি দুই একটী বিদ্যমান নাই।

আমরা এখানে দ্বাদশহস্ত বিশিষ্ট একটী বৌদ্ধ মূর্ত্তির চিত্র প্রদান করিলাম। এই মূর্ত্তিটি সোণারঙ্গ গ্রামস্থ এক গোঁসাই বাড়ী হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলাম, ইহা প্রায় ৭০।৮০ বৎসর পূর্ব্বে আবদুল্লাপুর গ্রামে পুষ্করিণী খনন করিতে পাওয়া গিয়াছিল। এই মূর্ত্তিটি কোনও হিন্দু দেব দেবীর নহে, কারন কোনও হিন্দু দেব দেবীরই দ্বাদশটি হস্ত নাই। প্রস্ফুটিত শতদলোপরি দ্বাদশ হস্তে দ্বাদশ প্রকারের অস্ত্র শস্ত্রাদি ধারণ করিয়া এই দেবমূর্ত্তিটি বিরাজমান। ইহার শিরে কিরীট, গলে মালা ও যজ্ঞোপবীত, বস্ত্র হাঁটুর উপর পর্য্যন্ত পরিহিত। মস্তকের উপরে সাতটি সর্প ফণা ধারিয়া আছে, সেই ফণার উপরে অমিতাভ ধ্যানস্তিমিত লোচনে যোগাসনে বসিয়া রহিয়াছেন। নিম্নে মূর্ত্তিটির উভয় পার্শ্বে দুইটি

দ্বাদশ হস্তবিশিষ্ট অবলোকিতেশ্বর মূর্ত্তি।

Vikrampur as if it had never been. Romance of an Eastern Capital by Bradlay Birt.

দ্বাদশহস্তবিশিষ্ট অবলোকিতেশ্বর মূর্ত্তি।

কোটরগত নয়না—বক্রকায়া রমণী মূর্ত্তি তীব্র দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে। তাহার নিম্নে আরও দুইটি ছোট ছোট পুরুষ মূর্ত্তি বক্রভাবে উপবিষ্ট। এক খণ্ড বার ইঞ্চি দীর্ঘ ও আট ইঞ্চি প্রশস্ত কৃষ্ণ প্রস্তরের উপরে এই মূর্ত্তি কয়টি খোদিত। মূল মূর্ত্তিটি দণ্ডায়মান ভাবে খোদিত—তাহার কর্ণ ভূষা ও কিরীটের কারুকার্য্যাদি দাক্ষিণাত্যের শিল্পের সহিত নৈকট্য সম্বন্ধ বিশিষ্ট বলিয়া অনুভূত হয়। ইহা অবলোকিতেশ্বর বুদ্ধমূর্ত্তি। অনেক প্রাচীন বৌদ্ধমূর্ত্তিই সময়ের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু দেবদেবীর মূর্ত্তিতে পরিণত হইয়াছে। বিক্রমপুরের বিভিন্ন গ্রামে স্থাপিত ও পূজিত বৌদ্ধমূর্ত্তিগুলি হইতেই তাহা বুঝিতে পারা যায়। বর্ষে বর্ষে নানা প্রকার বৌদ্ধ দেবমূর্ত্তি সমূহের আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে বিক্রমপুরে এক সময় বৌদ্ধ ধর্ম্ম যে কতদূর প্রাবল্য লাভ করিয়াছিল তাহাই সুস্পষ্ট অনুভূত হইতেছে।

জৈন পণ্ডিত রাজেন্দ্র চোল কর্ত্তৃক পূর্ব্ব বঙ্গের পাল বংশীয় নৃপতি গোবিন্দ চন্দ্র পরাজিত হইলে পূর্ব্ব বঙ্গ হীনবল হইয়া পড়ে, সে সময়ে বঙ্গ প্রদেশে একটা গোলযোগ উপস্থিত হয়, সেই সুযোগে বর্ম্ম বংশীয় ভূপালগণ বিক্রমপুর অধিকার করেন, এই বংশের কোন্ নৃপতি সর্ব্ব প্রথমে পূর্ব্ব বঙ্গের সিংহাসনারোহণ করেন তাহা জানিতে পারা যায় নাই, তবে শিলা-লিপি, তাম্রশাসন ও বৈদিক কুলগ্রন্থ ইত্যাদিতে হরি বর্ম্মদেব নামক এক বৈষ্ণব নৃপতির বিশেষ গুণ বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। পাশ্চাত্য বৈদিক-কুল-সম্ভূত রাঘবেন্দ্র কবি শেখর ও ইঁহার বহু গুণবত্তার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। এই বর্ম্ম বংশ শূর বংশের অন্যতম শাখা, ইঁহারা পূর্ব্বে কাশীপুর বর্ত্তমান কাশীয়ারী নামক স্থলে নরপতি ছিলেন, বর্ম্ম বংশীয়েরা যখন বিক্রমপুর অধিকার করেন, সে সময়ে পদ্মানদী বিক্রমপুরের দক্ষিণ পার্শ্ব দিয়া প্রবাহিত ছিল,

বিক্রমপুরে
বর্ম্ম বংশের অভ্যুদয়।

এখন উহা মধ্য দিয়া প্রবাহিত হওয়াতেই বিক্রমপুর উত্তর ও দক্ষিণ এই দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। এই বংশের হরি বর্ম্মা, জ্যোতি বর্ম্মা ও শ্যামল বর্ম্মার নাম বিশেষ সুপরিচিত। পাল ও বর্ম্ম বংশের ক্রমিক অধঃপতনের সঙ্গে সঙ্গেই খ্রীষ্টিয় একাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে সেন রাজ বংশের অভ্যুদয় হয়। বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী পাল রাজাগণের অবনতির সহিত বৌদ্ধধর্ম্ম যেরূপ বিক্রমপুর হইতে লুপ্ত হইতে থাকে, তদ্রূপ বর্ম্ম বংশের অভ্যুদয়ে ও সেন বংশের আধিপত্যের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু ধর্ম্ম পুনরায় পূর্ব্ব গৌরব লাভে সামর্থ হইয়াছিল। *

---

* য়ুয়নচয়ঙের সমতটের বর্ণনা হইতে কেহ কেহ অনুমান করেন যে বিক্রমপুরস্থ রায়পুরা, বজ্রযোগিনী, রামপাল, বেজিনীসার, শ্রীনগর, কুমরপুর, কুমরভোগ, তেলিরবাগ প্রভৃতি গ্রামে বৌদ্ধ সঙ্ঘারাম ছিল।

তৃতীয় অধ্যায়।

হিন্দু-শাসনকাল।

বিক্রমপুরের প্রকৃত প্রাচীন ইতিহাস সেনরাজাগণের সময় হইতেই আরম্ভ। আমাদের দেশে ধারাবাহিকরূপে ইতিহাস না থাকার দরুণ দেশের অতীত বৃত্তান্ত সমূহ প্রকৃতভাবে অবগত হইতে পারা যায় না; সে জন্য অনেক সময় বাধ্য হইয়াই প্রাচীন কিম্বদন্তীর উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতে হয়। এ সমুদয় কিম্বদন্তী ছাড়িয়া দিলে ইতিহাস রচনায় অধিকদুর অগ্রসর হওয়া অসম্ভব হইয়া পড়ে। আর বহুকাল লোকের মুখে বংশপরম্পরার সহিত যে সমুদয় প্রবাদ প্রচলিত হইয়া আসিতেছে তাহার মধ্যে যে বিন্দুমাত্রও ঐতিহাসিক সত্য নিহিত নাই, তাহাও কেহই জোর করিয়া বলিতে পারেন না। ঐতিহাসিক সত্য সকল প্রবাদের মধ্যে না থাকিলেও অন্ততঃ পক্ষে গল্পাংশের মনোহারিত্ব বিবেচনা করিয়াও সাহিত্যে এ সকলের স্থান হওয়া উচিত বোধে আমরা যত্নের সহিত স্থানে স্থানে ঐ সকল প্রবাদ-বাক্য গ্রহণ করিয়াছি।

সেন রাজাদের কথা।

সেনবংশীয় নরপতিগণের পূর্ব্বপুরুষ দাক্ষিণাত্য হইতে বঙ্গদেশে আগমন করেন। তাঁহাদের বংশোদ্ভব বিক্রমসেনই বিক্রমপুর নগরের স্থাপয়িতা, এই সেনবংশোদ্ভব বিখ্যাত নরপতি আদিশূর অত্যন্ত খ্যাতিমান রাজা ছিলেন। তিনি অতি সৎলোক, সদ্বিচারক তত্ত্ববেত্তা ও মহাত্মা ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার প্রতাপে সমুদয় শত্রু-কুল নির্ম্মূল প্রায় হইয়াছিল। *

---

* অম্বষ্ঠকুলসম্ভূত আদিশূরো নৃপেশ্বরঃ।
রাঢ়গৌড়বরেন্দ্রাশ্চ বঙ্গদেশ শুথৈবচ॥

তিনি স্বয়ংই বৌদ্ধদিগকে গৌড়রাজ্য হইতে দূরীকৃত করেন, তাঁহার সম্বন্ধে ধনঞ্জয় বলিয়াছেন—

"শ্রীমদ্রাজাদি শূরোঽভবদবনিপতি স্তত্র বঙ্গাদিদেশে,
সল্লোকঃ সদ্বিচারৈ র্বিদিত-সুরপতিঃ স্বর্গথাসীৎতথাসীৎ।
প্রতাপাদিত্য তপ্তাখিলতিমিররিপু স্তত্ত্ববেত্তা মহাত্মা,
জিত্বাবুদ্ধান্ চকার স্বয়মপি নৃপতি গৌড়রাজ্যাৎ নিরস্তান॥"

এই মহাত্মা আদিশূরই বিক্রমপুরান্তর্গত রামপাল নামক স্থানে বৃহৎ যজ্ঞানুষ্ঠানের জন্য কান্যকুব্জ হইতে পঞ্চব্রাহ্মণ আনয়ন করেন।*

ব্রাহ্মণ পঞ্চের আগমন।

তাঁহাদের চরণে চর্ম্মপাদুকা ও সর্ব্বাঙ্গ বস্ত্রাবৃত ছিল। তাঁহারা এইরূপ বেশে তাম্বুল চর্ব্বণ করিতে করিতে রাজবাটীর দ্বারদেশে উপনীত হইয়া দ্বারবান্‌কে রাজার নিকট তাঁহাদের আগমন বার্ত্তা বলিবার জন্য কহিলেন। ব্রাহ্মণগণ মনে ভাবিয়াছিলেন যে, রাজা তাঁহাদের আগমন বার্ত্তাশ্রবণান্তর, শীঘ্রই তাঁহাদের সহিত আসিয়া সাক্ষাৎ করিবেন; এই নিমিত্ত তাঁহারা সকলেই মহারাজকে আশীর্ব্বাদ করিবার জন্য জলগণ্ডূষ

এতেষাং নৃপতিশ্চৈব সর্ব্বভূমিশ্বরো যদা।
অমাত্যৈর্বান্ধবৈশ্চৈব মন্ত্রিভির্দ্বিজবৃন্দকৈঃ॥
এতৈঃ সহ মহীপাল একদা স নিজালয়ে।
উপবিষ্টো দ্বিজান্ পৃষ্টঃ ধর্ম্মশাস্ত্র পরায়ণঃ॥

ইতি দেবীবর ঘটককারিকা। ২য় সংস্করণ শব্দ-কল্পদ্রুম ৭১২ পৃষ্ঠা।

* অথ গৌড়দেশে কেন প্রকারেণ ব্রাহ্মণাগমনং তৎ শৃণু, অথ সকল দিগ্দেশীয় রাজ-মধ্যে কলিযুগাবতার ইব নিখিল মঙ্গলালয়ঃ শ্রীল শ্রীআদিশূরো নাম রাজা সদ্বৈদ্য কুলোদ্ভবঃ পরমধার্ম্মিক আসীৎ) ইত্যাদি। বারেন্দ্র ঘটককারিকাং। ৺ রামধন তর্কপঞ্চানন মহাশয় প্রাচীন ও প্রামাণ্য কুলজী গ্রন্থ হইতে এই শ্লোকটী এবং অন্য একটী শ্লোক সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

গজারী বৃক্ষ   রামপাল।

হস্তে দণ্ডায়মান ছিলেন। কিন্তু মহারাজ আদিশূর, এই সকল বিপ্রেরা যোদ্ধৃবেশে আগমন করায় বিরক্ত হইয়া তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন না। বিপ্র পঞ্চ বুঝিতে পারিলেন যে, রাজা তাঁহাদের বেশ-ভূষার প্রতি লক্ষ্য করিয়াই বিরক্ত হইয়াছেন, অতএব তাঁহাকে ব্রাহ্মণ্য প্রভাব দেখাইবার জন্য করস্থিত আশীর্ব্বাদ-বারি নিকটবর্ত্তী মল্লকাষ্ঠে স্থাপিত করিলেন। চিরশুষ্ক মল্লকাষ্ঠ দেখিতে দেখিতে পুনরুজ্জীবিত হইয়া পল্লবিত ও ফলপুষ্পে সুশোভিত হইয়া উঠিল। *

আদিশূর ব্রাহ্মণগণের মহিমাদর্শনে স্বকীয় অবিমৃষ্যকারিতার জন্য ম্রিয়মাণ হইয়া নানারূপ স্তবস্তুতিবাদে তাঁহাদিগকে সন্তোষিত করিয়া, ভবনে আনয়ন করিলেন এবং পরে তাঁহাদের দ্বারা যজ্ঞ সমাপনান্তে বহু ধনরত্ন প্রদান করিলেন। অদ্য পর্য্যন্তও রামপাল বল্লাল-দীঘীর উত্তর পারে সেই অমর গজারী বৃক্ষ নিকটবর্ত্তী স্ত্রী-পুরুষগণ কর্ত্তৃক

অমর গজারী বৃক্ষ।

* পঞ্চ ব্রাহ্মণের আনয়ন সম্বন্ধে নানাপ্রকার বিভিন্ন মত জানিতে পারা যায়; 'ক্ষিতীশবংশাবলী-চরিতে' লিখিত আছে যে, একবার মহারাজার ছাদের উপর গৃধ্র বসে, গৃধ্র বসা নিতান্ত অমঙ্গলের কারণ, মহারাজ সভাসদ্গণকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করেন, কিন্তু তৎকালে বিক্রমপুরে ও সমগ্র বঙ্গদেশে কেহ শাস্ত্রজ্ঞ না থাকায় কেহই মহারাজার কথার উত্তর দিতে পারিলেন না. কিন্তু মহারাজার সভাসদবৃন্দের মধ্যে জনৈক ব্রাহ্মণ তীর্থযাত্রা উপলক্ষে কান্যকুব্জ গিয়াছিলেন, সেখানকার রাজার ছাদেও এইরূপ গৃধ্র বসায় তথাকার ব্রাহ্মণগণ মন্ত্র দ্বারা সেই পক্ষী ধরিয়া তাহার মাংসে যজ্ঞ করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণের প্রমুখাৎ এই বৃত্তান্ত অবগত হইয়া মহারাজ তাঁহাকে পঞ্চযাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ আনিবার জন্য কনোজ পাঠাইয়া দিলেন। 'দুর্গামঙ্গল" কাব্যপ্রণেতা ভবানীপ্রসাদ বলেন যে আদিশূর বাজপেয় যজ্ঞ করিবার জন্য পঞ্চব্রাহ্মণ আনয়ন করেন, উক্ত গ্রন্থে আরও লিখিত আছে যে সে সময়ে অতি বৃষ্টির জন্য প্রজাদের অতিশয় কষ্ট হইয়াছিল তাই মহারাজ যজ্ঞানুষ্ঠানার্থ পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন।

পূজিত হইয়া সিন্দুর-রঞ্জিত দেহে অতীতকালের সাক্ষীরূপে বিরাজমান। নববসন্ত সমাগমে যখন সমুদয় তরুরাজি নবপত্রপল্লবে পরিশোভিত হইয়া অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য ধারণ করে, তখন ইহার উন্নতমস্তক দূর হইতেই পথিককে অন্যান্য বিটপী সমুদয় হইতে ইহার স্বাতন্ত্র্য প্রমাণ করিয়া দেয়। কত দিন, কত মাস, কত বর্ষ, চলিয়া গিয়াছে, কত ঝড় ঝঞ্ঝা ইহার উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে; কিন্তু এখনও ইহা অক্ষতদেহে মহাকালের সাক্ষীস্বরূপ, বিক্রমপুরের গৌরব-ধ্বজস্বরূপ বিদ্যমান। আমি যখন ইহাকে প্রথম দর্শন করি—সে এক ফাল্গুনের দ্বিপ্রহর,

---

'প্রজার সতত পীড়া লোক বলে ক্ষীণ।
দুর্ভিক্ষ হইল দেশে ভূমি শস্য হীন॥
বন্যায় বুড়িয়া যায় কতশত দেশ।
দ্রব্যের মহার্ঘ্য দেখি প্রজাদের ক্লেশ॥'

আবার কুলাচার্য্যগণের মতে আদিশূর পুত্রেষ্টি যজ্ঞের জন্য পাঁচজন ব্রাহ্মণ আনাইয়াছিলেন। 'সম্বন্ধ নির্ণয়কার' পণ্ডিত শ্রীযুক্ত লালমোহন বিদ্যানিধি বলেন, মহারাজাধিরাজ অশোক রাজার সময় হইতে আদিশূরের রাজত্বকালের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বঙ্গদেশে বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রভাব ছিল। সেই প্রভাবেই এদেশ হইতে এককালে ব্রাহ্মণ্য রহিত হইবার উপক্রম হইয়াছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আদিশূরের প্রভাবে যখন পুনর্ব্বার বঙ্গদেশে বৈদিক ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান হয় তখনও সমস্ত বঙ্গদেশ মধ্যে সাত শত ঘরের অতিরিক্ত ব্রাহ্মণ ছিল না এবং ঐ সকল ব্রাহ্মণগণ বৌদ্ধদিগের প্রভাবে এমন নিস্তেজ হইয়া গিয়াছিলেন যে, মহারাজ আদিশূর পুত্রেষ্টি যাগের প্রশ্ন করিলে তাঁহারা তদ্বিষয়ে অজ্ঞ ও অক্ষম বলিয়া রাজার নিকট পরিচয় দিলেন। ইহাদিগের মূর্খতানিবন্ধন রাজাকে ক্ষুব্ধ হইতে হইল। ক্ষুব্ধ হইলেন বটে, কিন্তু উক্ত যাগসিদ্ধি বিষয়ে এককালে হতাশ্বাস হইলেন না; তৎক্ষণাৎ (৯৯৯ সংবতে) কান্যকুব্জাধীশ্বরের নিকট পঞ্চগোত্রে পঞ্চজন সচ্চরিত্র, সাগ্নিক, বেদজ্ঞ, যজ্ঞ-নিপুণ ও বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ প্রার্থনা করেন। সম্বন্ধ নির্ণয়, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃ ১৪।১৫

আদিশূরো নবনবত্যধিক নবশতীশতাব্দে পঞ্চ ব্রাহ্মণানানায়য়ামাস। কৃষ্ণচন্দ্রচরিত্র। বহুবিবাহ পৃ ১৫।

মাথার উপরে দীপ্ত সূর্য্যদেব কিরণ বিকিরণ করিতেছিলেন, সম্মুখস্থ বিশাল দীর্ঘিকার উদাস দৃশ্যের মধ্য হইতে যেন একটা নৈরাশ্যের কাল ছায়া ধীরে ধীরে চারিদিকে ব্যাপৃত হইয়া পড়িতেছিল; উশৃঙ্খল বায়ু সোঁ-সোঁ শব্দে জগতের নশ্বরতা প্রতিপাদন করিতে করিতে ছুটিয়া যাইতেছিল, মাঝে মাঝে অদূরস্থ সহকার-তরুর শাখা হইতে দুই একটা কোকিল "কুহু কুহু" রবে যেন কালের অনন্তলীলার কথা ভাবিয়া ভাবিয়া মর্ম্ম পীড়িত হইয়া সকরুণ কণ্ঠে বিষাদ-কাহিনী ব্যক্ত করিতেছিল; ঠিক্ এমনি সময়ে আমি গজারী বৃক্ষের শীতল ছায়ায় লোটাইয়া পড়িয়াছিলাম এবং অতীত-গৌরব-কাহিনী চিন্তা করিতে করিতে নিজ অস্তিত্ব ভুলিয়া, অনন্তের এক মহান্ বিশ্বজনীন প্রেমে আপ্লুত হইয়া হৃদয়ে এক অভুত পূর্ব্ব আত্ম-প্রসাদ অনুভব করিতেছিলাম। বিক্রমপুরের আর কোথাও এতজ্জাতীয় বৃক্ষ নাই। বারেন্দ্র পঞ্জী এবং দেবীবরও বলিয়াছেন—

ইত্যুক্ত্বাতে দ্বিজাঃ সর্ব্বে ব্রহ্ম ধ্যান পরায়ণাঃ।
স্থাপয়ামাসুরর্ঘ্যাং তৎ শুষ্ককাষ্ঠস্য মস্তকে॥
দূর্ব্বাতণ্ডুল পুষ্পাদিনির্ম্মিতং জল সংযুতং।
তদর্ঘ্যাং মস্তকে ধৃত্বা শুষ্ককাষ্ঠঞ্চজীবিতং॥ (বারেন্দ্র পঞ্জী)
কান্যকুব্জাৎ সমানীতান্ দূতেন বিপ্রপঞ্চকান্।
বেদশাস্ত্রেষবগতান্ সর্ব্বশাস্ত্রে বিশারদান্॥
গোযানারোহিতান্ (বিকৃতপাঠ) বিপ্রাণ্ খড়্গচর্ম্মাদিভিযুতান্
পাত্তিবেশান্ সমালোক্য বিষাদো জায়তে হৃদি॥
অশ্রদ্ধা জায়তে রাজ্ঞ ইতি জ্ঞাত্বা দ্বিজোত্তমৈঃ।
আশীর্ব্বাদার্থ নির্ম্মাল্যং মল্ল কাষ্ঠোপরি ধৃতং॥
তদা কাষ্ঠং সজীবং স্যাৎ ফল পল্লব সংযুতং॥

দেবীবর।

এখানে একটী কথা হইতেছে যে, মহারাজ আদশূর যে পঞ্চব্রাহ্মণ

আনয়ন করিয়াছিলেন তাঁহারা কান্যকুব্জ হইতে গৌড় দেশে আগমন করিয়াছিলেন; তবে এখানে রামপাল বা বিক্রমপুর ত গৌড় নহে; তবে গৌড় অর্থে এখানে বিক্রমপুরের কথা লিখিত হইল কেন? এ সম্বন্ধে আমাদের এখন কোন্ দেশ গৌড় নামে প্রখ্যাত তাহাই অনুসন্ধান করিতে হইবে। আমরা মালদহের নিকট ও প্রাচীন ভারতের মহা গৌরব ভূমি প্রাচীন গৌড় নগরীর অবস্থান প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি। আবার "বিপ্রকুলকল্পলতা" পাঠে পরিজ্ঞাত হই যে, বরেন্দ্রসেন গৌড়রাজ্যের অধিপতি হয়েন এবং উক্ত গৌড়দেশ তদীয় নামানুসারে 'বরেন্দ্রভূমি' বলিয়া খ্যাতিলাভ করে। ইহা দ্বারা কি প্রমাণ হয়না যে, প্রাচীন বরেন্দ্র-ভূমি প্রাচীন গৌড়দেশের অন্তর্গত ছিল? তৎসময়ে রাঢ়, বঙ্গ সকলই গৌড় * বলিয়া অভিহিত হইয়াছিল এবং বঙ্গদেশের ভাষাও গৌড়ীয় ভাষা বলিয়া গৌরবান্বিত হয়। গৌড় ও বরেন্দ্রই পূর্ব্বে পুণ্ড্রদেশ বলিয়া পরিগণিত ছিল। আমরা পূর্ব্বে ধনঞ্জয়ের যে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছি তদ্দ্বারা ইহাই সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয়, যে আদিশূরের পৈতৃক রাজ্য বঙ্গাদি দেশ ও স্বোপার্জ্জিত রাজ্য গৌড়। 'লঘু ভারত' প্রণেতা গোবিন্দ কান্ত বিদ্যাভূষণ ও বলেন—

বিক্রমপুর ও গৌড়।

"আদিশূর স্তদা তস্য সভাসন্মন্ত্রিণাং বরঃ।
সহায় শ্বশুরস্তৈব বীরসিংহং নিরস্তবান্॥ (শুদ্ধ পাঠ নহে)
গৌড়ে পাল মহীপাল বংশানুচ্ছিদ্য তৎপরে।
পালবংশ শাসন গৌড়ে স্বয়ং স্বাধীনতাং গতঃ॥

গৌড়ে ব্রাহ্মণ ৪৬ পৃষ্ঠা।

* It is supposed that Gour was the most ancient city in Bengal. Some even say that it was built more than two thousand

মহারাজ আদিশূর তৎকালে আপনার শ্বশুরের সহায় হইয়া বীর-সিংহকে পরাভূত করেন এবং পাল নৃপতিগণকে পরাভূত করিয়া স্বয়ংই গৌড়ে স্বাধীনতা প্রাপ্ত হন। এখন অতি সহজে মীমাংসা করা যাইতে পারে, যে বীরসিংহের পরাজয়ের পূর্ব্বেও মহারাজ আদিশূর রাজাই ছিলেন, এবং সেই রাজধানী নিশ্চয়ই ধনঞ্জয় প্রণীত বঙ্গ দেশৈকাদেশ। সেস্থানটি কি এবং কোথায় তাহাই আমাদের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। 'লঘুভারত' বলিতেছেন ;—

"আস্তে মৎসন্নিধৌ কন্তে রামপালেতি বিশ্রুতা।
নগরী পালিতা পূর্ব্বে আদিশূরস্য ভূপতেঃ॥
তত্রাসীৎ রামনামৈকো বৈদ্যরাজো মহাধনী।
তৎপালিতা নগরী সা রামপালেতি সংজ্ঞিতা॥ গৌঃ ব্রাঃ
২৬২ পৃষ্ঠা ; লঘুভারত ২য় খণ্ড ১২৭—২৮ পৃষ্ঠা।

ইহা দ্বারা প্রমাণিত হইল, যে বঙ্গদেশের রামপাল নগরীই আদি-শূরের আদি রাজধানী ছিল। এখন আমাদের অনুসন্ধান করিতে হইবে, যে আদিশূর কোন্ রাজধানীতে পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়া-ছিলেন। 'বিশ্বকোষের' সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু এবং পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় বলিতেছেন যে ব্রাহ্মণগণ "সুরসরিদবিধৌত পাদ" গৌড় নগরে সমাগত হইয়াছিলেন।

বারেন্দ্রকুলপঞ্জী বলেন—

"সকল গুণসমেতাঃ সাগ্নিকা ব্রহ্মনিষ্ঠাঃ।
হুতবহ সমভাসা ব্রাহ্মণাঃ কান্যকুব্জাৎ॥

---

five hundred years ago From it, the whole Country. Marshman's History of Bengal. 'গৌড়ান্তর্গতকান্তবিক্রমপুরোপান্তে পুরীং নির্ম্মমে' ইত্যাদি রামদেবের বৈদিককুলমঞ্জরীর শ্লোক পাঠেও সহজেই অনুমিত হয় যে একদিন গৌড় বলিলে সমগ্র বঙ্গদেশকে বুঝাইত।

নিজ পারবারবর্গৈঃ পাবনং পাপমুক্তং।
সুরসরিদবধৌতং যাস্তি গৌড়ং মনোজ্ঞং॥

প্রাচীনকালে পবিত্র সলিলা গঙ্গানদী মালদহের নিকট দিয়া প্রবাহিত হইত; সুতরাং সে সময়ে গৌড় যে 'সুরসরিদবধৌতং' এই বিশেষণের সম্পূর্ণ উপযোগী ছিল, তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু দেশের জনশ্রুতি হইতে এবং সামাজিকগণের নিকট আমরা প্রত্নতত্ত্ব সম্বন্ধে যতদূর অবগত হইতে পারি, তাহাতে নিশ্চিতরূপে বলা যায় রামপাল ভিন্ন গৌড়ে ব্রাহ্মণ সমাগমের কথা প্রকৃত নয়। মহারাজ আদিশূর যখন কেবল গৌড়ের নহে, বঙ্গ দেশেরও রাজা ছিলেন, তখন বঙ্গের রাজধানীতে ব্রাহ্মণ সমাগম অসম্ভব হইবে কেন? পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন তৎপ্রণীত 'বল্লাল-মোহ-মুদ্গর' নামক সুবিখ্যাত গ্রন্থে এ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে, "কুমার সুন্দর যখন বর্দ্ধমানে আসিয়া হাজির হইলেন, তখন তিনি উহার সুষমা দর্শনে বিমোহিত হইয়া বলিলেন—

"দেখি পুরী বর্দ্ধমান, সুন্দর চৌদিকে চান,
ধন্য গৌড়, যে দেশে এ দেশ।
রাজা বড় ভাগ্যধর, কাছে নদ দামোদর,
ভাল বটে জানিনু বিশেষ'॥"

বর্দ্ধমান কি গৌড়ের অন্তর্গত? না কখনই নয়, রাঢ় বা সূহ্ম দেশের বক্ষস্থল বিশেষ। দামোদর নদ উহার প্রান্ত দিয়া প্রবাহিত, সুতরাং সুদূর গৌড় নগরী হইতে সম্পূর্ণ পৃথক পদার্থ। কিন্তু ভারতচন্দ্রের সময়ে রাঢ় দেশও গৌড়ের অন্তর্গত বলিয়া প্রখ্যাতি লাভ করিয়াছিল। বরেন্দ্র দেশ ও তৎপূর্ব্বে গৌড় বলিয়া বিশেষিত হয়। রাঢ় এবং বঙ্গও গৌড় বলিয়া পরিচিত হইত। বঙ্গ ভাষাও গৌড়ীয় ভাষা বলিয়া প্রখ্যাতি লাভ করে। কেন? না একদিন 'গৌড়'

বলিলে সকলে উহার নাম শ্রবণ মাত্রই চিনিতে পারিত। তজ্জন্য, বঙ্গ, রাঢ় বরেন্দ্র সাধারণ্যে গৌড় নামে বিকাইয়া যায়। বারেন্দ্রকুলপঞ্জী প্রণেতৃগণও রামপালকে উক্ত মর্য্যাদাকর গৌড় বিশেষণে বিশেষিত করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ মাত্রই নাই। রামপালও এক সময়ে বুড়ী গঙ্গার নিকটবর্ত্তী ছিল, পদ্মাই কিন্তু প্রকৃত গঙ্গা, বুড়ী গঙ্গা উহার দৈহিক ভাগ ভিন্ন আর কিছুই নহে। এখন যেমন বড় গঙ্গা গৌড় হইতে সুদূর রাজমহলের পশ্চিম দিয়া প্রবাহিত, পদ্মা ও বুড়ী গঙ্গাও তদ্রূপ কালমাহাত্ম্যে রামপাল হইতে দূরে সরিয়া পড়িয়াছে, কিন্তু পূর্ব্বে রামপাল নিশ্চয়ই পদ্মা (বড় গঙ্গা) বা বুড়ী গঙ্গার তীরবর্ত্তী ছিল, সুতরাং পণ্ডিতগণ উহাকেই "সুরসরিদবধৌত' বিশেষণে কেন বিশেষিত করিতে পারিবেন না? রামপাল পৈত্রিকবাটী, সুতরাং গৌড় অপেক্ষা তথায়ই কি ব্রাহ্মণ আনিবার বিশেষ সম্ভাবনা নহে।"

বিশেষতঃ আমাদের পূর্ব্বোল্লিখিত গজারীবৃক্ষ ইত্যাদি দৃষ্টে তাহা আরও সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয়। আর গৌড় যে শুদ্ধ একটী নগরের নাম তাহা নহে, উহা বঙ্গদেশের একটী অংশ বিশেষ। উহার পশ্চিমাংশে ও রাজধানী মুদ্গগিরি (মুঙ্গের) এবং পূর্ব্বাংশের রাজধানীর নাম গৌড়, ইহাই মালদহের নিকট অবস্থিত। অতএব আমরা অই সমুদয় প্রমাণ হইতে অতি সহজেই বলিতে পারি যে, আদিশূর যে পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন তাঁহারা বিক্রমপুরেই আসিয়াছিলেন। মৃত মহাত্মা প্রসন্নকুমার ঠাকুর কর্ত্তৃক "বেণী সংহার" নাটক মুদ্রাঙ্কন কালে পণ্ডিত মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ যে ভূমিকা লিখিয়াছেন, তাহাতেও তিনি বলেন "যখন কান্যকুব্জ হইতে ব্রাহ্মণেরা আইসেন, তখন আদিশূর রামপাল নগরীতে ছিলেন এবং ব্রাহ্মণেরাও তথায় উপস্থিত হন।" এ বিষয় অধিক বাক্য ব্যয় করা অনাবশ্যক, কারণ মহারাজ আদিশূর যজ্ঞ শেষে পঞ্চ ব্রাহ্মণকে বাস করিবার জন্য যে পাঁচখানা গ্রাম প্রদান করেন, অদ্যাপি সে সমুদয়

গ্রাম "পঞ্চসার," "পঞ্চগ্রাম" (পাঁচগাঁও) ইত্যাদি নাম লইয়া অতীতের সাক্ষীরূপে দণ্ডায়মান। মুন্সীগঞ্জের নিকটবর্ত্তী 'পঞ্চসার" গ্রামস্থ জন সাধারণ অদ্যাপি জিজ্ঞাসু পরিদর্শককে গৌরবের সহিত পঞ্চব্রাহ্মণের আবাসভূমি দর্শন করাইয়া থাকেন। একটী বিশাল দীর্ঘিকার তীরবর্ত্তী উচ্চস্থান সমূহ অদ্যাপি প্রাচীন স্মৃতি বুকে করিয়া কালের মহত্ত্ব ঘোষণা করিতেছে। *

---

* রায় কালাপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর সি, আই, ই, বলেন "বল্লালের পৈত্রিক ও পুরাতন রাজধানী বিক্রমপুর। বিক্রমপুরের অন্তর্গত চিরপরিচিত রামপাল গ্রামে অদ্যাপি লোকে সে রাজধানীর বিবিধ চিহ্ন ও বল্লালের সুবিস্তৃত দীঘি ও পরিখা প্রভৃতি দর্শনের জন্য গমন করে; আর বল্লালের পূর্ব্ব পুরুষগণ ঐ গ্রামের কোন্ স্থানে। পুত্রেষ্টি যজ্ঞের অনুষ্ঠানে পঞ্চ ব্রাহ্মণের পূজা করিয়াছিলেন এবং বল্লালই বা কোথায় কি স্মরণীয় কার্য্য সম্পাদন করিয়া সমাজে চিরস্মরণীয় হইয়াছেন, তাহা বড় বড় গাছের ছায়ায় বসিয়া উপন্যাসপটু বৃদ্ধদিগের মুখে শুনিতে থাকে।" (ভক্তির জয়-১৩ পৃষ্ঠা) সুপ্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিদ ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র বিশেষ প্রমাণ সহ এ বিষয়ে লিখিয়াছেন 'The chief seat of their power was at vikrampur near Dhaka where the ruins of Bullal palace are still shown Ito Itravellers. সুবিখ্যাত ঐতিহাসিক ডাক্তার ওয়াইজ সাহেবও এই মতাবলম্বী। রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর আরও বলেন যে "সেনবংশীয়গণ বঙ্গদেশে যখন প্রথম আসন গ্রহণ করেন, তখন বঙ্গের পশ্চিমও উত্তরভাগে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী পালরাজারা অতি প্রবল। বঙ্গীয় সেন রাজাদিগের আদিপুরুষ প্রসিদ্ধ নামা বীরসেন অথবা আদিশূর সেন কান্যকুব্জাগত পঞ্চব্রাহ্মণকে পাঁচখানি গ্রাম প্রদান করিয়া পূজা করিয়াছিলেন। সেই পঞ্চব্রাহ্মণের বাসস্থান অদ্যাপি বিক্রমপুরের পূর্ব্বদক্ষিণভাগে পাঁচগাঁ নামে বিদ্যমান রহিয়াছে এবং সেখানে এখনও বহুসংখ্যক কুলীন ব্রাহ্মণের বাস্তগৃহ আছে। এ পাঁচগাঁই যে আদিশূরের প্রদত্ত 'পাঁচগ্রাম' তাহা তত্রত্য অধিবাসীরাও পুরুষ পরম্পরা ক্রমে শুনিয়া আসিতেছেন। পাঁচগাঁয়ে এখনও ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য কোন বর্ণের প্রভুত্ব নাই, এবং সেখানকার ছোট বড় সমস্ত ব্রাহ্মণ অশূদ্র প্রতিগ্রাহী।

ভক্তির জয় ১৩।১৪ পৃঃ।

সেনরাজগণ বৈদ্য ছিলেন, কান্যকুব্জ হইতে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণ বিক্রমপুরে আগমন করেন, এজন্যই বিক্রমপুরে এই তিনজাতির বিশেষ প্রাধান্য দৃষ্ট হয়। কিন্তু মালদহঅঞ্চলে ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত ভাব।

সেনবংশীয় রাজগণের বংশাবলী।

সেনবংশীয় রাজগণের সময় নির্ণয় সম্বন্ধে নানারূপ গোলযোগ দৃষ্ট হয়। পণ্ডিত লালমোহন বিদ্যানিধি তদ্রচিত "সম্বন্ধ নির্ণয়ে" এবং স্বর্গীয় মহাত্মা রাজেন্দ্রবাবু প্রভৃতি যে সময় নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহা আমাদের মতে ভ্রমপূর্ণ। ইহাদের কাহারও সহিত কাহারও মতের ঐক্য নাই। শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকারের আধুনিক মত সত্যবোধে আমরা তাহাই গ্রহণ করিয়াছি। বল্লালসেন রচিত "অদ্ভুত সাগর" নামক গ্রন্থ পাঠে ডাক্তার ভাণ্ডারকার এই নবীন মত গ্রহণ করিয়াছেন। এই "অদ্ভুত সাগর" অদ্যাপি মুদ্রিত হয় নাই। বিলাতের ইণ্ডিয়া লাইব্রেরীতে একখানি ও বোম্বে নগরে দুইখানি, মোট তিনখানি হস্তলিখিত "অদ্ভুত সাগর" গ্রন্থের অস্তিত্ব জানা যায়। এ স্থানে পাঠকগণের বোধগম্যের জন্য "সম্বন্ধনির্ণয়োক্ত" ও স্বর্গীয় রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতির লিখিত বংশাবলীও প্রদত্ত হইল।

সম্বন্ধ নির্ণয়ের বংশাবলী।

আদিশূর (৯০০খ্রীঃ—৯৫২ঃ)
|
ভূশূর পুত্র (স্বতন্ত্র বংশ)
লক্ষ্মীকন্যা (৯৫২—৯৭০)
|
অশোক সেন (৯৭০—৮১)
|
শূরসেন (৯৮১—৯৪)
|
বীরসেন (৯৯৪—১০১২)
|

রাজেন্দ্র বাবুর ইণ্ডো এরিয়ানের বংশমালা।

পূর্ব্ববঙ্গে—

বীরসেন (আদিশূর) ৯৮৬ খৃঃ।

সামন্তসেন ... ১০০৬

হেমন্তসেন ... ১০২৬

সমস্ত বঙ্গদেশে—

বিজয় ওরফে শুকসেন ১০৪৬

বল্লালসেন ... ১০৬৬

বীরসেন (৯৯৪—১০১২)	বল্লালসেন ... ১০৬৬
সামন্তসেন (১০১২—১০৩০)	লক্ষ্মণসেন ... ১১০৬
হেমন্তসেন (১০৩০—১০৪৮)	মাধবসেন ... ১১৩৬
বিজয়সেন (বিষক) (১০৪৮)	কেশবসেন ... ১১৩৮
বল্লালসেন (১০৬৬—১১০১)	লাক্ষ্মণ্য বা অশোকসেন ১১৪২
১ম লক্ষ্মণসেন (১১০১—১১২১)	বিক্রমপুরে—
মাধবসেন (১১২১—২২)	বল্লালসেন ২য়
কেশবসেন (১১২২—২৩)	সুষেণ
লাক্ষ্মণেয় বা ২য় লক্ষ্মণসেন ইহারই নাম লক্ষ্মণনারায়ণ। (১১২৩—১২০৩)	শূরসেন

এই দুই বংশমালা ব্যতীত আরও অনেক বংশমালা উদ্ধৃত করা যাইত, কিন্তু তাহা এস্থলে অনাবশ্যক। কারণ অপর কেহই কোনও বিশেষ প্রমাণ এবং যুক্তি দ্বারা নিজ নিজ মত সমর্থন করেন নাই। অতএব বাধ্য হইয়াই আমরা ভিন্ন পথাবলম্বন করিলাম। পাঠকগণ অবশ্যই লক্ষ্য করিয়াছেন যে ইহাদের কাহারও মতের সহিত কাহারও ঐক্য নাই। এ বিষয় বিস্তারিত আলোচনা বিক্রমপুরের ইতিহাসের পক্ষে বিশেষ আবশ্যকীয় নহে, কাজেই আমরা এ সম্বন্ধে বৃথা বাক্যব্যয় না করিয়া, সেনবংশীয় রাজগণের মধ্যে যাহাদের সহিত বিক্রমপুরের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, মাত্র তাঁহাদের বিষয় আলোচনা করিয়া ক্ষান্ত হইব।

সেনবংশীয় রাজগণের মধ্যে বল্লালসেনের সহিত বিক্রমপুরের অতিশয় ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। এই খ্যাতনামা রাজার রাজত্ব সময়েই বিক্রমপুর ধনে,

ানে, জ্ঞানে ও পাণ্ডিত্যে জগতের এক শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছিল।

বল্লালসেন ও বিক্রমপুর।

বিক্রমপুরের প্রতি মৃত্তিকাকণায় বল্লালের পদ-চিহ্ন এক দিন অঙ্কিত হইয়াছিল, কৌলী-ন্যের গৌরব প্রতিষ্ঠা করিয়া ইনি যশস্বী হইয়াছিলেন। আজ পর্য্যন্তও বিক্রমপুরের ঘরে ঘরে ইঁহার পবিত্র স্মৃতি বিরাজমান। অজ্ঞান শিশু হইতে অশীতিপর বৃদ্ধ পর্য্যন্ত সকলেই এই মহানুভব রাজার কীর্ত্তিকাহিনী উপকথার ন্যায় বলিয়া থাকে। অদ্যাপি রামপালের ইক্ষুক্ষেত্র মধ্যে গ্রাম্য অজ্ঞ কৃষকগণ সগৌরবে বিক্রমপুরের জলন্ত সূর্য্য, হিন্দুকুল-গৌরব, বিজয়দৃপ্ত রাজা বল্লালের সুবিশাল প্রাসাদের চিহ্ন দেখাইয়া দিয়া অপূর্ব্ব আনন্দ লাভ করে। হায়! বিক্রমপুর, কে জনিত মহাকালের করাল শাসনে তোমার প্রাচীনকীর্ত্তি গরিমা একদিন কেবলমাত্র জনশ্রুতিতেই পর্য্যবসিত হইবে!

মহারাজ বল্লালসেন আদিশূরের কন্যাকুলসম্ভাত। বল্লালসেন আদিশূরের পুত্র বা দৌহিত্র নহেন। তিনি তাঁহার কন্যা লক্ষীর কুলজাত মাত্র।

"আসীৎ গৌড়ে মহারাজ আদিশূরঃ প্রতাপবান্।
তদাত্মজাকুলে জাতো বল্লালাখ্যো মহীপতিঃ॥"

কেহ কেহ রামজয়কৃত বৈদ্যকুলপঞ্জী হইতে

"কলিতে ক্ষেত্রজ পুত্রের নাহি ব্যবহার।
কিন্তু বৈদ্যবংশে এক পাই সমাচার॥
আদিশূরের বংশধ্বংস সেনবংশ তাজা।
বিশ্বক সেনের ক্ষেত্রজ পুত্র বল্লালসেন রাজা॥"

এই প্রবাদ বাক্য গ্রহণ করিয়া বল্লালের জন্ম সম্বন্ধে কুধারণার বশবর্ত্তী হইয়া পড়েন। আবার কেহ কেহ বা তাঁহাকে ব্রহ্মপুত্রনদের পুত্র বলিয়া উল্লেখ করেন। ঈদৃশ মূর্খতা মূলক উক্তির মূলে বিন্দুমাত্র

সত্যেরও অস্তিত্ব নাই।* আমাদের দেশে কোন কৃতী পুরুষ জন্মগ্রহণ করিলেই আমরা তাঁহাকে 'অবতার' করিয়া ফেলি, বল্লালসেনের অসাধারণ প্রতিভা ও বীর্য্যবত্তাই যে তাঁহাকে ব্রহ্মপুত্রের পুত্র করিয়া ফেলিয়াছে তাহা নিশ্চিত। এ সম্বন্ধে যে একটী উপাখ্যান প্রচলিত আছে তাহা এ স্থলে উদ্ধৃত করিবার কোন প্রয়োজন নাই বলিয়াই আমরা উহাতে ক্ষান্ত রহিলাম। বঙ্গদেশে দুইজন বল্লালসেন ছিলেন; প্রথম বল্লালসেন বিজয়সেনের পুত্র; দ্বিতীয় বল্লাল, বেদসেন বা বিশ্বক তাতের ঔরসপুত্র। এই উভয় বল্লালই বিক্রমপুরের সহিত গাঢ়তর-রূপে সংশ্লিষ্ট। প্রথম বল্লালসেন রামপালের শাসনভার গ্রহণ করেন এবং তাঁহার শাসনাধীন বঙ্গদেশকে পাঁচভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন।† ইনিই নিজরাজ্যে কৌলীন্য প্রথার সৃষ্টি করেন এবং ইনি অসবর্ণা অর্থাৎ নীচজাতীয়া রমণীকে বিবাহ বা উপবিবাহ করায় দেশের ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থগণের মধ্যে ঘোরতর বিপ্লবের সূত্রপাত হয়। বল্লাল-সেন তদীয় নব প্রণয়িনী ডোমকন্যার অন্নগ্রহণ করিবার নিমিত্ত সমাজের সমুদয় ব্যক্তিকে বাধ্য করিতে চেষ্টা করিলেন, ইহাতে অনেকেই নিজ নিজ জাতি রক্ষার্থ বিভিন্ন রাজ্যে পলায়ন করিতে বাধ্য হন।

---

* Ballalsen is fabled to have been the son of the Brahmputra river, which took the form of a Brahmin J. C. Marsh mens'- History of Bengal P. 4. বর্ত্তমান সুসভ্যযুগে এরূপ অলীক কাহিনী কেহ বিশ্বাস করিবেন বলিয়া আমাদের মনে হয় না।

† মাননীয় রাজেন্দ্রলাল মিত্র বলেন—Dr. Wise believes that there must have been a Ballal Senreigning in Vikrampur or Sonarganw after Lakhmania in Indo Aryan Vo. 1., Page 257.

"উৎপাত করিয়া রাজা না থুইলা দেশ।
স্বস্থান ছাড়িয়া সবে গেলা অবশেষ॥'*

* একদিন গেল রাজা মৃগয়া করিতে।
ঝড় বৃষ্টি দুর্য্যোগ হইল আচম্বিতে॥
ত্যজিয়া বিপিন রাজা গেল লোকালয়ে।
তথায় বসতি করে ডোমের আশ্রয়ে॥
সেই রাত্রি তথায় রহিল উপবাসী।
মিলিলেক ডোমকন্যা প্রাতঃকালে আসি॥
অতি শুভ্র দধি বাঁশের বেতিতে লৈলা।
পরম যতন করি রাজভোগ দিলা॥
তাহাতে সন্তুষ্ট রাজা হইলা বহুতর।
দিলা রাজা ধন রত্ন, বস্ত্র অলঙ্কার॥
বিবাহ করিব বলি লৈয়া আইলা ঘরে।
যেবা শুনে যেবা জানে শত নিন্দা করে॥
যদি কালক্রমে রাজা শুনে নিন্দাবাণী।
সর্ব্বস্ব হরিয়া তারে তাড়ান তখনি॥
ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আনি করয়ে বিচার।
শাস্ত্রমতে কার্য্য করি কি দোষ আমার॥
*　　*　　*　　*　　*　　*
এত শুনি রাজপুত্র মনে দুঃখ পেয়ে।
চলিল পিতার কাছে ক্রোধান্বিত হয়ে॥
জলের দৃষ্টান্তে কহে রাজাকে বচন।
পরম পবিত্র হয়ে নীচেতে গমন॥

যদুনন্দনের ঢাকুর ২১।২২ পৃষ্ঠা।

ইহা যে অলীক নহে তৎসম্বন্ধে বহু প্রমাণ বিদ্যমান। 'গৌড়েব্রাহ্মণ' শীর্ষক গ্রন্থ প্রণেতা মহিমচন্দ্র মজুমদার মহাশয় লিখিয়াছেন "উত্তর বারেন্দ্রগণ কহেন, বল্লালসেন এক অজ্ঞাতকুলশীলা সুন্দরী কন্যাকে স্বীয় রাজধানীতে আনয়ন করেন, তন্নিবন্ধন লক্ষ্মণ সেনের

ময়মনসিংহের অষ্টগ্রাম প্রভৃতির দত্ত মহাশয়দিগের কুর্ছিনামার উপরও এই শ্লোকটী দৃষ্ট হইয়া থাকে।

চন্দ্রর্ত্তু শূন্যাবনিসংখ্যশাকে বল্লালভীতঃ খলু দত্তরাজঃ।
শ্রীকণ্ঠনাম্না গুরুণা দ্বিজেন, শ্রীমাননন্তস্তু জগাম বঙ্গং॥

অর্থাৎ ১০৬১ শাকে বা ১১৩৯ খৃষ্টাব্দে শ্রীমান্ অনন্ত দত্ত বল্লালের

সহিত তাঁহার বিরোধ হয়। সেই সময়ে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণেরা দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া অধিকাংশ বল্লালসেনের পক্ষাবলম্বন করেন, কিয়ৎসংখ্যক ব্রাহ্মণ লক্ষ্মণসেনের মতাবলম্বন করিয়া, তাঁহার নিবাসভূমি গৌড়ের নিকট বাস করেন।" "গৌড়ে ব্রাহ্মণ ১৫৯ পৃষ্ঠা।" "বৈদ্যকুল-পঞ্জিকায়ও" এ বিষয়ের উল্লেখ আছে। এ বিষয়ে পিতা পুত্রের বিরোধ সম্বন্ধে যে সকল শ্লোক প্রচলিত আমরা তাহা উদ্ধৃত করিলাম।

লক্ষ্মণসেন— শৈত্যং নাম গুণস্তবৈ সহজঃ স্বাভাবিকী স্বচ্ছতা
কিং ব্রূমঃ শুচিতাং ভবন্তি শুচয়ঃ স্পর্শেন যস্যাপরে।
কিঞ্চাতঃ কথয়ামি তে স্তুতিপদং যজ্জীবিনাং জীবনং
ত্বঞ্চেন্নীচপথেন গচ্ছসি পয়ঃ কস্ত্বাং নিষেদ্ধুং ক্ষমঃ॥

বঙ্গানুবাদ— হে বারি, শৈত্য ও স্বচ্ছতা তব নৈসর্গিক গুণ,
তোমার মহিমা সে যে অসাধ্য বর্ণন।
স্পর্শে তব পাপশান্তি জীবের জীবন
তুমি হলে নীচগামী রোক্ষে কোন্ জন?

বল্লাল— তাপো নাপগত স্তৃষা ন চ কৃশা ধৌতা ন ধূলি তনো।
র্ন স্বচ্ছন্দমকারি কন্দকবলঃ কা নাম কেলীকথা॥
দূরোৎক্ষিপ্তকরেণ হস্ত করিণা স্পৃষ্টা ন বা পদ্মিনী
প্রারব্ধো মধুপৈরকারণমহোঝঙ্কারকোলাহলঃ॥

বঙ্গানুবাদ— নহে তাপ অপগত পিপাসা বারণ,
নহে ধৌত ধূলি-দেহ-বাঞ্ছাও এখন
হয় নাই কন্দগ্রাসে, সুদূর কল্পনা
ক্রীড়ার যে কথা হায়। দূরে করিরাজ
পদ্মিনীরে পরশিতে তুলি শুণ্ড তাজ

ভয়ে আপন গুরু শ্রীকণ্ঠশর্ম্মাকে সহ বঙ্গে পলায়ন করেন। এই কুচি-নামা অতি প্রাচীন। যদি ইহার উক্তি এবং দানসাগরের কথা প্রকৃত হয়, তবে প্রথম বল্লাল কেমন করিয়া ১০৬৩ খৃষ্টাব্দের লোক হন?

আছে শুধু অপেক্ষিয়া; করেনি স্পর্শন,
এরি মধ্যে বৃথা কেন অলির গুঞ্জন?

লক্ষ্মণ— পরীবাদস্তথ্যো ভবতি বিতথো বাপি মহতাং
তথাপ্যুচ্চৈর্দ্ধাম্নাং হরতি মহিমানং জনরবঃ।
তুলোত্তীর্ণস্যাপি প্রকটনতোশেষতমসঃ
রবেস্তাদৃক্ তেজো নহি ভবতি কন্যাং গতবতঃ॥

বঙ্গানুবাদ— হ'ক সত্য কিম্বা মিথ্যা অপবাদ হায়!
ধার্ম্মিকের নাম কিন্তু তাতে ডুবে যায়।
আশ্বিনে হইলে রবি কন্যারাশি-লীন,
কন্যাগত বলে কিন্তু প্রকাশে প্রবীণ।
সে পাপ দূরিতে হের দেব বিভাকর,
তুলা-পরীক্ষায় হন পুনঃ শুভ্রতর।
তবু তার লুপ্ত প্রভা হয় কিছু কাল,
অপবাদ নহে তুচ্ছ জানিও ভূপাল।

বল্লাল— সুধাংশোর্জ্জাতেয়ং কথমপি কলঙ্কস্য কণিকা
বিধাতুর্দোষোহয়ং ন চ গুণনিধেস্তস্য কিমপি।
স কিং নাত্রেঃ পুত্রো ন কিমু হরচূড়ার্চ্চনমণিঃ
ন বা হন্তি ধ্বান্তং জগদুপরি কিং বা ন বসতি॥

বঙ্গানুবাদ— সুধার আকর চন্দ্র বিধির বিধান,
নিষ্কলঙ্ক সে যে নহে কলঙ্কে প্রমাণ।
কলঙ্কে কি করে হত! গুণ আছে যার,
চন্দ্র যে অত্রির পুত্র অজ্ঞাত কাহার?
আপনি শঙ্কর হের ধরেছেন শিরে,
ঊর্দ্ধে রহি শশধর নাশে অন্ধকারে॥

প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের মধ্যে অনেকেই স্বীকার করেন যে ১১৬৯ খৃষ্টাব্দে দানসাগর রচিত হয়। ১১৬৯—১০৬৬=১০৩। বল্লাল যে একশত তিন বৎসর জীবিত ছিলেন ইহা কখন সম্ভবপর নহে, এই সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করিয়াই আমরা পণ্ডিত লালমোহন বিদ্যানিধির ও মৃত মহাত্মা রাজেন্দ্র বাবুর নির্দ্ধারিত সময়ের উপর বিশ্বাস করিতে পারি নাই।

আমাদের পূর্ব্বোল্লিখিত বল্লালসেন কৃত "অদ্ভুত সাগর" নামক গ্রন্থদ্বারাও প্রমাণিত হইতেছে যে মহারাজ বল্লাল ১০৯০ শকাব্দ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন; অতএব দত্তগণের কুছিনামার প্রমাণ অভ্রান্ত। মহারাজ বল্লাল যে ১০৫০ শকাব্দ হইতে ১০৯০ শকাব্দ অর্থাৎ ১১১৮—১১৫৮ খৃষ্টাব্দ এই পঞ্চাশ বৎসর রাজত্ব করেন ইহাই স্থির সিদ্ধান্ত।

মাননীয় রামকৃষ্ণ গোপালভাণ্ডারকার উক্ত গ্রন্থ সম্বন্ধে বলেন—অদ্ভুত সাগর" by Ballal Sen of Gour. The first Manuscript is incomplete, but the second which by oversight has been put into the Dharma Sastra which is complete. * * In the introduction we have first the following verses about the king & his geneology. Some of them are unintelligible owing to the corruption of the tent. * * The first prince mentioned is Bejaya Sena, he was

---

এই পদ্মিনীর পাকস্পর্শ-ব্যাপারে মহারাজ বল্লাল বৈদ্যগণকে নিমন্ত্রণ করিলে, বৈদ্যগণ তৎপুত্র লক্ষ্মণের উপদেশানুসারে স্ব স্ব উপবীত পরিত্যাগ পূর্ব্বক শূদ্র বলিয়া পরিচয় দিতে আরম্ভ করেন। এই উপলক্ষে বৈদ্যদিগের মধ্যে লক্ষ্মণী ও বল্লালী দুইটী থাক হয়, তাহা অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। লক্ষ্মণ বিক্রমপুর পরিত্যাগ করিয়া রাঢ়ে আসিয়া পূর্ব্ববৎ বৈশ্যাচার করিয়াছিলেন সুতরাং রাঢ়ে বৈদ্যেরা অদ্যাপি বৈশ্যাচারী রহিয়া গেলেন, আর বিক্রমপুরের ও পূর্ব্ববঙ্গের বৈদ্যগণ নিরুপবীত ভাবে থাকায় অদ্যাপি মাসাশৌচ গ্রহণ করিয়া থাকেন।

followed by Ballal Sena & after him his son Lakshman Sena ruled over the country. The work, it is stated, was begun in 1090 Shaka (শাক) by Ballala Sena & before it was finished he raised his son to the throne & enacted a promise from him to finish &c.

Ram Krishna Gopal Bhandarkar.

বল্লাল চরিত্র বিষয়ে হীন বলিয়া বিবেচিত হইলেও তিনি যে একজন প্রজারঞ্জক ও খ্যাতিমান নরপতি ছিলেন তদ্বিষয়ে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। তাঁহাকে বঙ্গদেশের 'বিক্রমাদিত্য' বলিলে কোনও রূপ অত্যুক্তি হয় না, কারণ ইনি বিদ্বান, বুদ্ধিমান, বীর্য্যবান, যশস্বী, বিদ্যোৎসাহী ও প্রজারঞ্জক নরপতি ছিলেন। তাঁহার বীর্য্যবত্তার নিমিত্তই বিক্রমপুর প্রকৃত বিক্রমপুর নামের অধিকারী হইয়াছে। বারেন্দ্রকুলপঞ্জীতে যথার্থই লিখিত রহিয়াছে যে

"ততো বহুতিথে কালে গৌড়ে বৈদ্যকুলোদ্বহঃ।
বল্লালসেননৃপতি রজায়ত গুণোত্তরঃ॥
রাঢ়ায়াং গৌড় বারেন্দ্র সুহ্ম বঙ্গোপবঙ্গকে।
অধিকারোঽভবত্তস্য বলবীর্য্যপ্রভাবতঃ॥

(বারেন্দ্রকুলপঞ্জী)

১১৬৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম বল্লাল সেনের মৃত্যুর পর বীরশ্রেষ্ঠ লক্ষ্মণসেন পিতৃসিংহাসনে অধিরোহণ করেন। মহারাজা বল্লালসেনের মিথিলা আক্রমণ কালে তাঁহার পুত্র লক্ষ্মণ সেন জন্মগ্রহণ করেন। পুত্রের জন্ম এবং মিথিলা বিজয় এই উভয় ঘটনা চিরস্মরণীয় করিবার নিমিত্ত তিনি পুত্রের নামে লক্ষ্মণ সম্বৎ নামে একটী অব্দ প্রচলিত করেন। কাহারও কাহারও মত এই যে মিথিলাবিজয়কালে চতুর্দ্দিকে বল্লালের মৃত্যু সংবাদ প্রচারিত হইয়া গিয়াছিল এবং সে নিমিত্ত নবজাত লক্ষ্মণসেন সিংহাসনে

প্রতিষ্ঠিতও হইয়াছিলেন এজন্যই উক্ত অব্দ বল্লালের নামে প্রচলিত না হইয়া তদীয় পুত্রের নামে প্রচলিত হয়। লঘু ভারতকার বলেন,

প্রবাদঃ শ্রূয়তে চাত্র পারম্পরীণবার্ত্তয়া।
মিথিলে যুদ্ধযাত্রায়াং বল্লালেঽভূন্মৃতধ্বনিঃ॥
তদানীং বিক্রমপুরে লক্ষ্মণো জাতবানসৌ॥

এই শ্লোক হইতে কি ইহাও দৃঢ়রূপে প্রমাণিত হয় না যে বল্লালসেন বিক্রমপুর রামপালেই বাস করিতেন? যদি তাহা না হইবে—তবে লক্ষ্মণসেনের বিক্রমপুরে জন্মগ্রহণ বিষয়ের উল্লেখ কখনই থাকিত না। এতদিন পর্য্যন্ত ঐতিহাসিকগণ মিন্‌হাজের 'তবকাৎ-ই—নাসেরী' নামক ঐতিহাসিক গ্রন্থকে প্রামাণিকরূপে গ্রহণ করিয়া বীর্য্যবান্ লক্ষ্মণসেনকে পলায়ন কলঙ্কে কলঙ্কিত করিয়া আসিতেছিলেন—কিন্তু এতদিন পরে স্বনামখ্যাত ঐতিহাসিক পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্র স্বীয় অতুল্য গবেষণা দ্বারা সে কলঙ্ক ক্ষালন করিয়াছেন; তাঁহার এই গবেষণা বাঙ্গালীকে অতীতের গৌরবান্বিতযুগে পুনরায় মহামহিমার সহিত স্থাপিত করিয়াছে।* রাজা লক্ষ্মণসেন পৈতৃক রাজ্য লাভ করিয়া স্বীয় রাজধানী বিক্রমপুর

লক্ষ্মণসেন।

---

* পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় লক্ষ্মণসেনের পলায়ন কলঙ্ক সম্বন্ধে লিখিয়াছেন বক্তিয়ার খিলিজির বঙ্গগমনের ষষ্টিবর্ষ পরে, সুবিখ্যাত মুসলমান ইতিহাস লেখক "মিন্‌হাজ-ই-সিরাজ" এদেশে উপনীত হইয়াছিলেন, তিনি 'তবকাৎ-ই-নাসেরীর নামক দিল্লী সাম্রাজ্যের যে ইতিহাস রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহার বিংশ পরিচ্ছেদে প্রসঙ্গক্রমে বঙ্গভূমির কিছু কিছু সংক্ষিপ্ত কাহিনী উল্লিখিত হইয়াছে। তাহাতে লিখিত আছে বক্তিয়ার সপ্তদশ অশ্বারোহী লইয়া "নওদিয়া" নামক রাজধানীতে উপনীত হইবামাত্র, 'রায় লহমনিয়া" নামক হিন্দু নরপতি পলায়ন করিয়াছিলেন। * * * * ইহার মূল প্রমাণ মিন্‌হাজের গ্রন্থ, তাহার একমাত্র প্রমাণ বৃদ্ধ সৈনিকের পুরাতন আখ্যায়িকা! বক্তিয়ার খিলিজির বঙ্গগমনের ষষ্টি বর্ষ পরে এদেশে আসিয়া, মিন্‌হাজ যে বৃদ্ধ সৈনিকের নিকট এই

হইতে গৌড় বা লক্ষ্মণাবতীতে পরিবর্ত্তিত করেন। তাঁহার প্রধান মন্ত্রী ছিল পশুপতি এবং প্রধান ধর্ম্মাধিকারী (Chief Justice) ছিলেন বিক্রমপুরের অধিবাসী 'ব্রাহ্মণসর্ব্বস্ব' প্রণেতা বৈদিক ব্রাহ্মণ হলায়ুধ। লক্ষ্মণসেন তান্ত্রিকতায় আচ্ছন্ন গৌড়বঙ্গের সমাজসংস্কারের নিমিত্ত তাঁহার প্রধান ধর্ম্মাধিকারী হলায়ুধের দ্বারা শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ ও তন্ত্রের সার সংগ্রহ পূর্ব্বক "মৎস্যসূক্ত' নামক গ্রন্থ প্রচার করিয়া তৎকালীন

অলৌকিক কাহিনী শ্রবণ করিয়াছেন বলিয়া লিখিয়া গিয়াছেন, তিনি তখন অশীতিপর বৃদ্ধ, তাঁহার সত্যনিষ্ঠা বা আত্মগৌরব ঘোষণার প্রবল প্রলোভন কতদূর প্রবল ছিল, এতকাল পরে তাহার মীমাংসা করিবার সম্ভাবনা নাই। মুসলমানগণের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী যুগে যাঁহারা এ দেশের রাজসিংহাসন অলংকৃত করিতেন, সেই সকল সুগৃহীতনামা নরপালগণের নানা শাসন লিপি আবিষ্কৃত হইয়া, আমাদিগের নিকটে যে সকল পুরাতত্ত্বের দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া দিয়াছে, তাহা সপ্তদশ অশ্বারোহীর অলৌকিক দিগ্বিজয় কাহিনীর সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারে না। * * * বক্তিয়ার খিলিজির বঙ্গাগমন সময়ে এদেশ রাঢ়, মিথিলা, বারেন্দ্র, বঙ্গ এবং বাগড়ী নামক ভাগ পঞ্চকে বিভক্ত থাকিবার কথা আমরা মুসলমান লেখকদিগের গ্রন্থেই দেখিতে পাই। তৎকালে এই পঞ্চবিভাগ গৌড়ীয় সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ও এক রাজার অধীন ছিল। বিক্রমপুর, লক্ষ্মণাবতী এবং লক্ষ্ণৌর নামক তিন স্থানে তিনটি রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই বর্ণনায় "নওদিয়া" নামক স্থানে কোনও রাজধানী সংস্থাপিত থাকিবার উল্লেখ নাই। "নওদিয়া" কোথায় ছিল, তাহা রাজধানী হইলে, তৎপ্রদেশে মুসলমান জায়গীর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল কিনা,—রায় লছমনিয়াই বা কাহার নাম —এ সকল প্রশ্নের কোন সদুত্তর প্রাপ্ত হইবার উপায় নাই। * * * * লক্ষ্মণসেন পশ্চিমে কাশী এবং পূর্ব্বে কামরূপ পর্য্যন্ত বিজয় লাভ করিয়া, বীরকীর্ত্তির জন্য বিখ্যাত হইয়া উঠিয়াছিলেন। মুসলমান ইতিহাস লেখকগণ বলেন,—এই নরপতির নামানুসারেই পুরাতন গৌড়নগরের নাম "লক্ষ্মণাবতী" বলিয়া পরিচিত হইয়া উঠিয়াছিল। অনেক দিন পর্য্যন্ত এদেশের মুসলমান রাজ্য দিল্লীর ইতিহাস লেখকদিগের গ্রন্থে "লক্ষ্মণাবতীরাজ্য" বলিয়াই উল্লিখিত আছে। লক্ষ্মণসেনের বীরপুত্র বিশ্বরূপ সেনের শাসনলিপিতে দেখিতে পাওয়া যায়, তিনি বাহুবলে আত্মরক্ষা করিয়া—'গর্গযবনান্বয় প্রলয় কালরুদ্র নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। মিন্‌হাজ যখন এদেশে পদার্পণ করেন, তখন ও (বক্তিয়ার

কদাচারাচ্ছন্ন হিন্দুসমাজকে রক্ষা করিয়াছিলেন। মহারাজ লক্ষণসেন যখন লক্ষণাবতীতে রাজত্ব করিতেছিলেন তখন তাঁহার পুত্র বীরশ্রেষ্ঠ বিশ্বরূপসেন বিক্রমপুরে শাসন দণ্ড পরিচালনায় ব্রতী ছিলেন। বিশ্বরূপ সেনের সময় বিক্রমপুর বীরত্বের কেন্দ্রস্থান ছিল। যখন পশ্চিমবঙ্গ মুসলমানগণ কর্তৃক বিজিত হইয়া গিয়াছিল—তাহার পরেও প্রায় শতাধিক বর্ষ পর্য্যন্ত পূর্ব্ববঙ্গ আপনার স্বাধীনতা রক্ষণে সমর্থ হইয়াছিল। মুসলমানগণ বিক্রমপুর জয় করিতে অগ্রসর হইলে বিশ্বরূপ সেন স্বদেশ ও বিক্রমপুরের বীরগণের সহায়তায় মুসলমানগণের করাল কবল হইতে পূর্ব্ববঙ্গকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সে নিমিত্তই বিশ্বরূপ নিজ তাম্রশাসনে "গর্গযবনান্বয় প্রলয়কালরুদ্র" ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত হইয়াছেন।

খিলিজীর বঙ্গে গমনের ষষ্টিবর্ষ পরেও) পূর্ব্ববঙ্গে লক্ষ্মণ সেনের পুত্রগণের অক্ষুণ্ণ অধিকার বর্ত্তমান ছিল, তদ্দেশে তখন পর্য্যন্তও মুসলমান-শাসন বিস্তৃত হইতে পারে নাই। শাসনলিপির ও মুসলমান ইতিহাসলেখকের এই সকল উক্তির সমালোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায়, বক্তিয়ার সহজে এদেশে অধিকার বিস্তার করিতে পারেন নাই;—তিনি যেখানে অধিকার বিস্তার করিয়াছিলেন, তাহা লক্ষ্মণাবতীর নিকটবর্ত্তী কয়েকটি পরগণামাত্র; এবং সেইখানেই মুসলমানদিগের সর্ব্বপ্রথম জায়গীর লাভের প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। * * অধ্যাপক ব্লকম্যান লিখিয়া গিয়াছেন "দিনাজপুরের অন্তর্গত দেবকোট নামক স্থানে একটী সেনানিবাস সংস্থাপিত করিয়া, বক্তিয়ার যুদ্ধকলহে লিপ্ত ছিলেন; এবং সেই সেনানিবাসই তাঁহার বিজয়রাজ্যের পূর্ব্বোত্তর সীমা বলিয়া পরিচিত ছিল।" মুসলমান ইতিহাস লেখকগণ লক্ষ্মণ সেনকে পলায়ন কলঙ্কে কলঙ্কিত করেন নাই; তদীয় রাজ্যাব্দের অশীতিবর্ষে দিগ্বিজয়ের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন; আমরাই তথ্য নির্ণয়ে অগ্রসর না হইয়া, অনুমান বলে "রায়লছমনিয়াকে" লক্ষ্মণ সেন বলিয়া ধরিয়া লইয়া, অযথা কলঙ্কে স্বদেশের ইতিহাস মলিন করিয়া তুলিতেছি।" 'প্রবাসী' মাঘ মাস ১৩১৫ দশম সংখ্যা 'লক্ষ্মণ সেনের পলায়ন কলঙ্ক' শীর্ষক প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য। অমর কবি ঋষি বঙ্কিমও লিখিয়াছেন "সপ্তদশ অশ্বারোহী লইয়া বক্তিয়ার খিলিজী বাঙ্গলা জয় করিয়াছিলেন, একথা যে বাঙ্গালী বিশ্বাস করে, সে কুলাঙ্গার। (বঙ্গদর্শন ১২৮৭ সাল অগ্রহায়ণ)

অধ্যাপক ব্লকম্যান লিখিয়াছেন The Bengal territory conquered in 1203-4 by the Mahamedans did not comprise the Eastern District. The Bangadesh was still under Bullal's descendents till the end of the 13th century, when Sonarganw was occupied by the second son of the Emperor Bulban,

(Blochman's History and Geograhy of Bengal).

১৩২৩ খ্রীষ্টাব্দে তোগলক সাহের শাসনকালে সুবর্ণগ্রামে ও সপ্তগ্রামে প্রথম মুসলমান শাসনকর্ত্তা নিয়োগের উল্লেখ দেখা যায়, এই সুদীর্ঘকাল পশ্চিমোত্তর বঙ্গের রাজছত্র মাত্র গ্রহণ করিয়া পূর্ব্ববঙ্গ অধিকারের চেষ্টায় পাঠান নৃপতিগণ পুনঃ পুনঃ বিফল মনোরথ হন। বিক্রমপুরের অতীত ইতিহাসের জীর্ণ পত্রে যে উজ্জ্বল মহিমাময় স্বাধীনতার জীবন্ত চিহ্ন অঙ্কিত রহিয়াছে তাহা চিরগৌরবময় পুণ্যকাহিনী। অধম আমরা, তাহা কি আলোচনা করিতে শিখিয়াছি ? বিশ্বরূপ সেন উদারচরিত্র, দানশীল এবং ভ্রাতৃবৎসল ছিলেন। মহারাজা লক্ষ্মণ সেন শেষ বয়সে তীর্থযাত্রায় প্রবৃত্ত হইলে কেশব সেন বিক্রমপুরে বিশ্বরূপের সভায় উপস্থিত হইলে মহারাজ বিশ্বরূপ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত গ্রহণ করেন ও স্বীয় সিংহাসনে অভিষিক্ত করেন। কেশব নিজে কোনও রূপ রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতেন না, প্রকৃত শাসন ভার বিশ্বরূপের হস্তেই অর্পিত ছিল, কেশব সেন কয়েক বৎসর মাত্র রাজা ছিলেন। লক্ষ্মণ সেনের তীর্থযাত্রার পরে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র মাধবসেনও রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া হিমালয় প্রদেশে যাত্রা করেন। কুমায়ূনে কেদারনাথ তীর্থে মাধবসেনের ও তাঁহার সঙ্গীয় বন্দ্যবংশীয় ব্রাহ্মণের নাম তাম্রশাসনে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। উক্ত বন্দ্যবংশধরগণ অদ্যাপি

বিশ্বরূপ সেন।
ও
তাঁহার প্রচলিত সন।

তথায় বাস করিতেছেন। বিশ্বরূপের শাসন সময়ে বিক্রমপুরের শাসন-শৃঙ্খলা ও কর আদায়ের সুবিধার্থ তিনি একটা সন প্রচলিত করেন,* অদ্যাপি শতাধিক বর্ষের প্রাচীন দলিলে সেই সনের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। আমরা এখানে একখানা দলিলের অনুলিপি প্রদান করিলাম। যে কয়খানা দলিল প্রাপ্ত হইয়াছি তাহার প্রত্যেকখানাই বিক্রমপুরের অন্তর্গত আরিয়ল গ্রামের কাগজীদের নির্ম্মিত কাগজের ন্যায় হরিদ্বর্ণ কাগজে লিখিত। এইগুলি এইরূপ জীর্ণ শীর্ণ হইয়া গিয়াছে যে অতি সন্তর্পণে নাড়াচাড়া না করিলে নষ্ট হইয়া যাইবার সম্ভাবনা খুব বেশী। সুন্দর ঘন কৃষ্ণবর্ণ কালিদ্বারা গোট গোট অক্ষরে লিখিত, অনেক স্থলেই বর্ত্তমান আকার, ইকার ও অক্ষরের পার্থক্য দৃষ্ট হয়। অনেক প্রাচীন ব্যক্তিরাও পরিষ্কাররূপে সমুদয় দলিলগুলির পাঠোদ্ধার করিতে পারেন নাই। এই দলিলগুলির মর্ম্ম পাঠে তৎকালীন রীতিনীতি সম্বন্ধেও কতকটা জ্ঞান লাভ করা যায়। বর্ত্তমান প্রচলিত দলিল-পত্রের ভাষা ও লিখন ভঙ্গিমা এবং ইহার ভাষা ও লিখন ভঙ্গিমা এক প্রকারের নহে। দলিলের কাগজগুলি দৈর্ঘ্যে প্রায় এক হাত এবং প্রস্থে ১০ অঙ্গুলীর বেশী হইবে না। দেখিতে কতকটা আধুনিক বালি কাগজের মত। দলিলের ইসাদি বা সাক্ষীর নামগুলি বর্ত্তমান সময়ে যেমন লিখিত পৃষ্ঠে থাকে, ইহা তদ্রূপ নহে, ইহাতে ইসাদীর নাম দলিলের পশ্চাৎ পৃষ্ঠে লিখিত। আমরা দলিলের যে যে স্থান বুঝিতে পারি নাই, সেই সেই স্থানে * * এইরূপ চিহ্ন প্রদান করিলাম। যে দু'এক স্থানের পাঠোদ্ধার করিতে পারি নাই, তাহাতে দলিলের মর্ম্ম অবগত হইবার পক্ষে কেনওরূপ অসুবিধা হইবে না।

* মোগল শাসনের সময় এই সনই বিক্রমপুরের সর্ব্বত্র পরগণাতিসন নামে উল্লিখিত হইত।
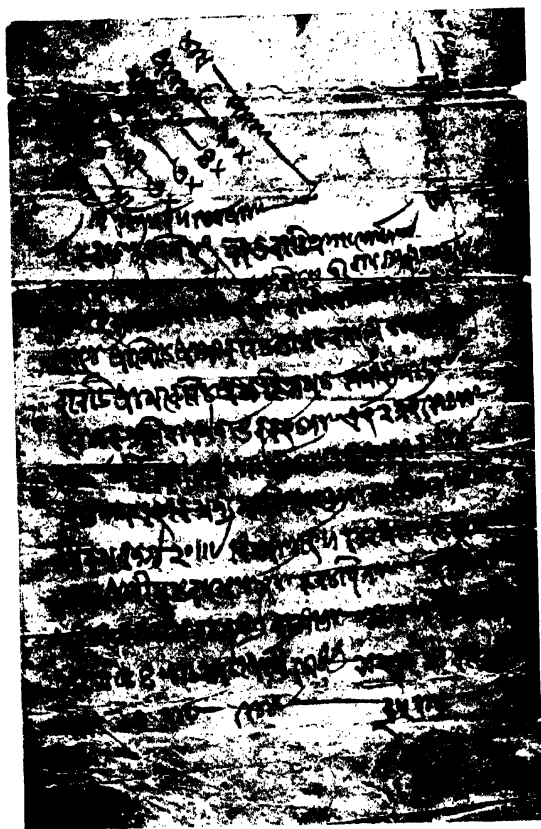
একখানি প্রাচীন দলিল।

দলিলের অনুলিপি।

/৭ ইয়াদি জমা মুর্ণ্য ভূমি বিক্রয় পত্র মিদং শ্রীভবানীপ্রসাদ শর্ম্মা ওলধে অনন্ত রায় শর্ম্মা মুচরিতেষু শ্রীরামগঙ্গা শর্ম্মণে ওলধে রামকেশব বাড়ুড়ি ইবনে রাজীব বাড়ুড়ি লিখনং আগে পরগণে বিক্রমপুর সরকার সোণারগাঁও তপে নহাটা হিস্তে রামরাম চৌধুরী আমার ঘরে নিজ তালুক বনামে রামচন্দ্র বাড়ুড়ি লিখা যায় এতাহ * * কিসমত কামারখাড়া স্থান পশ্চিম নাথের দরজার পশ্চিমের আমার নিজ অংশের যোত যাহা মূল্য এক কোঠা কাত ও বরুইতলা জোত * * * * এক কোঠা একুনে ২ কোঠা কাত মাপ জমি ১৬৷৷ পগুনে সতর গণ্ডির রসি কানি ২৫ পচিস রূপাইয়া পরে ১৪৷ চৌর্দ্দি গণ্ডায় এক কোণ * * জমি বসত * * মবলগ ২০৷৷৷/ কুড়ি রূপাইয়া তের আনা তোমার স্থানে পাইয়া * * বেচিলাম। আমি তোমার এই ভূমি মাফিক চিঠা দরোবস্ত সোমঝ করিয়া দান বিক্রয়াধিকারী হইয়া পুত্র পৌত্রাদি কারি হইয়া সনে সনে * * * আমল করিয়া যথিষ্ট বিয়োগ করহ এহার জমার কসিসিন কালে তোমার ঠাই কিছু দায় নাহি এই লিখনে জমা মূর্ণ্য ভূমি বিক্রয় পত্র * * * প্রতি সন ১১৬২ এগারশ বাষাঠ্য বাংলা পরগণাতী সন ৫৫৪ পাচস চৌপান্ন সহরে ১৪ রবিকুরি মাহে ৩ মাঘ রোজ বুদবার।

(দস্তখত) শ্রীরামগঙ্গা শর্ম্মা।

এই দলিলের বানান সাধারণে যাহাতে বুঝিতে পারেন তজ্জন্য ঈষৎ পরিবর্ত্তন করিয়া দিলাম, কারণ দলিল মধ্যে কোন স্থানেই র এর নিম্নস্থ বিন্দু লিখিত ছিল না, প্রত্যেকটীই ব এর মত লিখিত ছিল। /৭ এই রূপ চিহ্ন নাকি সেকালে মঙ্গল চিহ্নরূপে ব্যবহৃত হইত, বিস্ময়ের বিষয় এই যে, এই দলিলখানার পর্ব্বের ও পরের পরবর্ত্তী যে কয়েকখানা দলিল

পাইয়াছি তাহাতে /৭ এইরূপ চিহ্ন কিংবা পরগণাতি সনের কোনও উল্লেখ নাই, ইহার কারণ কি? আবার ১১৬২ সন হইতেও প্রাচীন যে দুই এক খানা দলিল দেখিয়াছি তাহাতেও এইরূপ /৭ চিহ্ন ও পরগণাতি সনের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। এখন আমাদের অনুসন্ধান করিতে হইবে যে, কোন্ সময় হইতে এই পরগণাতি সনের সৃষ্টি হইয়াছে। ১৩১৫—১১৬২ = ১৫৩ + ৫৫৪ = ৭০৭, যদি পরগণাতি সন অদ্যাপি প্রচলিত থাকিত তবে আমাদিগকে দলিল পত্রে ৭০৭ পরগণাতি সন এইরূপ উল্লেখ করিতে হইত। দুঃখের বিষয় দেড় শত বৎসর পূর্ব্বেও যাহা প্রচলিত থাকিয়া একটা প্রাচীন স্মৃতি বহন করিতেছিল, নূতন রাজশক্তির আবির্ভাবে নবীন শিক্ষা ও সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে তাহার ক্ষীণস্মৃতি ভবিষ্যদ্বংশীয়দের চক্ষুর নিকট হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় বল্লালসেন

বিশ্বরূপ সেনের পরে কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত সেনবংশীয় রাজগণের মধ্যে যাঁহারা পূর্ব্ববঙ্গের শাসন দণ্ড পরিচালিত করেন তাঁহারা কেহই প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন না। লাক্ষণ্য বা অশোক সেনের পরে দ্বিতীয় বল্লাল সেন বিক্রমপুরের রাজসিংহাসন অলঙ্কৃত করেন। প্রথম বল্লালের শাসন সময়ে বিক্রমপুর যেমন রাজশক্তিতে ও জ্ঞানালোকে দেশ দেশান্তরে যশঃপ্রভা বিকীর্ণ করিয়াছিল, এই বলবীর্য্যসম্পন্ন নরপতির সময়েও সৌভাগ্য-লক্ষ্মীর করুণাকটাক্ষে বিক্রমপুর পুনরায় যশোমাল্য গলে ধারণ করিতে সক্ষম হইয়াছিল। এই নৃপতির সম্বন্ধে এইরূপ একটী প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, ইনি বায়াদমের সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিয়া জয়লাভ করেন, কিন্তু তাঁহার কপোত হটাৎ ছুটিয়া গিয়া অগ্রে গৃহে প্রত্যাগত হওয়াতে রাজপুরান্তর্গত মহিলারা পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত জলন্ত অনলকুণ্ডে প্রবেশ করিয়া প্রাণত্যাগ করেন।

গোপালভট্ট কৃত বল্লালচরিতেও ইহার উল্লেখ দৃষ্ট হয়—

অথা বর্ষান্তরে প্রাপ্তে দৈবচক্রাৎ সুদারুণাৎ।
বিক্রমপুরমধ্যে চ রামপাল গ্রামে তথা॥
বায়াদুম্‌নাম ম্লেচ্ছোহসৌ যুদ্ধার্থং সমুপাগতঃ।
যযৌস যুদ্ধে চ বল্লালঃ বিপক্ষসম্মুখং তথা॥
প্রণম্য মাতরং স্ত্রীভ্যো দত্ত্বালিঙ্গনচুম্বনং।
স্ত্রিয়োঽব্রুবংস্তু রাজানং বাষ্পাকুলিতলোচনৈঃ॥
যদি স্যাদশিবং যুদ্ধে কিং নো নাথ গতিস্তদা।
ততো গদ্‌গদসৌ রাজা সংচুম্ব্যালিঙ্গৎ তাঃ পুনঃ॥
দুরাত্মযবনাৎ ধর্ম্মং সতীত্বং রক্ষিতুং চ বৈ।
শ্রেয়ো মৃত্যুশ্চ যুষ্মাকং চিতাদাহেন নিশ্চিতং॥
কপোতযুগলং দূতং মমামঙ্গলসূচকং।
পূর্ব্ব প্রস্তুত চিতায়াং দৃষ্টৈব মরণং ধ্রুবং॥

বাবা আদম সম্বন্ধীয় বিবিধ কথা।

আমরা এতৎসম্পর্কিত আরও দুইটী প্রচলিত কিম্বদন্তীর উল্লেখ করিতেছি, পাঠকগণ দেখিতে পাইবেন যে, এ সকলের মধ্যে কেমন একটা সুন্দর সামঞ্জস্য বিদ্যমান। (১) এই সম্বন্ধে রামপালের নিকটবর্ত্তী মুসলমানগণ বলিয়া থাকেন যে (১) বাবা আদম নামক একজন অতি ক্ষমতাশালী দরবেশ ছিলেন। তিনি বল্লালের (২য়) রাজত্ব সময়ে একদল সৈন্যসহ রামপালের সন্নিকটবর্ত্তী আবদুল্লাপুর গ্রামে ছাউনী করেন এবং গোমাংস খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া হিন্দুরাজার দুর্গ প্রাকারাভ্যন্তরে নিক্ষেপ করেন। বল্লালসেনের দৃষ্টিপথে সে সমুদয় মাংসখণ্ড নিপতিত হওয়ায় তিনি অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইয়া ইহার অনুসন্ধানের নিমিত্ত দেশের চারিদিকে লোক প্রেরণ করেন।

একজন দূত সত্বর প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বলিল যে রাজপ্রাসাদের অনতিদূরে এক দল সৈন্য আসিয়া ছাওনি করিয়াছে, তাহাদের দলপতি এক্ষণে

নমাজ পড়িতেছেন, সেই দলপতি দ্বারাই এই কার্য্য সংঘটিত হইয়াছে। বল্লাল সেন দূতমুখে এই সংবাদ জ্ঞাত হইয়াই যোদ্ধৃবেশে অশ্বারোহণে সেই নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিতে পাইলেন বাবা আদম তখনও উপাসনা নিযুক্ত রহিয়াছেন। বল্লাল শত্রুকে বধ করিবার এইরূপ উপযুক্ত সুযোগ পরিত্যাগ করা যুক্তি সঙ্গত মনে করিলেন না, তিনি সেই মুহূর্ত্তেই তরবারির আঘাতে উপাসনানিবিষ্টমনা বাবা আদমের মস্তক দেহ-চ্যুত করিয়া ফেলিলেন। * বাবা আদম কে ছিলেন তাহা কেহ বলিতে পারেন না। (২) অপর একটী জনপ্রবাদ হইতে আমরা জ্ঞাত হই যে,

* The Majid of Adam Shahid is in Vikrampur at a village called Qaziqacbash, within two miles of Ballal-bari, the resi-dence of Ballal Sen. Mr. Taylor, in his Topography of Dacca states that Adam Shahid or Baba adam, was a Qazi, who ruled over Eastern Bengal. He gives no authority for this statement and at the present day the residents of the village are ignorant of this fact. They relate that Baba Adam was a very powerful Durwash, who came to this part of the country with an army during the reign of Ballal Sen. Having encamped his army near Abdullapur a village about three miles to the N. E. he caused pieces of cows flesh to be thrown within the walls of Hindu prince's fortress. Ballal Sen was a very irate and sent messengers throughout the country to find out by whom the cow had been slaughtered. One of the messengers shortly returned and informed him that a foreign army was at hand and that the leader was then praying within a few miles of the palace. Ballal Sen at once galloped to the spot and found Baba Adam still praying, and at one blow cut off his head.

Such is the story told by the Mahomodians of the present day regardless of dates and well authenticated facts.

Dr wise in the
Asiatic Journal VoL. XIII.
Part I, Page 285.

তিনি মক্কা হইতে প্রত্যাগত একজন ক্ষমতাশালী ফকির ছিলেন। মহারাজ বল্লালসেনের (২য়) রাজত্ব সময়ে কোন মুসলমান গো-হত্যা করিতে পারিত না। রামপালের অদূরবর্ত্তী কোনও গ্রামবাসী অপুত্রক মুসলমান প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল যে, যদি জগদীশ্বরের কৃপায় তাহার পুত্রসন্তান হয় তাহা হইলে সে একটী গো-হত্যা করিয়া আত্মীয় স্বজনকে পরিতোষ সহকারে ভোজন করাইবে। দৈবক্রমে তাহার একটী পুত্র সন্তান হওয়ায় সে তাহার প্রতিজ্ঞানুযায়ী কার্য্য সম্পাদন করিল। বিধির আশ্চর্য্য বিধান। একটা চিল একখণ্ড মাংসমুখে করিয়া লইয়া রাজ প্রাসাদোপরি উপস্থিত হয়। রাজা বল্লালের (২য়) দৃষ্টিপথে উহা পতিত হইল। তাঁহার আদেশ অমান্য করার অপরাধে সেই মুসলমানটি ধৃত ও তৎসমীপে নীত হইলে, বল্লালসেন তাহাকে তদীয় আদেশ লঙ্ঘন করার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন সে ব্যক্তি তাহার প্রতিজ্ঞার বিষয় বিবৃত করিল। বল্লাল তৎক্ষণাৎ সেই শিশুটীকে তাহার নিকট আনয়ন করিতে আদেশ করিলেন। রাজাদেশ অচিরে প্রতিপালিত হইল। যে শিশুর জন্ম হইতেই তদীয় রাজ্যে ঈদৃশ হিন্দুধর্ম্ম বিগর্হিত গো-হত্যা সংসাধিত হইল, মহারাজা সেই প্রফুল্ল কুসুমতুল্য সুকুমার শিশুকে তন্মুহূর্ত্তেই তদীয় হতভাগ্য পিতার সম্মুখে নিহত করিতে আদেশ দিলেন এবং সেই মুসলমানকে তাঁহার রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া দিলেন। *

---

* Taylor সাহেব তৎপ্রণীত 'Topography of Daoca' শীর্ষক গ্রন্থে বাবা আদম সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে 'on the conquest of Bengal by the Mohamedans * * * the government of the eastern Districts was confided to Cazis, who resided at Bikrampore, Sabar and Sunergong. The most celebrated of these religious rulers was Pir Adam, who governed at Bikrampore, where it would appear he made himself notorious by his persecution and bigotry. তাঁহার এ উক্তির তিনি কোন প্রমাণ দেন নাই। Topography of Dacca, p. 67.

নির্ব্বাসিত, উৎপীড়িত এবং শোকার্ত্ত পিতা প্রতিহিংসা বৃত্তি চরিতার্থ করিবার উদ্দেশ্যে নানাদেশ পর্য্যটন করিতে করিতে অবশেষে মক্কায় উপনীত হইয়া বাবা আদমের সাক্ষাৎ পায়, এবং তাঁহার নিকট স্বকীয় মনঃকষ্টের কারণ বিবৃত করে; এই মুসলমানটীর সকরুণ বিবাদ কাহিনী শ্রুত হইয়া বাবা আদম সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন এবং তৎসহ ভারতবর্ষে আগমন করিলেন।

বাবা আদম নিজ চতুরতা ও বুদ্ধি কৌশলে ভারতে উপনীত হইবার অল্পকাল পরেই একদল সুশিক্ষিত ও সুদক্ষ সৈন্য সংগ্রহ পূর্ব্বক উৎপীড়িত মুসলমানটী সহ রামপালে উপনীত হইয়া রাজপ্রাসাদের অনতিদূরবর্ত্তী কানাইচঙ্গ নামক স্থানের একটী মসজিদে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। * মহারাজ বল্লালসেন (২য়) বাবা আদমের আগমনবার্ত্তা জ্ঞাত হইলেন এবং অনুসন্ধান করিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার সৈন্যগণ অপেক্ষা বাবা আদমের সৈন্যগণ অধিকতর শিক্ষিত, কাজেই এইরূপ যুদ্ধে তাঁহার জয়লাভ অসম্ভব। সুতরাং তিনি যুদ্ধ বাসনা পরিত্যাগ করিয়া সুকৌশলে বাবা আদমের সহিত দ্বন্দযুদ্ধের প্রস্তাব করিলেন। বাবা আদমও ইহাতে স্বীকৃত হইলেন। ইহাঁরা উভয়ে চৌদ্দদিন পর্য্যন্ত সমভাবে যুদ্ধ করিয়া ও কেহ কাহাকে পরাজয় করিতে পারিলেন না। যুদ্ধের শেষ দিবস বাবা আদম যখন সায়ংকালীন প্রার্থনা করিতেছিলেন, তখন বল্লাল সেন (২য়) পশ্চাৎ হইতে তাঁহাকে তরবারির আঘাত করিলেন, কিন্তু ঐ আঘাতে বাবা আদমের কিঞ্চিন্মাত্রও ক্ষতি হইল না, তিনি প্রসন্নচিত্তে বল্লালের দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন যে, "আমার নিজ তরবারি ব্যতীত, অপরের কোনরূপ অস্ত্রে আমার দেহে বিন্দুমাত্রও

* শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলেন যে বল্লালের কানাইচঙ্গ নামক একজন চণ্ডাল সৈন্যাধ্যক্ষ এই যুদ্ধে বিশেষ বীরত্ব প্রদর্শন করায় বল্লাল তাহার নাম স্মরণার্থ ঐ যুদ্ধক্ষেত্রের নাম কানাইচঙ্গের মাঠ রাখিয়াছিলেন।"

আঘাত লাগিবে না।" এই কথা শোনা মাত্রই মহারাজ বল্লাল বাবা আদমের পার্শ্বস্থিত তদীয় তরবারি গ্রহণ করিয়া এক আঘাতে বাবা আদমের মস্তক দেহচ্যুত করিয়া ফেলিলেন।

বল্লালের সর্ব্বশরীর শোণিতে রঞ্জিত হইয়া গিয়াছিল, তিনি শোণিত-সিক্ত দেহও বস্ত্র ধৌত করিবার নিমিত্ত যখন নিকটবর্ত্তী সরোবরে অবগাহন করিতেছিলেন, তখন তদীয় শিথিল বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে কবুতরটী বহির্গত হইয়া গগনপথে অদৃশ্য হইল। মহারাজ বল্লালসেন পুরমহিলাগণের নিকট বলিয়া আসিয়াছিলেন যে যদি কবুতরটী একা গৃহে ফিরিয়া আইসে, তাহা হইলে তাহার যুদ্ধে পরাজয় ও মৃত্যু বুঝিতে হইবে। কবুতরটীকে একা এইরূপে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে দেখিতে পাইয়া রাজ-কুল-লক্ষ্মীগণ মান সম্ভ্রম রক্ষা করিবার জন্য প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে নিপতিত হইয়া জীবন বিসর্জ্জন করিলেন। বিধাতার বিধান আশ্চর্য্যরূপে সম্পন্ন হইল!

বল্লালসেন (২য়) কবুতরটী এইরূপ আশ্চর্য্যভাবে অন্তর্হিত হওয়ায় বিশেষ উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন, এবং সত্বর রাজ প্রাসাদে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া দেখিতে পাইলেন যে পুরমহিলাগণ সকলেই অগ্নিতে দেহ বিসর্জ্জন করিয়াছেন। এইরূপ অবস্থায় জীবন ধারণ করা বিষম ভারাবহ বোধে তিনিও তাহাদের ন্যায় অগ্নিতে আত্মবিসর্জ্জন করিলেন। * বলা

---

* Notes on the Antiquities of Dacca by sayed Aulad Hasan.

ঔলদ হোসেন সাহেবের এ গল্পের উপাখ্যান ভাগ অতি রঞ্জিত। কারণ দ্বিতীয় বল্লালের রাজত্ব সময় রামপালের নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে মুসলমান বাস করিত না। তবে ইহা বিশ্বাস্য যে বায়াদম নামক কোন মুসলমান বল্লালের রাজধানী আক্রমণ করে এবং সেই যুদ্ধে তিনি উহাকে পরাজিত ও নিহত করিয়া বাড়ীতে ফিরিয়া পারিবারিক দুর্ঘটনা দৃষ্টে প্রাণ পরিত্যাগ করেন। নচেৎ বল্লালের ন্যায় একজন বীরপুরুষ যে ধর্ম্মকার্য্যে নিরত একজন ধার্ম্মিককে অন্যায়রূপে নিহত করিবেন ইহা অসম্ভব ও অপ্রামাণিক। নোটের উপর

বাহুল্য যে এ সমুদয়ই কিম্বদন্তী মাত্র। ইহার মধ্যে কোনও ঐতিহাসিক সত্য গোপনে এবং ক্ষীণদেহে নিজ অস্তিত্ব রক্ষা করিতেছে কি না তাহা কেহই বলিতে পারেন না।

আবদুল্লাপুরের এই ভীষণ যুদ্ধে বল্লাল পরাজিত হন এবং সেই সঙ্গে সঙ্গেই বিক্রমপুরও সুবর্ণ গ্রামের স্বাধীনতা সূর্য্য চিরঅস্তমিত হয়, ২য় বল্লালসেন পুড়িয়া মরিয়াছিলেন বলিয়া উত্তরকালে পোড়ারাজা নামে অভিহিত হইয়া রহিয়াছেন। কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন যে বায়াদম হত হওয়ার পরে আবদুল্লাপুরে (সে সময়ে আবদুল্লাপুর নাম ছিলনা—পাইকপাড়া) যুদ্ধ উপস্থিত হয় এবং সেই যুদ্ধেই দ্বিতীয় বল্লালের মৃত্যু ঘটে, সকল দিক দেখিতে গেলে ইহাই যথার্থ বলিয়া মনে হয়। সুবর্ণগ্রামের ইতিহাস-প্রণেতা স্বরূপ চন্দ্ররায়ের মতে—

গোপাল ভট্ট রচিত বল্লালচরিত মতে—

"বৈদ্যবংশাবতংসোঽয়ং বল্লালোনৃপ-পুঙ্গবঃ।
তদাজ্ঞয়া কৃতমিদং বল্লালচরিতং শুভম্ ॥
গোপাল ভট্টনাম্না চ তদ্রাজশিক্ষকেন চ।
অব্দরাজজমানে বহ্নিভির্বাণৈরধিকশাকেষু।
কুবৈশ্চ দর্শিতে মাসে রাশিভির্মানসম্মিতৈঃ ॥

অর্থাৎ ১৩০০ শকাব্দে (১৩৭৮ খৃঃঅঃ) বৈদ্যবংশোদ্ভব রাজা বল্লালের অনুজ্ঞায় তদীয় শিক্ষক গোপালভট্ট কর্ত্তৃক বল্লালচরিত রচিত হইল। এই বল্লাল চরিত পাঠেও জানিতে পারা যায় যে বৈদ্যরাজ বল্লাল বাবা আদম।নামক মুসলমানের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার পরিজনবর্গ জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে পতিত হইয়া দেহত্যাগ করিয়াছিলেন।

চতুর্থ অধ্যায়।

—:○:—

রামপাল।

রামপাল বঙ্গদেশের প্রাচীন রাজধানী। 'রামপাল' এই শব্দটী উচ্চারণ করিলেই বিক্রমপুরবাসীর হৃদয়ে এক অভূতপূর্ব্ব ভাবের উদয় হয়। স্বাধীনতার পুণ্য নিকেতন, বীরত্বের কেন্দ্রস্থল, পাণ্ডিত্যের গৌরব দর্পিত রামপালের পবিত্র স্মৃতি আমাদিগকে ক্ষোভে ও বিস্ময়ে অভিভূত করিয়া ফেলে। যে স্থানে একদিন রাজ প্রাসাদ শোভা পাইত; হস্তীর বৃংহিত নাদে, অশ্বের হ্রেষা রবে ও সৈন্যগণের কোলাহলে যে স্থান প্রতি নিয়ত ধ্বনিত হইত, তাহা এখন নীরব ও নির্জ্জন। রাজপ্রাসাদ যেখানে ছিল, সেখানে এখন কৃষক হল চালনা করিতে করিতে চিরজয়ী কালের বিজয় গৌরব ঘোষণা করিতেছে। গভীর জল পরিপূরিত প্রাসাদ বেষ্টিত পরিখাগুলি এখন সবুজ সুন্দর ধান্যক্ষেত্রে পরিণত হইয়া জাগতিক বস্তুর নশ্বরতা প্রকাশ করিতেছে। বৃহৎ ও সুন্দর যাহা কিছু দর্শনীয় ও উপভোগ্য ছিল সময়ের পরিবর্ত্তনের সহিত সে সমুদয় অন্তর্হিত হইয়াছে। বিক্রমপুর এক মহাশ্মশান—সে শ্মশানের শ্মশান রামপাল। অতীতের গৌরব-বৈভবময়, জ্ঞান-ধর্ম্মবিমণ্ডিত সভ্যতা ও শ্রেষ্ঠতার সঙ্গে ধনৈশ্বর্য্যের ও বীরত্বের যে মহিমোজ্জ্বল মিলন সংগঠিত হইয়াছিল, বর্ত্তমান যুগে শ্মশানের এই পুঞ্জীভূত ভস্মরাশির নিম্ন হইতে তাহার ছায়া-চিত্র গ্রহণ করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। এ সংসারে সকলি যায় থাকে কেবল স্মৃতি। অমা রজনীর তিমিরাবৃত গগনে জলদ—নিচয়ের মধ্য হইতে বিদ্যুত ঝলসিত হইলে পথ হারা পান্থ যেমন ক্ষণিক

উল্লসিত হইয়া উঠে, আমরাও তেমনি অন্ধতমসাচ্ছন্ন প্রাচীন ইতিহাস উদ্ধার করিতে যাইয়া স্মৃতির আলোকে পথ ধরিয়া চলিয়াছি!

বিক্রমপুরের পূর্ব্বোত্তর প্রান্তে মেঘনাদ (মেঘ্না) নদের পশ্চিম তটে বর্ত্তমান ঢাকা নগরীর বার মাইল দক্ষিণ পূর্ব্ব ও মুন্সীগঞ্জ মহকুমার দুই ক্রোশ পশ্চিমে রামপাল অবস্থিত। অক্ষা °২৩° ৩৮′ উঃ এবং দ্রাঘি ৹৯০°৩২′১০″ পূঃ। রামপাল এবং ইহার চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম ইত্যাদি অভিনিবেশ সহকারে পরিদর্শন করিলে প্রাচীন কালে যে ইহা কতদুর বিস্তৃত ও সমৃদ্ধিশালী ছিল তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। প্রাচীনকালে ইহার বিস্তৃতি দৈর্ঘ্যেও প্রস্থে প্রায় দশ বার মাইল পর্য্যন্ত ছিল। কারণ রামপালের সমীপবর্ত্তী দশবার মাইলের মধ্যে এমন স্থান নাই যেখানে অদ্যাপি কোন না কোন প্রাচীন চিহ্ন বিদ্যমান না আছে। যে সমুদয় বৈদেশিক এবং দেশীয় পর্য্যাটক অভিনিবেশ সহকারে রামপাল ও তৎসমীপবর্ত্তী গ্রাম সমূহ পরিদর্শন করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ইষ্টক স্তূপ, রাজপথাদির ভগ্নাংশ, দেউল ইত্যাদি দেখিয়া আমাদের উক্তির যথার্থতা স্বীকার করিবেন। এখনও আবদুল্লাপুর, রিকিববাজার, ফিরিঙ্গিবাজার, পঞ্চসার, সোণারঙ্গ, পাইকপাড়া, বজ্রযোগিনী, চুড়াইন ইত্যাদি স্থানে দেউল, রাস্তা ও অট্টালিকাদির ভগ্নাবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। হায়! কে জানিত যে, একদিন মহা সমৃদ্ধ রাজনগর দরিদ্র কৃষক বসতিতে পরিণত হইবে? কত প্রাচীন মহামহীরুহ আজিও উন্নত মস্তকে দণ্ডায়মান রহিয়াছে, কিন্তু হায়! সে নয়ন-মন-মোহকর স্বাধীনতার প্রদীপ্ত গৌরব স্থল, বল্লালের সুমহান রাজপ্রাসাদ কোথায়? সুদীর্ঘ সরোবর অদ্যাপি বিশুষ্ক দেহে পড়িয়া রহিয়াছে, কিন্তু তাহার পাষাণ সোপান সমূহ কোথায়? যাহা ছিল তাহা মাতা বসুন্ধরা নিজ

রামপালের অবস্থান।

উদরে গ্রহণ করিয়াছেন। ধ্বংসাবশিষ্ট পুরাতন দৃশ্যাবলীর মধ্যে দণ্ডায়মান হইলে হৃদয়ে আপনা হইতেই একটা শ্মশান বৈরাগ্যের ভাব জাগিয়া উঠে, মনে হয় কবি সত্যই গাহিয়াছেন :—

"বীরত্বের গর্ব্ব আর প্রভুত্ব বিভব
সম্পদ সংসার সব যাহা করে দান,
অলঙ্ঘ্য মৃত্যুর হায়! মুখাপেক্ষী সব
গৌরবের পথ মাত্র মৃত্যুর সোপান।"

রামপালের নামোৎপত্তি সম্বন্ধে নানা প্রকার জন প্রবাদ প্রচলিত। কেহ কেহ বলেন পালবংশীয় সপ্তদশ নরপতি রামপালের নামানুসারে 'রামপাল' এই নামোৎপত্তি হইয়াছে। * কিন্তু 'লঘুভারত'কার বলেন যে :—

* * * রাম নাম্নৈকো বৈদ্যরাজ মহাধনী,
তৎপালিতা সা নগরী রাম পালেতি সংস্থিতা।"

অর্থাৎ রাম নামক জনৈক বৈদ্যবংশোদ্ভব মহাধনী নরপতির রাজধানী ছিল বলিয়াই ইহার নাম রামপাল হইয়াছে। বিখ্যাত সাহিত্য-সংস্কারক রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর C. I. E. বলেন "বল্লাল প্রতিষ্ঠিত রাজবাড়ীর মুদীর নাম ছিল রামানন্দ পাল, লোকে তাহাকে সাধারণতঃ রামপাল বলিত। রাজবাড়ীর তণ্ডুলাদি যোগাইয়া, রামপাল কালে সমৃদ্ধিশালী হইল এবং বল্লালের রাজধানী হইতে খানিকটা দূরে বাড়ী করিয়া দেশীয় বণিক সমাজে সম্মানের আসন লাভ করিল। বল্লাল যখন দীঘী খনন করেন, তখন তাঁহার দীঘী সংবর্দ্ধিত হইয়া রামপালের বাড়ীর নিকট গিয়া পঁহুছে এবং রামপালের শুভাদৃষ্ট ক্রমে রামপাল দীঘী নামে পরিচিত হয়। এ সম্পর্কে একটী গ্রাম্য উপকথা আছে, তাহার

* বিশ্বকোষ—শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু।

প্রথম পংক্তি এই, "বল্লালকাটায় দীঘী নামে রামপাল।" * রামপালের নামোৎপত্তি সম্পর্কিত এ সমুদয় কিম্বদন্তী পর্য্যালোচনা করিলে আমাদের মনে হয় যে পালবংশীয় নরপতি রামপালের নাম হইতে কিংবা রাম নামক বৈদ্যরাজের নাম হইতেই রামপালের নামোৎপত্তি অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য ও সম্ভবপর। তবে ঐতিহাসিক তথ্য নির্ণয়ের জন্য এতাদৃশ প্রমাণ ও যুক্তির উপর নির্ভর করা বিশেষ সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। ইতিহাস যে স্থলে নীরব, জনপ্রবাদ যে, সে স্থানে সমাদর লাভের অগ্রগণ্য দাবী লইয়া দাঁড়াইবে, তাহাতে বিন্দু মাত্রও সন্দেহ নাই।

কয়েক বৎসর অতীত হইল কতকগুলি দেবদেবীর প্রতিমূর্ত্তি এখানে মৃত্তিকাগর্ভ হইতে পাওয়া গিয়াছিল, সে সমুদয় এখনও ঢাকা নগরীতে রক্ষিত আছে। আরও নানা প্রকার প্রবাদ প্রচলিত আছে যে অনেক নিম্ন শ্রেণীস্থ লোক কাষ্ঠ কর্ত্তন করিতে যাইয়া এবং কৃষকেরা হল চালনা কালে এই স্থানে বহু স্বর্ণ, রৌপ্যও বহুমূল্য প্রস্তরাদি পাইয়াছে। একবার সপ্তদশ সহস্র মুদ্রা মূল্যের একখণ্ড হীরক এস্থানে পাওয়া গিয়াছিল। † কত লোক যে এখান হইতে ধন রত্ন লাভ করিয়া অর্থশালী হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে রাম পালের পশ্চিম স্থিত জোড়াদেউল নামক গ্রামের জনৈক মুসলমান স্বর্ণ নির্ম্মিত একটী তলোয়ারের খাপ ও কয়েকটি স্বর্ণগোলক পাইয়াছিল, ঐ সমুদয় স্বর্ণের ওজন প্রায় সাত সের ছিল। বিগত ১৩১০ সনে

* বান্ধব দ্বিতীয় খণ্ড, আশ্বিন ও কার্ত্তিক ১৩১০, ষষ্ঠ ও সপ্তম সংখ্যা কিশোর গৌরাঙ্গ।

† A few years ago a ryott while ploughing a field in this place found a diamond of the value of Rs. 70,000 (£7,000), it afterwards gave rise to a law suit before the Provincial Court of Appeal.

(Taylor's Topography of Dacca).

চূড়াইন গ্রামে প্রাপ্ত রজত নির্ম্মিত বিষ্ণুমূর্ত্তি।
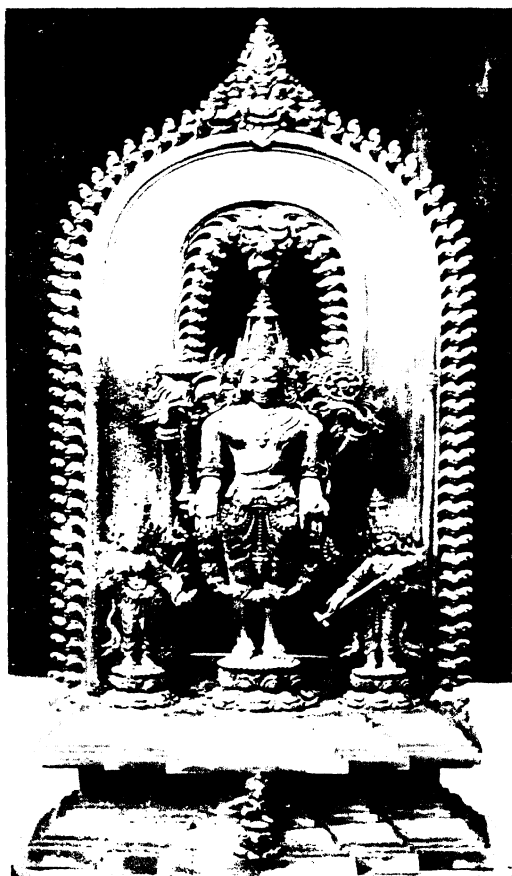
রামপালের নিকটবর্ত্তী রতনপুর নামক স্থানের একজন মুসলমান প্রাচীন কালের কতকগুলি স্বর্ণ মুদ্রা প্রাপ্ত হইয়াছে। কতকগুলি ধূর্ত্ত লোক তাহাকে নানারূপ ভয় প্রদর্শন করিয়া তাহার অধিকাংশ আত্মসাৎ করিয়াছে, বক্রী যাহা ছিল তাহা মুন্সীগঞ্জের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট বাহাদুর গবর্ণমেণ্টের সম্পত্তি বলিয়া বাজেয়াপ্ত করিয়াছেন, জনরবে প্রকাশ যে তাহার সংখ্যাও নাকি শতাধিক হইবে। প্রায় প্রতিবৎসরই কোন না কোন আশ্চর্য্য দ্রব্য এ স্থান হইতে পাওয়া গিয়া থাকে। গত বৎসর রামপাল হইতে একটী প্রস্তর নির্ম্মিত মূর্ত্তি ও তন্নিকটবর্ত্তী রামপালের সীমার অন্তর্ভুক্ত চুড়াইন গ্রাম হইতে একটী রজত নির্ম্মিত বিষ্ণুমূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। এই দেব-মূর্ত্তিটীর অনিন্দ্য সুন্দর শিল্প নৈপুণ্য বহু প্রাচীন হইলেও নূতনের মত দেখায়। এসিয়াটিক সোসাইটির কর্ত্তৃপক্ষগণ ইহাকে দাক্ষিণাত্যের শিল্পিগণের শিল্প নৈপুণ্য বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহাদের এ উক্তি যথার্থ, কারণ মূর্ত্তির মুখ কমল ও মুকুট ইত্যাদি ঠিক দাক্ষিণাত্যের দেবমূর্ত্তি গুলির সহিত মিলিয়া যায়। * এখন ইহা ইণ্ডিয়ান

* আজ প্রায় তিন বৎসর হইল চুড়াইন গ্রামস্থ বারুইগণ তাহাদের কোন একটী বোরজ নির্ম্মাণের জন্য নিকটবর্ত্তী একটী শুষ্ক পুকুর খনন করিতে করিতে উহা প্রাপ্ত হয়। দীর্ঘকাল মৃত্তিকাভ্যন্তরে থাকায় ইহা এতদূর বিবর্ণ হইয়া গিয়াছিল যে ইহা কোন্ ধাতুনির্ম্মিত তাহা প্রথমে কেহই ঠিক করিতে পারেন নাই, পরে ঢাকা নগরীতে নীত হইলে সেখানকার কর্ম্মকারগণ বহুপরিশ্রমে ইহার মলিনত্ব দূরীভূত করিতে সমর্থ হয়। মূর্ত্তিটি রূপার তৈরী। চালীসমেত দৈর্ঘ্যে ১৪ ইঞ্চি, প্রস্থে ৪ ইঞ্চি, ওজনে ১১৬ তোলা। প্রাচীন ভারতের শিল্পনৈপুণ্য যে কতদূর লোচনানন্দদায়ক ও উন্নতির কত উচ্চ সোপানে অধিষ্ঠিত ছিল, এই মূর্ত্তিটি হইতে তাহা বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যায়। শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী, বনমালাবিভূষিত, বিকশিত শতদলোপরি দণ্ডায়মান সৌম্য শান্তহাস্যময় এই বিষ্ণুমূর্ত্তি যিনি দেখিয়াছেন তাঁহাকেই বিস্ময়াবিষ্ট নয়নে প্রাচীন ভারতের শিল্পের অত্যাশ্চর্য্য সৌন্দর্য্য অনুভব করিয়া বর্ত্তমান অবনতির দিকে লক্ষ্য করিয়া দুঃখে ম্রিয়মাণ হইতে হইয়াছে। নিম্নস্থ বেদীর সম্মুখে গরুড় করযোড়ে উপবিষ্ট, বিষ্ণুমূর্ত্তির

মিউজিয়ামে আছে। আমাদের প্রতিলিপি হইতেই পাঠকগণ ইহার লোচনানন্দদায়ক শিল্প গৌরবের কতকটা আভাষ পাইতে পারিবেন। এই সকল মূর্ত্তিও স্বর্ণমুদ্রা ইত্যাদি প্রাপ্ত হওয়ায় সহজেই রামপালের প্রাচীন সমৃদ্ধির বিষয় বিশেষরূপে জ্ঞাত হইতে পারা যায়। আমাদের মনে হয় যে, যদি কোন প্রত্নতত্ত্ববিদের নেতৃত্বে এই সমুদয় স্থান খননের ব্যবস্থা করা যায় তবে অতীতের লুপ্ত ইতিহাসের অনেক পৃষ্ঠা উজ্জ্বল হইবার আশা করা যাইতে পারে। ইতিহাস ভিন্ন কোন জাতিই উন্নত হইতে পারে না। বর্ত্তমান ও অতীতের তুলনা দ্বারা জাতীয় জীবনে প্রেরণা না আসিলে দীর্ঘকাল সঞ্জাত অলসতা দূরীভূত হয় না। কিন্তু হায়! এমনই দুরাদৃষ্ট যে আমরা এখনো অতীতের ইতিহাসের জীর্ণ পত্র হইতে আমাদের পূর্ব্ব পুরুষ গণের মহিমোজ্জ্বল চিত্র সমূহ উদ্ধার করিতে প্রয়াসী হইতেছি না। কি ছিলাম,—কি হইয়াছি একথা কি আমরা ভাবি? যে স্বর্ণ প্রসূ বাঙলায় একদিন সোণা ফলিত, গৃহে গৃহে মরাইভরা ধান থাকিত এবং আত্মরক্ষার জন্য লাঠি তরোয়াল থাকিত, সেই সীতারাম প্রতাপাদিত্য কেদাররায়ের বাসভূমি বাঙ্গালার বর্ত্তমান দৈন্যাবস্থার সহিত প্রাচীন চিত্রের আলোচনা করিতে করিতে হৃদয়ে দারুণ ঘৃণা ও ক্ষোভের সঞ্চার হয়। বর্ত্তমান সময়ে (১) অমর গজারী বৃক্ষ (২) বল্লাল-বাড়ী (৩) অগ্নিকুণ্ড (৪) বাবা আদমের মসজিদ (৫) দীঘী ও পুষ্করিণী

মস্তকে কিরীট, দুই পার্শ্বে লক্ষ্মী ও সরস্বতী। ঢাকার প্রধান প্রধান শিল্পীগণ এই ক্ষুদ্রাবয়ব প্রাচীন মূর্ত্তিশিল্পের বহু প্রশংসা করিয়াছেন এবং এত ক্ষুদ্র অবয়বের মধ্যে এমন সূক্ষ্ম কারুকার্য্য ও গঠন নৈপুণ্য দেখাইতে তাহারা সম্পূর্ণ অক্ষম তাহাও স্বীকার করিয়াছেন। কোন কোন শিল্পানুরাগী ধনী ব্যক্তি পাঁচ সহস্র মুদ্রাদ্বারাও এই দেবমূর্ত্তিটি ক্রয় করিতে উৎসুক ছিলেন। কামারখাড়া (স্বর্ণগ্রাম) নামক গ্রামেও আজ প্রায় ৭।৮ বৎসর হইল একটী অষ্ট ধাতুনির্ম্মিত বিষ্ণুমূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছিল ঐ দেবমূর্ত্তির কারুকার্য্য ও নয়ন-মনমুগ্ধকর।

অষ্টধাতু নির্ম্মিত বিষ্ণুমূর্ত্তি।
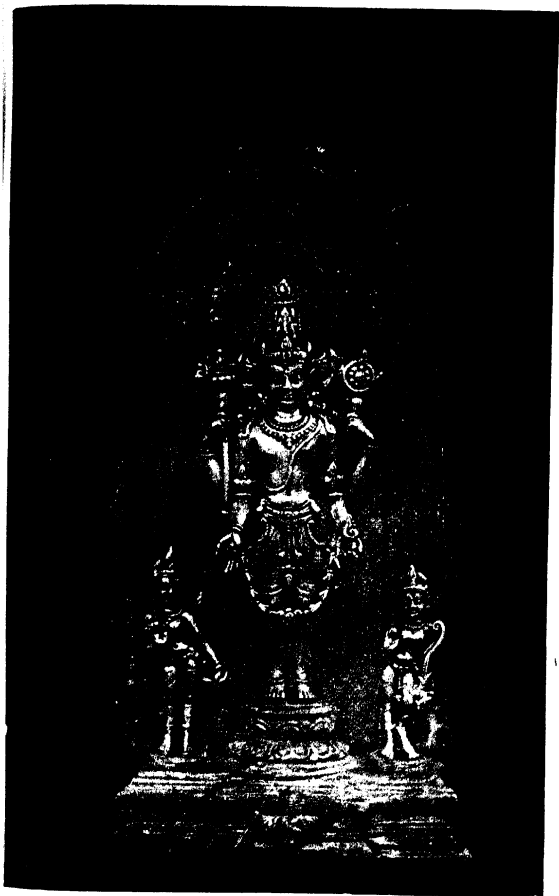
সমূহব্যতীত রামপালে দর্শনীয় কিছুই নাই। আমরা এখানে সে সমুদয়ের বিবরণ প্রদান করিলাম।

১। গজারী বৃক্ষ—এসম্বন্ধে আমরা পূর্ব্ব অধ্যায়েই বিশেষ রূপে উল্লেখ করিয়াছি। ইহার উচ্চতা প্রায় ৬০ হাত হইবে, দেখিলেই বহু প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়। বৃক্ষটি বিশাল দেহ নয়। ইহার গোড়ার বেড় ৪। ৪॥ হাত হইবে। প্রায় ৪। ৫ হাত উর্দ্ধে ইহা দু'টি মূল শাখায় বিভক্ত হইয়াছে। ঢাকা জেলায় এক ভাওয়াল ব্যতীত আর কোথাও শাল বা গজারী গাছ দৃষ্ট হয় না—এই একমাত্র শাল গাছ এখানে কিরূপে জন্মিল তাহা আলোচ্যের বিষয়ও বটে। নানাবিধ শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হওয়ায় ইহা পরম রমণীয় দেখায়। নিকটবর্ত্তী স্ত্রী পুরুষগণ কর্ত্তৃক অদ্যাপি ইহা দেবতারূপে পূজিত হইয়া থাকে। কথিত আছে যে মৃতবৎসা স্ত্রীগণ ইহাকে ক্রোড়ে ধারণ করিলে উষ্ণতা অনুভব করিয়া থাকেন। পূর্ব্বে ইহার তলদেশে স্তূপীকৃত ইষ্টকরাশি ছিল—এখন তাহা পরিষ্কৃত ও শ্যামল শষ্প পরিশোভিত। বংশপরম্পরা বিশ্রুত জন-প্রবাদ হইতেই ইহার প্রাচীনত্ব প্রমাণিত।

২। বল্লাল বাড়ী—অদ্যাপি ইহার প্রাচীন চিহ্ন বিদ্যমান আছে। যদিও কোন অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ বিদ্যমান নাই, তথাপি ইহার চতুষ্পার্শ্বস্থ প্রায় ২০০ শত ফিট প্রশস্ত পরিখা ইত্যাদি দ্বারা বিশাল রাজপ্রাসাদের গৌরব-গরিমা বুঝিতে পারা যায়। যে উচ্চভূমিতে রাজ-প্রাসাদ অবস্থিত ছিল তাহা দৃষ্টে অতি সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে, এখানে একদিন প্রবল প্রতাপশালী রাজার রাজধানী এবং প্রাসাদ বিদ্য-মান ছিল। বল্লাল বাড়ীর এক পার্শ্বের সহিত অদ্যাপি একটী সুপ্রশস্ত রাজ পথের সম্মিলিতাংশ দেখিতে পাওয়া যায়। * এখনও মৃত্তিকার

* The place where the Hindu Princes resided is still pointed out at Rampal a little to the west of Firinghibazar. The site

নিম্নে ইষ্টকরাশি, দেউল ইত্যাদির ভগ্নাবস্থা দেখিতে পাওয়া গিয়া থাকে। হায়! কালের বিচিত্র লীলা—রাজপ্রাসাদ এখন কৃষকের ইক্ষুক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। এইরূপ জনপ্রবাদ শুনিতে পাওয়া যায় যে বাদসাহ জাহাঙ্গীরের সময় এখান হইতে ইষ্টকাদি সংগৃহীত হইয়া বহু অট্টালিকা নির্ম্মিত হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত নিকটবর্ত্তী জনসাধারণও যে অট্টালিকা নির্ম্মাণের জন্য এখান হইতে ইষ্টক সংগ্রহ করিয়াছিলেন তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। যাহারা দেশের প্রাচীন স্মৃতি-গৌরবের শেষ ভগ্নাবশেষ এইরূপে নষ্ট করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই, তাহাদিগকে হৃদয়হীন বলা বোধ হয় দোষণীয় নয়।

৩। অগ্নিকুণ্ড—বল্লালবাড়ীর অনতিদূরে একটি ক্ষুদ্র গোলাকার পুষ্করিণী অগ্নিকুণ্ড বা মিঠাপুকুর নামে পরিচিত হইয়া আসিতেছে। জন-প্রবাদ এইরূপ যে এই স্থানেই নাকি দ্বিতীয় বল্লালের পুরমহিলাবর্গ ভ্রমে পড়িয়া মুসলমানের হস্ত হইতে সতীত্বরক্ষার্থ আত্মবিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। বল্লাল ও পরিশেষে পরিবারবর্গের এইরূপ শোচনীয় মৃত্যুতে এখানেই আত্মাহুতি দান করেন। কিছুদিন পূর্ব্বে মৃত্তিকা খনন করিতে করিতে এস্থান হইতে বহু অঙ্গার ইত্যাদি পাওয়া গিয়াছিল। স্থানীয় লোকে

---

of the palace of king Ballalsen consists of quadrangular mound of earth, covering an area of about three thousand squarefeet and surrounded by a moat about hundred feet wide. There are no traces of buildings within this enclosed space, but in its vicinity and in the country for many miles around mounds of bricks and wall foundations at a great depth below the surface are met with, and were formerly used as building materials for the construction of house in the city. Near the site of Ballalsen's palace there is a deep excavation called Agnikundu, where it is said the last Hindu Prince of Vikrampur, and his family burned themselves to the approach of the Musalman) Hunter's statistical Account of Bengal (Dacca Division) Page 70.

বলে যে ইহা খনন করিলে এখনও প্রচুর পরিমাণে অঙ্গার পাওয়া যায়। জনরব এইরূপ যে এই অগ্নিকুণ্ড খনন করিয়া অনেকে অনেক মুল্যবান প্রস্তর ইত্যাদি প্রাপ্ত হইয়াছে। সাধারণের বিশ্বাস যে ইহার মধ্যে বহু ধন, রত্ন নিহিত আছে—অনেকে প্রলোভনের বশবর্ত্তী হইয়া খনন করিবার চেষ্টা করিয়াছে, সেই সকল খননকারীরা বলেন যে ইহার কিয়দ্দূর খুঁড়িলেই অঙ্গার বাহির হইয়া পড়ে আর বহুসংখ্যক জুইয়া নামক এক প্রকার বিষমুখ পিপীলিকা বহির্গত হইয়া খননকারীকে দংশন করিতে থাকে।

৪। বাবা আদমের মস্‌জিদ—পূর্ব্ব অধ্যায়েও আমরা এতৎসম্পর্কিত কিম্বদন্তীসমূহ লিপিবদ্ধ করিয়াছি। এস্থলে ইহার ঐতিহাসিক তত্ত্ব বিবৃত করিব। বাবা আদমের মসজিদের এখন ভগ্নাবস্থা। ইহা দৈর্ঘ্যে প্রায় ৩৫ হাত এবং প্রস্থে প্রায় ২৮ হাত। ভিতরের ফুকারের দৈর্ঘ্য ২৬ হাত এবং প্রস্থ ১৯ হাত। পূর্ব্বে উপরে তিনটী গুম্বজ ছিল, এখন কেবল মাত্র একটী বিদ্যমান আছে। অপর দুইটী ১৮৯৭ সনের ভূমিকম্পে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে—ছাদ ভগ্ন। ইষ্টকরাশি সুচিত্রিত ও খোদিত, অদ্যাপি ইষ্টক রাশির কারুকার্য্যাদি দর্শন করিলে বিমুগ্ধ হইতে হয়। মস্‌জিদে প্রবেশ করিবার দ্বারের দুই পার্শ্বে দুইটি প্রস্তর স্তম্ভ দেখিতে পাওয়া যায়, উহা অভ্যন্তরের ছাদের সহিত সংলগ্ন রহিয়াছে। স্তম্ভ দুইটীর উচ্চতা ঘরের মেজে হইতে সাত হাত, পরিধি ৩৷৷ হাত। ইহাদের গায়ে অনেকগুলি সরল পলকাটা আছে। এই স্তম্ভ দুইটির কোন স্থানেই জোড়ার কোন চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় না। স্তম্ভের উপরে যে স্থানে গম্বুজের খিলান আরম্ভ হইয়াছে তাহার মধ্যে নানাপ্রকার সুন্দর সুন্দর কারুকার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা নিকটবর্ত্তী জনসাধারণের নিকট শুনিয়াছিলাম যে এই প্রস্তরস্তম্ভদ্বয় ক্রোড়ে ধারণ করিলে একটী উষ্ণ অপরটি শীতল অনুভূত হয়, কিন্তু আমরা উহা ক্রোড়ে ধারণ

করিয়া ইহার যথার্থতা বোধ করিতে পারিলাম না। মুসলমানেরা বলিয়া থাকেন যে এই স্তম্ভ দুইটি বাবা আদমের হস্তস্থিত 'গদা'। একথা যে নিতান্ত অমূলক তাহা আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হয় না। তবে এই প্রস্তর স্তম্ভ দুইটি যে কোন হিন্দুমন্দিরের ছিল এবং পরে মুসলমানেরা উহা তাহাদের মস্‌জিদে সংলগ্ন করিয়াছে এ অনুমান আমাদের নিকট অযথা বলিয়া মনে হয় না। মস্‌জিদের চারিদিকে সুপারি বাগান, বাঁশ ঝাড় এবং নানাজাতীয় তরুরাজি উন্নতমস্তকে দণ্ডায়মান থাকায় স্থানটি একটু অন্ধকার বোধ হয়। মস্‌জিদের উপরে একটি প্রস্তর ফলক গ্রথিত আছে। বহুদিন পর্য্যন্ত উহার পাঠোদ্ধার হয় নাই, কিন্তু সম্প্রতি বহু-ভাষাভিজ্ঞ সুবিখ্যাত পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিনাথ দে এম, এ মহাশয় ইহার পাঠোদ্ধার করিয়াছেন, আমরা এখানে তাহার ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করিলাম।

God Almighty &c. The prophet, on whom be the blessings of God, says &c. * *. The Jami masjid was built by the great malik, malikkafur, in the time of Sultan, the son of the Sultan, Jalaluddin Waddin Abul Mazaffar Shah the king, son of Mahmad Shah, the king, in the middle of the month of Rajab 888 H.H,

(Copy of the Inscription on the mosque.)

এই মস্‌জিদটির অনতিদূরে একটি দীঘী আছে, লোকে তাহাকে 'কোদাল ধোয়ার' দীঘী বলিয়া থাকে। এই দীঘীটীর সম্বন্ধে এইরূপ জন প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, যাহারা বল্লালের দীঘী খনন করিয়াছিল, তাহারা প্রতিদিন কার্য্য শেষে একটী যায়গা হইতে প্রত্যেকে এক কোদাল করিয়া মাটি কাটিয়া পরে কোদাল ধৌত করিত, এইরূপে এইদীঘীর
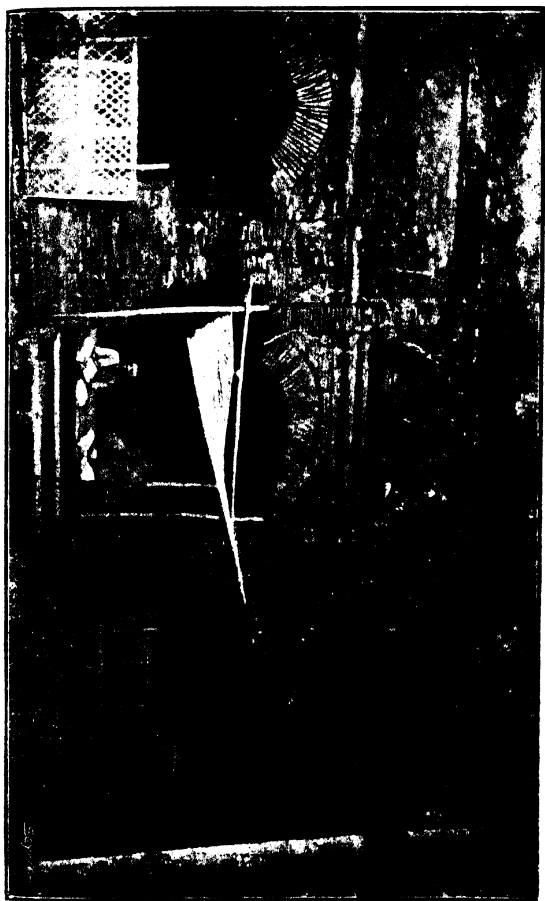
সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়াই ইহার নাম কোদাল ধোয়ার দীঘী হইয়াছে। ইহা দৈর্ঘ্যে প্রায় সহস্র হস্ত এবং প্রস্থে ৫।৬ শত হস্ত হইবে। এই দীঘীর উৎপত্তি সম্বন্ধে আর একটী সুন্দর উপাখ্যান প্রচলিত আছে আমরা পাঠক বর্গের অবগতির নিমিত্ত তাহাও এস্থানে উদ্ধৃত করিলাম। কথিত আছে বল্লাল বাড়ীর পশ্চিমের পরিখার পশ্চিম পারে, রাজপথের উপরে কোতোয়ালের থানা ছিল। তাহার ব্যবহারের জন্য থানার পশ্চিম পার্শ্বে একটী জলাশয় খনিত হইয়াছিল। এই জন্যই উহার নাম কোতোয়াল দহ বা কোতোঁলদহ হয়। সচরাচর তদপভ্রংশ কোদাল ধোয়া বলা হয়। এই সরোবরের মধ্যে একটী শাল কাঠ প্রোথিত আছে। ইহাতে বার মাস জল থাকে এবং ইহা বহু মৎস্য পরিপূর্ণ।

৫। বল্লাল দীঘী—রামপালে মহারাজ বল্লাল কর্ত্তৃক খনিত একটী দীর্ঘিকা অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। এইদীঘীটী কোন্ বল্লাল কর্ত্তৃক খনিত হইয়াছে তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। ইহা দৈর্ঘ্যে উত্তর ও দক্ষিণে প্রায় এক মাইল এবং প্রস্থে প্রায় অর্দ্ধ মাইল হইবে। এখন পর্য্যন্ত ইহার খাত বিদ্যমান আছে। স্থানে স্থানে জল আছে এবং অধিকাংশ স্থলেই ধানক্ষেত এবং পাটক্ষেত শোভা পাইতেছে ও চারি পারেই মুসলমান কৃষকগণের কুটীর শ্রেণী নির্ম্মিত হইয়া প্রাচীন রাজধানী অপূর্ব্ব রূপে কালের অদ্ভুত লীলা প্রকাশ করিতেছে। এই দীঘীর উত্তর পারেই গজারী বৃক্ষটী অবস্থিত। চতুর্দ্দশ শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া পঞ্চদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত বিক্রমপুরের মহাপতনের কাল, তখন পাঠান শাসনকাল, —পাঠান রাজারা পূর্ব্ববঙ্গের রাজধানী বিক্রমপুর হইতে সোণারগাঁয়ে (সুবর্ণগ্রামে) স্থানান্তরিত করেন। কাজেই এই দীর্ঘকালে বিক্রমপুরের পূর্ব্বগৌরব ও প্রতিষ্ঠা অন্তর্হিত হইয়াছিল।

৬। বাবা আদমের সমাধি—মসজিদের অনতিদূরে বাবা আদমের সমাধি বিদ্যমান আছে। কবরটি ধ্বংসের পথে চলিয়াছিল কিন্তু

গবর্ণমেণ্টের কৃপায় কয়েক বৎসর হইল উহার সংস্কার সাধিত হইয়াছে।

কথিত আছে বাবা আদমের মৃত্যু হইলে পর তাহার মস্তকটী শ্রীহট্ট এবং দেহটি এই স্থানে প্রোথিত করা হয়। শ্রীহট্টের সাজানাশের দরগা আজিও বিশেষ বিখ্যাত।

রামপালের সমৃদ্ধির সময় এস্থানে তাঁতী, শাখারী প্রভৃতি ব্যবসায়ী গণের জন্য ভিন্ন ভিন্ন স্থান নিরুপিত ছিল, অদ্যাপি পানহাটা অধুনা পানি হাটি, শাখারী দীঘী এবং পাইকপাড়া নামক স্থানে যে পাইক বা সৈন্যগণ থাকিত তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। বিক্রমপুরের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে ঢাকার ক্রমোন্নতির সহিত এস্থানের অধিবাসী বৃন্দ তথায় গমন করায় এখন আর সে সমুদয় প্রাচীন শিল্পিগণের বংশধর গণের কেহই বিক্রমপুরে নাই। রামপালে এখন হিন্দু মাত্রই নাই মুসলমান জাতীয় কৃষকগণই এখন ইহার একমাত্র অধিবাসী। বর্ত্তমান সময়ে রামপাল কৃষি কার্য্যের জন্য বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছে। এখানকার কৃষিলব্ধ দ্রব্যাদি দেশ বিখ্যাত। রামপালের কলা, মূলা, ইক্ষু, বেগুণ ইত্যাদি দেখিবার জিনিস। একটী বলিষ্ঠ লোকের পক্ষেও রামপালের তিন চারিটি মূলা বহন করিয়া লইয়া যাওয়া বিশেষ কষ্টকর হয়। এস্থানের কৃষকগণ কৃষিকার্য্যে বিশেষ অভিজ্ঞ। রামপালে যেইরূপ ফল মূলাদি জন্মে বিক্রমপুরের অন্যত্র কোথাও সেরূপ হয় না, অতএব এ স্থানের মৃত্তিকার ও যে যথেষ্ট গুণ আছে তাহা বলাই বাহুল্য। বিধাতার বিচিত্র বিধান বলে এখনও রামপালের নাম কৃষিকার্য্যের জন্য গৌরবের সহিত লোকমুখে উচ্চারিত হইয়া থাকে। রামপালের পূর্ব্বদিকস্থ গ্রাম পঞ্চসার হইতে পশ্চিমে মীরকাদিমের খাল, উত্তরে ফিরিঙ্গি বাজার, রিকাবি বাজার হইতে দক্ষিণে মাকোহাটির খাল পর্য্যন্ত এই ২৫ বর্গ মাইল ভূমি খনন করিলে সর্ব্বত্রই প্রচুর ইষ্টক পাওয়া যায় এবং উহার নিম্নস্থ

ভূভাগ ইষ্টক প্রোথিত বলিয়া বোধ হয়। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বজ্রযোগিনী গ্রাম নিবাসী ভগবানচন্দ্র ঘোষের বাড়ীর নিকট এক স্থানে ভূগর্ভ হইতে একটী ইষ্টকালয় পাওয়া গিয়াছিল তিনি সেই ইষ্টক দ্বারাই নিজ সুবৃহৎ বাসভবন নির্ম্মাণ করিয়াছেন। গতবৎসর চুড়াইন গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত গঙ্গাপ্রসাদ দাশ গুপ্ত বি. এ মহাশয়ের বাড়ীর নিকটেও ভূগর্ভে একটী ইষ্টকালয়ের অভগ্ন কক্ষ পাওয়া গিয়াছে। এসকল দৃষ্টে সহজেই বোধগম্য হয় যে রামপাল সত্য সত্যই একদিন বহু সৌধরাজী সমাকীর্ণ সমৃদ্ধিশালী নগর ছিল। ইতিহাসের ক্রমোন্নতির সহিত এইরূপ আশা করা যায় যে নব নব আবিষ্কারের সহিত বিক্রমপুরের প্রাচীন ইতিহাস আরও উজ্জলতর হইবে।

পঞ্চম অধ্যায়।

পাল ও সেন রাজাদিগের সময়ে বিক্রমপুরের অবস্থা।

প্রাচীনের স্মৃতি বড় মনোহর। বর্ত্তমানের উজ্জল আলোকের মধ্য দিয়া অতীতের কুহেলিমাখা স্বপ্নকাহিনী অতি সুন্দর। জগতের প্রত্যেকেই বিগত কাহিনী শুনিতে ও জানিতে বড় ভালবাসে। হিন্দু ও বৌদ্ধ প্রাধান্য সময়ে বিক্রমপুর কেমন ছিল, তাহা জানিবার ইচ্ছা কি স্বাভাবিক নহে? তখনও এমনি ফলপুষ্প-ভারাবনতা শ্যামল তরুশ্রেণী—উর্ম্মিমালিনী তরঙ্গিণী—ও হরিৎ শস্য ক্ষেত্র পরিশোভিতা মাতা বসুন্ধরা শোভা পাইতেন—কিন্তু হায়! অতীত ও বর্ত্তমানে কত প্রভেদ। তখন স্বাধীন দেশের স্বাধীন নরপতি—দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা ছিলেন, সর্ব্বত্র

স্বাধীনতার গৌরব পতাকা উড্ডীন ছিল, বর্ত্তমানে সে কল্পনা আকাশ কুসুম বলিয়া প্রতীয়মান হয়। মুসলমানের অভ্যুত্থানের পূর্ব্বে বিক্রমপুরে পাল ও সেন রাজগণ প্রাচীনপ্রচলিত হিন্দুশাস্ত্রানুযায়ী রাজ্য শাসন করিতেন। ব্রাহ্মণের শক্তি ও শাসন সমাজে বিশেষ প্রচলিত ছিল। পাল নৃপতিগণ বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী হইলেও তাঁহারা ব্রাহ্মণের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ ছিলেন,—তাঁহাদের সময়ের যে সকল তাম্রশাসনাদি আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা হইতেই ইহা সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যায়। পাল রাজারা বৌদ্ধ ধর্ম্মের বিস্তৃতির জন্য চেষ্টিত থাকা সত্ত্বেও তৎকালে বৈদিক ধর্ম্মই অধিকতর প্রতিষ্ঠাবান্ ছিল। তবে একথা ঠিক যে বৌদ্ধ ধর্ম্মের তান্ত্রিকতা অলক্ষ্যে সে সকলের মধ্যে প্রবেশ লাভ করিয়া বৈদিক আচার ও অনুষ্ঠানের পূর্ব্ব রীতি নীতি বহুল পরিমাণে শিথিল করিয়া ফেলিয়াছিল। পাল রাজাদিগের সময়ে হিন্দু সমাজের জাতিগত সংকীর্ণতা দূরীভূত হইয়া আর্য্য, শক ও অনার্য্যদিগের মধ্যে একতার দৃঢ়-সূত্র বৃদ্ধি পাইতেছিল—কাজেই সে সময় বিক্রমপুরে প্রত্যেক জাতিই দ্বেষ ভাব ভুলিয়া যাইয়া মিলনের সুমহান্ মঙ্গল আস্বাদে প্রত্যেকে প্রত্যেককে আপনার ভাবিতে শিখিয়াছিল, কিন্তু হায়! পুনরায় সেনরাজগণের অভ্যুদয়ে জাতি ভেদ হিন্দু সমাজে দৃঢ় মূল হইয়া বাঙ্গালীর উন্নতির পথ রুদ্ধ করিবার নিমিত্ত বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত জীবিত রহিয়াছে।

তাঁহাদের রাজত্ব সময়ে নৃপতি দেবতার ন্যায় পূজিত ও সম্মানিত হইতেন। প্রজা সাধারণ রাজাকে দেবতা অপেক্ষা কোন অংশেই পৃথক জ্ঞান করিত না,—রাজ দর্শনে পাপ নাশ—সেকালে এই মহৎ নীতি প্রচলিত ছিল। নৃপতি বৃন্দও প্রজাদের হিতার্থ সর্ব্ব প্রকার স্বার্থ বিসর্জ্জন করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না, তাঁহারা "পরমভট্টারক," "মহারাজাধিরাজ" "পরমেশ্বর" ইত্যাদি উপাধিভূষণে ভূষিত হইতেন,

হিন্দু-শাস্ত্র বিধি লঙ্ঘন করিয়া শাসন দণ্ড পরিচালনা করিতেন না, এক কথায় বলিতে কি তাঁহারা কেহই স্বেচ্ছাচারী ছিলেন না। তৎকালে পুষ্করিণী খনন, দেবালয় নির্ম্মাণ, পথ প্রস্তুত, পান্থশালা, অন্ন-সত্র, বৃক্ষ রোপণ ইত্যাদি ধর্ম্মের কার্য্য বলিয়া বিবেচিত হইত। জল কষ্ট কাহাকে বলে সে যুগে তাহা কেহ জানিত না। বিক্রমপুরের গ্রামে গ্রামে অদ্যাপিও অসংখ্য দীর্ঘিকা, পুষ্করিণী, মঠ, দেউলবাড়ী ইত্যাদি বিরাজমান থাকিয়া পাল ও সেন রাজন্যবৃন্দের কীর্ত্তি গরিমা বিঘোষিত করিতেছে। গমনাগমনের সুবিধার্থ খাল, নৌসেতু, ইষ্টক-সেতু, প্রশস্ত রাজপথ ইত্যাদি এবং বাণিজ্য বৃদ্ধি ও বিস্তৃতির জন্য হাট, বাজার স্থাপন করিয়া পাল ও সেন রাজগণ যশস্বী হইয়া গিয়াছেন। রাজ্য-রক্ষার্থ দুর্গ ও তাঁহারা নির্ম্মাণ করিতেন।

বল্লালীপুল।

বিক্রমপুরবাসী প্রত্যেকেই মিরকাদিমের খাল ও তালতলার খাল নামক দুইটি প্রশস্ত খালের উপর বহুদিনের প্রাচীন দুইটী পুল দেখিয়াছেন। এই পুল দুইটী মুসলমানাগমনের বহু পূর্ব্বে মহারাজা বল্লাল সেন কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল।* মিরকাদিমের খালের উপর যে পুলটি আছে, উহা দৈর্ঘ্যে প্রায় ১৭৩ ফিট, খালের গর্ভ হইতে ইহা প্রায় ২৮ ফিট উচ্চ। পার্শ্বস্থ খিলানের দুই দিকে যে দুইটী পারিপার্শ্বিক স্তম্ভ বা span আছে, উহার প্রত্যেকটী ১৭ ফিট উঁচু এবং ৭ ফিট ৩ ইঞ্চি পুরু। এই পুলটী দেখিতে অত্যন্ত সুন্দর, ইহার গায়ে নানাজাতীয় বন্যবৃক্ষ সমূহ জন্মিয়া যাওয়ায় ইহা এক প্রকার ধ্বংসের পথে চলিয়াছে। ঢাকার

* "It is said to have been built by Raja Ballal Sen before the conquest of Bengal by Mahammedans. List of Ancient Manuments in the Dacca Division Page 26. Published by authority.

এক পূর্ব্বতন কালেক্টার সাহেব বলিয়াছিলেন যে, যদি আট নয় হাজার টাকা ব্যয় করিয়া ইহা মেরামত করান যায় তাহা হইলে ইহা প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা ব্যয়ের নির্ম্মিত পুলের সমতুল্য হইবে। তাল তলার খালের উপরে যে পুলটী আছে, তাহার অবস্থা পূর্ব্ববর্ণিত খালের অপেক্ষা শোচনীয়, ইহার তিনটী স্তম্ভ ছিল, তন্মধ্যে মধ্যের বৃহৎস্তম্ভটী ইংরেজ রাজত্বের প্রথম সময়ে কলিকাতা হইতে ঢাকায় সংবাদ প্রেরণের সুবিধার এবং বড় বড় মাল বোঝাই নৌকার গমনাগমনের জন্য বারুদ দ্বারা উড়াইয়া ফেলা হইয়াছে। ইহার স্থানে স্থানে ফাটিয়া যাওয়ায় যাতায়াতের বড় কষ্ট হইয়াছে, তবে এখনও অতিকষ্টে জন সাধারণ এক খণ্ড কাঠের সাহায্যে ইহার উপর দিয়া যাতায়াত করে। প্রাচীন-হিন্দু নৃপতিগণের রাজধানী রামপাল হইতে যে সুপ্রশস্ত রাজপথ বরাবর পশ্চিমদিকে পদ্মা পর্য্যন্ত গিয়াছে, তাহার বক্ষ ভেদ করিয়া যে দুইটী খাল সমান্তরাল ভাবে বর্ত্তমান, এই পুল দুইটী তাহার উপর অবস্থিত। আট শত বৎসর পূর্ব্বের হিন্দু স্থাপত্য যে কতদূর উন্নত ছিল এই পুল দুইটী হইতে তাহা সুস্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যায়।

পাল এবং সেন রাজাদিগের রাজত্ব সময়ে বঙ্গদেশ "ভুক্তি", 'মণ্ডলিকা, এবং মণ্ডলিকা সমূহ 'শাসনে' বিভক্ত হইয়াছিল। রাজা কর স্বরূপ উৎপন্ন শস্যের একষষ্ঠাংশ গ্রহণ করিতেন। ব্যবসায়ী দিগের নিকট হইতেও শুল্ক গৃহীত হইত। রাজার অধীনে মহাধর্ম্মাধ্যক্ষ (প্রধানবিচারপতি) মহা সন্ধিবিগ্রহিক (সন্ধিবিগ্রহাদি কার্য্যের প্রধান অমাত্য) সেনাপতি, চৌরোদ্ধরণিক (প্রধান শান্তি রক্ষক) মহামাত্য, মহাপাত্র (প্রধান সভাসদ) কোটাল (নগরের শান্তিরক্ষক) কোষাধ্যক্ষ ইত্যাদি বহু বিভিন্ন নাম ও উপাধিধারী কর্ম্মচারী নিযুক্ত থাকিয়া রাজ্যের শাসন-শৃঙ্খলা নির্ব্বাহ করিতেন। এ সকল উচ্চ

একটী প্রাচীন স্বর্ণ মুদ্রা।

স্বর্ণ মুদ্রার অপর পৃষ্ঠা।

কর্ম্মচারী ব্যতীত রাজ্যের আভ্যন্তরীন অবস্থা নৃপতির নিকট বিবৃত করিবার নিমিত্ত বহু গুপ্তচর ও নিযুক্ত ছিল।

পাল ও সেন রাজগণের অধীনে অশ্বারোহী, পদাতিক, নৌসৈন্য এবং বহু গজসৈন্য থাকিত। বঙ্গ দেশাধিপতিগণের গজ সৈন্যের তৎকালে বিশেষ প্রসিদ্ধি ছিল। নৌ-যুদ্ধের খ্যাতি ও বিক্রমপুরাধিপতি সেনরাজ গণের সর্ব্বত্র প্রচলিত ছিল। যুদ্ধে এক প্রকার দ্রুতগামী-সুদীর্ঘ নৌকা ব্যবহৃত হইত সে সকলকে কোষা নৌকা বলিত, এই সকল কোষ নৌকায় বহু দাঁড় থাকিত। এ সমুদয় রণতরী কৈবর্ত্ত, চণ্ডাল, ভুঁইমালী প্রভৃতিই সাধারণতঃ বাহন করিত। যুদ্ধার্থ 'কোষা' ছাড়া আরএক প্রকার বৃহৎ নৌকাও ব্যবহৃত হইত। যুদ্ধোপকরণের মধ্যে অসি, চর্ম্ম, বল্লম, শড়্কি, তীর, ধনু, গদা, বন্দুক প্রভৃতি ছিল।

শিল্প সম্বন্ধেও এ সময় বিক্রমপুর বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল।

শিল্প।

তখন এখানকার নির্ম্মিত কার্পাস বস্ত্র, ভারতের বিভিন্ন স্থানেও খ্যাতি লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিল, এতদ্ব্যতীত মাটির বাসন, সোণারূপার বিবিধ অলঙ্কার, লৌহ নির্ম্মিত দ্রব্যাদি, কাঁস ও পিত্তলের বাসন ইত্যাদি নানা স্থানে প্রেরিত হইত। সে সময় স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রা থাকা সত্ত্বেও লোকে অধিকাংশ স্থলেই কড়ির বিনিময়েই ক্রয় বিক্রয়াদির কার্য্য নির্ব্বাহিত করিত।

আমরা এখানে সেনরাজগণের সময়ের একটী স্বর্ণ মুদ্রার প্রতিলিপি প্রদান করিলাম। এই মুদ্রাটি কোন্ সময়ের তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। রবি গুপ্তের মুদ্রার সহিত ইহার কতকটা সৌসাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। পুরুষেরা পাগড়ী বন্ধন, দীর্ঘকেশ রক্ষণ ও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশবাসীদের ন্যায় বস্ত্র পরিধান করিতেন। এমন কি পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বেও বিক্রমপুরে কেন, সমগ্র বাঙ্‌লা দেশে ও পূর্ব্ববঙ্গে দীর্ঘ কেশরক্ষা প্রচলিত ছিল। পূর্ব্ববঙ্গের কবি বিজয় গুপ্তের মনসার পুঁথি হইতেও ইহার পরিচয়

পাওয়া যায় যথা "পরম সুন্দর লখাইর দীর্ঘ মাথার চুল।" পাল ও সেন রাজাদিগের সময় স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে কোনও রূপ অবরোধ প্রথা ছিলনা—তখন তাঁহারা সর্ব্বত্র স্বাধীন ভাবে গমনাগমন করিতে পারিতেন। রমণীরা যে অশ্বারোহণেও সুপটু ছিলেন বিক্রমপুরের প্রচলিত মহিলা ব্রতাদি হইতে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়, যেমন "দোলায় আসি ঘোড়ায় যাই।" (মাঘমণ্ডল ব্রতের কথা)

স্ত্রীলোকেরা ঘাঘড়া, কাঁচুলি এবং বিলাসিতার উপকরণ স্বরূপ বারাণসী সাড়ী, পাটের কাপড়, ও পশমী বস্ত্রাদি পরিধান করিতেন।* অলঙ্কারের মধ্যে শাখা, অঙ্গুরী, কঙ্কণ, কেয়ুর, হার, বেসর, কুণ্ডল, নূপুর, নোলক, একদানা, পৈছি, গুঞ্জী, বেকী, তোড়ল, ইত্যাদি ব্যবহার করিতেন। সধবা কুলস্ত্রীগণ সিঁথীতে সিন্দুর, গাত্রে চন্দন, পায়ে আলতা ও তাম্বুলরাগে অধর সুরঞ্জিত করিয়া প্রণয়ী জনের চিত্ত বিভ্রম জন্মাইতেন। রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, মনসারগীত, মাণিকচাঁদের গীত, সত্য নারায়ণের পাঁচালী ইত্যাদি সর্ব্বত্র পঠিত হইত।

রামপাল তখন বহু জনাকীর্ণ, সৌধরাজি পরিশোভিত সুন্দরী নগরী ছিল। তখন ইহাতে তৎকালীন দ্রব্য সম্ভারাদি লইয়া বিবিধ বিপণিরাজি শোভা পাইত।

বর্ত্তমান কালের ন্যায় সে যুগে স্কুল কালেজ ছিল না, তালপত্রে এবং তুলট কাগজের লিখিত গ্রন্থই ছাত্রগণ অধ্যয়ন করিত এবং নকল করিয়া লইত। ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যদিগের টোল ও চতুষ্পাঠিতে ছাত্রগণ অধ্যয়ন করিতেন ও বৈদিক যুগের সভ্যতার ন্যায় পাঠ সমাপ্তির পূর্ব্ব পর্য্যন্ত গুরু গৃহে অধ্যাপকের আজ্ঞাধীন হইয়া অবস্থান করিতেন। গ্রাম্য পাঠশালায় ছোট ছোট বালকগণ শিক্ষা লাভ করিত। তৎকালে ব্যায়াম ও সঙ্গীত

* বিক্রমপুরে ও পূর্ব্ববঙ্গের সর্ব্বত্র স্ত্রীলোকদের 'ঘোবেড়ে কাপড় পরিধান' ঘাঘড়ার রূপান্তর একথা অনুমান করা অসঙ্গত কি?

বিশেষ আদরণীয় ছিল। সাধারণতঃ ছোট ছোট মোকদ্দমাদি গ্রাম্য বিচক্ষণ বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তিদিগের দ্বারাই মীমাংসিত হইত, অতি অল্প লোকই রাজদ্বারে মোকদ্দমা নিষ্পত্তির জন্য উপস্থিত হইতেন। তখন ডাক বিভাগ ছিল না—বাহক দ্বারা নিজ নিজ ব্যয়ে অভিলষিত স্থানে পত্রাদি প্রেরণ করিতে হইত। খাদ্য দ্রব্যাদি বিশেষ সুলভ ছিল—দুর্ভিক্ষ, মারীভয় ইত্যাদি শুনা যাইত না। কমলার শস্যভাণ্ডার তখন দেশদেশান্তরে অন্ন যোগাইত—পাণ্ডিত্যের গৌরব দর্পে তখন রাজ কক্ষ মুখরিত হইত, অভিসারিণী রমণীর নূপুর শিঞ্জনে নীরব নিশীথে রাজপথ প্রতিধ্বনিত হইতেও তখন শুনা যাইত। বারবিলাসিনীগণের আধিপত্য তখন খুব ছিল। সে স্বপ্নময় যুগ সুখৈশ্বর্য্যে—গৌরবমাধুর্য্যে চিরদীপ্তিমান ছিল। ধনে, মানে, বিদ্যায় সকল বিষয়েই বিক্রমপুরের বিক্রম তখন বিশ্ব বিশ্রুত ছিল। তখন সত্য সত্যই বঙ্গজননী, সুজলাং সুফলাং ও শস্যশ্যামলাং, এবং বিক্রমপুর তাঁহার কিরীট মণিছিল।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

পাঠান শাসনকাল

বখ্‌তিয়ার খিলিজি কর্ত্তৃক বাঙ্‌লা বিজয়ের পরেও ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্য্যন্ত পূর্ব্ববঙ্গ মুসলমানদের করতলগত হয় নাই এ কথা আমরা পূর্ব্বেই লিপিবদ্ধ করিয়াছি। বখ্‌তিয়ার বাঙ্‌লা জয় করিয়া জিত অংশ দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া বাঙ্‌লার প্রাচীন রাজধানী লক্ষ্ণৌতীরই পুনরায় সংস্কারাদি করিয়া সেখানেই রাজধানী স্থাপনান্তর রাজকার্য্য সম্পন্ন করিতে লাগিলেন। খোত্‌বা * ও সিক্কা † সুলতান

বাঙ্গালা বিজয় ও লক্ষ্ণৌতীতে রাজধানী স্থাপন।

* নমাজের শেষভাগে স্বাধীন নৃপতিগণের নিমিত্ত যে মঙ্গল কামনা করা হয়।

† রাজকীয় মুদ্রা।

কুতব উদ্দীনের নামেই প্রচারিত হইয়াছিল। মালিক এক্তিয়ারউদ্দিন বখ্‌তিয়ারই সর্ব্বপ্রথম বঙ্গদেশের আংশিক অধিপতি। তাঁহার সময় হইতেই পশ্চিমবঙ্গ দিল্লীর আফগান অধিপতিগণের অধিকারভুক্ত হয়। বখ্‌তিয়ারের রাজ্যলাভেচ্ছা এতদূর প্রবল ছিল যে, লক্ষ্ণৌতীতে রাজধানী স্থাপনানন্তর কিছুদিন পরেই দুর্গম তিব্বতে অভিযান করিয়াছিলেন। নিজ সৈন্যসামন্তদিগের কোনও রূপ সুখ সুবিধার দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া বখ্‌তিয়ার দশ বার হাজার অশ্বারোহী সৈন্যসহ বাঙ্গালার উত্তর-পূর্ব্বদিকস্থ পার্ব্বত্য পথে অগ্রসর হন, পথে আলিমেচ নামক জনৈক শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে ইস্‌লামধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া উহাকে সৈনিকবৃন্দের পথ প্রদর্শকরূপে লইয়া পার্ব্বত্য প্রদেশে উপনীত হইয়াছিলেন। তিব্বতে উপনীত হইলে সেখানে গর সাসেপ সাহের দুর্গে যুদ্ধ আরম্ভ হইল, বহু মুসলমান সৈন্য এ যুদ্ধে নিহত হইল, কিন্তু তথাপি স্বার্থান্ধ বখতিয়ারের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল না *। নানাপ্রকার বিপদাপদের মধ্যদিয়া বহু কষ্টে বখ্‌তিয়ার কুচবিহারে উপনীত হইলেন, সেখানে আলিমেচ এবং অন্যান্য স্থানীয় অধিবাসীবৃন্দ তাহার মনঃকষ্ট লাঘব এবং অভাব পূরণ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন—কিন্তু হতভাগ্য মৃত সৈনিকবৃন্দের আত্মার অভিসম্পাত এবং তাহাদের হতভাগিনী বিধবা পত্নী ও অনাথপুত্র প্রভৃতির প্রবল অশ্রুধারাই বখতিয়ারে মৃত্যুর কারণ হইল †। কেহ কেহ বলেন যে দেব-

* রিয়াজ্‌-উস-সালাতিনের বঙ্গানুবাদ—শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত।

† When Mohammed Bukhtyar had reached koonch (Probably Cooch Beyhar) he was hospitably received by the inhabitants and especially the relation af Aly Miekh, who endeavoured to alleviate his wants and mitigate his Sorrows ; but melancholy and dissappointment overwhelmed him ; and a few days after his arrival at Deocote in Bengal, he sank under the pressure of his calamities, amidst the execration and curse of the orphans and widows of the soldiers who had fallen a sacrifice to his insatiable ambition—History of Bengal C. Stewart Page 55.

কোটে প্রত্যাবর্ত্তনের কিছুদিন পরে জ্বর ও কাশ রোগে আক্রান্ত হইয়াই হতাশ ও বিষাদক্লিষ্ট বখ্‌তিয়ারের প্রাণান্ত হয়। আবার কেহ কেহ বলেন যে তাঁহারএই পীড়িতাবস্থাতেই আলিমর্দ্দন খিলিজি নামক জনৈক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির শাণিত ছুরিকা, তাঁহার রুধিরে রঞ্জিত হইয়াছিল। হায়! রাজ্যলোভী স্বার্থান্ধ বখ্‌তিয়ার! এই তোমার পরিণাম! বখ্‌তিয়ারের মৃত্যুর পর আজ্জউদ্দিন মোহাম্মদ শিরাণ নামক তাঁহার সেনাপতি বাঙ্‌লার রাজসিংহাসনে আরোহণ করিলেন। শিরাণ সিংহাসনারোহণের কিছুকাল পরেই আলিমর্দ্দনকে তাহার জায়গীর নীরকোচিতে বন্দী করিয়া শাস্তির নিমিত্ত কোতোয়ালের হস্তে অর্পণ করেন। আলিমর্দ্দন কিন্তু কৌশলে কোনরূপে মুক্তিলাভ করিয়া দিল্লীতে উপনীত হন। সে সময়ে বাদসাহ কুতবউদ্দীন দিল্লী হইতে গজনি যাইতেছিলেন, যাওয়ার সময় কুতব আলিমর্দ্দনকে তাহার কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়া গিয়াছিলেন। ইহার পরে আলিমর্দ্দনের পুনঃ পুনঃ প্ররোচনায় কুতব বঙ্গবিজয়ে অগ্রসর হন, সে সময়ে গঙ্গোত্রীর শাসনকর্ত্তা হোসেন উদ্দিন নামক জনৈক পাঠানও স্বকীয় স্বার্থসিদ্ধির জন্য কুতবের সৈন্যের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন।

মহম্মদ শিরাণ

শিরাণের রাজত্বের অষ্টম মাস পূর্ণ হইতে না হইতেই নানা বিপ্লবের মধ্যে পড়িয়া ইনি আলিমর্দ্দন খিলিজি কর্ত্তৃক নিহত হন। বখ্‌তিয়ারের প্রিয়তম সুহৃদের জীবনলীলাও সেই এক ভাবেই সমাপ্ত হইল! এতদিনে আলিমর্দ্দনের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল। আলিমর্দ্দন বঙ্গের সিংহাসনে আরোহণ করিলেন এবং যে দিবস শুনিতে পাইলেন যে কুতবউদ্দিন ইহলোকে নাই, সেই দিবসেই তিনি আপনাকে স্বাধীন নরপতি জ্ঞানে সুলতান আলাউদ্দিন নাম গ্রহণ করিয়া নিজ নামে সিক্কা ও খোত্‌বা প্রচার করিতে লাগিলেন। পাপের পূর্ণাবতার আলাউদ্দিনের নানা প্রকার অত্যাচার অবিচার বৃদ্ধির

আলিমর্দ্দন খিলিজি।

সঙ্গে সঙ্গে জগদীশ্বরের মহান্ ন্যায়ের ভেরীও বাজিয়া উঠিল,—দুই বৎসর যাইতে না যাইতেই গুপ্তঘাতকের শাণিত ছুরিকা চিরদিনের জন্য তাহার জীবন প্রদীপ নির্ব্বাণ করিয়া দিল। আলিমর্দ্দনের মৃত্যুর পর গিয়াস-উদ্দিন খিলিজি, নসীরুদ্দিন প্রভৃতি অনেকেই লক্ষ্মণাবতীর সিংহাসনে আরোহণ করিয়া দেখিতে দেখিতে কালসাগরে বিলীন হইয়া গেলেন। মহাম্মদ তাতার খাঁয়ের রাজত্বের পর সম্রাট গিয়াসউদ্দিন, তোগরল খাঁ নামক জনৈক তুর্কী ক্রীতদাসকে লক্ষ্মণাবতীর সিংহাসন অর্পণ করেন। ইক্তারউদ্দিন তোগরলখাঁ লক্ষ্মণাবতীর আধিপত্য দৃঢ় করিয়া ১২৫৮ খ্রীষ্টাব্দে কামরূপ আক্রমণ করেন ও উহা অধিকার করিতে সমর্থ হন।

তোগরল খাঁ

তোগরল সুচতুর, সাহসী ও বুদ্ধিমান ছিলেন। ১২৭৯ খ্রীষ্টাব্দে ইনি আপনাকে বাঙ্‌লার স্বাধীন সুলতান বলিয়া ঘোষণা করিয়া মধিসউদ্দিন নাম ধারণ করিয়া ছিলেন।* ধারণ করিবার কতক সুযোগও ঘটিয়াছিল কারণ সে সময়ে সুলতান গিয়াসউদ্দিন বল্‌বন্ বার্দ্ধক্যেও পীড়ানিবন্ধন নিতান্ত কাতর ছিলেন; তাঁহার পুত্রদ্বয়ও আবার সে সময়েই মোগলের সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত মুলতানে অবস্থিতি করিতেছিলেন, কাজেই লক্ষ্মৌতীর কেহ কোন সংবাদ লইতে পারেন নাই, অকৃতজ্ঞ তোগরলও সুযোগ বুঝিয়া খোত্‌বা তাহার নিজ নামেই প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হইল।

সম্রাট বল্‌বন্ একমাস পরে আরোগ্যলাভ করিয়া সমুদয় সংবাদ জ্ঞাত হইলেন এবং তোগরলের অবাধ্যতায় ও অন্যায় ব্যবহারে ক্রুদ্ধ হইয়া

*Toghril, fired by ambition, and destitute of every principle of fratitude, deemed this a favourable opportunity to render himself independent ; and having caused it to be reported that the Emperor was dead, he assumed the red umbrella and other insignia of royalty and proclaimed himself King of Bengal, under the title of Sultan Mogiesuddeen. Stewart's History of Bengal P 79,

তাহাকে শাস্তি দিবার জন্য তাহার বিরুদ্ধে অভিযান করিলেন। প্রথমতঃ অযোধ্যার শাসনকর্ত্তা আমীন খাঁকেই বঙ্গদেশের আধিপত্য দিয়া তোগরলের বিরুদ্ধে পাঠান হইয়াছিল। আমীন তোগরলের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া অযোধ্যাভিমুখে পলায়ন করেন! কিন্তু হায়! সম্রাট গিয়াসের কোপানলে পতিত হইয়া আমীন খাঁকে অযোধ্যার সিংহদ্বারসম্মুখে ফাঁসী কাষ্ঠে ঝুলিতে হইল! আমীনের পর সম্রাট স্বয়ং আসিয়া উপনীত হইলেন, তোগরল কৌশলে পলায়ন করিয়া জীবনরক্ষার চেষ্টা পাইয়াছিলেন, কিন্তু অবশেষে নবাব সোকন্দার হস্তে নিহত হন (১)। তোগরল যখন পলায়ন করে সুলতানও তাহার পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া সোণারগাঁয়ে উপনীত হন, তখন সেনবংশীয় কেশব সেনের পৌত্র রাজা দনোজমাধব সেন সুবর্ণগ্রামের স্বাধীন নরপতি ছিলেন; তিনি সম্রাটের সহিত সন্ধি করিলেন (২)। সে সময়ে সোণারগাঁ পৈনাম নামে অভিহিত হইত। দনৌজমাধব অত্যন্ত ক্ষমতাশালী নৃপতি ছিলেন, ইহাদ্বারা ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ সমাজে কৌলীন্যমর্য্যাদা এবং নূতন নূতন কুলনিয়মাদি প্রচারিত হইয়াছিল। গিয়াসউদ্দিন সোণারগাঁ হইতে

---

(১) রিয়াজ উস-সালাতিন ৭৮২ পৃঃ শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত।

(২) ষ্টুয়ার্ট দনৌজ মাধবকে দিনাজ রায় Dhinaj Rai লিখিয়াছেন, ফেরিস্তা ইহার নাম ভোজরায়, প্রফেসার ডাউসন দনুজরায় এবং আবুল ফজল আইন-ই-আকবরীতে নৌজা লিখিয়াছেন। মুসলমান ঐতিহাসিক বরণি প্রভৃতি কর্ত্তৃকও ইনি দনুজরায় নামে অভিহিত হইয়াছেন। অনেকেই ইঁহাকে সেন বংশীয় শেষ স্বাধীন নৃপতি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন কিন্তু ইহা ভুল। কারণ দ্বিতীয় বল্লাল যে ১৩১৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বিক্রমপুর রামপালে রাজত্ব করিয়াছিলেন; তাহা আমরা বিক্রমপুরের সেনবংশীয় নৃপতিগণের শাসনাবস্থা পর্য্যালোচনা কালে বিশেষ রূপে লিপিবদ্ধ করিয়াছি। সম্রাট বলবনের সহিত দনৌজ মাধবের সন্ধি হয় ১২৮০ খ্রীষ্টাব্দে, তিনি শেষ স্বাধীন নরপতি হইলে দ্বিতীয় বল্লালের কোনও উল্লেখ থাকিত না। মোট কথা ১৩১৮ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে সমস্ত বঙ্গে মুসলমানাধিপত্য বিস্তৃত হয় নাই।

লক্ষ্মৌতীতে প্রত্যাগমন করিয়া সেখানে তোগরলের পক্ষীয় লোক দিগকে ধৃত ও নৃশংসভাবে হত্যা করিয়া নিজের দ্বিতীয় পুত্র বগর খাঁকে সুলতান নাশেরউদ্দিন নামে বিখ্যাত করিয়া লক্ষ্মণাবতীর শাসন ভার অর্পণ করিলেন। নাশেরকে তাহার নিজ নামে খোত্‌বা এবং সিক্কা প্রচলন করিবার অধিকার ইত্যাদি দিয়া বলবন্ দিল্লীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন। নাশেরের মৃত্যুর পর রুকনউদ্দিন শামসুদ্দিন, আজিম-উল-মুলক প্রভৃতি অনেকেই লক্ষ্মৌতিতে রাজত্ব করেন কিন্তু কেহই পূর্ব্ববঙ্গের স্বাধীনতা লোপ করিতে সমর্থ হন নাই। ১৩৩০ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ তগ্‌লক্ পূর্ব্ববঙ্গ মুসলমান রাজ্যভুক্ত করিতে সমর্থ হন; এবং সমস্ত বঙ্গদেশকে—লক্ষ্মণাবতী, সাতগাঁও এবং ঢাকা সহ সোণারগাঁ বা সুবর্ণগ্রাম এই তিন ভাগে বিভক্ত করেন। * পূর্ব্ববঙ্গ বিজয়ের পর হইতেই প্রকৃতপক্ষে বঙ্গদেশের স্বাধীনতাসূর্য্য চিরদিনের জন্য অস্তমিত হইল,—বাঙ্গালী সেই দুর্দ্দিন হইতেই আপনাকে দাসত্বে দীক্ষিত করিল, সেদিন হইতেই বাঙ্গালীর অধঃপাতের সূত্রপাত হইল।

পূর্ব্ববঙ্গে পাঠানাধিকার ও সোণার গাঁ।

পূর্ব্ববঙ্গ বিজয়ের পর হইতেই সোণারগাঁয়ে রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হইল। সে সময়ে বহরম খাঁ তথাকার শাসনকর্ত্তা ছিলেন (১৩৩৫—১৩৩৮) তাঁহার মৃত্যুর পর ফকিরউদ্দিন শাসনভার গ্রহণ করিয়াই আবুল মুজফ্‌ফর মুবারক সাহ নাম গ্রহণ পূর্ব্বক আপনাকে স্বাধীন নৃপতি বলিয়া ঘোষণা করিলেন, ইনি (১৩৩৮—১৩৪৯) খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত নিরাপদে রাজত্ব করিয়াছিলেন। ১৩৫১খ্রীষ্টাব্দে পুনরায় শামসুদ্দিন ইলিয়াসসাহ এবং তাহার পুত্র সেকেন্দর

* "In 1330, Muhammed Tughluk conquered Eastern Bengal also, and divided it into three Provinces—Lakhnauti, Satgaon and Sonargaon including Dacca." (Hunter's Statistical Account of Bengal. P. 119)

সাহ পূর্ব্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গ একত্র করেন। সুবর্ণগ্রামের অন্যতম স্বাধীন নৃপতি আজম সাহের বংশধরগণের সময়ে পূর্ব্ববঙ্গ, ত্রিপুরা, আসাম এবং আরাকানের রাজার হস্তে পতিত হয়; কিন্তু পুনরায় ইলিয়াস সাহের বংশধর নাশিরউদ্দিন মামুদ সাহ কর্ত্তৃক ১৪৪৫ খ্রীষ্টাব্দে উভয় বঙ্গ একত্র হয়। ১৪৮৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই বংশ পূর্ব্ববঙ্গে স্বাধীনভাবে রাজদণ্ড পরিচালনা করিয়াছিলেন। ইহারা জল বুদ্বুদের মত কালসাগরে বিলীন হইয়া গেলে পর আলাউদ্দিন সৈয়দ হুসেনসাহ বাঙ্‌লার সিংহাসনে আরোহণ করেন, ইনি প্রজাদিগের অতিশয় প্রিয় ছিলেন। ইহাকে সকলেই শ্রদ্ধা করিত। তৎকালে হুসেন সাহের ওমরাহগণের অনেকে বঙ্গীয় কবিদিগের প্রতিপালক স্বরূপ ছিলেন, বঙ্গ সাহিত্যজ্ঞ ব্যক্তিগণ ইহা বিশেরূপে জ্ঞাত আছেন। অনেক প্রাচীন কাব্য গ্রন্থের * ভণিতায় কৃতজ্ঞ কবিগণ সে সকল ওমরাহের দানশীলতায় ও সৌজন্যের ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। হাণ্টার সাহেব হুসেন সাহার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন "The greatest King Bengal has had, who extended his power from the Eastern Districts over the whole of Bengal." † হুসেন সাহের পরে সুরবংশের পাঁচজন এবং কররাণী বংশের তিনজন বঙ্গদেশে রাজত্ব করেন। কররাণী বংশের শেষ নরপতি দাউদের সঙ্গে সঙ্গে প্রায় দুই শতাব্দী পরে পাঠান রাজশক্তি অস্তমিতা হইলেন। দাউদ খাঁ বিন্ সুলেমান আকবর-সেনাপতি মুনাইম খাঁ কর্ত্তৃক পরাভূত হইলেন। মোগল সেনাপতি মৈনামের

---

* Hunter's Statistical Account of Bengal P. 119.

† Sonargaon, although celebrated as a seat of trade, and the Musalman metropolis of Eastern Bengal, does not appear to have ever had any pretensions to architectural grandeur (Hunter's Statistical Account of Bengal P. 72)

দেহাবসানে দাউদ পুনরায় মোগলের বিরুদ্ধে মুক্ত অসি হস্তে দাঁড়াইয়াছিল বটে, কিন্তু আর কিছুতেই চঞ্চলা সৌভাগ্য লক্ষ্মী তাহার দিকে করুণ নয়নে চাহিলেন না—তাহার মৃত্যু ঘটিল এবং শোণিত রঞ্জিত ছিন্নশির আগ্রায় প্রেরিত হইল। দুই শতাব্দীর পরে পাঠানসৌভাগ্য সূর্য্য অন্ধকারে আবৃত হইল। ১৩৩৮ খ্রীষ্টাব্দে মুবারক সাহ সুবর্ণগ্রামে স্বাধীন নৃপতি বলিয়া ঘোষণা করার পর হইতেই সোণারগাঁ ধীরে ধীরে সর্ব্বত্র সুপরিচিত হইয়া উঠে, এবং ক্রমশঃ উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করে। সে সময় সুবর্ণগ্রামে যেরূপ সূক্ষ্ম ও শুভ্র বস্ত্র এবং মছলিন প্রস্তুত হইত ভারতের আর কোথাও তদ্রূপ হইত না। খ্রীষ্টিয় চতুর্দ্দশ শতাব্দী হইতে ষোড়শ শতাব্দী পর্য্যন্ত সোণারগাঁয়ের প্রস্তুতি বস্ত্র ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বস্ত্র বলিয়া বিবেচিত হইত। সুবর্ণগ্রাম তৎকালে পূর্ব্ববঙ্গের রাজধানী হইলেও স্থাপত্য গৌরবে গৌরবান্বিত ছিল না, * আবুলফজল এবং ফিচের বর্ণনা হইতে ইহাই অনুমিত হয়। উভয়েই লিখিয়াছেন "এখানকার লোকেরা বংশ নির্ম্মিত খরের ঘরে বাস করে, উহাদের প্রধান খাদ্য ভাত, ইহারা অর্দ্ধোলঙ্গ অবস্থায় থাকে, উর্দ্ধাংশ সম্পূর্ণ নগ্ন থাকে। সাধারণতঃ এ দেশের লোকেরা মালপত্র ইত্যাদি নিতে কিংবা কোন স্থানে যাইতে নৌকার ব্যবহার করে, স্থলপথে যাইতে চতুর্দ্দোলা ব্যবহৃত হয়; রৌদ্র বৃষ্টি নিবারণের নিমিত্ত উহাতে বস্ত্রাবরণ থাকে। † ফিচ ১৫৮৬

সোণারগাঁর কথা।

* আইন-ই-আকবরী।

Fitch লিখিয়াছেন "Sinergan is a town six leagues from Serripur, where there is the best and finest cloth made in all India. The houses here, as they be in most part of India, are very little and covered with straw, and have a few mats round about the walls, and the door to keep out the tigers and the foxes. Many of the people are very rich. Here they will eat no flesh, nor kill beast. They live on rice, milk, & fruits. They go with a little cloth before them, & all the rest of the body is naked."

খ্রীষ্টাব্দে সোণারগাঁ দর্শন করিয়াছিলেন তিনি বিশেষত্বের মধ্যে ইহা লিখিয়াছেন যে, এখানকার লোকেরা অধিকাংশই ধনী, ইহারা মাংস খায় না এবং কোনও পশু হত্যা করে না—সাধারণতঃ ভাত, দুধ এবং ফল খাইয়াই জীবন ধারণ করে। * রেনেল সাহেব সোণারগাঁয়ের যেরূপ বর্ণনা দিয়াছেন তাঁহাতে কিন্তু আইন-ই-আকবরী এবং ফিচের বর্ণনা কেমন একটু অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়, তিনি লিখিয়াছেন যে সোণারগাঁ পূর্ব্বে বৃহত্তম নগরী এবং পূর্ব্ববঙ্গের রাজধানী ছিল, এখন সামান্য গ্রামে পরিণত হইয়াছে। † সোণারগাঁ সম্বন্ধে আমরা আর অধিক আলোচনা করিবার অধিকারী নহি—যাহা করিলাম তাহা বর্ণিত ইতিহাসের সহিত সংশ্লিষ্ট বলিয়াই করিতে হইয়াছে। এখনও সোণারগাঁয়ে যে সকল প্রাচীন কীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ দেখা যায় তাহাতে উহা যে প্রাচীন কালে সমৃদ্ধি সম্পন্ন নগর ছিল না, ইহা আমাদের নিকট যেন কেমন অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়; যেখানে স্বাধীন পাঠান নৃপতিগণের রাজধানী ছিল সেস্থান যে একেবারে শোভা-সমৃদ্ধিহীন ছিল, ইহা বিচিত্র নয় কি ?

বিক্রমপুরে ১৩৭৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে মুসলমান রাজার আধিপত্য বিস্তৃত হয় সে সময় হইতেই সেখানে মুসলমানেরা বাস করিতে থাকে; কিন্তু বিক্রমপুরের অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় যে, ইহা মুসলমানগণের অধীন হইলেও তথায় মুসলমান অধিবাসীর আধিক্য হয় নাই; না হইবার মূল কারণ রামপাল হইতে সোণারগাঁয়ে রাজধানী পরিবর্ত্তন। বোধ হয় সে নিমিত্ত

* "Sunergong or Sunnergaun, was a large city, and the provincial capital of the eastern division of Bengal."
(Rennell's Memoir of Map of Hindoostan.)

† যাঁহারা সোণারগাঁয়ের বিস্তৃত বিবরণ জানিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা স্বরূপচন্দ্র রায়ের সোনারগাঁয়ের ইতিহাস পাঠ করিতে পারেন।

এখনও বিক্রমপুরে হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানের সংখ্যা অনেক কম। আমরা

বিক্রমপুরে পাঠানকীর্ত্তি।

সমগ্র বিক্রমপুরে অনুসন্ধানদ্বারা মাত্র দুইটী পাঠান শাসনকালীন প্রাচীন কীর্ত্তির চিহ্ন প্রাপ্ত হইয়াছি; তাহার একটী রামপালের বাবা আদমের মস্‌জিদ্ উহা ৮৮৮ হিঃ অঃ (১৪৮১) ফতে সাহা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। এ মস্‌জিদের বিস্তৃত বিবরণ পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে। পাঠান শাসন সময়ের দ্বিতীয় কীর্ত্তি রিকিববাজারের মস্‌জিদ্। এই মস্‌জিদটী কররাণী বংশীয় সুলেমান কররাণীর রাজত্ব সময়ে ৯৭৬ হিঃ অঃ (১৫৬৯ খ্রীঃ অঃ) মালিক আবদুল্লা মিঞা নামক জনৈক কাজী কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। মস্‌জিদ্‌টী ইষ্টক নির্ম্মিত; বাহ্যাকৃতি ৩৬×৩৪ ফুট; উপরে একটী মাত্র গুম্বজ; প্রাচীর ৪ ফিট পুরু। স্থানীয় মুসলমানেরা এখনও ইহাতে নমাজ পড়ে—ইহা এখনও একেবারে ব্যবহারের অনুপযুক্ত হয় নাই। মস্‌জিদ্‌টীর দ্বারোপরি যে প্রস্তরলিপি আছে নিম্নে তাহার ইংরেজী অনুবাদ দেওয়া হইল, সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিনাথ দে মহাশয় কর্ত্তৃক ইহার পাঠোদ্ধার হইয়াছে।

God Almighty says "The mosques belongs to God, worship no one else with Him" The Prophet, on whom be peace says, "He who builds a mosque in the world will have seventy castles built for him by God in Paradise. "These mosques together with what there is of other buildings' (were built) during the reign of the King of the age, his august majesty Miyn, during the month of xilquadh 976 (April 1569)"

এই মস্‌জিদ্‌টী সাধারণতঃ "কাজীর মস্‌জিদ্" নামে পরিচিত, এই জনপ্রবাদ হইতে মস্‌জিদ্ নির্ম্মাতা আবদুল্লা মিঞাকে তৎকালীন বিক্রম-

পুরের কাজী ছিলেন। আবছুল্লাপুর গ্রামও ইনিই নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। পাঠান অধিপতিদের মধ্যে হোসেন সাহই অত্যন্ত খ্যাতিমান নরপতি ছিলেন, এ দেশে তাঁহার বহু কীর্ত্তি জীবিত থাকিয়া অদ্যাপি তাঁহার বিজয় ঘোষণা করিতেছে। ইনি বঙ্গদেশের উত্তর পূর্ব্বদিকস্থ কামরূপ, কামত, প্রভৃতি স্থান পর্য্যন্ত অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। হোসেন সাহ হিন্দু মুসলমানকে সমভাবে দেখিতেন, ইহার সময়ে দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থ পুরন্দর খাঁ, সনাতন গোস্বামী ভাদুড়িয়ার প্রসিদ্ধ রাজা কংশনারায়ণের ভাগিনেয় সুবুদ্ধি ভাদুড়ি প্রভৃতি বহু উচ্চ রাজপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। * তাঁহার সময়েই প্রেমাবতার

শ্রীশ্রীচৈতন্ত মহাপ্রভুর অভ্যুদয়।

শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অভ্যুদয়ে সমগ্র বঙ্গদেশ প্রেমের পীযূষধারায় সিক্ত হইয়াছিল—তখন প্রেম ও শান্তির প্রীতিপূর্ণ মূর্ত্তি চৈতন্যদেবের বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচারে শান্তিপুর 'ডুবু ডবু' এবং ন'দে ভাসিয়া গিয়াছিল। খ্রীষ্টিয় পঞ্চদশ শতাব্দী হইতে ষোড়শ শতাব্দী পর্য্যন্ত ধর্ম্ম, সাহিত্য, রাজনীতি প্রত্যেক বিষয়েই বঙ্গদেশের উন্নতি হইয়াছিল। সে সময়ে বঙ্গীয় কাব্যকাননে শ্যামা, পাপিয়া, দয়েল, কোকিল প্রভৃতি মধুরকণ্ঠ কবি-বিহঙ্গগণ প্রাণ মাতানো গানে চতুর্দ্দিক মুখরিত করিয়া তুলিয়াছিলেন।

বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রচার।

হোসেন সাহের সময়ে নবদ্বীপ পাণ্ডিত্যে কবিত্বে ও ধর্ম্মে অতি গৌরবান্বিত হইয়া উঠিয়াছিল। শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর তিরোভাবের পরে তদীয় প্রেম-ধর্ম্ম প্রচারের জন্য তাহার ভক্ত শিষ্যগণ নানা দেশ-দেশান্তরে গমন করিয়াছিল। বিক্রমপুরেও সে প্রেমতরঙ্গের কম্পন অনুভূত হইয়াছিল। পাঠানশাসন সময়ে বিক্রমপুর বাসীর কোনও রূপ ঝড় বা ঝঞ্ঝাবাত সহ্য করিতে না হইলেও

* রিয়াজ-উস-সলাতিনের বঙ্গানুবাদ শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত। ১২৫ পৃষ্ঠা।

দেশের অবস্থা সন্তোষজনক ছিল না, কারণ পাঠানেরা দেশ শাসন করিতে জানিতেন না। চোর ডাকাতের উপদ্রব তখন খুব বেশী ছিল, লোকে সর্ব্বদা সশঙ্ক চিত্তে জীবনাতিবাহিত করিত। টাকা কড়ি ঘরের মেজে খনন করিয়া রক্ষা করিত। অর্থের ব্যবহার তখন খুব অল্প ছিল, ক্রয় বিক্রয়ে কড়িই বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইত। দুর্ভিক্ষের প্রকোপ ছিল না। ধান চাউল বাণিজ্য সামগ্রী বিশেষ সুলভ ছিল। সে সময়ে 'কার্ত্তিক বারুণীর, মেলার বিশেষ প্রসিদ্ধি ছিল, নানা দেশ দেশান্তর হইতে বিক্রয়ার্থ বহু জিনিস পত্রাদি এখানে আমদানী হইত এবং ইহার নিকট-বর্ত্তী 'যোগিনীঘাট' নামক স্থান তীর্থস্থান বলিয়া তথায় বহুলোক অব-গাহন করিয়া পুণ্য সঞ্চয় করিতেন। সে সময়ে ধলেশ্বরী ও ইচ্ছামতী বিস্তৃত কলেবরা ও বেগশালিনী ছিল। বিক্রমপুরের অন্যান্য বিষয়ে কোনরূপ অভাব অভিযোগ না থাকিলেও রামপাল হইতে সুবর্ণগ্রাম রাজধানী পরিবর্ত্তিত হওয়ায় এ স্থানের পূর্ব্ব গৌরব বৈভব বিলুপ্ত হইয়াছিল।

সপ্তম অধ্যায়।

—:○:—

মোগল শাসনকাল।

উত্থান ও পতন জগতের স্বাভাবিক নিয়ম। পাঠান রাজবংশের দুই শতাব্দীর সুদৃঢ় সিংহাসন দাউদের সঙ্গে সঙ্গে চূর্ণ হইয়া গেলে ধীরে ধীরে মোগল-গৌরব-রবি ভারতাকাশে উদিত হইতে আরম্ভ করিল। এ সময়ে বাঙ্গলায় সুলতান হুসেনশাহের জ্যেষ্ঠপুত্র নসরৎ শাহ স্বাধীনভাবে রাজদণ্ড পরিচালনা করিতেছিলেন। ইনিও পিতার ন্যায় সিংহাসনারোহণের পর

বহু সদ্‌গুণাবলীর পরিচয় দিয়াছিলেন। অন্যান্য মুসলমান সুলতানগণের ন্যায় ভ্রাতা ও অন্যান্য নিকট-আত্মীয়গণকে, চক্ষু উৎপাটন ইত্যাদি করিয়া নির্য্যাতন করার পরিবর্ত্তে ইনি পিতৃদত্ত বৃত্তি দ্বিগুণ করিয়া দিয়া যথেষ্ট মহত্ত্ব ও সৌজন্যতার পরিচয় দিয়াছিলেন। নসরৎ যখন বাঙ্‌লায় স্বীয় প্রভুত্ব ও প্রাধান্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যবিস্তারে মনোযোগী হইয়াছিলেন, তখন ভারতের অপর প্রান্তে তৎকালীন দিল্লীশ্বর ইব্রাহীম লোদীকে পাণিপথের ভীষণ যুদ্ধে ১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দে পরাস্ত ও নিহত করিয়া মোগলসাম্রাজ্য সংস্থাপক বাবর শাহ দিল্লীর অধীশ্বর হইলেন। এইরূপে ভারতে মোগলের অভ্যুদয় হইল। বাবর শাহ কষ্টার্জ্জিত দিল্লী-সিংহাসন বেশী দিন ভোগ করিতে পারিলেন না, চারি বৎসর মাত্র রাজত্ব করিয়া ১৫৩০—৩১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। বাবরের মৃত্যুর পর তৎপুত্র হুমায়ুন দিল্লীসিংহাসন অধিকার করেন। হুমায়ুনের সময়েই সের খাঁ বঙ্গদেশ স্বীয় অধিকার ভুক্ত করিয়া পরিশেষে দিল্লী-সিংহাসন পর্য্যন্ত অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সের শাহ যখন দিল্লীশ্বরের বিরুদ্ধে যুদ্ধের উদ্যোগ করেন,সে সময়ে খিজির খাঁ নামক এক ব্যক্তিকে বঙ্গের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া যান। খিজির খাঁ বঙ্গের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইবার পর বঙ্গের শেষ স্বাধীন নরপতি মামুদ শাহের কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। এই বিবাহ-সূত্রে খিজির খাঁ পূর্ব্ব রাজবংশের অনুগৃহীত বহু আফগানকে স্বীয় দলভুক্ত করতঃ স্পর্দ্ধিত হইয়া সের খাঁর অধীনতা অস্বীকার করিয়া রাজদ্রোহিতার ভাব প্রকাশ করিলে, সের খাঁ পুনরায় বঙ্গদেশে আসিয়া খিজিরখাঁকে দমন করেন এবং তিনি বঙ্গদেশকে কয়েক খণ্ডে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক প্রদেশে এক এক জন শাসন কর্ত্তা নিযুক্ত করেন। ইহার শাসন সময়ে বাঙ্গলার ভূমি বন্দোবস্ত হয়। তিনি উৎপন্নের এক চতুর্থাংশ রাজকর ধার্য্য করিয়া বাঙ্গলার ভূমির বন্দো-

ভারতে মোগলের অভ্যুদয়।

বন্ধ করেন। সের শাহ সুবর্ণগ্রাম হইতে সিন্ধু নদের তীর পর্য্যন্ত একটী সুবৃহৎ বর্ত্ম প্রস্তুত করাইয়া তাহার উভয় পার্শ্বে বৃক্ষ রোপণ ও প্রয়োজনানুরূপ পান্থনিবাস বা সরাই নির্ম্মাণ ও কূপ ইত্যাদি খনন করিয়া জনসাধারণের বিশেষ মঙ্গল সাধন করেন। ইহার শাসন সময়ে দেশে দস্যুভয় ছিল না, পথিক ও বণিকগণ নির্ভয়ে পথিমধ্যে দ্রব্যাদি নিক্ষেপ করিয়া নিদ্রা যাইত। ভারতবর্ষে সর্ব্বপ্রথমে ইহাঁর দ্বারাই ঘোড়ার ডাকের প্রচলন হয়। ১৫৪৫ খ্রীষ্টাব্দে সের শাহ কাল-কবলে নিপতিত হন।

সের শাহের মৃত্যুর পরে তৎপুত্র সেলিম দিল্লী-সিংহাসনে আরোহণ করিয়া তাহার নিকট-আত্মীয় মহম্মদ খাঁ শূরকে বাঙ্গলার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করেন। সেলিম মৃত্যুমুখে পতিত হইলে তাঁহার তনয়কে নিহত করিয়া ১৫৫৩ খ্রীষ্টাব্দে তদীয় শ্যালক মহম্মদ আদিল শাহ দিল্লী-সিংহাসন অধিকার করেন। এই সুযোগে মহম্মদ খাঁ শূর স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়া জৌনপুরের কতকাংশ স্বীয় অধিকার ভুক্ত করেন ও স্বীয় নামাঙ্কিত মুদ্রা প্রচলন করেন। আদিল শাহ মহম্মদের এইরূপ অবৈধাচরণে ক্রুদ্ধ হইয়া স্বীয় হিন্দুসেনাপতি হিমুকে বাঙ্‌লায় প্রেরণ করেন, হিমু কুল্‌পীর নিকটস্থ ছাপরঘাটার যুদ্ধে বঙ্গেশ্বরকে পরাজিত ও নিহত করেন (১৫৫৫)। মহম্মদ খাঁর মৃত্যুর পরে তৎপুত্র খিজির খাঁ বাহাদুর শাহ নাম ও বাঙ্গলার মসনদ গ্রহণ করিয়া গৌড়ের স্বাধীন নরপতিরূপে সম্রাট আদিলের বিরুদ্ধে অভিযান করিয়া মুঙ্গেরের যুদ্ধে ৯৬৩ হিজিরায় (১৫৫৫ খ্রীষ্টাব্দে) তাঁহাকে নিহত করিয়া পিতার মৃত্যুর প্রতিশোধ লইতে সক্ষম হইয়াছিলেন। আদিল নিহত হইলে হুমায়ুন পুনরায় দিল্লী অধিকার করেন ও অল্প কয়েক দিন পরেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। হুমায়ুনের মৃত্যুর পরে মোগল-কুল-রত্ন আকবর শাহ দিল্লীর সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া চতুর্দ্দিকে স্বীয় প্রাধান্য বিস্তার করিতে আরম্ভ করিলেন। বাহাদুর শাহের অপুত্রক অবস্থায় মৃত্যু হইলে তাঁহার

আকবর শাহ।

ভ্রাতা জালালউদ্দীন বঙ্গসিংহাসন অধিকার করেন, তাঁহার মৃত্যু হইলে তাঁহার যুবক পুত্র সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন, কিন্তু ইনি গিয়াসউদ্দীন নামক এক ব্যক্তি কর্ত্তৃক নিহত হন। অতঃপর কেওরাণী বংশীয় সলেমান ও তাঁহার ভ্রাতা তাজখান্ আসিয়া বাঙ্‌লাঅধিকার করেন। ১৫৬৪ খ্রীষ্টাব্দে তাজখাঁর মৃত্যু হইলে সুলেমান গৌড় হইতে উহার অপর তীরবর্ত্তী তাঁড়া নামক স্থানে রাজধানী স্থাপন করেন এবং সেখান হইতে সম্রাটের নিকট উপঢৌকন প্রেরণ করিয়া তাঁহার মনস্তুষ্টি সাধন করেন। ১৫৭৩ খ্রীষ্টাব্দে সুলেমানের মৃত্যুর পর তৎপুত্র বয়াজিদ রাজা হন, কিন্তু ইহার আচরণে উত্ত্যক্ত হইয়া আফ্‌গান সর্দ্দারগণ তাঁহাকে বিনষ্ট করিয়া তাঁহার ভ্রাতা দাউদকে সিংহাসন প্রদান করেন। দাউদ সিংহাসনারোহণ করিয়া দেখিলেন যে তাঁহার ১৪০০০০ পদাতিক ৪০০০০ অশ্বারোহী, ২০০০০ কামান ও অন্যান্য অস্ত্র ও ৩৬০০ হস্তী ও বহু শত যুদ্ধ-নৌকা ইত্যাদি প্রস্তুত আছে, ইহাতে তাঁহার মনে রাজ্য বিস্তার লালসা বৃদ্ধি পাইল এবং আপনাকে স্বাধীন নরপতি জ্ঞানে বাঙ্‌লা ও বিহার সর্ব্বত্র স্বীয় নামে খুতবা পড়িবার হুকুম দিলেন। দাউদ গাজিপুরের সন্নিহিত জমানিয়া নামক একটা মোগল দুর্গ বল পূর্ব্বক অধিকার করায় আকবর দাউদের বিরুদ্ধে সেনাপতি মনিয়াম খাঁকে ও রাজা টোডর মল্লকে পাঠাইয়া দেন। মেদিনীপুরের ও বালেশ্বরের মধ্যবর্ত্তী

বঙ্গে মোগল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা।

মোগলমারি নামক স্থানে ১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দে মোগল পাঠানের ভীষণ যুদ্ধ হয়, সে যুদ্ধে প্রথমতঃ পাঠানদিগেরই জয়ের সম্ভাবনা হইয়া উঠে, কিন্তু অবশেষে মোগলদিগেরই জয় হয়। দাউদ যুদ্ধ ক্ষেত্র হইতে পলায়ন করেন, কিন্তু পরিশেষে সম্রাটের কৃপায় ওড়িষ্যার শাসনভার লাভ করেন। এবং মনিয়াম খাঁ বাঙ্গলার শাসন কর্ত্তা নিযুক্ত হন। মনিয়াম তাঁড়া হইতে পুনরায় গৌড়ে রাজধানী পরিবর্ত্তন করেন এবং অল্পকাল

পরেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। মনিয়ামের মৃত্যুর পরে দাউদ পুনরায় বাঙ্‌লা আক্রমণ করেন কিন্তু নব নিযুক্ত শাসনকর্ত্তা খান্‌ জহান্‌ ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহাকে পরাজিত করেন, দাউদ খাঁ বন্দী হইলেন এবং রাজদ্রোহিতা-পরাধে তাঁহার প্রাণদণ্ড হইল, তাঁহার ছিন্নশির খান্‌জহান্‌ দূতহস্তে আগ্রায় আকবর বাদশাহের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। দাউদের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গলার পাঠান রবি অস্তমিত হইয়া বাঙ্গলার পাঠান রাজ্য লোপ পাইল।

মোগল সুবেদারগণ।

এইরূপে বাঙ্‌লাদেশ মোগলসাম্রাজ্য ভুক্ত হইলে তথায় এক এক জন অধীন শাসন কর্ত্তা বা সুবেদার নিযুক্ত হইয়া শাসন কার্য্য পরিচালনা করিতেন। খান্‌-জহানের পরে মুজঃফর খাঁ,—এবং মুজঃফর খাঁয়ের পরে ১৫৮০ খ্রীষ্টাব্দে রাজা টোডর মল্ল বাঙ্গলার শাসন কর্ত্তা নিযুক্ত হন। কিন্তু তাঁহার সহিত মুসলমান সেনাপতিদিগের মনের মিল না হওয়ায় সম্রাট আকবর তাঁহার হস্ত হইতে শাসনভার গ্রহণ করিয়া খাঁ আজিনের প্রতি অর্পণ করেন ও রাজা টোডর মল্লের প্রতি রাজস্ব বন্দোবস্তের ভার অর্পণ করেন। রাজা টোডর মল্ল সমগ্র বাঙ্‌লাদেশকে ১৯ সরকারে ও ৬৮২ পরগণায় বিভক্ত

ওয়াসিল-তুমার-জমা ও সরকার বাজুয়া।

করেন। বৃহত্তর বিভাগগুলি সরকার ও ক্ষুদ্রতর বিভাগগুলি পরগণা বা মহাল নামে অভিহিত হইয়াছিল। কতকগুলি মৌজা বা গ্রাম লইয়া পরগণার সৃষ্টি, আর কতকগুলি পরগণা লইয়া সরকার গঠিত হয়। এইরূপে সমগ্র বঙ্গরাজ্য টোডরমল্ল ১৯ সরকার ও ৬৮২ পরগণায় বিভাগ করিয়াছিলেন। বঙ্গদেশের ভূমি তৎকালে খালসা ও জায়গীর নামে অভিহিত হইত, যে জমীর জমা বা আয় রাজকোষে আসিত তাহাকে খালসা ও যাহার আয় কর্ম্মচারীদের ব্যয় নির্ব্বাহার্থে আবশ্যক হইত তাহার নাম জায়গীর ছিল। টোডর মল্ল খালসা ভূমির ৬৩, ৪৪, ২৬০ টাকা ও জায়গীর ভূমির ৪৩, ৪৮, ৮৯২ টাকা মোট ১, ০৬, ৯৩,

২৬০ টাকা সমগ্র বঙ্গরাজ্যের জমা নির্দ্দেশ করেন। তাঁহার এই জমা বন্দোবস্তের যে কাগজ প্রস্তুত হইয়াছিল তাহাই ওয়াশীল-তুমার-জমা নামে পরিচিত হইয়া আসিতেছে। বিক্রমপুর সরকার সোণার গাঁয়ের অন্তর্গত একটী মহাল বা পরগণা ছিল। সোণার গাঁ ৫২ পরগণায় বিভক্ত ছিল, এই বায়ান্ন মহালের রাজস্ব ১০,৩৩,১৩,৩৩৩ দাম বা ২,৫৮,২৮৩ টাকা ছিল, তন্মধ্যে বিক্রমপুরের রাজস্বই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ছিল। মেঘনা নদের পূর্ব্বতীর ব্যাপিয়া শীলহাটের দক্ষিণ ও ত্রিপুরার পশ্চিম সীমা' পর্য্যন্ত সরকার সোণার গাঁ বিস্তৃত ছিল। ১৫৮৯ খ্রীষ্টাব্দে রাজা মানসিংহ বঙ্গের ষষ্ঠ সুবেদাররূপে আগমন করেন।

বারভূঁইয়া।

ইহাঁর সময়ে রাজমহলে বাঙ্‌লা বিহার ও ওড়িষ্যার রাজধানী স্থাপিত হয়। এবং মানসিংহের বাঙ্‌লাদেশের শাসনভার গ্রহণ করিবার পূর্ব্ব হইতেই যখন বিহার ও ওড়িষ্যায় আফগান বিদ্রোহী হইয়া নানারূপ উৎপাত করিতে আরম্ভ করে, সে সময়ে ধীরে ধীরে বাঙ্‌লা দেশের বিভিন্নাংশে অল্পে অল্পে ভৌমিক বা ভূঁইয়াগণ স্বাধীনতা প্রাপ্তির প্রয়াস পান। ভৌমিক বা জমিদার একই কথা। ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে এ সমুদয় ভৌমিকগণের অভ্যুদয় হয়। সম্রাট আক্‌বর শাহের রাজত্বকালেই ইহাদের অভ্যুদয় হয় এবং পরিশেষে সেলিম বা জাহাঙ্গীর বাদশাহের রাজত্ব সময়ে ইহারা পরাজিত হন। এই সমুদয় ভৌমিকগণ প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তার অত্যাচার উৎপীড়নে ব্যথিত হইয়া আপনাদের সম্পত্তি ও সম্মান রক্ষার জন্য দলবদ্ধ হইয়া নিয়মিত রাজস্ব প্রদানে বিরত হন, এবং আপনাদিগকে স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করেন। বারভূঁইয়ার ইতিহাস বঙ্গের গৌরব। ইহাঁরা এক সময়ে যেরূপ বীর্য্যবত্তার পরিচয় দিয়াছিলেন তাহা আজিও বঙ্গের কুটীরে কুটীরে পরিকীর্ত্তিত হইয়া আসিতেছে। ইহাঁদের মধ্যে আবার বিক্রমপুরের কেদাররায় ও যশোহরের প্রতাপাদিত্য

যে বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন তাহা বাঙ্গালীজাতির নিকট চিরগৌরবময় পুণ্য ইতিহাস। সে পুণ্য কাহিনী বঙ্গদেশ হইতে কখনও অন্তর্হিত হইবে না। এইবার ভূঞাদের নাম লইয়া বড়ই গোলযোগ, তবে বিক্রমপুরের কেদার রায়, ভাওয়ালের ফজলগাজী, খিজিরপুরের ঈশা খাঁ, সাতৈলের রাজা রামকৃষ্ণ, চাঁদপ্রতাপের চাঁদগাজী, যশোহরের প্রতাপাদিত্য, ভূষণার মুকুন্দ রায়, চন্দ্রদ্বীপের কন্দর্পনারায়ণ রায়, ভুলুয়ার লক্ষ্মণমাণিক্য প্রভৃতি নয় জনের নাম নির্ব্বিবাদে চলিয়া আসিতেছে—ইহাদের কীর্ত্তিকলাপ ও উল্লেখযোগ্য। (১)

বিক্রমপুরে চাঁদরায় ও কেদার রায়।

ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে চাঁদরায় ও কেদার রায় এই দুই ভ্রাতা মোগলদিগের শাসনশৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া আপনাদিগকে স্বাধীন নরপতি বলিয়া ঘোষণা করেন। (২) ইহাঁদের রাজধানী সুবর্ণ গ্রাম বা সোণার গাঁ হইতে ৯ ক্রোশ দূরবর্ত্তী পদ্মাতীরে অবস্থিত ছিল। শ্রীপুর বিক্রমপুর পরগণার অন্ত-

(১) কেহ কেহ পুটিয়ার রাজা, তাহির পুরের রাজা ও দিনাজপুরের রাজাকেও বার ভূঁইয়ার অন্তর্গত ব'লিয়া থাকেন, কিন্তু এ বিষয়ে বহু মতভেদ আছে।

২। কথিত আছে যে এই বংশের আদি পুরুষ নিমরায় কর্ণাট হইতে আসিয়া বিক্রমপুরস্থ আড়ফুলবাড়িয়া নামক গ্রামে বাস করিতে থাকেন। এই নিমরায়ের বংশেই চাঁদ রায় ও কেদার রায় জন্মগ্রহণ করেন। বহু অনুসন্ধানেও চাঁদরায় ও কেদার রায়ের পিতার নাম সংগ্রহ করিতে পারি নাই। ইহাদের গুরুবংশ এবং পুরোহিত বংশের কেহই প্রাচীন কোন কাগজ পত্র কিংবা কোন কুলজী গ্রন্থ হইতে উহা সংগ্রহ করিয়া দিতে পারেন নাই। নিম রায় সম্বন্ধে ডাক্তার ওয়াইজ সাহেব লিখিয়াছেন যে,—The tradition is, that about a hundred and fifty years before the reign of Akbar, Nim Rai came from Karnat and settled at Araphullbria in Bikrampur. He is believed to have been the first Bhuya, and to have obtained the sanction of the ruling monarch to his retaining the tittle as on

ভুক্ত। মোগলেরা বিক্রমপুরকে সরকার সোণার গাঁয়ের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়া তাহাকে আপনাদের অধীনস্থ ভূভাগ বলিয়া ঘোষণা করিলেও চাঁদরায় কেদার রায় নিজ স্বাধীনতা পরিত্যাগ করেন নাই। বিক্রমপুরের চতুর্দ্দিকে বহু নদী বিদ্যমান থাকায় তাঁহারা এক স্থান হইতে আর এক স্থানে গমন করিয়া মোগল সৈন্যদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিতেন, কাজেই মোগল সৈন্যগণ ইহাঁদিগকে বশীভূত করিতে পারিতেন না। এই রাজবংশের সহিত খিজিরপুরাধিপতি ঈশাখাঁর বিশেষ সদ্ভাব ছিল, তাঁহারা কখনও ঈশাখাঁর বিরুদ্ধাচরণ করিতেন না। ঈশাখাঁও মৈত্রীভাব রক্ষা করিতে পরাঙ্মুখ ছিলেন না।

এক সময়ে ঈশাখাঁ মিত্ররাজ কেদার রায়ের বাটীতে আগমন করেন; কেদার রায় ও এই রাজ অতিথির উপযুক্ত রূপ সম্বর্দ্ধনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, কিন্তু এই আনন্দ কোলাহলের নিবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গেই উভয় পক্ষের প্রীতির বন্ধন বিচ্ছিন্ন হইয়া চির বিদ্রোহের ও মনান্তরের সৃষ্টি হইল। * কেদার রায়ের এক অপূর্ব্বরূপ লাবণ্যবতী যুবতী বিধবা

---

hereditary one in farmly," (James wise—on the Barah Bhuyas Asiatic Society's Journal 1874).

ওয়াইজ সাহেবের মতে নিম রায় সম্রাট আকবরের রাজত্বের প্রায় ১৫০ দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে কর্ণাট হইতে বিক্রমপুরে আগমন করেন। শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় মহাশয় অনুমান করেন যে যে সময়ে সেনরাজগণ বিক্রমপুরে রাজত্ব করিয়াছিলন, সেই সময়েই তাঁহাদের স্বদেশবাসী নিমরায় আগমন করেন। (নিখিল বাবুর প্রতাপাদিত্য দেখ)।

* প্রবীণ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত আনন্দ নাথ রায় কেদার রায়কে চাঁদ রায়ের পুত্র বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা সাধারণতঃ দুইভ্রাতা বলিয়াই কথিত হইয়া থাকেন। আমরাও সেই সাধারণ বিশ্বাসের সহিত তাঁহাদিগকে দুইভ্রাতা বলিয়াই উল্লেখ করিলাম। বংশপরম্পরাগত জনপ্রবাদ হইতেও দুই ভ্রাতা বলিয়া জানা যায়। ডাক্তার ওয়াইজও এই মতাবলম্বী।

ভগ্নী ছিলেন—তাহার নাম ছিল সোণা বা সোণামণি। এই বালবিধবা বৈধব্যের দারুণ যন্ত্রণার মধ্যে ভ্রাতৃদ্বয়ের আশ্রয়ে থাকিয়া জীবন কাটাইতেছিল। ঈশাখাঁ যখন কেদার রায়ের অতিথি রূপে শ্রীপুরে অবস্থিতি করিতে ছিলেন তখন তিনি কোনও রূপে এই ললনারত্নকে দেখিতে পাইয়া একেবারে বিমুগ্ধ হইয়া পড়েন। হায়! রমণীর রূপ, জগতে তুমিই যত অনিষ্টের মূল।

ঈশাখাঁ সোণামণির রূপ লাবণ্যে এতদুর মোহিত হইয়াছিলেন যে তিনি খিজির পুরে গমন করিয়াই সোণামণিকে পাইবার জন্য একজন দূত প্রেরণ করেন। তিনি জানিতেন না যে ইহাতে বীর শ্রেষ্ঠ কেদার রায়ের মনে দারুণ ঘৃণার ও ক্রোধের সঞ্চার হইবে, কেদার দূতকে বিদায় দিয়া যুদ্ধ ঘোষণা করতঃ ঈশাখাঁর অধিকৃত কলাগাছির দুর্গ আক্রমণ করিয়া তাহা ধ্বংস করেন ও ঈশাখাঁ আত্মরক্ষার জন্য ত্রিবেণীর দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিলে কেদার রায় উক্ত দুর্গ আক্রমণ করিয়া খিজিরপুর লুণ্ঠন করেন। এদিকে যখন রণোন্মত্ত কেদার রায় স্বীয় অসীম শক্তি প্রভাবে ঈশাখাঁর দুর্গ ইত্যাদি বিধ্বস্ত করিয়া মুসলমানের ঘৃণিত প্রার্থনার উপযুক্ত প্রতিশোধ দিতে সক্ষম হইয়াছেন মনে করিয়া কথঞ্চিত আরাম অনুভব করিতেছিলেন, তখন ঈশাখাঁ ও এক বিশ্বাস ঘাতকের সহায়তায় কেদার রায়ের সর্ব্বনাশ সাধনে ব্রতী হইলেন।

শ্রীমন্ত খাঁ কেদার রায়ের অমাত্য ছিলেন, কিন্তু তাঁহাকে উপেক্ষা করিয়া এক সময়ে কেদার রায় কোটীশ্বরের দেবল ব্রাহ্মণকে গোষ্ঠিপতিত্ব প্রদান করেন, শ্রীমন্ত ইহার প্রতিকূলতাচরণ করে, কিন্তু পরিশেষে রাজাজ্ঞায় ঐ দেবল ব্রাহ্মণকে গোষ্ঠিপতি শ্রোত্রিয় বলিয়া মানিতে বাধ্য হন। এই ঘটনা হইতেই শ্রীমন্ত খাঁ হৃদয় মধ্যে এই রাজপরিবারের অনিষ্ট চিন্তা করিয়া আসিতে ছিলেন। এক্ষণে সুযোগ বুঝিয়া শ্রীমন্ত গোপনে ঈশাখাঁর সহিত সাক্ষাৎ করে, ঈশাখাঁ ও এই পামরকে পরম সমাদরের সহিত গ্রহণ করেন

ও বহু অর্থ পারিতোষিক প্রদানে শ্রীমন্ত খাঁকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করান যে, যে উপায়েই হউক সোণামণিকে আনিয়া আমার অঙ্কশায়িনী করিয়া দিতে হইবে। শ্রীমন্ত খাঁ উহাতে স্বীকৃত হয় এবং অত্যল্প কাল মধ্যেই বিশ্বাস-ঘাতকতা করিয়া স্বর্ণময়ীকে ঈশাখাঁর হস্তে অর্পণ করে। এতদুর কৌশলের সহিত এই ব্যাপার সম্পন্ন হইয়া ছিল যে চাঁদ কেদার রায় ইহার বিন্দু মাত্রও জানিতে পারেন নাই। কথিত আছে যে চাঁদরায় ঈশাখাঁ কর্ত্তৃক সোণামণির এইরূপে অপহরণ ব্যাপার অবগত হইয়া লজ্জায় ও অপমানে একেবারে শয্যাশায়ী হইয়া পড়েন এবং অত্যল্প কাল মধ্যেই কোটীশ্বরের পদ মূলে স্বীয় নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিয়া জগতের সর্ব্বপ্রকার গ্লানি হইতে উদ্ধার লাভ করেন।

চাঁদ রায়ের মৃত্যুর পরে কেদার রায় একাকী আপনার পরাক্রম প্রকাশে প্রবৃত্ত হ'ন, তিনি কেবল যে ঈশাখাঁর রাজ্য আক্রমণ করিয়া ক্ষান্ত হইলেন তাহা নহে—কেদার একেবারে মোগলের অধীনতা পাশ ছিন্ন করিয়া আপনাকে স্বাধীন নরপতি বলিয়া ঘোষণা করেন। মোগলেরা যখন পূর্ব্ববঙ্গ অধিকার করেন তখন তাহারা সরকার সোণার গাঁয়ের সহিত সনদ্বীপও মোগলসাম্রাজ্য ভুক্ত করিয়া লন। এক্ষণে কেদার রায় উহার পুনরুদ্ধারের জন্য কৃতসংকল্প হইলেন। সনদ্বীপের অধিকার লইয়া বাঙ্গালী, মগ, ফিরিঙ্গী ও মগের মধ্যে যে ঘোরতর যুদ্ধ হইয়াছিল তাহা বাঙ্গলার ইতিহাসে বিশেষ প্রসিদ্ধ। বীরশ্রেষ্ঠ কেদার রায় নৌযুদ্ধে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন, তাঁহার বহু কোষা (সেকালের রণতরী) ও নৌ সৈন্য ছিল, তিনি এ সকল সৈন্যও রণতরীর পরিচালনা জন্য কতকগুলি পর্টুগীজ ফিরিঙ্গীকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, উহাদের মধ্যে আবার কার্ভালিয়ন বা কার্ভালোই প্রধান ছিল। এই কার্ভালো ও তাহার সহযোগী মার্টিন নামক ফিরিঙ্গীর সাহায্যে কেদার রায় মোগল দিগের হস্ত হইতে সনদ্বীপ

উদ্ধার করিতে সমর্থ হন ও দুইবার পর্য্যন্ত আরাকান রাজকে পরাজিত করিয়া সনদ্বীপ নিজ অধিকার ভুক্ত রাখিতে পারিয়াছিলেন, কিন্তু পরিশেষে উহা আরাকান রাজের অধিকার ভুক্ত হয়। এই নৌ যুদ্ধ ১৬০২ খ্রীষ্টাব্দে ঘটিয়াছিল। *

যখন বিক্রমপুরে কেদাররায় এইরূপ ভাবে সর্ব্বত্র নিজ বাহুবল প্রকাশে কীর্ত্তি সঞ্চয় করিতেছিলেন, সে সময়ে আকবর বাদসাহের মৃত্যুর পর ১৬০৫ খ্রীষ্টাব্দে সেলিম জাহাঙ্গীর নাম ধারণ করিয়া দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। জাহাঙ্গীর পূর্ব্ব হইতেই বাঙ্গালার বারভূঞাগণের বীরত্ব কাহিনী জ্ঞাত ছিলেন, সিংহাসনারোহণের পর ক্রমশঃই তাহাদের উদ্ধত ব্যবহারের কথা শ্রবণে তিনি এ সকল বিদ্রোহী জমিদারগণের দমনার্থ অম্বরাধিপতি হিন্দু কুলাঙ্গার রাজা মানসিংহকে বাঙ্গলার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া ভূঞাদলের নির্ম্মূলার্থ প্রেরণ করিলেন।

মহারাজা মানসিংহ বাঙ্‌লা দেশে আসিয়াই প্রথমতঃ ভূঞাদলের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি করিবার চেষ্টা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, এ ভেদ ঘটাইতে তাঁহাকে বিশেষ কষ্টও পাইতে হয় নাই কারণ ভূঞাদল পূর্ব্ব হইতেই পরস্পরে পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ ভাব পোষণ করিয়া আসিতেছিলেন, যশোহরাধিপতি প্রতাপাদিত্যের সহিত তাঁহার জামাতা চন্দ্রদ্বীপের রাজা রামচন্দ্রের, রামচন্দ্রের সহিত ভুলুয়ার লক্ষ্মণ মাণিক্যের, বিক্রমপুরাধিপতি কেদারের সহিত খিজির পুরের ঈশাখাঁ মসনদ আলির মনোমালিন্য সুচতুর মানসিংহের নিকট অধিক কাল গুপ্ত রহিল না।

ইহার উপরে আবার ভবানন্দ মজুমদার ও শ্রীমন্ত খাঁ প্রভৃতি স্বদেশদ্রোহী কুলাঙ্গার গণ তাঁহার সহায়তায় নিযুক্ত হইল। এই কুলাঙ্গার দ্বয় কিরূপ ভাবে এবং কোন্ পথে সৈন্য পরিচালনা করিলে যুদ্ধ জয়ের সম্ভাবনা বেশী হইবে তৎসম্পর্কে মানসিংহকে পরামর্শ দিতে পশ্চাৎপদ

* See purcha's Pilrimes, fourth part Book V. P.51'5, 1625.

হইল না। মানসিংহ এইরূপ ভাবে সমুদয় গৃহ ছিদ্র অবগত হইয়া যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া ভৌমিক গণের নিকট দুত প্রেরণ করিলেন, ইহাতে এই ফল হইল যে অধিকাংশ ভৌমিক গণই ভয়ে বা প্রলোভনে মোগলের আধিপত্য স্বীকার করিল—কিন্তু কেবল দুই মহাপুরুষ হিমাদ্রির ন্যায় অটল চিত্তে স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার্থ প্রবৃত্ত হইলেন। প্রতাপের স্বাধীনতা ঘোষণার অব্যবহিত পরেই পদ্মার তটস্থিত বিক্রমপুরের রাজধানী কেদার রায়ের প্রিয়তম শ্রীপুর দুর্গশিরেও বিক্রমপুরের স্বাধীনতা ধ্বজা সেনরাজ-বংশের পতনের বহুকাল পরে পুনরায় গৌরবের সহিত উড্ডীয়মান হইল। জানিনা সেদিন বিক্রমপুরের ঘরে ঘরে কি আনন্দ কোলাহলই না জাগিয়া উঠিয়াছিল! বঙ্গের নর নারী সে শুভযোগে স্বাধীনতার মুক্ত আনন্দে হর্ষ বিহ্বল হইয়া উঠিল, সকলেই মৃত্যুকে তুচ্ছজ্ঞান এবং দেশের স্বাধীনতাই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম বোধে মোগল সৈন্যের গতিরোধার্থ উলঙ্গ কৃপাণ হস্তে প্রস্তুত হইতে লাগিল। হায়রে সে দিন!

যখন একে একে অন্যান্য ভৌমিকগণ মানসিংহের পদানত হইল, তখন মানসিংহ বুঝিতে পারিলেন যে বাঙ্গালার দুই দীপ্ত সূর্য্য প্রতাপ ও কেদারকে দমন না করিতে পারিলে তাঁহার সমুদয় চেষ্টা যত্নই বৃথা, যদি এই দুই বীর পুরুষকে পরাজিত করিতে না পারেন, তবে তাঁহার আর মোগলবাহিনী সহ দিল্লীতে ফিরিয়া যাইবার সুযোগ থাকিবেনা। রণ-কুশল মোগল সেনাপতি এইরূপ চিন্তা করিয়া প্রতাপাদিত্যকে আক্রমণ করিবার সুযোগ অনুসন্ধান করিতে আরম্ভ করিলেন এবং বিক্রমপুরাধি-পতি কেদার রায়কে পরাজিত করিবার নিমিত্ত স্থলপথে একদল সৈন্য, জনৈক উপযুক্ত সেনা নায়কের অধীন শ্রীপুরাভিমুখে প্রেরণ করি-লেন। মানসিংহের বিশ্বাস ছিল যে বাঙ্গালীকে দমন করা বিশেষ কঠিন হইবে না; তিনি জানিতেন না, কিংবা বুঝিতে পারেন নাই যে, কি দুর্জ্জয় শক্তির সহায়তায় প্রতাপ ও কেদার বাঙ্গালায় স্বাধীনতার

ধ্বজা উড্ডীন করিয়াছে। বাঙ্গালী যে বীরত্বে ক্ষত্রিয় বীরগণ হইতে কোনও প্রকারেই ন্যূন নহে এ বিশ্বাস তাহার মনে ছিল না। এ দিকে যখন নরাধম বঙ্গকুল কুলাঙ্গার ভবানন্দের সহায়তায় সেনাপতি মান বঙ্গের দীপ্ত স্বাধীনতা সূর্য্যকে অস্তমিত করিবার জন্য বহুদূর অগ্রসর হইয়াছেন, সে সময় সংবাদ পাইলেন যে তাঁহার প্রেরিত মোগল-বাহিনী বিক্রমপুরাধিপতির প্রবল আক্রমণ সহিতে না পারিয়া বহু হত, আহত ও রণে পৃষ্ঠ প্রদর্শনপূর্ব্বক পলায়ন করিয়াছে। এ সংবাদে মোগল সেনাপতির চমক ভাঙ্গিল, তিনি যত সহজে বাঙ্লা জয় করিবেন বলিয়া ভাবিয়াছিলেন, তাহা আর তত সহজ সাধ্য বলিয়া প্রতীয়মান হইল না। স্থলপথের পরাজয় ব্যাপারে জলযুদ্ধে বিক্রম-পুরাধিপতিকে পরাজিত ও বিধ্বস্ত করিবার সংকল্প করতঃ বিপুল আয়োজনের সহিত একশত রণতরী সাহসী ও নির্ভীক মোগলসৈন্য এবং সমর-বিদ্যা-বিশারদ সেনাপতি মন্দারায়কে তৎসঙ্গে প্রেরণ করিলেন। মানসিংহের প্রেরিত এই রণতরীসমূহ কেদার রায়ের গর্ব্ব এবং বিক্রমপুরের স্বাধীনতা হরণ করিবার উদ্দেশে অর্দ্ধচন্দ্র শোভিত পতাকা উড়াইয়া "আল্লাহো আক্‌বর" রবে পদ্মার উভয়তীর প্রতিধ্বনিত করিয়া বীরদর্পে শ্রীপুরের দিকে অগ্রসর হইল। মোগলের সহিত এই জলযুদ্ধে বঙ্গবীরগণ যে সাহস ও কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন—তাহা বিক্রমপুরবাসীর চির-গৌরবের বিষয়।

কেদার রায়, গুপ্তচর প্রমুখাৎ সমুদয় অবগত হইয়া গ্রামে গ্রামে চর পাঠাইয়া সৈন্য সংগ্রহে ও যুদ্ধের আবশ্যকীয় কর্ত্তব্য কার্য্য সাধনে ব্রতী হইলেন। স্বদেশভক্ত বীরের নিকট জীবন থাকিতে শত্রু হস্তে মাতৃভূমি তুলিয়া দেওয়া কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে! চারিদিক হইতে সহস্র সহস্র সৈন্য রাজধানী শ্রীপুরে সমবেত হইতে লাগিল—একটা বৈদ্যুতিক-তেজ-স্ফুরণ জনিত শক্তি নির্জীব নরনারীর বাহুতেও শক্তি সঞ্চার করিয়া-

দিল। কেদার রায়ের কোষা (রণতরী) সমূহ বঙ্গীয় সৈনিকবৃন্দে সুশোভিত হইয়া মধুরায় ও কার্ভালো এই দুই বীরেন্দ্র সেনাপতির নেতৃত্বাধীনে মোগল সৈন্যের প্রতীক্ষায় প্রস্তুত হইয়া রহিল।

কালো জলে কালো ঢেউ তুলিয়া আজ যেমন মেঘনাদ (মেঘনা) নদ বিক্রমপুরের পূর্ব্ব প্রান্ত ধৌত করিয়া প্রতি তরঙ্গ উচ্ছ্বাসে অধীনতা-নিগড়-বদ্ধ-হৃদয়ের সুতীব্র লাঞ্ছনায় বিষময় যন্ত্রণা ব্যক্ত করিতেছে, তেমনি সে একদিন উদ্দাম যৌবনের পুলকচাঞ্চল্যে স্বাধীনতার গৌরবময় হর্ষে আনন্দ সঙ্গীত গাহিয়াছিল, কিন্তু সেদিন এখন কোথায়? তাহার এই সুবিশাল বক্ষে একদিন যে সমরলীলা সংঘটিত হইয়াছিল, নির্ভীক হৃদয় বঙ্গবীরগণ যে বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন, কালো জলে মোগল বাহিনীর লোহিত শোণিতে করালবদনী রণরঙ্গিনীর যে ভীষণামূর্ত্তির বিকাশ পাইয়াছিল, সেই লোহিত আভা সেই ভৈরব-গর্জ্জন-রব—সেই ফেণিলোজ্জ্বল তরঙ্গরাশির অট্টহাসি এখনও যেন কাণে বাজিতেছে—এখনও যেন সুদূর অতীতের বঙ্গবীরগণের সহস্র কণ্ঠোচ্চারিত রণজয়ের আনন্দ-কোলাহল দিকে দিকে জাগিয়া উঠিতেছে!

চিরদিনই কি বাঙ্গালী ভীরু কাপুরুষ বলিয়া ঘৃণিত ছিল? সত্য সত্যই কি তাহারা কামান ভেরীর প্রবল নিনাদে, অসির ঝনঝনায় ও রণবাদ্যের প্রবল নির্ঘোষে ভীত চকিত হৃদয়ে প্রেয়সীর অঞ্চল ছায়ায় লুকাইতে চাহিত? তাহারা কি একদিন মাতৃভূমির হিতার্থে—প্রাণ-প্রিয়তম জন্মভূমির স্বাধীনতা রক্ষার্থ যুদ্ধস্থলে আত্মবিসর্জ্জন করিতে অগ্রসর হয় নাই? তাহারা কি রাজপুতদিগের ন্যায় জীবনকে তুচ্ছ ও মৃত্যুকে অমৃত জ্ঞানে অতুল সমৃদ্ধিশালী মোগল-পাঠানের সহিত যুদ্ধ করিতে যায় নাই? পাঠক! একবার অতীত ইতিহাস আলোচনা কর, দেখিবে তোমরা কি ছিলে কি হইয়াছ—দেখিবে তোমরা কোন্

উচ্চ শিখর হইতে অবনতির গাঢ়তম অন্ধকারাচ্ছন্ন গহ্বরে নিপতিত হইয়াছ—তখন হৃদয়ে এক গৌরবময় বৈদ্যুতিক শক্তির সঞ্চালন অনুভব করিয়া শিহরিয়া উঠিবে, ভাবিবে আমরা কি সেই বাঙ্গালী ? বর্ত্তমান সময়ে আমরা যেমন দীন দরিদ্র ও বাহুবল হীন এবং দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত কঙ্কালসার দেহে জীবন যাপন করি, আমাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা সেরূপ ছিলেন না। তাঁহাদের বাহুতে বল ছিল, হৃদয়ে সাহস ছিল, তরবারির ভীষণ আঘাতে শত্রুর মুণ্ড ছিন্ন করিবার শক্তি সামর্থ্যও ছিল। তখনকার বাঙ্গালী ভীরুতা কি তাহা জানিত না—বিলাস ব্যসনাশক্ত তাহারা ছিল না—দুর্ভিক্ষ ও অন্নকষ্ট কি তাহা তাহারা কল্পনাও করিতে পারিত না। তখন একদিকে যেমন শস্য শ্যামলা সোণার বাঙ্‌লার ক্ষেতে ক্ষেতে সোণা ফলিত, তদ্রূপ বীর্য্যবতী বঙ্গনারীগণও বীরকুমারই প্রসব করিতেন ; সে সময়ে শান্তি, সুখ, ধীরত্ব ও বীরত্ব সম্মিলিত ভাবে বঙ্গের কুটীরে কুটীরে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল।

ওদিকে দেখিতে দেখিতে মানসিংহের একশত রণতরী তীরবেগে আসিয়া মেঘনার উপকূলে উপনীত হইল—শ্রীপুর নগরী বিধ্বস্ত করিয়া যাওয়াই মানসিংহের আদেশ ছিল। বৈশাখের মধ্যভাগে বাঙ্গালীও মোগলে তুমুল যুদ্ধ বাধিল। সেদিন নীল মেঘাবৃত গগনতলে প্রচণ্ড বায়ুর তীব্র আস্ফালনে, মেঘনা প্রবল উচ্ছ্বাসে বহিয়া যাইতেছিল, আকাশে থাকিয়া থাকিয়া বিদ্যুৎ ঝলকিতেছিল,—সেই প্রকৃতির ভীষণ বিপ্লবের মধ্যে মেঘ ও কামানের গর্জ্জনে বাঙ্গালী ও মোগলে ভীষণ সংগ্রাম চলিতে লাগিল। একদিকে স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার্থ বঙ্গবীরগণ প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে রণরঙ্গে মাতিয়াছে—অপরদিকে বাহুবল দৃপ্ত দিগ্বিজয়ী মোগল সেনানী, একদিকে স্বার্থ, ঐশ্বর্য্য ও সুখের বিশ্বগ্রাসী কামনা, অন্যদিকে হৃদয়ের তপ্তশোণিত দানে স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার্থ

মেঘনার উপকূলে কেদারের সহিত মোগলের নৌযুদ্ধ।

মৃত্যুবাসনা; সে বাসনায় স্বার্থ নাই—মোহ নাই—একমাত্র আছে স্বাধীনা বঙ্গজননীর কল্যাণময়ীমূর্ত্তির শ্রীচরণ সেবা।

ভৈরব রবে যুদ্ধ চলিতে লাগিল—মেঘনার তরঙ্গ ভঙ্গে সে প্রলয় তাণ্ডবে রণতরী নাচিতে নাচিতে উভয় পক্ষ উভয় পক্ষের নিকট হইতেও নিকটতর হইতে লাগিল। "আল্লাহো অক্‌বর" ও 'জয়মা কালী' ধ্বনি সুদূর দিগন্তে প্রতিধ্বনিত হইল। তীরে উৎসুক নরনারী ব্যাকুল হৃদয়ে দেশের মঙ্গল প্রার্থনা করিতেছে। বিক্রমপুর কি তাহার বিক্রম রক্ষা করিতে পারিবে না? কেদার কি তাঁহার মাতৃভূমি রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে না? বাঙ্গালীর বাহুতে কি বল অন্তর্হিত হইয়াছে? সত্য সত্যই কি দেশ বীরশূন্য হইয়াছে? অইশোন, চতুর্দ্দিকে প্রলয়-মন্দ্রে ধ্বনিত হইতেছে—কথনই না! কেদারকে যে আজ তাঁহার গুরুদেব সিদ্ধ সাধক গোসাঞি ভট্টাচার্য্য দেবী ছিন্নমস্তার আশীর্ব্বাদী বিল্বপত্র দিয়া বলিয়াছেন, 'যাও বৎস, ভয় নাই—মায়ের বরে তুমি নির্ব্বিঘ্নে রণজয়ী হইবে,—মোগলবাহিনীর কি সাধ্য যে তোমায় পরাজিত করে?" তেজস্বী ব্রাহ্মণ সন্তানের ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যা হইবে এও কি কখন সম্ভব? কখন নহে—কখন নহে। সেই দিন সেই ভীষণ সমরে, মেঘনার সেই ভয়ঙ্কর জল যুদ্ধে মোগল সৈন্য পরাজিত হইল। বিজয়োন্মত্ত বঙ্গসৈন্যের প্রবল আক্রমণ তাহারা রোধ করিতে সমর্থ হইল না—একে একে মোগল রণতরী মেঘনা-বক্ষে নিমজ্জিত হইল। "জয় বাঙ্গালীর জয়" "জয় কেদারের জয়" রব কেন্দ্রে কেন্দ্রে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল, মেঘনার তরঙ্গ উচ্ছ্বাসে, জীমূতের প্রবল মন্দ্রে, বাতাসের উন্মত্ত রোলে বিক্রমপুরাধিপতির বিজয় বার্ত্তা সুদূর সীমান্তে গিয়া পঁহুছিল। (১)

(১) * * * Cadry lord of the place, where he was suddenly assaulted with one hundred cosses, sent by Mansinga, Governor under the Mogal, who having subjected that tract to his master

বীরেন্দ্র মধুরায় এই ভীষণ যুদ্ধে বিশেষ বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। মধুরায় স্বকীয় বীরত্বের জন্য মুকুটরায় নামে অভিহিত হইতেন, সেকালে এইরূপ মুকুট রায় উপাধি বিশেষ গৌরবব্যঞ্জক ছিল। (২) বিক্রমপুরে অদ্যাপি মধুমুকুট রায়ের প্রাচীন স্মৃতি চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। মুকুট রায় যে স্থানে স্বীয় বাসস্থান (রাজধানী) নির্ম্মাণ করেন তাহা এখনও মুকুটপুর (মটুকপুর) নামে কথিত হইয়া আসিতেছে, তাঁহার খনিত দীর্ঘিকা সমূহ এবং প্রায় ৮০হাত প্রশস্ত পদ্মাতীর পর্য্যন্ত রাস্তা বিদ্যমান থাকিয়া মুকুট পুরের দীঘী ও দরজা নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে। বিক্রমপুরস্থ (বর্ত্তমান উত্তর বিক্রমপুরের) ধীপুর ও রাউতভোগ গ্রামের প্রান্তভাগে যে সুরক্ষিত "দেউল বাড়ীর" ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়, উহাই তাঁহার বাটীর অন্তঃপুর ছিল বলিয়া অনুমিত হয়। ঐ বাটীর চতুর্দ্দিকে যে বিস্তৃত গড় খনিত হইয়াছিল, উহা এখনও "দেউল গড়" নামে সাধারণের নিকট পরিচিত। এই দেউল বাড়ীর পূর্ব্ব উত্তর দিকে যে দু'টি অব্যবহার্য্য দীঘী আছে, তাহাতে সময় সময় কারুকার্য্যবিশিষ্ট, চৌকাট, কবাট ও অন্যান্য অনেক প্রাচীন জিনিষ পাওয়া যায়। অনুসন্ধান করিলে যে আরও পাওয়া যাইবে না, তাহা কে বলিতে পারে? মধুমুকুট রায়ের কোনও বংশধর অদ্যাপি বর্ত্তমান আছেন কি না, তাহার কোন পরিচয় পাই নাই; তবে

মধুরায় ও মুকুট পুর।

---

sent forth this Navie against Cadry. Mandary a man famous in these parts being Admiral; where after a bloudie fight Mandry was slain.

(Parch's Pilgrims Pt. IV. BK. V. P. 513)

(২) এই মধুমুকুট রায়ের সহিত বর্দ্ধমান জেলার জাহাঙ্গীরাবাদ পরগণাভুক্ত পূর্ব্বস্থলী গ্রামনিবাসী বৈদিক ব্রাহ্মণ মুকুট রায়ের কোন সংস্রব নাই।

তাঁহার জ্ঞাতি ও দেওয়ান শ্রীপতি রায়ের অধস্তন দশম পুরুষ রাউতভোগ গ্রামে "দে-সরকার" নামে পরিচিত হইয়া আসিতেছেন। এই শ্রীপতি রায়ের তৃতীয় পুরুষ শ্রীরূপ রায় নবাবের কর্ম্মচারী ছিলেন এবং বিশ্বাস উপাধি প্রাপ্ত হ'ন—ইহাঁরা বহুদিন হইতেই রাউতভোগ গ্রাম বাসী। মধুরায়ের বাড়ীর দ্বার পণ্ডিত যোগেশ্বর চক্রবর্ত্তীর বংশধরগণও অদ্যাপি জীবিত আছেন। এই জলযুদ্ধে কেদার রায়ের পর্ত্তুগীজ সেনাপতি কার্ভালো শরবিদ্ধ হইয়াও বিশেষ বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। জলযুদ্ধে বাঙ্গালীর এইরূপ বীরত্ব অন্য কোথাও প্রদর্শিত হইয়াছে কি না জানি না। বৈদেশিক ঐতিহাসিকেরাও স্বীয় স্বীয় গ্রন্থে এই যুদ্ধের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন।

বংশ পরম্পরায় এই সমর-কাহিনী নানা প্রকার কল্পনার বর্ণ-বিচিত্রতার সহিত বিক্রমপুরের পল্লীবৃদ্ধেরা গল্প করিয়া থাকেন। স্বয়ং দেবী ভগবতী আসিয়া কেদারের সহায়তা করিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহাদের বিশ্বাস।

সে দিন মেঘনার চঞ্চল বক্ষোপরি তরঙ্গের উন্মত্ত নর্ত্তন দর্শনে আমার এ অতীত কাহিনী মনে পড়িয়া অলক্ষ্যে একবিন্দু তপ্তাশ্রু পতিত হইল; শ্মশান বিক্রমপুরে এখন কি আছে? সেই গর্ব্ব সেই বীরত্ব-সেই একতা সেই মহত্ব এখন বিচ্ছিন্ন ও লুণ্ঠিত।

নৌযুদ্ধের এই পরাজয় কাহিনী মানসিংহের নিকট পহুঁছিলে তিনি কেদার রায়কে বিধ্বস্ত করিবার জন্য কৃতসংকল্প হইলেন এবং ১৬০৬ খৃষ্টাব্দের যুদ্ধে প্রতাপাদিত্যকে পরাজিত করিলেন, হায়! প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও প্রতাপ বাঙ্গলার স্বাধীনতা রক্ষা করিতে সমর্থ হইলেন না। প্রতাপের পরে মুকুন্দ রায়ের রাজধানী ভূষণা নগরী বিধ্বস্ত ও হস্তগত করিয়া মোগল সেনাপতি মোগল-বাহিনী সহ বিক্রমপুরে আগমন করেন। কথিত আছে যে মানসিংহ শ্রীপুরের সন্নিকটবর্ত্তী স্থানে শিবির সংস্থাপন

করিয়া যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্বে কতিপয় দূত সহ তরবারি, শৃঙ্খল ও একখানা লিপি প্রদান করেন, ঐ লিপিতে এইরূপ লেখা ছিল :—

"ত্রিপুর মঘ বাঙ্গালী কাককুলী চাকালী,
সকল পুরুষ মেতৎ ভাগি যাও পালায়ী,
হয়-গজ-নর-নৌকা কম্পিতা বঙ্গভূমি
বিষম-সমর সিংহো মানসিংহঃ প্রযাতি ॥"

কেদার রায় মানসিংহের মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া তরবারি খানা গ্রহণ করেন এবং শৃঙ্খল দূতদিগের নিকট প্রত্যর্পণান্তর তদীয় পত্রের নিম্নলিখিতরূপ উত্তর লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন :—

"ভিনত্তি নিত্যং করিরাজ কুম্ভং
বিভর্ত্তি বেগং পবনাতিরেকং।
করোতি বাসং গিরিরাজ শৃঙ্গে
তথাপি সিংহঃ পশুরেব নান্যঃ ॥"

মানসিংহ কেদার রায়ের নিকট হইতে এইরূপ উত্তর পাওয়া মাত্র তৎক্ষণাৎ শ্রীপুর নগরী অবরোধ করিবার জন্য একদল সৈন্য প্রেরণ করিলেন, সেই সময়ে কেদারের অধীনে ৫০০ শত রণতরী ছিল। কামানের প্রলয় গর্জ্জনে—উভয় পক্ষের ঘোরতর অগ্নি ক্রীড়ায় ভীষণ সমরাভিনয় চলিতে আরম্ভ করিল—নয় দিবস পর্য্যন্ত তুমুল যুদ্ধ চলিল কিন্তু কোন পক্ষেরই জয় পরাজয় হইল না—কেদার রায়ের অদ্ভুত বীরত্ব দর্শনে মানসিংহ বিস্মিত হইয়া গিয়াছিলেন, বাঙ্গালীর বাহুতে যে এত বল—বাঙ্গালী যে আপনার মাতৃভূমিকে স্বর্গাদপি গরীয়সী বলিয়া বিবেচনা করে—ক্ষত্রকুল কলঙ্ক মোগলের পাদুকাবাহী মানসিংহের নিকট তাহা আশ্চর্য্য বলিয়া বোধ হইয়াছিল। দেশীয় প্রবাদানুযায়ী জানিতে পারা যায় যে, অবশেষে বিশ্বাসঘাতক শ্রীমন্ত খাঁর সহায়তায় গুপ্ত ঘাতকের সাহায্যে কেদারকে হত্যা করিয়া মানসিংহ বিক্রমপুরজয়ে সমর্থ

হইয়াছিলেন। যদি কুলাঙ্গার দেশদ্রোহীগণ শত্রুর পক্ষাবলম্বন না করিত তাহা হইলে যে বাঙ্লার ইতিহাস বিভিন্ন বর্ণে চিত্রিত হইত না তাহা কে বলিতে পারে? নয় দিবস পর্য্যন্ত ভীষণ যুদ্ধ করিয়া দশম দিবসে কেদার রায় স্বীয় ইষ্টদেবী দশমহাবিদ্যার মন্দিরে প্রবেশ করিয়া চক্ষু মুদ্রিত করতঃ যখন দেবীর ধ্যানে মগ্ন ছিলেন, তখন সেই ধ্যান পরায়ণ মহাবীরকে মোগল পক্ষীয় গুপ্ত ঘাতক দ্বারা শাণিত তরবারির আঘাতে দ্বিখণ্ডিত করিয়া ফেলিল। ঐতিহাসিকগণ বলেন যে উভয় পক্ষে ঘোরতর অগ্নিক্রীড়ার পর কেদার রায় আহত হইয়া মোগল হস্তে বন্দী হন, এবং মানসিংহের নিকট নীত হইবার অব্যবহিত পরেই তাঁহার প্রাণ বিয়োগ হয়। আমাদের নিকটও ইহাই প্রকৃত বলিয়া অনুমিত হয়। * কেদার রায় বীরত্বে প্রতাপাদিত্য অপেক্ষা কোন অংশেই নিকৃষ্ট ছিলেন না, বরং নৌযুদ্ধে তিনি তাহা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ ছিলেন। (১) বাঙ্গালী যে এককালে বাহুবলে কতদূর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়া-

---

* Raja Mansingh + * * turned his attention towards Kaid Rai of Bengal, who has collected nearly 500 vessels of war and had laid seige to Kilmak the imperial Commander in Srinagur. Kilmak held out, till a body of troops was sent to his aid by the Raja. These finally over came the enemy, and after a furious cannonade took Kaid Rai prisoner, who died of his wounds soon after he was brought before the Raja." (Elliot's History of India VOL. VI. Inayatulla's Takmilla? Akbar nama—P. 111) এই ভীষণ যুদ্ধে মোগল সেনাপতি কিলমক্ কেদার রায় কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হইয়া শ্রীনগরে অবস্থিতি করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ফতেজঙ্গপুর নামক স্থানে এই রণাভিনয় হইয়াছিল।

(১) প্রবীণ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত আনন্দনাথ রায় বলেন যে "বারভূঞাগণের মধ্যে যদি কাহাকেও সর্ব্বপ্রথম আসন প্রদান করা কর্ত্তব্য হয়, আমাদের বিবেচনায় তবে তাহা

ছিল প্রতাপ ও কেদার এই দুই মহাপুরুষের জীবনী পর্য্যালোচনা করিলে তাহা আমরা সুস্পষ্টই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি। প্রতাপাদিত্যের জীবনীকার রামরাম বসু ও সত্যচরণ শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন যে, প্রতাপাদিত্য কেদার রায়কে পরাজিত করিয়াছিলেন—কিন্তু আমরা এ সম্বন্ধে কোনও প্রমাণই পাইলাম না। বোধ হয় প্রতাপের বীরত্বের সর্ব্ব প্রকার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনার্থই উক্ত লেখকগণ ঐরূপ উক্তি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

চাঁদরায় ও কেদার রায় ভ্রাতৃদ্বয়ের শাসন প্রভাবে বিক্রমপুরের বহু উন্নতি সংসাধিত হইয়াছিল। ইহাঁরা দে উপাধিধারী বঙ্গজ কায়স্থ ছিলেন। কুলীন না হইলেও তাঁহারা বিক্রমপুর সমাজের গোষ্ঠীপতি ছিলেন—এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ইহাঁদের যেমন সম্মান ও প্রতিপত্তি ছিল, সমাজে ও সম্মান, প্রতিষ্ঠায় তাহা অপেক্ষা ন্যূন ছিল না। রায় রাজগণ কর্ত্তৃক বহু ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কুলীন কায়স্থ বিক্রমপুরে আনীত হইয়াছিল—কুলীন কায়স্থগণের মধ্যে মালখানগরের বসুগণ, রায়াস বরের (শ্রীনগরের) গুহ মুস্তফি-নীবার ঘোষ এবং কাঠালিয়ার দত্তগণ আনীত হন—ইহারা সাড়ে তিন ঘর কুলীন বলিয়া কথিত। (২) শ্রীযুক্ত আনন্দ নাথ রায় বলেন যে "যশোহরের কায়স্থ সমাজ, বিক্রম-পুরের সমাজ স্থাপনের পরে সংগঠিত হয়। মালখানগর নিবাসী

বিক্রমপুরের কেদার রায়েরই প্রাপ্য। ঈশাখাঁ মসনদ আলি সর্ব্বপ্রধান ছিলেন বটে, কিন্তু পরিণামে তিনিও মোগল পতাকামূলে মস্তক অবনত করিতে বাধ্য হইলেন। অধিকাংশই তৎপথাবলম্বন করেন, করিলেন না কেবল তিনটি মহাপ্রাণ; বিক্রমপুরের কেদাররায়, ভূষণার মুকুন্দ রায় ও যশোহরের প্রতাপাদিত্য। (ঐতিহাসিক চিত্র ১৩১২ বৈশাখ বীরকাহিনী নামক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)।

(২) বসু, গুহ, ঘোষ এই তিন ঘর পূর্ণ কুলীন আর দত্ত অর্দ্ধঘর কুলীন ধরিয়া সাড়ে তিন ঘর কুলীন কথিত হইয়া থাকে।

যদুনন্দন বসু, বসন্ত রায় কর্ত্তৃক নীত হইয়া, যশোহরের অন্তর্গত মঙ্গল পাড়া গ্রামে প্রচুর বৃত্তি সহ বাস করিতে থাকেন। মালখানগর নিবাসী বাসুদেব ও রঘুনাথ বসু এইরূপে যশোহরের রাজাদের বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া স্বদেশ পরিত্যাগ করতঃ যশোহরের অন্তর্গত খোরগাছি ও শ্রীপুর গ্রামে বাস করেন। এই সূত্রে বলা যাইতে পারে, যশোহর কায়স্থ সমাজ প্রতিষ্ঠাতা, রাজা বিক্রমাদিত্য ও বসন্ত রায়, বিক্রমপুরের রায় রাজগণের সাহায্যেই এইরূপে বিক্রমপুর হইতে কুলীন উঠাইয়া লইতে সমর্থ হইয়াছিলেন।”

বিক্রমপুরে এই সুবিখ্যাত রায় বংশের বহু কীর্ত্তি বিদ্যমান ছিল—এখনও কিছু কিছু বিদ্যমান থাকিয়া বিক্রমপুরের বিক্রম এই ভ্রাতৃ-দ্বয়ের অপূর্ব্ব স্বদেশ প্রীতি ও দেশব্যাপী বীরত্বের গৌরব-গরিমা প্রকাশ করিতেছে। আমরা এখানে তাঁহাদের কীর্ত্তি ও কার্য্যকলাপের

বিক্রমপুরে চাঁদ ও কেদার রায়ের কীর্ত্তি।

যে যে ভগ্নাংশ অদ্যাপি কঙ্কাল দেহে বিরাজ-মান থাকিয়া, জনসাধারণের হৃদয়ে প্রাচীন লুপ্ত স্মৃতি তড়িৎ প্রবাহের ন্যায় সঞ্চার করিয়া দিতেছে তাহার বিবরণ বিবৃত করিলাম। পূর্ব্বে বিক্রমপুরের মধ্য দিয়া এক নির্ম্মলসলিলা স্রোতস্বিনী প্রবাহিত ছিল তাহার নাম কালীগঙ্গা; কালীগঙ্গা বিক্রমপুরের নানাস্থানে নানা নামে অভিহিত হইত। কোথাও ইহার নাম ছিল কাথারিয়া; কোথাও বা কালীগঙ্গাই কহিত। এই কালীগঙ্গার তটদেশেই চাঁদরায়ের ও কেদার রায়ের অতি প্রিয়তম শ্রীপুর নগরী বিরাজিত ছিল। সে সময়ে ফেনিল স্রোত-ধারা বুকে

শ্রীপুর।

লইয়া তরঙ্গের ভীষণ ব্যাকুল আরাবে চতুর্দ্দিক প্রকম্পিত করতঃ কীর্ত্তিনাশা নদী প্রবাহিত হইত না,—কীর্ত্তিনাশা নামক কোন নদীর অস্তিত্ব ও তখন ছিলনা। নির্ম্মলসলিলা কালীগঙ্গার তটে সৌধরাজি সমাকীর্ণ শ্রীপুর

সে সময়ে ইন্দ্রপুরীর ন্যায় প্রতীয়মান হইত। এখানে সুন্দর ও সুবিশাল কারুকার্য্য সম্পন্ন রাজপ্রাসাদ, সৈনিকবাস, বিচারার্থ বিবিধ বিচারালয়, কারাগার, কোষাগার, সুপ্রশস্ত ও শ্রেণীবদ্ধ তরুরাজি-পরিশোভিত রাজপথ এবং কোটীশ্বর নামক পল্লীতে নানাবিধ সুন্দর সুন্দর দেব-মন্দির শ্রেণী শ্যামল বনস্পতি সমূহের মাথার উপর দিয়া উচ্চ শীর্ষে দূরাগত পথিককে রাজকীয় গৌরব বৈভবের পরিচয় দিত। কথিত আছে যে কোটীশ্বর নামক শিবলিঙ্গের বেদীমূলে এক ক্রোর টাকা প্রোথিত করিয়া উহা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়া ইহার নাম কোটীশ্বর হয় এবং এই দেবপল্লী উক্ত নামে খ্যাত হইয়া পড়ে। এই কোটীশ্বর পল্লীতে দশমহাবিদ্যা এবং স্বর্ণনির্ম্মিত দশভুজা দুর্গা মূর্ত্তিও প্রতিষ্ঠাপিত ছিল। দুর্গামূর্ত্তিকে জন সাধারণে স্বর্ণময়ী নামে অভিহিত করিত। কিন্তু হায়! পদ্মার প্রবল তরঙ্গাভিঘাতে বর্ত্তমান সময়ে তাহাদের কোন চিহ্নই নাই। (১) আর কি স্বাধীনতার লীলাক্ষেত্র, আত্মত্যাগের পবিত্র ভূমি বিক্রমপুরের মুকুট মণি শ্রীপুর নগরী কাহারো দৃষ্টিপথে পতিত হইবে! কেদার রায় ও চাঁদরায়ের কীর্ত্তি ধ্বংস করিয়াই পদ্মা কীর্ত্তিনাশা এই অপনাম লাভ করে। সার্জ্জন জেম্‌সটেলার সাহেব তাঁহার Topography of Dacca নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন "The first of these channels, which is represented as the Calliganga in Rennel's maps, is now called Kirtinessa, or Sireepur river. It runs a little to the north of Rajnagur and Molfutgange and is considered to be the principal

(১) The city on the opposite side of the Megna was not senergong, but seripore which stood in Bickrampore, and was destroyed by the Kirtinasa (Taylor's Topography of Dacca P. 108.)
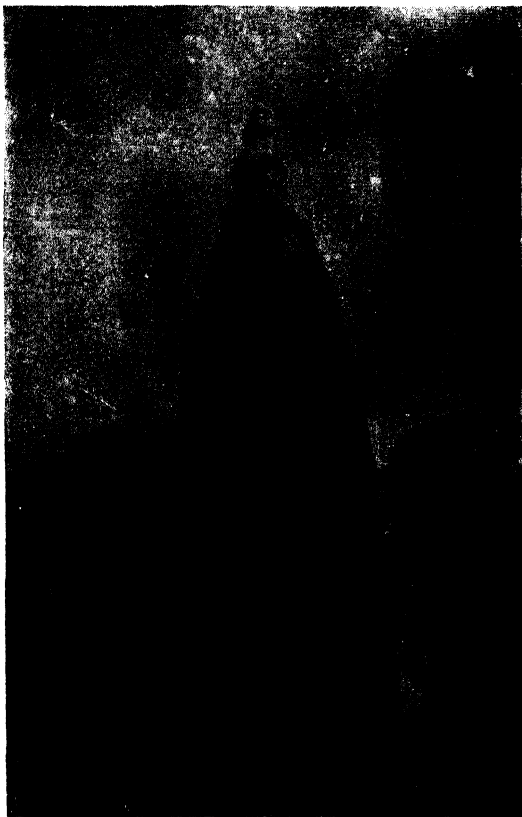
রাজাবাড়ীর মঠ।

branch of the Ganges." টেলার সাহেবের গ্রন্থ ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছিল, অতএব আমরা দেখিতেছি যে ৬৮ বৎসর পূর্ব্ব হইতেই কায়স্থ বংশীয় এই জমিদার ভ্রাতৃদ্বয়ের কীর্ত্তি ধ্বংস করিয়া ইহা কীর্ত্তিনাশা নাম ধারণ করিয়া আসিতেছে। ভট্ট কাবরা এখনও বিক্রমপুরের গ্রামে গ্রামে পর্ব্বোপলক্ষে গাহিয়া থাকেন—

"চাঁদ কেদার রায়ের কীর্ত্তি চমৎকার
ভেঙ্গে নিল কোটীশ্বর,
গোবিন্দ মঙ্গল, . সোণার দেউল
থাকুটিয়াদি গ্রাম বহুতর।"

শ্রীপুর সম্বন্ধে আর বেশী কোন কথা বলা অনাবশ্যক, কারণ সেখানকার এমন কোন ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান নাই, যাহা দর্শকের দৃষ্টিপথে পতিত হইতে পারে। এই বিখ্যাত রায় বংশের যে কয়টী ক্ষীণ কীর্ত্তিরেখা অদ্যাপি জীবিত থাকিয়া তাঁহাদের নাম স্মরণ করাইয়া দেয়, তন্মধ্যে রাজাবাড়ীর মঠ, কেদার বাড়ী, কেদার মার দীঘী এবং কাঁচকীর দরোজাই প্রধান। এ কয়টির মধ্যে আবার রাজাবাড়ীর মঠই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গৌরবময় কীর্ত্তি স্তম্ভ। যাঁহারা পদ্মা বক্ষে গোয়ালন্দ, ঢাকা কিংবা

রাজাবাড়ীর মঠ।

চাঁদপুরের দিকে যাতায়াত করিয়াছেন তাঁহারা নিশ্চয়ই এই মঠটিকে দর্শন করিয়াছেন। বহুদূর হইতেই ইহা দৃষ্টিপথে পতিত হয়। বিক্রমপুরের আর কোথাও এতাদৃশ প্রাচীন কীর্ত্তি বিদ্যমান নাই। উত্তাল তরঙ্গময়ী ভয়ঙ্করী পদ্মা এখন ইহার অতি অল্প দূর দিয়া খরবেগে প্রবাহিতা। শীঘ্রই যে রায়বংশের এই শেষ কীর্ত্তিচিহ্নও সর্ব্বগ্রাসিনীর কুক্ষিগত হইবে ইহা নিঃসন্দেহ। এই মঠের নির্ম্মাণ সম্বন্ধে কয়েকটি কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। (১) কেদার রায় মাতৃশ্মশানোপরি এই মঠ নির্ম্মাণ করিয়া বলিলেন যে "এতদিনে মাতৃদায় হইতে উদ্ধার পাইলাম।" একথা তাঁহার মুখ

হইতে উচ্চারিত হইবামাত্রেই ভীষণ শব্দে মঠের চূড়া ভাঙ্গিয়া ভূমিতলে পতিত হইল। হায়! যাঁহার স্নেহের ঋণ শোধ করিবার ক্ষমতা কাহারো জগতে নাই, সেই স্নেহশালিনী জননীর শ্মশানোপরি মঠ নির্ম্মাণ করিলেই কি তাঁহার স্নেহ-ঋণ শোধ হইতে পারে? এই উক্তির মধ্যে যে কোন প্রকার সত্য নিহিত আছে, তাহা আমাদের মনে হয় না, তবে অতি শৈশব হইতে বৃদ্ধদের নিকট নানা অলঙ্কারের সহিত আমরা এই জনপ্রবাদ শুনিয়া আসিতেছি।

(২) দ্বিতীয় কিম্বদন্তী এই যে স্থপতি বহু বৎসর পর্য্যন্ত মঠের কার্য্য করিয়া অন্যান্য অংশ যেরূপ সুন্দর করিতে সক্ষম হইল, শীর্ষ দেশ কিছুতেই সেইরূপ মানান সই করিয়া উঠিতে পারিল না। যেরূপ ভাবে চূড়া নির্ম্মিত হইলে মঠের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি পাইত, সেইরূপ না হওয়ায় কেদার রায় স্থপতিকে ভর্ৎসনা করিলেন ও প্রাণদণ্ডের ভয় দেখাইলেন। স্থপতি ভাবিল যে, কিছুতেই যখন আমা দ্বারা ইহা অপেক্ষা সুন্দর চূড়া হইবে না, তখন এক রকমে না এক রকমে আমার প্রাণ যাইবেই যাইবে, যখন মরিতেই বসিয়াছি তখন একটা অনিষ্ট করিয়াই যাই। মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া স্থপতি কেদার রায়কে কহিল "মহারাজ! আপনি আদেশ করিলে আমি পুনরায় মঠের সংস্কার কার্য্যে প্রবৃত্ত হই।" কেদার রায় তাহাকে অনুমতি দিলেন, স্থপতিও স্বকীয় উদ্দেশ্য সাধনার্থ মঠের উপর আরোহণ করিয়া উহার চূড়া ভগ্ন করিয়া সেই সঙ্গে নিম্নে পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। অই ভগ্ন চূড়ার আর সংস্কার হইল না। প্রকৃত পক্ষেই রাজাবাড়ীর মঠের চূড়া ছিল না, আমাদের বিশ্বাস যে কেদার রায় যুদ্ধ বিগ্রহে পতিত হইয়া যথা সময়ে মন্দিরের কার্য্য শেষ করাইতে না পারায় পল্লীবৃদ্ধগণের উর্ব্বর মস্তিষ্ক হইতে এইরূপ নানা গল্পের সৃষ্টি হইয়াছে। এ সকলের যথার্থতা নিরূপণ করা সুকঠিন। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে ভাগ্যকূলের সুনামধন্য রাজা

শ্রীনাথ রায়ের অর্থানুকূল্যে এই মঠটির সংস্কার এবং ইহার উপরের চূড়া নির্ম্মিত হইয়াছে। সংস্কারের পর ইহার দ্বারের উপরিভাগে যে খোদিত প্রস্তর ফলক স্থাপিত হইয়াছে পাঠকবর্গের কৌতূহল তৃপ্তির জন্য আমরা এখানে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। তাহা এই—

This structure being an Ancient and sacred Hindu Monument and a valuable land mark for the District. Erected by Chand Ray and Kedar Ray over the funeral pyre of their mother in the sixteenth century was repaired in 1896 at the cost of Raja Sree Nath Ray of Bhagyakul by Babu Sashi Bhusan Mitter District Engineer under the order of C. J. S. Foulder Esq, collector of Dacca.

কেহ কেহ বলেন যে পূর্ব্বে এই স্থানে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত ছিল; 'বিশ্বকোষের' নগেন্দ্রবাবুও ইহাকে শিবালয় নামে অভিহিত করিয়াছেন— আমরা কিন্তু এ উক্তির কোনও সত্যাসত্যের প্রমাণ পাই নাই। সে যাহাই হউক এই বৃহৎ ও সুন্দর মঠটি যে বিক্রমপুরের গৌরব তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। ইহার গাত্রস্থ ইষ্টক সমূহে অতি সুন্দর সুন্দর চিত্র বিচিত্র ফুলকাটা দেখিতে পাওয়া যায়। এরূপ গঠনের মঠ বাঙ্‌লা দেশে এখন আর নাই।

রাজাবাড়ীর থানার প্রায় ১½ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমদিকে মঠটি অবস্থিত। মঠের মধ্যে একটী ক্ষুদ্র কক্ষ আছে, ইহার নিম্নাংশ বহু পরিমাণে মৃত্তিকাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছে। গবর্ণমেণ্টের পূর্ত্তবিভাগ হইতে প্রকাশিত রিপোর্টে এই মঠটির সম্বন্ধে নিম্নলিখিতরূপ লিখিত হইয়াছে "It is a monumental tower of brick masonry built, it is said, over the funeral pyre of the mother of chand Rayya and

Kedar Rayya who were about 300 years ago some independent princes of the locality. It is known as the Rajbari Math. It measures 30 feet square at base and about 80 feet in height and has a small room within it. The dimensions of the math are large and its proportions elegant. It stands up as a conspicious land mark visible for many miles across thc Ganges on the south and the Megna on the north." (P. 24.. List of Ancient Monuments in the Dacca Division) মঠটি ৮০ ফিট উচ্চ। ইহার নিম্নাংশের বেষ্টন ১২০ ফিট। এস্থলে চাঁদরায় কেদার রায়ের একটী বাড়ী ছিল বলিয়াই ইহার নাম রাজাবাড়ী হইয়াছে। কাহারও কাহারও মতে ইহা কেদার রায়ের যাত্রাবাড়ী ছিল। এই মঠটির সম্বন্ধে আরও কয়েকটী কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে আমরা এ স্থানে তাহার উল্লেখ করিলাম। কাহারও কাহারও মতে ইহা পাল-বংশীয় কোন বৌদ্ধ—নৃপতি কর্ত্তৃক দশম শতাব্দীর শেষভাগে কিংবা একাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে নির্ম্মিত হইয়াছিল। আবার কেহ কেহ বলেন যে, চাঁদ মিঞা নামক জনৈক খ্যাতিমান মুসলমান হিন্দু পদ্ধতির অনুকরণে স্বীয় জননীর কবরের উপর ইহা নির্ম্মাণ করেন; এ সকলের মধ্যে কোনও রূপ সত্য নিহিত আছে বলিয়া মনে হয় না। রাজাবাড়ী ইহার নামোৎপত্তির সম্বন্ধে কার্য্যতঃও যে কোন সম্বন্ধ আছে, তাহা নিশ্চিত। এই গ্রামের চতুর্দ্দিকস্থ পরিখা যাহা এখন 'রাজাবাড়ীর খাল' নামে পরিচিত, তাহা এবং বৃহৎ বৃহৎ সরোবর, বাঁধানঘাটের ধ্বংসাবশেষ, রাস্তার চিহ্ন ইত্যাদি দৃষ্টে সহজেই ইহার প্রাচীন কীর্ত্তি গরিমার কাহিনী উজ্জ্বলবর্ণে মানসপটে চিত্রিত হইয়া যায়। কাহারও কাহারও মতে এ স্থানে চাঁদরায়ও কেদার রায়ের প্রমোদোদ্যান ছিল। কেদার রায়ের

উক্ত বাগান বাটী হইতেই রাজারবাড়ী নামের সঙ্গে সঙ্গে ইহা এক্ষণে রাজাবাড়ী নামে পরিচিত হইয়া আসিতেছে। কেদার রায় বিক্রমপুর ও কার্ত্তিকপুর এই উভয় পরগণার মধ্যস্থলে একটী সুবৃহৎ বাটী নির্ম্মাণ করিবার উদ্দেশে উহার চতুর্দ্দিকে পরিখা ইত্যাদি খনন করাইয়াছিলেন,—রাশীকৃত ইষ্টকাবলী সংগৃহীত হইয়াছিল। এমন কি কয়েক খানা অট্টালিকার মূল ভিত্তি পর্য্যন্ত গ্রথিত হইয়াও উহার কার্য্য শেষ হয় নাই। সাধারণে এখনও ঐ স্থানকে কেদারপুর বা কেদার বাড়ী বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকে। *

কেদার বাড়ী।

কাচ্‌কীর দরোজা।

ইহা একটী সুবৃহৎ রাস্তা। ইদিলপুরের অন্তর্গত বুড়ীর হাট হইতে আরম্ভ করিয়া উহার এক শাখা বিক্রমপুরের বক্ষ ভেদ করিয়া ধলেশ্বরী নদীর তট পর্য্যন্ত পঁহুছিয়াছিল। এই রাস্তা দুইটি বক্রভাবে বিক্রমপুরের প্রায় অধিকাংশ গ্রামের নিকট দিয়া ঘুরিয়া যাওয়ায় সেকালে যাতায়াতের পক্ষে ইহা বিশেষ প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত হইত। সেন রাজগণের সময়ে নির্ম্মিত কতকগুলি রাস্তার সহিত কাচ্‌কীর দরোজা সংযোজিত হওয়ায়—জন সাধারণের যে কত উপকার হইত তাহা বলাই বাহুল্য। এখন ইহার কতকাংশ পদ্মার কুক্ষিগত, কতকাংশ অরণ্যানীতে এবং কতকাংশ

* At Kedderpore there are the remains of residence, which is said to have belonged to Rajah of the name of chande Ray, of the Boone'ahs, who appear to have extended their authority to several parts of the Country West and South of the Boorigonga, during the decline of the Kingdom of Bangoz (Taylor's Topography of Decca, P. 101.)

কৃষকের ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। বিক্রমপুরের স্থানে স্থানে এখনও সামান্য পরিমাণে এই সুদীর্ঘ রাস্তাটির চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। কাচ্‌কীর দরোজার উৎপত্তি সম্বন্ধে একটী কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে যে, একজন জ্যোতির্ব্বিদ কেদার রায়ের জননীর অদৃষ্ট গণনা করিয়া বলিয়াছিলেন যে, মৎস্যের কণ্টকবিদ্ধ হইয়া তাঁহার মৃত্যু হইবে। মাতৃভক্ত পুত্র মাতাকে এইরূপ মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য কাচকীগুড়া * মৎস্য প্রত্যহ ধলেশ্বরী, মেঘনা, পদ্মা প্রভৃতি নদী হইতে আনয়ন করিবার সুবিধার্থ এই রাস্তা প্রস্তুত করাইয়াছিলেন, বোধ হয় সে জন্যই ইহার নাম কাচ্‌কীর দরোজা হইয়াছে। এ উক্তির সত্যতা সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ সন্দেহ আছে, তবে চিরকালের প্রচলিত বংশপরম্পরায় শ্রুত জন-প্রবাদের মধ্যে যে কিছুমাত্র সত্যও ক্ষীণদেহে বিরাজমান নাই, তাহাই বা কিরূপে বলিতে পারি।

এ সকল কীর্ত্তিরাশির আর কয়েক বৎসর পর চিহ্নমাত্রও থাকিবে না, শ্রীপুরের সৌধাবলী যেমন রাক্ষসী পদ্মা গ্রাস করিয়াছে—আর দুই এক বৎসরের মধ্যেই যে তদ্রূপ রাজাবাড়ীর মঠটিকেও গ্রাস করিবে তাহা নিঃসন্দেহ; কারণ বেগময়ী পদ্মা ইহার অতি অল্প দূর দিয়াই প্রবাহিতা। সুতরাং এই নশ্বর কীর্ত্তি যে শীঘ্রই ধ্বংসের পথে যাইবে তাহার আর বিচিত্রতাই বা কি আছে? কিন্তু ইতিহাসের সুবর্ণ পৃষ্ঠায় মণিরঞ্জিত গৌরবাক্ষরে চাঁদ কেদার রায়ের যে অক্ষয় গৌরবকাহিনী লিখিত রহিয়াছে, তাহা পদ্মার অনন্তকালব্যাপী তরঙ্গ প্রহারেও ধরণীর বক্ষ হইতে মুছিয়া যাইবে না।

উত্তর বিক্রমপুরে কেশার মার দীঘীর সম্বন্ধে এইরূপ একটী কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে, যে, উপযুক্ত রূপ দীঘী খনিত হইল কিন্তু তথাপিও উহাতে জল উঠিল না, ইহাতে কেদার রায় নিতান্ত বিস্মিত হইলেন ও

* একপ্রকার ছোট কণ্টকহীন মৎস্য।
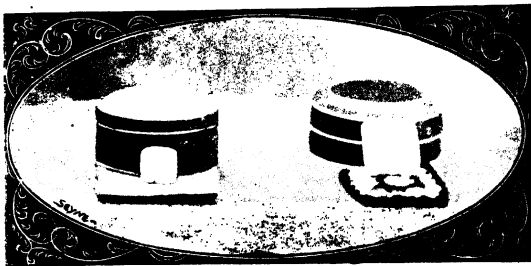
গোসাঞিঃ ভট্টাচার্য্যের প্রদত্ত তদীয় পত্নীদ্বয়ের পূজা করিবার যন্ত্র ।

কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। এইরূপ অবস্থায় একদিন রজনী যোগে তিনি স্বপ্নে দেখিলেন, যে, যদি তাঁহার ধাত্রীমাতার গর্ভসম্ভূত পুত্র কেশা দীঘীর মধ্য দিয়া অশ্বারোহণে যায় তাহা হইলে ইহাতে জল উঠিবে। কেদার প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করিয়া এই স্বপ্ন-বৃত্তান্ত সকলের নিকট প্রকাশ করিলেন, কেশাকে একথা বলায় সেও উহাতে স্বীকৃত হইল। অপরাহ্ন সময়ে যেমন কেশা অশ্বারোহণে দীঘীর মধ্যে গিয়াছে অমনি প্রবলনাদে চারিদিক হইতে জল উঠিয়া অশ্বসহ তাহাকে ডুবাইয়া ফেলিল, উপস্থিত জনবৃন্দ চারিদিক হইতে হাহাকার করিয়া উঠিল, তাহারা শত চেষ্টা করিয়া আর কিছুতেই তাহাকে বাঁচাইতে পারিল না। কেশার মা পুত্রের এইরূপ শোচনীয় মৃত্যুতে শোকাকুলিত চিত্তে 'কেশা কেশা' করিয়া চীৎকার করিতে করিতে সেই প্রবল জলধারার মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া পুত্রের অনুগমন করিল। কেশার ও তাহার মাতার এইরূপ শোচনীয় মৃত্যুতে, বিশেষ কেশার মার এইরূপ পুত্রস্নেহের নিমিত্ত আত্মবিসর্জ্জন করায় ক্ষুব্ধ চিত্তে কেদার বলিলেন "আজ হইতে এই দীঘী 'কেশার মার দীঘী' নামে পরিচিত হউক।" কেদারের এ আদেশ সকলেই শোকপূর্ণ চিত্তে শিরোধার্য্য করিয়া লইলেন, তদবধি ইহার নাম হইয়াছে কেশার মার দীঘী।

কেশার মার দীঘী।

রাজাবাড়ীর এক মাইল উত্তরে প্রায় অর্দ্ধ মাইল দীর্ঘ ও পোয়া মাইল প্রশস্ত এই দীঘীটী অবস্থিত। এখন ইহার বক্ষে কৃষাণেরা ধান্য, পাট ইত্যাদি নানাবিধ শস্যের চাষ করে। বর্ষার সময়ে দীঘীটী জলে ভরিয়া যায়, তখন দেখিতে পরম রমণীয় হয়। ইহার চারি পারেই বস্তি, এই দীঘীর পারস্থিত প্রসিদ্ধ হাটটী বিক্রমপুরে "দীঘীর পারের হাট" বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহার দক্ষিণ তীরে একটী ভগ্ন ইষ্টকস্তূপ দেখিতে পাওয়া

যায়, উহা যে কি ছিল কেহই ঠিক করিয়া বলিতে পারে না। কেহ বলেন মস্‌জিদ ছিল, কেহ বলেন বাঁধান ঘাট ছিল, উহার অবস্থা দৃষ্টে আমাদিগের নিকট শেষোক্ত সিদ্ধান্তই যথার্থ বলিয়াই অনুমিত হয়। কেশার মা কেদার রায়ের ধাত্রীমাতা ছিলেন, কেশা উক্ত রমণীর পুত্রের নাম ছিল। ঐ রমণীকে লোকে কেশার মা বলিয়া ডাকিত। কেদার ধাত্রীমাতার স্মরণার্থ এই দীঘীটী খনন করাইয়াছিলেন—এই দীঘী চিরদিনই "কেশার মার দীঘী" নামে পরিচিত হইয়া আসিতেছে। বিক্রমপুরে এমন লোক অতি বিরল, যিনি কেশার মার দীঘীর নাম শুনেন নাই। এখন এই দীঘীর সম্বন্ধে বলিতে গেলে বলিতে হয়,—

নাই নাই কিছু নাই;—লইয়ে গাগরী
রঙ্গে ভঙ্গে নাহি আসে নাগরিকা যত,
নীরশূন্যা শোভাহীনা সরসী সুন্দরী
জরাগ্রস্তা লোলচর্ম্মা প্রাচীনার মত।

কেদার রায়ের মৃত্যুর পরে সৈন্যগণ নিতান্ত নিরুৎসাহ হইয়া পড়িল, কিন্তু কেদার-মহিষী, মন্ত্রী রঘুনন্দন চৌধুরী, সেনাপতি রামশরণ রায়, কালিঢালি, রাম রাজা সর্দ্দার, সেখ কালু প্রভৃতির সাহায্যে যুদ্ধে ক্ষান্ত না হইয়া বীরদর্পে যুদ্ধ চালাইতে লাগিলেন। মানসিংহ এই সময়ে এক দূত প্রেরণ করেন যে, যদি রাজ্ঞী যুদ্ধে ক্ষান্ত দিয়া মোগলের আনুগত্য স্বীকার করেন, তাহা হইলে তিনি বিক্রমপুরের উপর আর কোনওরূপ হস্তক্ষেপ না করিয়া চলিয়া যাইবেন এবং রাজ্ঞীর উপরেই সমুদয় রাজকার্য্যের ভার থাকিবে। রঘুনন্দন দাশ গুপ্ত চৌধুরী এই বিবরণ রাণীর নিকট জ্ঞাত করান এবং সকলে পরামর্শ করিয়া মোগলের আনুগত্য স্বীকার করা উচিত বোধে মানসিংহের প্রস্তাবে সম্মত হইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া মোগলের আনুগত্য স্বীকার করিলেন। এইরূপে বিক্রমপুরের

শেষ কথা।

স্বাধীনতা চিরদিনের জন্য অন্তর্হিত হইয়া গেল। যতদিন পর্য্যন্ত রাজ্ঞী জীবিত ছিলেন, ততদিন পর্য্যন্ত তাঁহার হস্তেই সমুদয় রাজকার্য্যের ভার ন্যস্ত ছিল, পরে রাণীর মৃত্যুতে মোগল রাজপ্রতিনিধির আদেশানুসারে চাঁদ রায় কেদার রায়ের রাজত্ব তদীয় সৈন্যাধ্যক্ষ ও মন্ত্রীগণের মধ্যে বিভক্ত হইয়া পড়ে। *

রঘুনন্দন চৌধুরী—বিক্রমপুরের জমিদারী। ইনি বৈদ্যবংশসম্ভূত ভরদ্বাজ গোত্রীয় এবং নওপাড়ার চৌধুরীগণের পূর্ব্বপুরুষ। এই বংশের পূর্ব্বখ্যাতি ও প্রতিপত্তি এখন লোপ পাইয়াছে।

---

* বীরশ্রেষ্ঠ কেদার রায় তিনবার মোগলবাহিনীর সহিত যুদ্ধ করিয়া যে অপূর্ব্ব বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন তাহা প্রত্যেক বাঙ্গালীর হৃদয়ে জপমন্ত্রের ন্যায় জাগরূক থাকা কর্ত্তব্য। প্রথমবারের যুদ্ধে বীরশ্রেষ্ঠ কেদার রায় মানসিংহের সেনাপতি মন্দারায়কে পরাজিত ও নিহত করেন। দ্বিতীয়বার মানসিংহ স্বয়ং বহু সৈন্য সহ বিক্রমপুরে উপস্থিত হন এবং কেদারের অদ্ভুত রণ-কৌশল দর্শনে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকেই আবার স্বীয় রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া প্রস্থান করেন। তৃতীয়বার সেনাপতি কিলমক অবরুদ্ধ হইলে পুনরায় মানসিংহ একদল সৈন্য সহ কেদারের রাজ্যে উপনীত হন—এই যুদ্ধেই কেদার রায় নিহত হন। দ্বিতীয়বারের যুদ্ধাবসানে মানসিংহ কেদার রায়ের গৃহাধিষ্ঠাত্রী দেবী শিলামাতাকে জয়পুরে লইয়া যান এবং কেদার রায়ের একটী কন্যাকে বিবাহ করেন। সেই শিলামাতা অদ্যাপি জয়পুর রাজ্যের প্রাচীন রাজধানী অম্বর নগরে প্রতিষ্ঠাপিতা আছেন। "প্রতাপা-দিত্যকো জীতকর রাজা কেদারকে রাজ্যপর চঢ়াইকী। বহ (ইনি) জাতি কা কায়স্থ থা, ঔর সন্নামাতা নামী দেবী কা উস্‌কে ইষ্টথা; মানসিংহজীকী লড়াইকে সমাচার সুনকর কেদার নৌকামে বৈঠ কর সমুদ্রকী ঔর (অভিমুখে, দিকে) ভগ্ গয়া। ঔর মন্ত্রী সে কহ গয়া কি যদি হোসকে (যদি সম্ভবপর হয়) তোমেরী পুত্রী মানসিংহজীকো দে কর করলে না; মন্ত্রীনে ঐসাহী কিয়া মানসিংহ জীনে প্রসন্ন হো কর কেদার কো বাদশাহকা পাদসেবী বনা কর উস্‌কা রাজ্য পীছা দে দিয়া, ঔর সন্নাদেবীকো আমের লে আয়ে।" শ্রীযুক্ত নিখিল বাবুর প্রতাপাদিত্যের পরিশিষ্ট ও সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় শ্রীযুক্ত মেঘনাদ ভট্টাচার্য্যের লিখিত প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

কমলশরণ ও সেক কালু	কার্ত্তিকপুরের জমিদারী।
কালিদাস ঢালি ও রামরাজা সর্দ্দার	দেওভোগ ও মূলপাড়া পৃথক দুই তালুক প্রাপ্ত হইয়া তাহাতে বাস করেন, এই বংশীয়গণ পরে মুখুটি ও চাটাতি বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করে।

চাঁদ—কেদার রায়ের কোনও বংশধর জীবিত আছেন কিনা তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন, তবে ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত দুর্গাপুর গ্রামবাসী ৺নীলকমল রায় ও কালীকমল রায় ভ্রাতৃদ্বয় ও কার্ত্তিকপুর নলমুরির রায়েরা এই রাজবংশোদ্ভব বলিয়া দাবী করিয়া থাকেন, স্বর্গীয় নীলকমল বাবু ও কালীকমল বাবুর পুত্রকন্যাগণ জীবিত আছেন। কেহ কেহ বলেন যে চাঁদ রায়ের নামানুসারেই চাঁদপুরের নামোৎপত্তি হইয়াছে, কেবলমাত্র জনপ্রবাদের উপর নির্ভর করিয়া এ সমুদয় বিশ্বাস করা যাইতে পারে না।

গোসাঞি ভট্টাচার্য্য।

কেদার রায়ের গুরু গোসাঞি ভট্টাচার্য্যের সম্বন্ধে আর গোটাদুই কথা লিপিবদ্ধ করিলেই চাঁদ রায় কেদার রায়ের সম্বন্ধে আমাদের সমুদয় কথার শেষ হয়। গোসাঞি ভট্টাচার্য্য সিদ্ধ শ্রোত্রিয়কুলোদ্ভব, তৎকাল প্রচলিত বীরাচারী তান্ত্রিক সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। সে যুগে পূর্ব্ব বঙ্গের প্রায় সর্ব্বত্রই শক্তিমন্ত্র প্রচলিত ছিল—বিশেষ স্থানীয় রাজা মহারাজারাও প্রধান প্রধান ব্যক্তিরা উক্ত মন্ত্রেই দীক্ষিত হইতেন। এই মহাত্মার সম্বন্ধে নানা প্রকার আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য কিম্বদন্তী শুনিতে পাওয়া যায়। আমরা এ স্থানে সংক্ষেপে তাহার একটীর উল্লেখ করিলাম। একবার অশোকাষ্টমী ব্রতোপলক্ষে কেদার রায় গুরুদেব সহ ব্রহ্মপুত্র স্নানে যাইবার অভিলাষ প্রকাশ করিলে ভট্টাচার্য্য মহাশয় উত্তর করিলেন যে তোমার সেখানে

যাইবার কোনও প্রয়োজন নাই তোমার রাজধানীর পূর্ব্বপ্রান্ত দিয়া যে মেঘনাদ (মেঘনা) নদ প্রবাহিত হইতেছে উহাতে স্নান করিলেই তোমার সে ফল লাভ হইবে। মহারাজ ইহাতে বিস্ময়ের ভাব প্রকাশ করিলে গোসাঞি নিজ সম্মুখস্থ একটী কমলা লেবু উত্তোলন করিয়া বলিলেন যে তুমি এই লেবুটীকে গ্রহণ কর এবং ইহা নদ বক্ষে নিক্ষেপ কর, যে স্থান হইতে স্বয়ং ব্রহ্মপুত্রদেব হস্ত উত্তোলন করিয়া উহা গ্রহণ করিবেন জানিও সে স্থান পর্য্যন্ত ব্রহ্মপুত্র নদ প্রবাহিত আছে। রাজা গুরুদেবের আদেশানুযায়ী'উহা লাঙ্গলবন্ধের কিছু দূরে পঞ্চমী ঘাট নামক স্থানে নিক্ষেপ করিলেন, লেবুটী স্রোতের সঙ্গে সঙ্গে ভাসিয়া চলিল, রাজাও তৎপশ্চাৎ পশ্চাৎ নৌকারোহণে অনুসরণ করিতে লাগিলেন। কমলা লেবুটী ভাসিতে ভাসিতে কার্ত্তিকপুরের পূর্ব্ব দিকে প্রবাহিত মেঘনার একটী ঘোলার মধ্যে পড়িয়া ঘুরিতে লাগিল—কেদার রায়ও সেই স্থানে নৌকা রাখিয়া দিলেন। দেশের সর্ব্বত্র এই কথা রাষ্ট্র হইয়া পড়ায় দলে দলে লোক নদীর তীরে সমবেত হইতে লাগিল, পরে যখন মধু শুক্লাষ্টমী তিথির আবির্ভাব হইল তখন তীরবর্ত্তী কৌতূহলী নরনারী বিস্মিত নেত্রে দেখিতে পাইল যে নদীগর্ভ হইতে দিব্যালঙ্কারভূষিত এক মূর্ত্তি আবির্ভূত হইলেন, এদিকে গোসাঞি ভট্টাচার্য্যও নদী গর্ভ হইতে কমলালেবুটী উত্তোলন করিয়া মূর্ত্তির হস্তে অর্পণ করিলেন, দেখিতে দেখিতে মূর্ত্তি অদৃশ্য হইয়া গেল। এই ঘটনায় সকলেই বিস্মিত হইয়া ভক্তিপূর্ণচিত্তে ঐ জলে স্নান করিয়া ব্রহ্মপুত্র নীরে স্নান করিবার ফললাভ করিলেন। এই ঘটনার পর হইতে ঐ স্থান কমলাপুর নামে খ্যাত হইয়া আসিতেছে। অদ্যাপি অশোকাষ্টমীর দিবসে প্রতি বর্ষে বহুসংখ্যক যাত্রী এ স্থানে অবগাহন করিয়া পুণ্যসঞ্চয় করিয়া থাকেন। প্রকৃত কমলাপুর বহুদিন হইল মেঘনার উদরস্থ হইয়া বহু পশ্চিমে সরিয়া পড়িয়াছে। এই নিমিত্তই লালা রামগতি রায় তৎপ্রণীত "মায়া-

তিমির-চন্দ্রিকা” নামক গ্রন্থে বিক্রমপুরের সীমা বর্ণনায় পূর্ব্ব-প্রান্তবর্ত্তী মেঘনা নদীর নামের স্থানে ব্রহ্মপুত্রের নামোল্লেখ করিয়াছেন। যথা—

> “মহাতীর্থ ব্রহ্মপুত্র পূর্ব্বেতে প্রচার।
> পশ্চিমেতে পদ্মাবতী বিদিত সংসার ॥
> মধ্যেতে বিক্রমপুর রাজ্য মনোহর।
> ব্রাহ্মণ পণ্ডিত তাহে সদ্‌গুণী বিস্তর ॥”

গোসাঞি ভট্টাচার্য্যের প্রকৃত নাম রত্নগর্ভ। তিনি দুই বিবাহ করিয়াছিলেন এবং ঐ দুই স্ত্রীকে ৺কালী পূজা করিবার নিমিত্ত দুইখানা অষ্টধাতুনির্ম্মিত যন্ত্র প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন, বড় স্ত্রীর যন্ত্রখানা বড় এবং কনিষ্ঠা পত্নীর যন্ত্রখানা ছোট।

গোসাঞি ভট্টাচার্য্যের প্রথমাপত্নীর কোনও পুত্রসন্তান জন্মে নাই, তাঁহার গর্ভে একটী মাত্র কন্যা জন্মে, সেই কন্যার বংশধরগণ বর্ত্তমান সময়ে বেলপুকুরিয়া ঠাকুর নামে খ্যাত। দ্বিতীয়া পত্নীর গর্ভেও কেবল মাত্র একটী পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, তাঁহার নাম রামভদ্র ভট্টাচার্য্য; এই রামভদ্রের নামানুযায়ী তদীয় বাসগ্রামের নাম রামভদ্রপুর হইয়াছে। রামভদ্র ভট্টাচার্য্যের তিনপুত্র (১) রাজীবলোচন (২) রামজীবন (৩) রামনাথ। রাজীবলোচনের বংশধর শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার ভট্টাচার্য্য মহাশয় গোসাঞি ভট্টাচার্য্য হইতে অধস্তন অষ্টমপুরুষ—তিনি এখন প্রাচীন ও স্থবির। রামজীবনের বংশধরগণ (১) শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য (২) রজনীকান্ত ভট্টাচার্য্য। ইহাঁরা দুই ভ্রাতাও অত্যন্ত বৃদ্ধ হইয়াছেন ইহাঁরা গোঁসাই ভট্টাচার্য্য হইতে অধস্তন দশমপুরুষ। তৃতীয় রামনাথের বংশধর উমাকান্ত ভট্টাচার্য্য এখন কাশীবাসী। কেদার রায়ের প্রদত্ত গোসাঞি ভট্টাচার্য্যের ব্রহ্মোত্তর রামভদ্রপুর, সৌদপুর, সাজনপুর প্রভৃতি গ্রামসমূহ আজ পর্য্যন্তও তাঁহার বংশধরগণেরই অধিকারভুক্ত আছে। রামভদ্রপুরে গোসাঞি ভট্টাচার্য্যের বংশধরগণের নিকট হইতে

অবগত হইলাম যে পূর্ব্বে এস্থানে একটী ক্ষীরাই গাছ ছিল, প্রত্যহ ভট্টাচার্য্য মহাশয় পূজার সময় ঐ বৃক্ষ হইতে একটী করিয়া ক্ষীরাই ৺কালীমাতাকে উপহার দিতেন। শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পিতাও ঐ গাছে ক্ষীরাই ফলিতে দেখিয়াছেন। এখন ঐ গাছটী মৃত, কেবল উহার একটুকু চিহ্ন বিদ্যমান আছে। রামভদ্রপুরের ভট্টাচার্য্য মহাশয়গণ ঐ ক্ষীরাই গাছের গোড়াটী অতি যত্নের সহিত বেড়া দিয়া রাখিয়াছেন।

ভট্টাচার্য্যের প্রথমা স্ত্রী রায়ের ঝি ও দ্বিতীয়া স্ত্রী খাঁয়ের ঝি নামে অভিহিতা হইতেন। যন্ত্র দু'খানি বড় ঠাকুরাণী ও ছোট ঠাকুরাণী নামে অভিহিত। বড় ঠাকুরাণীর অধিকারী—চন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য এবং ছোট ঠাকুরাণীর অধিকারী—রজনীকান্ত ভট্টাচার্য্য।

ইহাঁদের নিকট প্রাচীন কোনওরূপ দলিল পত্রাদি পাওয়া গেল না। ঐ যন্ত্র দু'খানির জন্য উক্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয়গণ একটা দর্শনী পাইয়া থাকেন। এই ব্রাহ্মণ পরিবার অদ্যাপিও সততায়, তেজস্বিতায় ও মহত্বে নিকটবর্ত্তী গ্রাম্য জনসাধারণের নিকট হইতে শ্রদ্ধা ও ভক্তি পাইয়া আসিতেছেন *।

পুরোহিত বংশ।

উত্তর বিক্রমপুরের ধলছত্র নামক গ্রামনিবাসী বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণের অন্যতম পূর্ব্বপুরুষ ৺কৃষ্ণদেব বিদ্যালঙ্কার কেদার রায়ের পুরোহিত ছিলেন। ইনি পূর্ব্বে অশূদ্রযাজী ক্ষমতাশালী সাধক ব্রাহ্মণ ছিলেন।

* শ্রীমদ্ ব্রহ্মানন্দ মহাভারতী তৎপ্রণীত সিদ্ধজীবনীতে ব্রহ্মাণ্ডগিরিও গোঁসাই ভট্টাচার্য্যকে অভিন্নরূপে বর্ণনা করিয়াছেন তাহা ভুল। ইহাঁরা দুই ব্যক্তি। গোঁসাই ভট্টাচার্য্যের বংশধরগণ অদ্যাপি জীবিত আছেন, কিন্তু ব্রহ্মাণ্ডগিরির কোন বংশধর জীবিত আছেন কি না তাহা অনুসন্ধানে ঠিক করিতে পারিলাম না।

কেদার রায়ের পৌরোহিত্য নির্ব্বাচন সম্বন্ধেও একটী প্রবাদ শুনিতে পাওয়া যায়। কথিত আছে যে, রাজা একটী লৌহ মৎস্য নির্ম্মাণ করিয়া বলিলেন যে "যে ব্রাহ্মণ মন্ত্র প্রভাবে উহার মধ্যে জীবনী-সঞ্চার করিয়া জলমধ্যে সন্তরণ করাইতে পারিবে আমি তাঁহাকে বংশানুক্রমে পৌরোহিত্য পদে নিযুক্ত করিব।"

কোন ব্রাহ্মণই এইরূপ কার্য্যে অগ্রসর হইল না, অবশেষে কৃষ্ণদেব বিদ্যালঙ্কারের দুই পুত্র হরিদেব ও সুন্দরানন্দ চক্রবর্ত্তী রাজসমীপে গমন পূর্ব্বক মন্ত্রপ্রভাবে উহা জীবিত করিলেন কিন্তু ঐ মৎস্য জলে সন্তরণক্ষম হইল না। কেদার অনুসন্ধানে জানিতে পারিলেন যে এক কৃষ্ণদেব বিদ্যালঙ্কার ব্যতীত এইরূপ শক্তিশালী ব্রাহ্মণ আর কেহই নাই, বহু সাধ্যসাধনায় কৃষ্ণদেব আসিয়া উহাতে মন্ত্রশক্তি প্রয়োগ করা মাত্রই লৌহ-মৎস্য জলমধ্যে সন্তরণ করিতে লাগিল। রাজা এইরূপ আশ্চর্য্য ঘটনা দর্শনে বিদ্যালঙ্কার মহাশয়কে পৌরোহিত্য পদে বরণ করিলেন। এ গল্পের মধ্যে যে কোনও সত্য আছে ইহা একেবারেই অবিশ্বাস্য, বোধ হয় বৈদিক পুরোহিতগণ স্বকীয় পূর্ব্বপুরুষগণের মহত্ত্ব ও ব্রহ্মণ্য ক্ষমতা ঘোষণা করিবার নিমিত্ত এই অত্যদ্ভুত গল্পের সৃষ্টি করিয়াছেন। এই বৈদিকগণের পূর্ব্বনিবাস ধূল্লা—ধূল্লা পদ্মার কুক্ষিগত হওয়ার পর হইতে ইহাঁরা উত্তর বিক্রমপুরান্তর্গত ধলছত্র গ্রামে বাস করিতেছেন। কেদার রায় ইহাদিগকে ধূল্লা, মানগাঁও, বেড়গাঁও ইত্যাদি কয়েকখানি গ্রাম ব্রহ্মোত্তর স্বরূপ দান করিয়াছিলেন।

বারভূঁইয়াগণকে দমন করিয়া কিছুকাল মানসিংহ বঙ্গের সুবেদারী করিয়া ফিরিয়া আসিলে তাঁহার পর কুতুবউদ্দীন বঙ্গের সুবেদার নিযুক্ত হন, সের আফগানের হস্তে তাঁহার মৃত্যু হইলে জাহাঙ্গীর কুলী খাঁ বঙ্গের শাসনকর্ত্তার পদে নিযুক্ত হইয়া আসেন, ইহার পূর্ব্বনাম ছিল লালবাগ। কর

সুবেদার ইসলাম খাঁ।

আদায়ের সময় ইনি যেরূপ নিষ্ঠুরতা অবলম্বন করিতেন তাহা চিরদিন ইতিহাসের বুকে কলঙ্কের সহিত অঙ্কিত থাকিবে। জাহাঙ্গীর খাঁ কুলীর মৃত্যুর পরে সেখ আলাউদ্দীন ইসলাম খা ১৬০৮ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার পদে সুবেদার নিযুক্ত হন। ইসলাম খাঁই রাজমহল হইতে ঢাকা সহরে রাজপাট পরিবর্ত্তন করিয়া উহার নাম জাহাঙ্গীরনগর রাখেন। তাঁহার শাসন সময়েই ওসমানের অধীন আফগানেরা বিরোধী হয়, ইসলাম খাঁ সেনাপতি সুজাখাঁকে বিদ্রোহ দলনার্থ প্রেরণ করেন এই সূত্রে পূর্ব্ববঙ্গে এক যুদ্ধ ঘটে ও তাহাতে ওসমানের পরাজয় ও মৃত্যু হয়। আফগানদিগের পুনঃ ক্ষমতা প্রাপ্তির চেষ্টা ওসমানের মৃত্যুতে একেবারে চিরবিলুপ্ত হইয়া গেল।* ইসলাম খাঁর শাসন সময়েই ঢাকানগরে দুর্গ ও প্রাসাদাদি নির্ম্মিত হইতে আরম্ভ হয়, অদ্যাপি ঢাকাস্থ লালবাগের অসম্পূর্ণ কেল্লা ও প্রাসাদাদি বিরাজিত থাকিয়া তাহার নাম স্মৃতিপথে উদয় করিয়া দিতেছে। ইহার রাজত্বের শেষভাগে মগ ও পর্ত্তুগীজেরা নিম্নবঙ্গে দৌরাত্ম্য ও উপদ্রব করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, ইসমাইল খাঁ এই উপদ্রব নিবারণ করিবার নিমিত্তই রাজমহল হইতে ঢাকার রাজধানী স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন কিন্তু তাহাতেও পর্ত্তুগীজেরা ভীত হয় নাই, এমন কি গঞ্জালিসের নেতৃত্বে তাহারা লক্ষ্মীপুর ও ভোলা নগর পর্য্যন্ত জয় করিয়াছিল। কিন্তু পরিশেষে মোগল সৈন্য কর্ত্তৃক তাহারা চট্টগ্রামে বিতাড়িত হয়। ইসলাম খাঁর মৃত্যুর পরে (১৬১৩ খ্রীষ্টাব্দে) তাঁহার

* Usman khan one of their chiefs, collected an army of 20,000 men and was proclaimed king, He overran the lower part of Bengal was defeated and slain by the Mughuls in a battle in Eastern Bengal (erroneously spoken to orissa.) - Stewart's History of Bengal.

ভ্রাতা কাসিম খাঁ সম্রাটের আদেশে বাঙ্গালা ও ওড়িষ্যার সুবেদার নিযুক্ত হন। ইহার শাসন সময়ে পর্ত্তুগীজ দস্যুদল নায়ক গঞ্জালিস বিশ্বাস ঘাতকতা করিয়া আরাকান রাজের রণতরীগুলি হস্তগত ক'রিয়া তাহার উপকূল প্রদেশ লুণ্ঠন করে। আরাকান রাজ ওলন্দাজ দিগের সহায়তায় তাহাদিগকে দমন করেন। ইহার পরে আরাকান মগেরা পুনরায় বাঙ্গালার পূর্ব্বদক্ষিণ প্রদেশ লুণ্ঠন করিতে থাকে, ইব্রাহিম ইহাদের দমন করিতে না পারায় সম্রাট ক্রুদ্ধ হইয়া নুরজাহেনের ভ্রাতা ইব্রাহিম খাঁ ফতেজঙ্গকে সুবেদার রূপে প্রেরণ করেন। ইব্রাহিম খাঁর শাসনে উল্লেখ যোগ্য ঘটনা এ সময়ে যুবরাজ শাজাহান পিতার বিরোধী হইয়া বঙ্গদেশ আক্রমণ করেন (১৬২৩খ্রীঃ অঃ) ও প্রায় দুই বৎসর কাল স্বাধীন ভাবে রাজত্ব করিয়াছিলেন। দুই বৎসর কাল রাজত্বের পরে তিনি সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়া বঙ্গদেশ হইতে বিতাড়িত হন। শাজাহান পিতার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করায় সমুদয় গোলমাল মিটিয়া যায়—জাহাঙ্গীর পুত্রের অপরাধ মার্জ্জনা করেন। শাজাহান যখন বাঙ্গালায় ছিলেন তখন তিনি নিজ চক্ষে পর্ত্তুগীজ দিগের অত্যাচার দর্শন করিয়াছিলেন, ইহারা এদেশবাসীদিগকে বলপূর্ব্বক খ্রীষ্টান্ করিত, এবং খাটাইয়া মজুরী ইত্যাদি দিত না। ইব্রাহিম খাঁর শাসন সময়ে ঢাকার বিশেষ উন্নতি হয় এমন কি আগ্রার আমীর ওমরাহ প্রভৃতি সভাসদ্‌মণ্ডলীর নিকটেও ঢাকার সুচিক্কণ কাপড়, মালদহের পট্টবস্ত্র ইত্যাদি আদৃত হইয়াছিল। জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর পরে শাজাহান নিজে যখন সম্রাট হইলেন তখন তিনি পর্ত্তুগীজদিগকে দমনার্থ কাসীম খাঁ যুবৈনীকে সুবেদার নিযুক্ত করিয়া প্রেরণ করেন। কাশীম খাঁ সুবেদারের পদ গ্রহণ করিয়াই হুগলী অবরোধের জন্ত একদল সৈন্ত পাঠাইলেন। কাশিম খাঁ তিন মাসের

গঞ্জালিসের আরাকান রাজের সহিত বিশ্বাসঘাতকতা

ইব্রাহিম খাঁ।

অবরোধের পর হুগলী জয় করিতে সমর্থ হইলেন। (১৬৩২ খ্রী অঃ) এই যুদ্ধে প্রায় এক সহস্র পর্ত্তুগীজ মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। এবং প্রায় ৪০০০ সহস্র পর্ত্তুগীজ বন্দী দিল্লীতে প্রেরিত হয়। এই দমনের পরে পর্ত্তুগীজেরা আর এদেশে মাথা তুলিতে পারে নাই। এই সময় হইতেই প্রসিদ্ধ বাণিজ্য প্রধান স্থান সপ্তগ্রামের অবনতি হইতে আরম্ভ করে। কাসেম খাঁর পরে আজিম খাঁ প্রভৃতি কয়েক জন সুবেদার হন কিন্তু তাঁহাদের কাহারও শাসন সময়ই উল্লেখ যোগ্য নহে। অতঃপর শাজাহানের দ্বিতীয় পুত্র সুলতান সুজা বাঙ্‌লা দেশের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন। ইনি ১৬৩৯ হইতে ১৬৫৯ অব্দ পর্য্যন্ত বঙ্গের সুবেদার ছিলেন। ইঁহার সময়েই বাঙ্গালা দেশে ইংরেজ বাণিজ্য দৃঢ়ীভূত হয়। ইনি শাসনভার প্রাপ্ত হইয়াই ঢাকা হইতে রাজমহলে রাজধানী পরিবর্ত্তন করেন। সুজার শাসন সময়ে প্রজাবৃন্দ অত্যন্ত সুখ-স্বচ্ছন্দে বাস করিয়াছিল। ১৬৫৭ খ্রীঃ অব্দে সুজা বাঙ্গালা দেশের এক নূতন রাজস্বের হিসাব প্রস্তুত করেন, ইনি সমগ্র বঙ্গভূমিকে ৩৪ সরকারে ও ১৩৫০ মহলে বিভক্ত করিয়া ১, ৩১১৫,৯০৭ টাকা রাজস্ব বৃদ্ধি করেন। এ সময়ে সম্রাট শাজাহান গুরুতর রূপে পীড়াক্রান্ত হইলে সুজা সাম্রাজ্য লোভে আগ্রাভিমুখে যাত্রা করেন। পথিমধ্যে দারার তনয় সুজার ভ্রাতুষ্পুত্র সোলেমানের সহিত সাক্ষাৎ হইল—তাঁহার নিকট যুদ্ধে পরাজিত হইয়া তিনি মুঙ্গেরে পলায়ন করিলেন। ইতিমধ্যে দিল্লী সিংহাসন ঔরংজেবের করতলগত হইল। সুজাকে ঔরংজেব বাঙ্গালার সুবেদারী প্রদান করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে তিনি সন্তুষ্ট না হইয়া শীঘ্র বহু সৈন্য সংগ্রহ পূর্ব্বক ভ্রাতার বিদ্রোহী হইলেন। কিন্তু সুজার কামনাপূর্ণ হইল না তিনি ১৬৬০ খ্রীঃ অব্দে সম্রাটের সৈন্যের নিকট এলাহাবাদের কাছে পরাজিত

কাসীম খাঁ থুবৈনী ও পর্ত্তুগীজ দিগকে হুগলী হইতে বিতাড়িত করা।

সুলতান সুজা।

হইলেন। সুজার অদৃষ্টে বিধাতা বিরূপ হইলেন * তিনি যেখানে যান সেখানেই সম্রাটের সৈন্য তাহার অনুসরণ করে। ঔরংজেবের সেনাপতি মিরজুম্লা এই কার্য্যে নিযুক্ত ছিল। সুজা অবশেষে আরাকানে পলায়ন করেন কিন্তু হায়! সেখানেও তিনি নিরাপদ হইতে পারিলেন না, আরাকান রাজের তাঁহার উপর বহুদিন হইতেই আক্রোশ ছিল, তিনি এই সুযোগে সুজার প্রাণবধ করিলেন। এইরূপে রাজ্যলোভে সম্রাট নন্দনের প্রাণ বিয়োগ হইল। সুজার নিষ্ঠুর হত্যা কাহিনী যখন শাজাহানের কর্ণে পহুঁছিল তখন তিনি অশ্রুপূর্ণ লোচনে বলিয়াছিলেন "could not the cursed infidel have left one son of shuja alive to avenge the wrong of his grand father."

মীরজুমলা।

সুজার পর সেনাপতি মহম্মদ সৈয়দ মীরজুম্লা নবাব মুয়াজিম খাঁ খানান্ সিপামালর বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা হইলেন। তিনি সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই ঢাকা নগরীতে রাজধানী স্থাপন করিলেন। পূর্ব্ব হইতেই নিম্ন বঙ্গে মগও আরাকান বাসীদিগের উপদ্রব আরম্ভ হইয়াছিল,এই দৌরাত্ম্য নিবারণার্থ

ইদ্রাকপুরের দুর্গ বা মুন্সীগঞ্জের কেল্লা।

তিনি ঢাকার প্রাচীন দুর্গাদির সংস্কার ও বিক্রমপুরান্তর্গত ইদ্রাকপুর নামক স্থানে একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। বর্ত্তমান মুন্সীগঞ্জ পূর্ব্বে ইদ্রাকপুর নামে পরিচিত ছিল। শতবর্ষ পুর্ব্বেও এই স্থানের পাদদেশ ধৌত করিয়া ইচ্ছামতী নদী প্রবাহিত হইত; কিন্তু এখন উহা প্রায় এক মাইল দূরে সরিয়া গিয়াছে। মগ-দস্যুদিগের অতর্কিত আক্রমণ হইতে বিক্রমপুরের পূর্ব্বপ্রান্ত নিরাপদ করিবার নিমিত্তই ১৬৬১ খৃঃ অব্দে মিরজুমলা যে গোলাকার দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন তাহা অদ্যাপিও

* Stewart's History of Bengal P. 318.
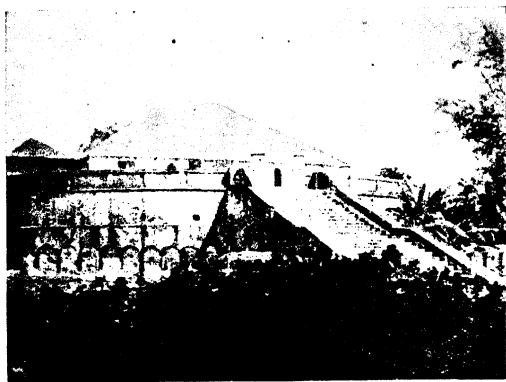
ইদ্রাকপুরের দুর্গ (মুন্সীগঞ্জের কেল্লা)।

বিদ্যমান আছে। উহার চতুর্দ্দিকে পূর্ব্বে যে সকল ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হইত এখন আর সে সমুদয় কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। পূর্ব্বে ইহা বর্ত্তমান মুন্সীগঞ্জের 'লক্ষ্মীনারায়ণের আখরা' পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। বর্ত্তমান সময়ে ইহার উপরিস্থিত বাংলোতে মুন্সীগঞ্জের সবডিবিসনাল অফিসারগণ বাস করেন। দূর হইতে এই লোহিত বর্ণের প্রাচীন দুর্গটি দেখিতে বড়ই সুন্দর। দুর্গের পূর্ব্বদিকে একটী ছোট প্রাচীন সরোবর বিদ্যমান আছে—ইহার জল বেশ নির্ম্মল। (১) ১৬৬১ খৃষ্টাব্দে মিরজুমলা কোচবেহার জয় করেন এবং উহার নাম পরিবর্ত্তন করিয়া সম্রাটের নামানুসারে আলমগীর রাখেন। (২) কোচরাজ্য জয় করিয়া তিনি আসাম জয় করিতে যাত্রা করেন কিন্তু এই যুদ্ধ যাত্রায় তাঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়া যায় এবং ঢাকায় পহুঁছিবার অব্যবহিত পরে ১৬৬৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। মিরজুমলার পর সায়েস্তা খাঁ বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়া আসেন। মধ্যে তিন বৎসর ব্যতীত তিনি পঁচিশ বৎসর পর্য্যন্ত (১৬৬৪—১৬৮৯) বাঙ্গালা শাসন করেন। সায়েস্তা খাঁ যে তিন বৎসর শাসন কর্ত্তার পদে আসীন ছিলেন না তখন সম্রাট ঔরংজেবের মতানুসারে ফিদাই খাঁ আজিম খাঁ ও তৎপরে সম্রাট ঔরংজেবের তৃতীয়

সায়েস্তা খাঁ।

(১) Idrackpore, * * stands upon the bank of the Issamutty, lies about three n iles to the South of Feringy Bazar. There is, here, a circular fort built by Meer Jumla, and several brick buildings and ghauts, where probably the Shabunder duties of Bickrampore were formerly collected. (Taylor's Topography of Dacca P. 104). পূর্ব্বে মোগলদের সময় এখানকার ঘাটে শুল্ক আদায় হইত।

(২) Meerjumla took possession the capital of Cooch Behar. and in compliment to the reigning Emperor, changed its name to Alamgir Nagor. December 1661. Stewart's History of Bengal, P. 332.

পুত্র মহম্মদ আজিম খাঁ বাঙ্গালায় সুবেদার নিযুক্ত হন। ইহাঁর সময়েই ঢাকা সহরে ইংরেজ ও ওলন্দাজেরা কুঠি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। সায়েস্তা খাঁ অত্যন্ত প্রজারঞ্জক নরপতি ছিলেন,—ইহাঁর সুশাসনের চিহ্ন সমস্ত হিন্দুস্থানেই বিস্তৃত আছে। * একটী কথার উল্লেখ করিলেই এ বিষয়ে যথেষ্ট বলা হইবে। তাঁহার শাসন কালে শস্যাদি এতদুর সুলভ হইয়াছিল যে ঢাকা প্রদেশে এক দামড়ি করিয়া চাউলের সের ছিল (৩২০ দামড়ীতে এক টাকা) অর্থাৎ টাকায় আটমণ করিয়া চাউল বিক্রী হইত, তিনি এই ব্যাপার স্মরণার্থ ঢাকার পশ্চিম পার্শ্বে একটী তোরণ দ্বার নির্ম্মাণ করাইয়া লিখিয়া রাখিয়াছিলেন যে "যে রাজার শাসন সময়ে শস্য এরূপ সুলভ হইবে তিনিই যেন এই তোরণ দ্বার উন্মুক্ত করেন।" ঢাকা নগরে সায়েস্তা খাঁ কৃত কাটরা ও অট্টালিকা এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে। তাঁহার শাসন সময়ে বিক্রমপুরস্থ ফিরিঙ্গি বাজার ব্যবসায়ের কেন্দ্র স্বরূপ ছিল। কিন্তু ঢাকা নগরীর শিল্প বাণিজ্যের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে ইহার নাগরিক সমৃদ্ধির হ্রাস হইয়া বর্ত্তমান সময়ে উহা একটী সামান্য গ্রামে পরিণত হইয়াছে। ফিরিঙ্গি বাজার ইচ্ছামতী নদীর তীরে অবস্থিত। সায়েস্তা খাঁর সময়ে (১৬৬৩ খ্রীষ্টাব্দে) মোগল সেনাপতি হোসেন বেগের পক্ষাবলম্বন করিয়া কতিপয় পর্ত্তুগীজ ফিরিঙ্গি আরাকান রাজকে পরিত্যাগ করতঃ এ স্থানে আসিয়া বাস করে, তাহাদের বাসের সঙ্গে সঙ্গেই এ স্থানের নাম ফিরিঙ্গি বাজার হইয়াছে। এখন সে সকল ইক্রু পিক্রুর বংশধর গণের সহিত মুসলমান কৃষকগণের কোনও পার্থক্য অনুভূত হয় না। ইহাদের কেহ কেহ ইস্‌লাম ধর্ম্মাবলম্বী হইয়াছে, কেহ কেহ এখনও নামে মাত্র খ্রীষ্টান রহিয়া প্রতি রবিবারে গির্জ্জায় যায়। ফিরিঙ্গি বাজারে একটী গির্জ্জা

ফিরিঙ্গি বাজার।

* রিয়াজ উস্ সালাতিন—রামপ্রাণগুপ্ত।

ঘর আছে, এখানে একজন রোমান ক্যাথলিক মিশনারি বাস করেন। সায়েস্তা খাঁ বঙ্গদেশের সুবেদারী পদ পরিত্যাগ করিবার বৎসর (১৬৮৯ খ্রীষ্টাব্দে) ইংরেজদিগের পাটনা, মালদহ, ঢাকা ও কাশিম বাজারের কুঠি হস্তগত করিয়া তাহাদিগকে বাঙ্‌লা হইতে বাহির করিয়া দেন। *

ইব্রাহিম খাঁ।

সায়েস্তা খাঁর পরে ইব্রাহিমখাঁ বঙ্গের শাসন কর্ত্তা হইয়া জাহাঙ্গীর নগরে আগমন করিলেন, ইনি অত্যন্ত ন্যায় পরায়ণ নরপতি ছিলেন এমন কি একটী সামান্য পিপীলিকাকেও তিনি উৎপীড়িত হইতে দেখিতে পারিতেন না। ইব্রাহিম দয়া ও ন্যায় পরায়ণতার আধিক্যে একরূপ কাপুরুষ নরপতি হইয়া পড়িয়াছিলেন। ইহার সময়েই ইংরেজদের ক্ষমতা বাঙ্গালায় বদ্ধমূল হইবার সুযোগ ঘটে। এ সময়ে শোভাসিংহ নামক বর্দ্ধমানের একজন জমিদার বিদ্রোহী হয়। তাহার হস্তে বর্দ্ধমানের মহারাজা কৃষ্ণরামের প্রাণ গেল

শোভাসিংহের বিদ্রোহ।

এবং রাজার যাবতীয় ধন রত্ন ও তাঁহার স্ত্রী পুত্রাদির প্রাণ বিনষ্ট হইল। জগতে পাপীর শাস্তি চিরদিনই হইয়া থাকে। কখন ইহা শীঘ্র কখন বা বিলম্বে ঘটে, কিন্তু শোভাসিংহের পাপের ফল শীঘ্রই ফলিল। সে যখন বর্দ্ধমানের রাজকুমারীর ধর্ম্মনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছিল তখন রাজকুমারীর হস্তস্থিত তীক্ষ্ণ ছুরিকাঘাতে তাহার প্রাণ বিয়োগ হয়। অতঃপর বিদ্রোহীরা রহিম

---

* Feringy Bazar, situated upon the Issamutty, was originally inhabited by Portuguese. They settled here during the Government of Shaista Khan in 1663 and consisted chiefly of persons who had deserted from the Rajah of Aracan to Hussein Beg. the Moghul officer then beseiging Chittagong. It was once a place of considerable size, but since the decline of trade, it has dwindled down to a village, still containing however in the midst of its huts a few large brick houses. (Topography of Dacca, P. 103).

নামক অপর একজনকে শোভাসিংহের পদে নিযুক্ত করিয়া বিদ্রোহ চালাইতে থাকে। ইংরেজেরা ও সুযোগ বুঝিয়া সুবেদারের নিকট আবেদন করিয়া আত্মরক্ষার্থ কলিকাতায় তৎকালীন ইংলণ্ডের সম্রাট তৃতীয় জর্জ্জের নামানুযায়ী ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। ক্রমে বঙ্গদেশের নানাবিধ অত্যাচার অবিচার ঔরংজেবের কর্ণগোচর হইলে তিনি তাঁহার পৌত্র যুবরাজ আজিমকে বাঙ্‌লা শাসন করিতে প্রেরণ করেন। এ সময় হইতেই বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তার পদবী নবাব নাজিম হয়। ইব্রাহিমের পর মুর্শিদকুলীখাঁ বাঙ্গালার নবাব নিযুক্ত হন, ইনি অত্যন্ত বিচক্ষণ শাসন কর্ত্তা ছিলেন। মুর্শিদ পূর্ব্বে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের সন্তান ছিলেন অবশেষে এক মুসলমান বণিক তাহাকে ক্রয় করিয়া মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করে। নিজ অধ্যবসায় ও সৌজন্য গুণে তিনি এত বড় উচ্চপদ লাভ করিতে সমর্থ হইয়া ছিলেন। তিনি ন্যায় পরায়ণ, বিদ্যোৎসাহী ওমিতাচারী ছিলেন। বাঙ্গালার রাজস্বের নূতন বন্দোবস্তই তাঁহার সর্ব্বপ্রধান কীর্ত্তি। মুর্শিদ কুলীর পরে তদীয় জামাতা সুজাউদ্দৌলাও তৎপরে তাঁহার দৌহিত্র সরফরাজখাঁ নবাব নাজিমীর পদে নিযুক্ত হন। সরফরাজ খাঁর শাসন কালের সহিত বিক্রমপুরের ইতিহাসের একটী বিশেষ ঘটনার সম্বন্ধ আছে বলিয়াই আমাদিগকে এতটা প্রাচীন ইতিহাস আলোচনা করিতে হইল; ১৭০৩খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ঢাকায় বাঙ্গালার রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল মুর্শীদকুলিই রাজধানী ঢাকা হইতে মুক্‌সুদাবাদে স্থানান্তরিত করেন। ইহাঁর সময়ে ১৭২২ খ্রীষ্টাব্দে বাঙ্গালার ভূমি তৃতীয়বার বন্দোবস্ত হয়—এই বন্দোবস্তে বাঙ্গলা দেশ ১৩ চাকলা, ৩৪ সরকার ও ১৬৬০ মহালে বিভক্ত হয়। *

মুর্শিদকুলিখাঁ

* টোডর মল্লের বন্দোবস্তের ৭৬ বৎসর পরে ১৬৫৮ খ্রীষ্টাব্দে সুলতান সুজার দ্বিতীয়

মুর্শিদ কুলির মৃত্যুর পরে তদীয় জামাতা সুজাউদ্দৌলা (সুজাউদ্দীন) ১৭২৫ খ্রীষ্টাব্দে বাঙ্গালার শাসন কর্ত্তা হন। ইহার সময়ে ১৭২৮ খ্রীষ্টাব্দে (১১৩৫ বঙ্গাব্দে) ঢাকা নোয়াবত্তের এক ওয়াশীল জমা তুমারি প্রস্তুত হয়। ইহার সহিত আমাদের বিশেষ প্রয়োজন নাই বোধে তাহা পরিত্যাগ করিলাম। সুজাউদ্দীন ধার্ম্মিক এবং প্রজাবৎসল নরপতি ছিলেন। তাঁহার শাসন সময়েই স্বাধীন ত্রিপুরা রাজ্য মোগল সম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৭৩৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার প্রাণ বিয়োগ হয়। সুজাউদ্দৌলার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র সরফরাজ খাঁ বাঙ্গলার সুবেদার নিযুক্ত হন। এই সময়ে ইরান রাজবংশোদ্ভব ঘালেব আলি খাঁ সুবেদার সরফরাজের প্রতিনিধি স্বরূপ ঢাকার নায়েব ও যশোবন্ত রায় তাঁহার দেওয়ান ছিলেন। রাজ-কার্য্য সমুদায়ই যশোবন্ত রায়কে সম্পাদন করিতে হইত। যশোবন্ত ধার্ম্মিক, সাধু ও কর্ম্মনিষ্ঠ ছিলেন। খ্যাতনামা রাজা রাজবল্লভ সেন গুপ্ত এ সময়ে তাঁহার মোহরের ছিলেন। বর্ত্তমান সময়ে বিক্রমপুরের গ্রামে গ্রামে যে সুখশান্তি বিরাজিত তাহার জন্য যশোবন্ত ও ঘালেব আলি খাঁর নিকট বিক্রমপুরবাসী বিশেষ ঋণী। সে ঋণের কথাই এখন আমরা বলিতে যাইতেছি। মানসিংহ বারভূঁইয়াগণকে দমন করিয়া গেলে পর তাহাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য বা জমিদারীগুলি বহুভাগে বিভক্ত হইয়া

ওয়াশীল জমাতুমারি।

সেকালের জমিদার ও বিক্রমপুরের সুখ শান্তি।

বন্দোবস্ত এবং মুর্শিদ কুলিখাঁর সময় ১৭২২খ্রীষ্টাব্দে তৃতীয় বন্দোবস্ত হয়। এই বন্দোবস্তের কাগজের নাম "জমা কামেল তুমারী"। মুর্শিদের সৃষ্ট এই চাকলার মধ্যে ১১ চাকলা নিজ বঙ্গদেশের অপর দুইটি ওড়িষ্যার। আমরা এখানে চাকলা গুলির নাম দিলাম। বন্দর বালেশ্বর, হিজলী, মুর্শিদাবাদ, বর্দ্ধমান, সপ্তগ্রাম, (হুগলী) যশোহর, ভূষণা, আকবর নগর, ঘোড়াকাট, কারীবাড়ী, জাহাঙ্গীর নগর, শীলেট এবং চাটগাও—এ সমুদায় চাকলার রাজস্বের বন্দোবস্ত জমিদারগণের সহিত হইয়াছিল। বলা বাহুল্য যে বিক্রমপুর জাহাঙ্গীর নগর চাকলার অন্তর্ভুক্ত ছিল।

যায় এবং তাহাতে অনেক জমিদারের অভ্যুত্থান ঘটে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে কেদার রায়ের জমিদারী নিজ বিক্রমপুর নওপাড়ার ভরদ্বাজ বংশীয় বৈদ্য চৌধুরী দিগের হস্তগত হয়। এই বংশের প্রথম জমিদার রঘুনন্দন দাশ চৌধুরী অত্যন্ত গুণবান, সচ্চরিত্র ও বিনয়ী ছিলেন।

নওপাড়ার চৌধুরী।

তাঁহার এ সমুদয় সদ্‌গুণাবলী দেখিয়াই মানসিংহ তাঁহাকে জমিদারী অর্পণ করিয়া ছিলেন। ইনি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর হইয়া গর্ব্বিত হওয়া দূরে থাকুক বরং অত্যধিক বিনয়ী ও সজ্জনরূপে পরিচিত হইয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে তদীয় বংশধরগণ ক্রমশঃ অত্যন্ত অত্যাচারী হইয়া ওঠে—ইহাদের অত্যাচার কাহিনী অদ্যাপিও বিক্রমপুরের বৃদ্ধ নর নারীগণ গল্প করিয়া থাকেন। ইহাদের অত্যাচারের মাত্রা ক্রমশঃই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া ক্রমে উহা সর্ব্ব শ্রেণীর মধ্যেই গড়াইয়া পড়িল, শুনা যায় যে ইহারা সাড়ে সাতশ ঘর লোককে ক্রীতদাস বা (নফর) নিযুক্ত করিয়াছিলেন। নওপাড়ার চৌধুরীগণের যখন এইরূপ প্রবল প্রতাপ তখন বিক্রমপুরে বৈদ্য সম্প্রদায়ের মধ্যে, জপ্সার রায়, সোণারঙ্গের ও সোম কাটের ভূঞা, এবং সরকার ও বাঘিয়ার (পরে দশলঙ্গ) গুপ্ত এবং কায়স্থ সম্প্রদায়ের মধ্যে মালখানগরের বসুগণ বিশেষ প্রতিপত্তিশালী ছিলেন। ব্রাহ্মণগণ তখন কেহই বৈষয়িক কার্য্যে লিপ্ত হইতে চাহিতেন না সেযুগে তাঁহারা পাণ্ডিত্যের প্রাবল্যে, যজন যাজনে ও টোল চতুষ্পাঠিতে ছাত্র শিক্ষা দিয়াই সময় কাটাইতেন কোনও গোলযোগের ধার ধরিতেন না।

মালখানগরের বসু মহাশয়েরা পূর্ব্ব হইতেই বিশেষ ক্ষমতাশালী ও অবস্থাপন্ন ছিলেন কিন্তু তাহা হইলে কি হয় একা কখনই এইরূপ প্রবল প্রতাপান্বিত জমিদারের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়া যায় না। এখন উৎপীড়ন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইহারা সকলে উৎপীড়িত প্রজাবৃন্দের পক্ষ হইয়া জমিদারের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন। জমিদারও প্রজাগণের শক্তিকে

পদদলিত করিবার জন্য নিত্য নূতন নূতন অত্যাচারের সৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না, উভয় পক্ষের দাংগা হাঙ্গামা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে আরম্ভ করিল এবং বিক্রমপুরের গ্রামে গ্রামে অশান্তি বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

প্রজারা অবশেষে মিলিত হইয়া জমিদারের বিরুদ্ধে নবাব সরকারে অভিযোগ আনয়ন করিলেন, জমিদার ও বাইচের নৌকা ভঙ্গ ইত্যাদি কয়েকটী মিথ্যা দোষে দোষী করিয়া প্রজার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিলেন। ন্যায়পরায়ণ খালেব আলি খাঁ ও যশোবন্ত রায় অনুসন্ধান দ্বারা প্রজার মনোব্যথা ও অত্যাচার অবিচারের কথা জ্ঞাত হইলেন। প্রজার করুণ ক্রন্দনে তাঁহাদের করুণ হৃদয় ব্যথিত হইল, তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন যে যদি প্রজাদিগকে জমিদারের হস্তে অর্পণ করা যায় তাহা হইলে ইহাদের আর রক্ষা নাই—কাজেই তাঁহারা ন্যায় বিচার করিয়া অনুমতি দিলেন যে অতঃপর যে কোন প্রজা জমিদারের অধীন হইতে নিজ নিজ বিষয় সম্পত্তি নবাব সরকারের সেরেস্তায় নাম জারি করিবে তাহাদের আর জমিদারের সহিত কোনও সম্বন্ধ রহিবে না। হুকুম প্রচারের সঙ্গে সঙ্গেই প্রজাগণ আবেদন দ্বারা নিজ নিজ সম্পত্তির নবাব সেরেস্তায় নাম জারি করিয়া লইল। *

এইরূপে জমিদারের কবল হইতে মুক্তি লাভই বিক্রমপুরের উন্নতির কারণ। দেওয়ান যশোবন্ত রায়ের শাসন সময়ে বিক্রমপুরবাসীগণ যে পরম শান্তি ও সুখ ভোগ করিয়াছিলেন সেই রাম রাজত্বের শুভ ফল আজিও বিক্রমপুরবাসীগণ ভোগ করিতেছেন। আজ কতদিন—কত বর্ষ—কত যুগান্তর চলিয়া গিয়াছে, যশোবন্ত স্বর্গলোকে গমন করিয়াছেন, কিন্তু আজিও তিনি পদ্মার উভয় তটবর্ত্তী বিক্রমপুরবাসীগণের

* বীর কাহিনী—শ্রীআনন্দ নাথ রায় (ঐতিহাসিক চিত্র)।

হৃদয় সিংহাসনে দেবতারূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া পূজিত হইতেছেন। আর বিক্রমপুরের গৌরব যে সকল মহাত্মা দুঃখ ও নির্য্যাতন মাথায় লইয়া এই মহৎ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন তাঁহাদের যশ অক্ষয় হইয়া অনন্তকাল পর্য্যন্ত স্বদেশবাসীর হৃদয়ে জাগরুক থাকিবে। তাঁহাদের দেহাবশেষ মৃত্তিকার অণুতে অণুতে মিশিয়া ধ্বংস হইয়া গিয়াছে—কিন্তু যে অক্ষয় কীর্ত্তি তাঁহারা অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন তাহা আজিও বংশপরম্পরার সহিত হৃদয়ে হৃদয়ে গীত হইয়া আসিতেছে।

সেই শুভদিন হইতেই নওপাড়ার চৌধুরী গণের গৌরব ও রাজলক্ষ্মী অন্তর্হিতা হইয়াছেন; আর সে বংশে দেবীর কখনও শুভদৃষ্টি হইবে এইরূপ আশা করা যায় না কারণ সে বংশে এখন আর তেমন খ্যাতনামা ব্যক্তি কেহই জন্মগ্রহণ করেন নাই। *

যে সময়ে যশোবন্ত ঢাকার দেওয়ান পদে আসীন ছিলেন তখন সরফরাজ তদীয় ভগিনী নফিসা বেগমের অনুরোধে তাঁহার পুত্র এবং সরফরাজের জামাতা মোরাদ আলির প্রতি নাওয়াড়া বা নৌবিভাগের

* বল্লাল সেনের ভয়ে ভরদ্বাজ গোত্রীয় যে একঘর দাশ জঙ্গলে পলাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহার বংশেই প্রখ্যাতনামা গৌরীদাস ঠাকুরতা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, উক্ত গৌরীদাসের দুই পুত্র শ্রীনাথ ও যাদবেন্দ্র। ইঁহারা মুন্সীগঞ্জ থানার অধীন চাপাতলী গ্রামে বাস করিতেছেন। এই শ্রীনাথ দাশের পুত্র খ্যাতনামা রূপচন্দ্র পঞ্চানন মহাশয়ই পরে রাজাবাড়ী থানার অধীন নওপাড়া গ্রামে গৃহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, সে নওপাড়া বহুদিন হইল পদ্মা নদীর কুক্ষিগত হইয়াছে। খ্যাতনামা জমিদার রঘুরাম দাশ মহাশয় এই বংশোদ্ভব। অন্য এক শাখা প্রসিদ্ধ বানারী গ্রামে বাস করিতে থাকেন, তাঁহাদের বংশধরগণ অদ্যাপি জীবিত আছেন। রঘুরাম রায় অত্যন্ত খ্যাতিমান লোক ছিলেন:—"পদ্মা তাকাতে যান, বাঙ্গালাতে রঘুরাম বজ্র ভরিয়া যায় খ্যাতি"। নওপাড়াস্থিত বংশধর শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসাদ দাশ ঠাকুরতা ও তাঁহার পুত্রদ্বয় শ্রীযোগেন্দ্রপ্রসাদ দাশ ঠাকুরতা ও শ্রীরাজেন্দ্রপ্রসাদ দাশ ঠাকুরতা ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত পঞ্জুরা গ্রামে বাস করিতেছেন।

ভার অর্পিত হয়। এসময়ে রাজা রাজবল্লভ নৌবিভাগের মোহরের ছিলেন। সায়েস্তা খাঁর শাসন সময়ে ঢাকায় প্রতি টাকায় আটমন করিয়া চাউল বিক্রী হইয়াছিল। সায়েস্তা খাঁ তাহার স্মরণার্থ ঢাকা নগরীর কেল্লার তোরণ দ্বারে খোদিত লিপি রাখিয়াছিলেন যে যদি কোন শাসনকর্ত্তা একসের চাউলের মূল্য এক দামড়ী (পয়সা) নির্দ্দেশ করিতে পারেন তাহা হইলে যেন এ দ্বার উন্মুক্ত হয়। যশোবন্ত রায় সায়েস্তা খাঁর মতানুসারে তাঁহার সময় অপেক্ষা একসের চাউল অধিক বিক্রয় করা নির্দ্দেশ করণান্তর মহাসমারোহে এই তোরণ দ্বার উন্মুক্ত করিলেন। সে সময় ঢাকার সমগ্র ভূভাগ, বিক্রমপুর প্রভৃতির সর্ব্বত্র এমনি শান্তি বিরাজমান ছিল যে আর কাহারও সময় তদ্রূপ হয় নাই।

নকিসা বেগমের অনুরোধে গালেব আলি খাঁকে ঢাকা হইতে স্থানান্তরিত করিয়া সরফরাজ যখন মোরাদ আলিকে ঢাকার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করেন সে সময় হইতেই ঢাকার চতুর্দ্দিকে অশান্তি বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। মোরাদ অত্যন্ত অত্যাচারে প্রবৃত্ত হন, যশোবন্ত রায় পূর্ব্বে সুনামের ভাগী হইয়া অবশেষে দুর্নামের ভাগী হইতে অনিচ্ছুক হইয়া এই কার্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক ঢাকা হইতে মুর্শিদাবাদ গমন করেন।

বিক্রমপুর ও ঢাকার সর্ব্বত্র অশান্তি।

রাজবল্লভ এ সময়ে মোরাদের কৃপায় নৌবিভাগের পেস্কারের পদে উন্নীত হন। যশোবন্তের ঢাকা পরিত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে ঢাকা প্রদেশের সর্ব্বত্র যারপরনাই অত্যাচার অবিচার হইতে থাকে। গ্রামে গ্রামে দুর্ভিক্ষ, ডাকাতি লুণ্ঠন, চুরি রাহাজানি প্রভৃতি এতদূর বৃদ্ধি পায় যে জনসাধারণের হাহাকারে চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছিল। সে সময়ে বিক্রমপুরবাসীগণ দারুণ অশান্তিতে দিন কাটাইতেন—কাহার বাড়ীতে কোন্ সময় ডাকাত পড়ে—কোন্ বাড়ী আগুণ লাগে—কোথায় কোন্ কুল-ললনা অপহৃত হয় এই দুশ্চিন্তায়

লাঠি সড়কি হস্তে পল্লীযুবকগণ গ্রামে গ্রামে বাড়ীতে বাড়ীতে পাহারা দিয়া বেড়াইত। মোরাদের অত্যাচার বিক্রমপুরে ধ্বংস ও দারিদ্র্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ হাহাকার আনয়ন করিয়াছিল।

সরফরাজ খাঁ ইন্দ্রিয় পরায়ণ ও অত্যাচারী ছিলেন, তাঁহার অত্যাচারে ও অবিচারে উৎপীড়িত হইয়া আলম চাঁদ জগৎ শেঠ, হাজি মহম্মদ ও আলিবর্দ্দী খাঁ প্রভৃতি ষড়যন্ত্রপূর্ব্বক তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এই ষড়যন্ত্রের ফলে ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে আলিবর্দ্দী খাঁ মুর্শিদাবাদের নিকটবর্ত্তী গিরিয়া নামক স্থানে সরফরাজের সহিত যুদ্ধ করেন—সেই যুদ্ধে সরফরাজ খাঁ নিহত হন এবং আলিবর্দ্দী খাঁ বাঙ্গালা, বিহার ও ওড়িষ্যার নবাবী পদ প্রাপ্ত হইলেন। আলিবর্দ্দী খাঁর শাসন সময়েই মহারাষ্ট্রীয়েরা বঙ্গদেশ আক্রমণ করে। ইহারা সম্মুখ যুদ্ধে অগ্রসর না হইয়া গ্রামে গ্রামে লুঠ তরাজ করিয়া বেড়াইত, সুতরাং আলীবর্দ্দী ইহাদিগকে দমন করিতে না পারিয়া উহাদিগকে ওড়িষ্যা প্রদেশ ছাড়িয়া দিলেন এবং বার্ষিক লক্ষ টাকা কর দিতে অঙ্গীকার করিলেন। এখনও কুলললনাগণ অশান্ত শিশুগণকে ঘুম পাড়াইবার সময়—

আলিবর্দ্দী খাঁ।

ছেলে ঘুমাল পাড়া জুড়াল বর্গী এল দেশে,
বুলবুলীতে ধান খেয়েছে খাজনা দিব কিসে।

এই ছড়ার আবৃত্তি করিয়া থাকেন, ইহার উৎপত্তি বর্গীর হাঙ্গামা হইতেই হইয়াছে। সৌভাগ্যের বিষয় যে বর্গীর হাঙ্গামার উৎপাত বিক্রমপুর বাসীদিগকে সহ্য করিতে হয় নাই। ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে আলীবর্দ্দী খাঁর মৃত্যু হয় তাঁহার কোনও পুত্র সন্তান ছিল না সুতরাং তাঁহার প্রিয়তম দৌহিত্র সিরাজউদ্দৌলা বাঙ্গালা ও বিহারের সুবেদার হইলেন। তিনি যখন বাঙ্গালার নবাব হইলেন তখন তাহার বয়স ২০ বৎসর মাত্র। এই হতভাগ্য যুবকের শাসন সময়েই পলাশীর যুদ্ধ ক্ষেত্রে মীরজাফর

প্রভৃতি বিশ্বাস ঘাতকের সাহায্যে ক্লাইব কৃষ্ণনগর ও মুর্শিদাবাদের মধ্যবর্ত্তী পলাশী নামক গ্রামে (২১শে জুন ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে) নবাবকে আক্রমণ করিয়া বিজয়ী হইলেন। এই যুদ্ধ হইতেই এদেশে ইংরেজদিগের সৌভাগ্যের সূত্রপাত হইল—তাঁহারাই এখন দেশের প্রকৃত অধীশ্বর হইলেন—সে সব কাহিনী পরবর্ত্তী অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ করা গেল।

পাঠানদের অপেক্ষা মোগলেরা শাসন কার্য্যে অধিক নিপুণ ছিলেন। ইঁহারা প্রায় দেড়শত বৎসর অসীম প্রতাপের সহিত দেশ শাসন করিয়াছিলেন। ব্যবসায় বাণিজ্য প্রভৃতি সে সময়ে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করে—তাঁতী, কর্ম্মকার প্রভৃতি ব্যবসায়ীরা তখন বেশ স্বচ্ছল অবস্থায় ছিল,—তবে শান্তি রক্ষা ও বিচার পদ্ধতি উৎকৃষ্ট ছিলনা। এইজন্য এখনও লোকে বিচার বিভ্রাট লক্ষ্য করিলে 'কাজীর বিচার' একথা বলিয়া উপহাস করিয়া থাকে। মোগল রাজত্ব সময়ে বঙ্গসাহিত্য বিশেষ পুষ্টি লাভ করে—সে সময়ে মুকুন্দরাম, চণ্ডীদাস, কাশীরামদাস, ঘনরাম, রামপ্রসাদ সেন, ভারতচন্দ্র রায় প্রভৃতি মহাত্মা-গণ জন্মগ্রহণ করিয়া বাঙ্গলা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়া গিয়াছেন। তৎকালে পার্সী ভাষাই রাজভাষা ছিল, লোকে যত্নের সহিত পার্সী শিক্ষা করিত। জনসাধারণের শিক্ষা বিধানের জন্য রাজকীয় কোনও রূপ বিধি ব্যবস্থা ছিলনা,—গ্রামে গ্রামে পাঠশালাও মক্তব থাকিত তাহাতেই গুরু মহাশয় ও মৌলভী মহাশয়েরা বালকগণের শিক্ষা বিধান করিতেন। তাহাদের দক্ষিণা ছিল, গ্রামবাসীদিগের প্রদত্ত চাউল, ডাল ও পূজা পার্ব্বণ উপলক্ষে পার্ব্বণী। এ ছাড়া বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় সর্ব্বত্র কোনও রূপ রাজ সাহায্য প্রদত্ত হইত না। *

মোগল শাসনে দেশের অবস্থা।

---

* মোগলশাসন সময়েও প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ মাদ্রাসায় সাহায্য প্রদত্ত হইত। ঢাকানগরে আসাদুল্লা নামক একজন মৌলভী ঢাকা মাদ্রাসার অধ্যাপক ছিলেন, তাঁহাকে মোগল

বিক্রমপুরে মোগলশাসন সময়ের কীর্ত্তি।

মোগলশাসন সময়ের চিহ্ন স্বরূপ বিক্রমপুরে দুইটি কীর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়।

একটী ইদ্রাকপুরের (মুন্সীগঞ্জ) কেল্লা—দ্বিতীয়টী সম্রাট আলমগীর সাহার (ঔরংজেব) রাজত্ব সময়ে তাঁহার জনৈক আনোয়ারী সভ্য কর্ত্তৃক

পাথরঘাটার মসজিদ।

১১০২ হিজরায় নির্ম্মিত শ্রীনগর থানার এলাকাধীন পাথর ঘাটা নামক গ্রামের একটী মসজিদ। এই মসজিদের বাহ্যাকৃতি ৩৪×২০ ফিট। দরোজার উপরে যে প্রস্তর ফলক আছে তাহাতেই ইহার বিষয় সুস্পষ্ট লিখিত আছে। মসজিদের উপরে একটী ও দুই পার্শ্বে ছোট দুইটি গম্বুজ আছে, ঢাকার নবাব আসান উল্লা বাহাদুর ইহা মেরামত করাইয়া দেওয়ায় এই মসজিদটির অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা ভাল হইয়াছে। স্থানীয় মুসলমানগণ ইহাতে দৈনিক উপাসনাদি করিয়া থাকে। *

গবর্ণমেন্ট মাসিক ৬০, ষাটি টাকা বেতন প্রদান করিতেন, তৎকালে তাঁহার বিদ্যাবত্তার যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। মৌলভী সাহেব ১৭৫০ খ্রীষ্টাব্দে বৃদ্ধ বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হন। জেমস্ টেইলার সাহেব ইহাঁর সম্বন্ধে তৎ প্রণীত Topography of Dacca নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন:—The last professor that taught at Dacca was a person of the name of the moolavy Assaud Ullah. He had a salary of 60 rupees a month from the Moghul Government, and at his school, which was held in a Mushjhid at the Lall Bagh, the youth of the city were taught the Arabic language, logic, metaphysics and law. He died about the year 1750 since which date there has been no public teacher of any of those branches of learning here. (274. p.)

* The Majid was built in Hijri 1102, i. e. 207. years ago, by one Anwar, a courtier of Emperor Alamgir Shah (Aurangzeb), and bears an inscription in front. It is 34×20, out side measurment, has one central dome and a smaller one on each side. Government publication List of the monuments in the District of Dacca, page 24.

সপ্তম অধ্যায়।

মহারাজ রাজবল্লভ ও রাজনগর।

যে কৃতী পুরুষের নাম বাঙ্‌লার ইতিহাসে সুপরিচিত, যাঁহার কাহিনী বঙ্গের ঘরে ঘরে নানা ঔপন্যাসিক কথার ন্যায় আলোচিত হয়, এক্ষণে আমরা তাঁহার বিষয় আলোচনা করিব। এই স্বনাম খ্যাত রাজার কল্যাণে বিক্রমপুর একদিন ধনৈশ্বর্য্যে অতি উচ্চ স্থান অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিল। এই পুরুষ প্রবরের জীবনী আলোচনা করিবার পূর্ব্বে তাঁহার বংশ পরিচয়ও সংক্ষেপে প্রদান করিলাম। মহারাজা বল্লাল-সেনের রাজত্ব সময়ে বীরভূমের অন্তর্গত সেনভূম নামক স্থানে শ্রীহর্ষ নামক জনৈক মহাত্মা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইনি সে সময়ে বৈদ্য বংশ মধ্যে বিশেষ প্রসিদ্ধ ও পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। সেনভূম পরগণা সম্পূর্ণ তাঁহার করায়ত্ত ছিল। তাঁহার কমল ও বিমল নামে দুইটি পুত্র জন্মে, বিমল সেনের পুত্র বিনায়ক সেন, তৎপুত্র ধন্বন্তরি সেন, ধন্বন্তরির পুত্র গাণ্ডেয়ী, গাণ্ডেয়ীর পুত্র হিঙ্গু, হিঙ্গুর পুত্র বলভদ্রসেন। *

বংশ পরিচয়।

বিনায়ক সেনের আরও বহু পুত্র সন্তান ছিল, তাহার মধ্যে তিনিই কেবল পৈতৃক কৌলীন্য মর্য্যাদা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। † হিঙ্গুসেনের উচলী, ডমন, বিকর্ত্তন, বলভদ্র. হল ও কমল সেন এই ছয় পুত্র হয়, ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ কুলীন ও কেহ কেহ মৌলিক স্থির হন।

---

* হিঙ্গু রাঢ় দেশ পরিত্যাগ করিয়া খুলনার অন্তর্গত সেনহাটি গ্রামে আসিয়া বাস করেন, পূর্ব্বে ঐ স্থানের নাম ছিল চুঁচহাটি, সেন মহাশয়ের আগমনের পর হইতেই উহা সেনহাটি নামে সাধারণের নিকট পরিচিত হইয়া উঠে।

† কবি কণ্ঠহার প্রণীত 'কুলপঞ্জিকা' দেখ।

সপ্তম অধ্যায়।

মহারাজ রাজবল্লভ ও রাজনগর।

যে কৃতী পুরুষের নাম বাঙ্গালার ইতিহাসে সুপরিচিত, যাঁহার কাহিনী বঙ্গের ঘরে ঘরে নানা উপাখ্যানের কথায় আজ আলোচিত হয়, এক্ষণে আমরা তাঁহার বিষয় আলোচনা করিব। এই মহান ব্যক্তি যাঁহার কল্যাণে বিক্রমপুর একদিন ধনৈশ্বর্য্যে অতি উচ্চ স্থান অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিল। এই পুরুষ প্রবরের জীবনী আলোচনা করিবার পূর্ব্বে তাঁহার বংশ পরিচয়ও সংক্ষেপে প্রদান করিলাম। মহারাজা বল্লাল

বংশ পরিচয়।

সেনের রাজত্ব সময়ে বীরভূমের অন্তর্গত সেনভূম নামক স্থানে শ্রীহর্ষ নামক জনৈক মহাত্মা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইনি সে সময়ে বৈদ্য বংশ মধ্যে বিশেষ প্রসিদ্ধ ও পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। সেনভূম পরগণা সম্পূর্ণ তাঁহার করায়ত্ত ছিল। তাঁহার কমল ও বিমল নামে দুইটি পুত্র জন্মে, বিমল সেনের পুত্র বিনায়ক সেন, তৎপুত্র ধন্বন্তরি সেন, ধন্বন্তরির পুত্র গাণ্ডেরী, গাণ্ডেরীর পুত্র হিঙ্গু, হিঙ্গুর পুত্র বলভদ্রসেন। *

বিনায়ক সেনের আরও বহু পুত্র সন্তান ছিল, তাঁহার মধ্যে তিনিই কেবল পৈতৃক কৌলীন্য মর্য্যাদা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। † হিঙ্গুসেনের উচলী, তমন, বিকর্ত্তন, বলভদ্র, হল ও কমল সেন এই ছয় পুত্র হয়, ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ কুলীন ও কেহ কেহ মৌলিক হিয় হন।

---

* [illegible]

† [illegible]

বলভদ্রের পুত্র অনিরুদ্র, অনিরুদ্রের পুত্র অর্জ্জুন, অর্জ্জুনের পুত্র বাচস্পতি, বাচস্পতির পুত্র হৃষীকেশ বা যশশ্চন্দ্রসেন—যশশ্চন্দ্রসেনের পুত্র গোবিন্দসেন—গোবিন্দের পুত্র রামভদ্র ও বেদগর্ভ। বেদগর্ভ সেন যশোহর জেলার অন্তর্গত ইতনা গ্রামে বাস করিতেন, তিনি বিদ্যাভ্যাস করিবার নিমিত্ত পাণ্ডিত্যের লীলা নিকেতন বিক্রমপুরের অন্তর্গত বিলদাওনিয়া গ্রামে আগমন করেন। * সে সময়ে প্রসিদ্ধ নওপাড়ার চৌধুরীবংশের দেওয়ান সত্যমন্ত দাস সে গ্রামে বাস করিতেন। বেদগর্ভ উক্ত কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া বিলদাওনিয়াতেই স্থায়ীরূপে বাস করিতে আরম্ভ করিলেন। পরে স্বকীয় বিদ্যাবত্তা ও প্রতিভাবলে বহু অর্থোপার্জ্জন পূর্ব্বক দায়নীয়, জপ্‌সা, ভোজেশ্বর প্রভৃতি গ্রাম ক্রয় করিয়া সম্পত্তি বৃদ্ধি করেন। বেদগর্ভের শ্রীকৃষ্ণ ও নীলকণ্ঠ নামে দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করেন, তন্মধ্যে নীলকণ্ঠ সেন জপ্‌সা গ্রামে গিয়া বাস করিতে থাকেন, তাঁহার বংশে রামগতি রায়, লালা জয়নারায়ণ, আনন্দময়ী দেবী গঙ্গাদেবী প্রভৃতি বহু খ্যাতনামা কবি জন্মগ্রহণ করিয়া বংশ উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন। জপ্‌সা গ্রামের রায় বংশীয়গণ নীলকণ্ঠেরই অধস্তন পুরুষ। শ্রীকৃষ্ণ সেন দাওনীয়াতেই বাস করিতে থাকেন। তাঁহার শ্রীমুখ, নরসিংহ এবং মহেশচন্দ্র নামে তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করে। শ্রীমুখ সেনের বংশধরগণ রাজনগরের অন্তর্গত মান্দারিয়া নামক পল্লীতে এবং মহেশচন্দ্রের উত্তর পুরুষগণ পশ্চিমপাড়া নামক পল্লীতে বাস করিতেন। মধ্যম নরসিংহ সেন ঢাকা নগরীতে রাজস্ব বিভাগে কার্য্য করিয়া মজুমদার উপাধি লাভ করেন, তদবধি তাঁহার বংশধরগণ এই উপাধি

বেদগর্ভের বিক্রমপুরে আগমন।

* আমার আত্মীয় পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত রসিক লাল গুপ্ত মহাশয় বলেন যে তিনি ব্রহ্মপুত্র স্নানোপলক্ষে বিক্রমপুরে আগমন করেন।

ভূষণে ভূষিত হইয়া আসিতেছেন। রামচরণ, রামনারায়ণ এবং রাম-গোবিন্দ নামে নরসিংহের তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তন্মধ্যে রামচরণ নিঃসন্তান অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হন। রামনারায়ণের বংশধরগণ রাউতপাড়া নামক পল্লীতে অবস্থান করিতেন। সর্ব্ব কনিষ্ঠ রাম-গোবিন্দের কৃষ্ণজীবন নামক এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে, তন্মধ্যে প্রাণবল্লভ ও রামবল্লভ শৈশবেই কালগ্রাসে নিপতিত হন। ১৬৯৮ খ্রীষ্টাব্দে রাজবল্লভ জন্মগ্রহণ করেন। *

বাল্যশিক্ষা।

মহারাজা রাজবল্লভের পিতা কৃষ্ণজীবন মজুমদার তদীয় জ্যেষ্ঠতাত রামচরণের অনুকম্পায় প্রথমতঃ নাওয়ার মহলের এহ্‌তেমাস ও পরিশেষে খাসনবিসের পদে উন্নীত হইয়া পশ্চাৎ মজুমদারী পদলাভ করেন। কাহারও কাহারও মতে তিনি মালখা নগর নিবাসী দেবীদাস বসুর এক মোহরের নিযুক্ত হন। সে যাহা হউক কৃষ্ণজীবন নবাব সরকারে কার্য্যগ্রহণ করিয়া স্বকীয় অবস্থার যথেষ্ট উন্নতি সাধন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। রাজবল্লভের কীর্ত্তিরাশি নির্ম্মিত হইবার বহু পূর্ব্বেই তিনি 'নবরত্ন' নামক সুন্দর অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। রাজবল্লভের জন্ম সম্বন্ধে নানারূপ কিম্বদন্তী শুনিতে পাওয়া যায়, আমরা রসিক বাবুর গ্রন্থ হইতে

---

* রাজবল্লভের জন্ম তারিখ সম্বন্ধে মতভেদ দৃষ্ট হয়। ৺চন্দ্রকুমার রায় প্রণীত মহারাজা রাজবল্লভের জীবন-চরিত পাঠে জ্ঞাত হই যে 'রাজবল্লভ ১১০৫ বঙ্গাব্দে জন্মগ্রহণ ও ১১৭০ বঙ্গাব্দে প্রাণত্যাগ করেন।" প্রবীণ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত আনন্দনাথ রায় মহাশয়ও এমতাবলম্বী তিনি লিখিয়াছেন, "আমরা ১১০৫ বঙ্গাব্দ বা ১৬৯৯ খ্রীষ্টাব্দই রাজবল্লভের জন্মমাস ধরিয়া লওয়া সঙ্গত বিবেচনা করি।" শ্রীযুক্ত আনন্দনাথ রায়ের সিদ্ধান্তই যথার্থ বোধে আমরাও রাজবল্লভের জন্ম সন ১৬৯৯ খ্রীঃ অঃ বলিয়া উল্লেখ করিলাম। 'ঐতিহাসিক চিত্র' ভাদ্র ও আশ্বিন শ্রীযুক্ত আনন্দনাথ রায় লিখিত 'মহারাজা রাজবল্লভ সেন' শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

এস্থানে একটী উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। 'কৃষ্ণজীবনের প্রথম দুই পুত্র অতি অল্পবয়সে কালগ্রাসে পতিত হন। কথিত আছে যে জনৈক সন্ন্যাসী কৃষ্ণজীবনের গৃহে আগমন করিয়া প্রকাশ করেন যে ঐ পুত্রদ্বয় অপদেবতা। অনন্তর ঐ সন্ন্যাসী মন্ত্রপ্রয়োগ দ্বারা উভয়কে বিনষ্ট করিয়া কৃষ্ণজীবনকে একটী লক্ষ্মীনারায়ণ চক্র প্রদান করেন এবং তাঁহার বংশে এক মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিবেন বলিয়া আশ্বস্ত করেন। রাজনগরের সুপ্রসিদ্ধ রাজা লক্ষ্মীনারায়ণই ঐ সন্ন্যাসী প্রদত্ত লক্ষ্মীনারায়ণ চক্র এবং সন্ন্যাসীর কথিত মহাপুরুষই রাজবল্লভ সেন।

* * * রাজবল্লভের জন্মের অব্যবহিত পূর্ব্বে একদা রজনী যোগে কৃষ্ণজীবন ও তদীয় সহধর্ম্মিণী একত্রে নিদ্রাগত আছেন। এমন সময় মজুমদার পত্নী স্বপ্নে দেখিলেন যে, স্বয়ং চন্দ্রমা আকাশ হইতে ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া তাঁহার উদর মধ্যে প্রবেশ করিতেছেন। অনন্তর তিনি জাগরিত হইয়া স্বপ্নবৃত্তান্ত স্বামীর নিকট জ্ঞাপন করিলে কৃষ্ণজীবন তদীয় গণ্ডদেশে এক চপেটাঘাত করেন। জমিদার তনয়া * স্বামী হস্তে এইরূপে অপ্রত্যাশিত ভাবে লাঞ্ছিত হইয়া অভিমান ভরে সমস্ত রজনী অনিদ্রায় কর্ত্তন করেন। রাত্রি প্রভাত হইলে কৃষ্ণজীবন পত্নীকে এই বলিয়া প্রবোধ দিলেন যে, শুভস্বপ্ন দেখিয়া নিদ্রাগত হইলে তাহা কখনও সফল হয় না এবং তাঁহাকে জাগরিত রাখিবার উদ্দেশ্যেই ঐরূপ দুর্ব্ব্যবহার করা হইয়াছে। বলা বাহুল্য রাজবল্লভের ভাবী জননী একথা শুনিয়া সান্ত্বনা লাভ করিয়াছিলেন।" এতদ্ব্যতীত মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের হস্ত চালনা দ্বারা প্রাপ্ত :—

---

* রাজবল্লভের জননী বাখরগঞ্জ জেলার অন্তর্গত উত্তর সাহাবাজপুর পরগণার জনৈক জমীদারের কন্যা ছিলেন। কৃষ্ণজীবন শ্বশুরের নিকট হইতে যৌতুক স্বরূপ লক্ষ্মীদিয়া নামক তপা প্রাপ্ত হন।

কিংবা পৃচ্ছসি রে মূঢ় বারংবারং পুনঃ পুনঃ।
পূর্ব্বে রাজা জরাসন্ধ ইদানীং রাজবল্লভঃ॥

এ সকল কিম্বদন্তীর মধ্যে কতটুকু সত্য আছে তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। আমাদের দেশে যে কোন কৃতী পুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তাহাকেই যখন আমরা অবতার বলিয়া গ্রহণ করি এবং নানা ডালপালে তাহার অলৌকিকত্ব বর্ণনা করি, তখন মহারাজা রাজবল্লভের ন্যায় একজন খ্যাতিমান পুরুষের নামের সঙ্গে এইরূপ কিম্বদন্তীর সংমিশ্রণ থাকিবে তাহা অবিশ্বাস করিবার কোন কারণই বিদ্যমান নাই।

রাজবল্লভ শৈশবেই পিতৃহীন হন। পিতার মৃত্যুর পরে তিনি অন্যান্য জ্ঞাতি ও ভ্রাতাগণের সহিত জপ্‌সা গ্রামে দেওয়ান কৃষ্ণরামের বাড়ীতে থাকিয়া রঘুনন্দনের নিকট লেখা পড়া শিক্ষা করেন। সেকালে বিলদাওনিয়া গ্রামে কোনও চতুষ্পাঠী বা মক্তব ছিল না, জপ্‌সা গ্রামই সে সময়ে সংস্কৃত ও পারসিক শিক্ষার নিমিত্ত বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল। সেখানে মক্তব ও চতুষ্পাঠী উভয়ই থাকায় দেশ দেশান্তর হইতে ছাত্র আসিয়াও সেখানে অধ্যয়ন করিত। রাজবল্লভ শৈশব হইতেই অতিশয় প্রতিভাশালী ছিলেন, একদিকে যেমন তৎকাল প্রচলিত মল্লযুদ্ধ, অসি চালনা প্রভৃতি শারীরিক ব্যায়ামে খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন তদ্রূপ বিদ্যাবত্তায়ও সকলের মন আকর্ষণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। রূপে গুণে সর্ব্ববিষয়েই তাঁহার কৃতিত্ব ছিল।

রাজকার্য্য।

রাজবল্লভ সর্ব্ব প্রথমে কানুন্ গো সেরেস্তার মুহুরীর পদে নিযুক্ত হন (১৭১৭ খ্রীষ্টাব্দে) পরে মোরাদ আলি নাওয়ার বিভাগের অধ্যক্ষ পদ লাভ করিয়া ঢাকা নগরে আগমন করেন। তখন তিনি জমা নবিশের পদে নিযুক্ত ছিলেন। ১৭৩৮ খ্রীষ্টাব্দে মোরাদ ঢাকার নায়েব সুবেদার হইলে রাজবল্লভ তাঁহার অনুকম্পায় নাওয়ার বিভাগের পেস্কারের পদ লাভ করিলেন। ১৭৩৯ খ্রীষ্টাব্দে

নবাব সুজার্খার মৃত্যুর পরে সরফরাজ খাঁ বাঙ্‌লার সিংহাসনারোহণ করেন। যখন লোকের অদৃষ্ট-লক্ষ্মী সুপ্রসন্ন হয় তখন নানাদিক্ হইতেই সুযোগ সুবিধা ঘটে, রাজবল্লভেরও তাহাই হইল, তিনি নবাব সরফরাজ খাঁর কৃপাকটাক্ষে একেবারে নাওয়ার বিভাগের অধ্যক্ষপদ লাভ করিলেন।

সরফরাজ খাঁর মৃত্যুর পরে আলীবর্দ্দী খাঁ বাঙ্‌লার নবাব হন এবং নিবাইস মহম্মদ ঢাকার নায়েব নবাব হইলেন, নিবাইস মুর্শিদাবাদে থাকিয়াই তাঁহার বিশ্বস্ত প্রতিনিধি হোসেনকুলী খাঁকে দিয়া কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতেন। তখন হোসেন কুলী খাঁর অসাধারণ প্রতিপত্তি ছিল। গোকুলচাঁদ নামক হোসেনকুলীর একজন প্রিয়পাত্র তাহার পেস্কার ছিলেন, গোকুল কোনও কারণে স্বীয় প্রভুর উপর অসন্তুষ্ট হইয়া আলীবর্দ্দীর নিকট অভিযোগ করিলে হোসেনকুলী পদচ্যুত হন, কিন্তু আলিবর্দ্দীর জ্যেষ্ঠা তনয়া নিবাইস মহম্মদের পত্নী ঘাসেটী বেগমার সহায়তায় পুনরায় পূর্ব্বপদ লাভ করেন ও হিসাব নিকাশের দায়িত্বে ফেলিয়া গোকুলচাঁদের সর্ব্বনাশ সাধন করেন।

হোসেনকুলী রাজবল্লভের প্রতিভা ও কার্য্যকুশলতা অবগত ছিলেন, এদিকে গোকুলচাঁদের স্থলে একজন উপযুক্ত কর্ম্মচারী নিযুক্ত না করিলেও হয় না, এজন্য রাজবল্লভকে তিনি সহকারীর পদে নিযুক্ত করিয়া মুর্শিদাবাদ হইতে রাজোপাধি আনয়ন করিয়া দিলেন।

এই ঘটনার কিছুকাল পরেই ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে আলিবর্দ্দী খাঁর মৃত্যু হইলে পর তাঁহার দৌহিত্র সিরাজউদ্দৌলা বাঙ্‌লার নবাব হইলেন। ঘাসেটি বেগম তদীয় পোষ্য পুত্র এক্রামউদ্দৌলাকে মসনদে বসাইবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু তাহার সে চেষ্টা ব্যর্থ হইল। সিরাজ-উদ্দৌলার আদেশে ঘাসেটির প্রিয় পাত্র হোসেন কুলিখাঁর হত্যাকাণ্ড সাধিত হইল। হোসেন কুলিখাঁর মৃত্যুর পরে রাজা রাজবল্লভ নিবাইস মহম্মদের দেওয়ান নিযুক্ত হইলেন। নিবাইস অধিকাংশ সময়ই

মুর্শিদাবাদে থাকিতেন কাজেই রাজবল্লভ ঢাকায় এক প্রকার সর্ব্বেসর্ব্বা হইলেন—তাঁহার শক্তি অসাধারণ হইল; ইংরেজ ঐতিহাসিকগণ বলেন যে এ-সময়ে তিনি অত্যন্ত প্রজাপীড়ন ও ইংরেজ এবং ফরাসী বণিক্‌দিগের উপর জুলুম করিয়া ৪৩০০ টাকা আদায় করিয়াছিলেন। *

সে সময়ে ঢাকায় রাজবল্লভের প্রতিপত্তি এতদূর বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে তৎপুত্র কৃষ্ণদাসকে লোকে 'নবাব' নামে অভিহিত করিতেও কুণ্ঠিত হইত না।

নিবাইসের মৃত্যুর পরে রাজবল্লভ ঘাসেটি বেগমের সর্ব্ব বিষয়ে পরামর্শদাতা হইয়াছিলেন। আলিবর্দ্দী যখন মৃত্যুমুখে উপনীত, তখন বেগমের পক্ষ হইতে প্রায় দশ সহস্র সৈন্য সংগ্রহ পূর্ব্বক তিনি মুর্শিদাবাদের একক্রোশ দক্ষিণে মতিঝিল নামক উদ্যান মধ্যে ছাউনী করিলেন। যুদ্ধ বিদ্যা পারদর্শী রাজবল্লভ জানিতেন যে জয় পরাজয় অনিশ্চিত, যদি পরাজিত হন তাহা হইলে তাঁহার সমুদয় সম্পত্তি সিরাজউদ্দৌলার হস্তগত হইবে। এমতাবস্থায় ধন সম্পত্তি নিরাপদ করিবার নিমিত্ত তিনি তাঁহার মধ্যম পুত্র কৃষ্ণদাসকে সমস্ত সম্পত্তি সহ কলিকাতায় ড্রেক সাহেবের আশ্রয়ে থাকিবার জন্য পাঠাইয়া দিলেন। কৃষ্ণদাস পিতার আদেশে জগন্নাথ যাইবার ছল করিয়া কলিকাতায় উপস্থিত হইলেন। সে সময়ে ইংরেজেরা সামান্য ব্যবসায়ী মাত্র ছিল, এমন কি দুর্গ নির্ম্মাণের ক্ষমতা পর্য্যন্ত তাহাদের ছিল না। বাঙ্‌লার সুবেদারের গৃহ বিবাদ দর্শনে ইংরেজ এক পক্ষ অবলম্বনের সুযোগ দেখিতেছিলেন—ঠিক এমনি সময়ে রাজবল্লভের অনুরোধে কাশিমবাজারের কুঠীর অধ্যক্ষ ওয়াটস সাহেবের লিখিত কৃষ্ণদাসকে আশ্রয় দিবার জন্য অনুরোধ সূচক পত্র পাইয়া ড্রেক † সাহেবের অনুপস্থিতিতেও কৌন্সিলের অপরাপর

* Selection from the Records of Govt. India.

† ড্রেক সাহেব তখন বায়ু সেবনার্থ বালেশ্বর গমন করিয়াছিলেন।

কৃষ্ণদাসের কলিকাতায় আগমন।

সাহেবেরা কৃষ্ণদাসকে আশ্রয় প্রদান করিলেন। কৃষ্ণদাস ধন সম্পত্তি ও পরিজনবর্গ সহ ওমিচাঁদের ভবনে অবস্থান করিতে লাগিলেন। একথা শীঘ্রই সিরাজের কর্ণগোচর হইল, বৃদ্ধ আলিবর্দ্দী তখনও জীবিত, সিরাজ আলিবর্দ্দীর নিকট কৃষ্ণদাসের পলায়ন ও ইংরাজেরা ঘাসিটি বেগমের সহিত যোগ দিয়াছেন এই কথা বিবৃত করিলেন। কাশিম বাজারের কুঠির ডাক্তার ফোর্থ সাহেব তখন আলিবর্দ্দীর চিকিৎসা করিতেন, আলিবর্দ্দী ফোর্থকে এ বিষয় জিজ্ঞাসা করায় ফোর্থ সাহেব সমুদয় অস্বীকার করিলেন। সাহেব চলিয়া গেলে বৃদ্ধ নবাব সিরাজকে বলিলেন "বৎস, যদি তুমি ইংরেজ বণিক্‌দিগকে দমন করিতে না পার তাহা হইলে তোমার রাজ্য স্থায়ী হইবে না। সকলের আগেই ইংরেজ বণিক্‌কে দমন করা আবশ্যক।" এই ঘটনার কিছুদিন পরে ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই এপ্রেল তারিখে বর্ষীয়ান নবাব মৃত্যু মুখে পতিত হইলেন।

সিরাজউদ্দৌলা সিংহাসনারোহণ করিয়াই দৌত্য বিভাগের অধ্যক্ষ রামরাম সিংহের ভ্রাতাকে পত্র দিয়া কলিকাতায় ড্রেক সাহেবের নিকট অগৌণে কৃষ্ণদাসকে সমর্পণ করিবার আদেশ প্রদান করেন। ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই মে তারিখে রামরামের ভ্রাতা কলিকাতায় পহুছিলেন কিন্তু সেখানকার ইংরেজগণ দুতের কথায় কোন কর্ণপাত না করিয়া তাহাকে নগর হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিল। ইহাতে সিরাজের ক্রোধাগ্নি প্রজ্জলিত হইয়া উঠিল, তিনি ইংরেজ দিগকে দমন করিবার নিমিত্ত কলিকাতা অভিমুখে ধাবমান হইলেন। ইংরেজ সৈন্য নবাব সৈন্যের নিকট পরাজিত হইল। যে দিন কলিকাতা জয় হইল তার পর দিবস প্রাতঃকালে সিরাজ দরবারে উপবিষ্ট হইয়া বন্দী দিগকে তাঁহার নিকট আনয়ন করিবার আদেশ প্রদান করিলেন, সর্ব্ব প্রথমেই কৃষ্ণদাস আনীত হইলেন, প্রহরী বেষ্টিত হইয়া বিষণ্ণ চিত্তে ইষ্টদেবের নাম স্মরণ

করিতে করিতে তিনি উপস্থিত হইলেন। সকলেই ভাবিয়াছিল না জানি কি গুরুতর শাস্তিই ইহার উপর অর্পিত হয়। কিন্তু এ কি? নবাব কোন কঠোর বিধান করা দূরে থাকুক, বরং বিশেষ ভদ্রতার সহিত গ্রহণ করিয়া দরবারে বসিবার অনুমতি দিয়া সম্মানিত করিলেন এবং তাঁহাকে বহুমূল্য পরিচ্ছদ প্রদান করিয়া যথেষ্ট সৌজন্য দেখাইলেন; ওমিচাঁদও অত্যন্ত ভদ্রতার সহিত গৃহীত হইলেন।

সিরাজের দুর্ভাগ্য তাই অল্পদিনের মধ্যেই তদীয় প্রধান প্রধান রাজপুরুষগণের ষড়যন্ত্রে রাজ্য হারাইলেন ও পাপিষ্ঠ মীরণের আদেশে মহম্মদীবেগ নামক জনৈক দুর্বৃত্তের তরবারির আঘাতে জীবন হারাইলেন! হায়! সিরাজ! হায়! আলিবর্দ্দীর নয়ন পুতলী, হায়! বঙ্গ বিহার ওড়িষ্যার নবাব! কেহ কি কল্পনা করিতেও পারিয়াছিল তোমার এই পরিণাম হইবে?

সিরাজের মৃত্যুর পর অহিফেন সেবী মীরজাফর বঙ্গ সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। সিরাজের শাসন সময়ে রাজবল্লভ কর্ম্মচ্যুত অবস্থায় ছিলেন। এক্ষণে মীরণ নিজামতের দেওয়ান হইয়া রাজবল্লভকে পূর্ব্বপদ প্রদান করিলেন, এই সময় হইতে তিনি পুনরায় নিজামতের প্রধান সচিবের কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেন ও রাজা কৃষ্ণদাসের উপর ঢাকার শাসন কার্য্য অর্পিত হইল। এই সময়ে সম্রাট সাহ আলম তাঁহাকে মহারাজা রাজবল্লভ রাঁয় রাঁইয়া সলার জঙ্গ বাহাদুর উপাধি সহ পুরস্কার প্রদান করেন ও মুঙ্গেরের সুবেদারের পদে নিযুক্ত করেন। কৃষ্ণদাস ঢাকার শাসন কার্য্যে ও রাজবল্লভ মুঙ্গেরের সুবেদারী পদে নিযুক্ত থাকিয়া সে সময়ে যথেষ্ট প্রতিপত্তি লাভ করেন। অতঃপর কৃষ্ণদাস মীরজাফর কর্ত্তৃক 'রাজা বাহাদুর' উপাধি প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার মন্ত্রী পদে নিযুক্ত হন।

রাজবল্লভের পুনরায় রাজকার্য্য লাভ

মীরজাফরের রাজত্ব সময়ে রাজবল্লভের বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ ঘটিয়াছিল। কিন্তু মীর কাসিমের শাসন সময়ে তাঁহাকে এক প্রকার বন্দীভাবে জীবন যাপন করিতে হইয়াছিল।

মীরকাসিম গিরিয়ার যুদ্ধে পরাজিত হইয়া উদয়নালায় আশ্রয় গ্রহণ করিতে যাইবার পূর্ব্বে হঠাৎ দরবার গৃহে উপস্থিত হইয়া রাজা রাজবল্লভ ও তৎপুত্র কৃষ্ণদাসকে গলদেশে বালুকাপূর্ণ গোণী বদ্ধ করিয়া মুঙ্গেরের নিকট গঙ্গাবক্ষে নিক্ষেপ করিয়া প্রাণবধ করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। যে সময়ে পশ্চাদ্ভাগ হইতে ঘাতক রাজবল্লভকে তাড়না করিল সে সময়ে "হা রাম!" এই একটী মাত্র শব্দ করিয়া নদীগর্ভে পতিত হইলেন, কৃষ্ণদাসও পিতার অনুগমন করিলেন। হায়! এইরূপে বিক্রমপুরের গৌরব-দেশের অলঙ্কার—বুদ্ধি ও বিদ্যার অপূর্ব্ব প্রতিভা মহারাজা রাজবল্লভ ১৭৬৪ খ্রীঃ অঃ—নিষ্ঠুর নবাবের কঠোর অত্যাচারে অকালে কালগ্রাসে পতিত হইলেন। কথিত আছে যে মুর্শিদাবাদে কিরীটেশ্বরীর আলয়ে রাজবল্লভ যে পাষাণময় শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন ঐ রাজবল্লভেশ্বর লিঙ্গ—যে সময়ে রাজবল্লভ মুঙ্গেরের দুর্গের উপরিভাগ হইতে ভাগীরথী গর্ভে নিপতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন তখন ভয়ঙ্কর শব্দ হইয়া বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছিল, অদ্যাপি সে ভগ্ন মন্দির ও ভগ্ন শিবলিঙ্গ বিদ্যমান আছে।

রাজবল্লভের সলিলশয্যা

এইরূপে রাজবল্লভের মৃত্যু হইলে তাঁহার জমিদারী তদীয় পঞ্চপুত্রের মধ্যে সমান পাঁচ অংশে বিভক্ত হয়, তখন সর্ব্ব সুদ্ধ জমিদারীর আয় চৌদ্দ লক্ষ টাকা ছিল। রাজবল্লভের প্রথম পুত্র রামদাস ও চতুর্থ পুত্র রতন কৃষ্ণ পিতার জীবদ্দশায় মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ায় তাঁহাদের দত্তকগণ জমিদারীর অংশ না পাইয়া ভরণ পোষণার্থ প্রত্যেকে মাসিক ৫০০৲ টাকা প্রাপ্ত হইলেন।

রাজা বাহাদুর কৃষ্ণদাসের তিনপুত্র রাজকৃষ্ণ, হৃদয়কৃষ্ণ ও রমণকৃষ্ণ এক অংশ পান। প্রাণকৃষ্ণ নিঃসন্তান অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হইলে তাহার পত্নী পোষ্য পুত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন কিন্তু সেই পুত্র জমিদারীর কোনও অংশ পান নাই। রাজবল্লভের মৃত্যুর পরে তাঁহার তৃতীয় পুত্র গঙ্গাদাস কিছু দিন রাজত্ব করেন, তাঁহার কাল কবলে নিপতিত হওয়ার পরে রাজার পঞ্চম পুত্র গোপালকৃষ্ণ জমিদারি গ্রহণ করেন। গোপালকৃষ্ণ অত্যন্ত প্রতাপশালী ও বুদ্ধিমান জমিদার ছিলেন, তিনি সৈন্য সংগ্রহ পূর্ব্বক কার্ত্তিকপুরের ভূস্বামীগণের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়া তাহাদিগকে পরাভূত করতঃ কার্ত্তিকপুর সুজাবাদ পরগণার পুনরুদ্ধার সাধন করেন। এই যুদ্ধে যে সকল সৈন্য নিহত হইয়াছিল তাহাদের ছিন্ন শির সমূহ রাজনগরে আনয়ন করিয়া ভূগর্ভে প্রোথিত করতঃ তদুপরি বিজয় চিহ্ন স্বরূপ রণদক্ষিণাকালী নামক এক দেবীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠাপিত করিয়াছিলেন। এই অপরাধের নিমিত্ত তাঁহার প্রথম ইংরেজ রাজত্বে ২॥ ঘণ্টা মেয়াদ হইয়াছিল।

রাজা গঙ্গাদাস ও গোপালকৃষ্ণ।

জগতে সুখ দুঃখ উন্নতি ও অবনতি চক্রবৎ পরিবর্ত্তনশীল। যে মহাপুরুষ স্বকীয় প্রতিভাবলে বহু ধন সম্পত্তি সঞ্চয় করিয়া নিজ কৃতিত্ব বলে দেশ দেশান্তরের নর নারীর নিকট খ্যাতিলাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন—কাল বশে সে বংশের অধঃপতন হইল। রাজবল্লভের বংশের অধঃপতনের পর নাওয়ারার দেওয়ান রায় মৃত্যুঞ্জয় বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করেন, সে সময়ে রাজনগরের পূর্ব্ব গৌরব বৈভব তাঁহার দ্বারাই রক্ষিত হইয়াছিল। তিনি কুরাশী গ্রামে যে সকল দীর্ঘিকা, মঠ ও শিবলিঙ্গাদি নির্ম্মাণ ও প্রতিষ্ঠা করেন তাহা এখনও বিদ্যমান থাকিয়া, মৃত্যুঞ্জয়ের অক্ষয় কীর্ত্তি বর্ত্তমানের উজ্জ্বল আলোকের নিকট ও সমুজ্জ্বল করিতেছে। পদ্মার তরঙ্গভঙ্গে রাজনগরের শেষ চিহ্ন বসুন্ধরার গর্ভ হইতে বিলীন হইয়া যাওয়ার পর হইতে রাজবল্লভের বংশধরগণ এখন

পালংগ্রামে বাস করিতেছেন। এখন ইহাদের সে গৌরব বৈভব কিছুই নাই—যদিও ঐশ্বর্য্যশালী আজ হীনাবস্থায় পতিত, তথাপি ইহাঁদের বংশপরম্পরায় প্রবাহমান দয়া ও সৌজন্যের কোনও ব্যতিক্রম হয় নাই। জনসাধারণে এখনও ইহাদিগকে শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিয়া থাকে।

রাজবল্লভ সম্বন্ধে বিবিধ কথা।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে এবং তৎপরবর্ত্তী যুগে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত মহারাজ রাজবল্লভের ন্যায় কোনও ভাগ্যবান এবং প্রতিভাশালী ব্যক্তি বৈদ্যবংশে জন্মগ্রহণ করেন নাই। তিনি সমগ্র বঙ্গদেশের বৈদ্যগণের সমাজপতি ছিলেন। হিন্দুধর্ম্মের প্রতি তাঁহার গাঢ় আস্থা ছিল। দিবসের এক চতুর্থাংশ সময় তিনি নানাবিধ জপতপ পূজা প্রভৃতি ধর্ম্মানুষ্ঠানে অতিবাহিত করিতেন। তিনি অগ্নিষ্টোম, বাজপেয় প্রভৃতি যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া যে কত লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া গিয়াছেন তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন।

১৩১১ সনের 'নবনূর' পত্রে প্রকাশিত উমাচরণ কানুনগো প্রণীত মহারাজ রাজবল্লভ সেনের জীবন চরিত পাঠে জানিতে পারা যায় যে তিনি "যজ্ঞের দক্ষিণা ৩০০০০০৲ লক্ষ মুদ্রা এবং দেশীয় পণ্ডিতগণের প্রত্যেক জনে ২০৲ টাকা আর বিদেশীয় পণ্ডিত ব্রাহ্মণগণকে যথাযোগ্য হস্তী ঘোটক উষ্ট্র যান স্বর্ণ রৌপ্যাদি ভূষণাভরণ দান করিয়াছিলেন। সর্ব্ব সাকল্যে এই মহৎব্যাপারে কত ব্যয় হইয়াছিল তন্নিরাকরণ করা সুকঠিন।"

দেব দ্বিজের প্রতি তিনি নিয়ত ভক্তিমান ছিলেন। * বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত শ্রীখণ্ড গ্রামে ভূতনাথ দেবের মন্দির, তাঁহার দত্ত বহুবৃত্তি, ব্রহ্মত্র, দেবত্র ও লাখেরাজ ভূমি হইতেই ইহা স্পষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম হয়। রাজ-

* উত্তর বিক্রমপুরের কামার খাড়া (বর্ত্তমান স্বর্ণগ্রাম) গ্রামে অদ্যাপিও তাঁহার প্রদত্ত শিবমন্দির ও টোলের দালান বিদ্যমান থাকিয়া পণ্ডিতবর্গের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা ও ভক্তির পরিচয় প্রদান করিতেছে।

বল্লভের জমিদারীর অধিকাংশই লক্ষ্মীনারায়ণ ঠাকুরের নামে ছিল। তাঁহার সর্ব্বসমেত প্রায় নয় লক্ষ টাকা আয়ের সম্পত্তি ছিল। তিনি জ্ঞানী পণ্ডিত বর্গের বিশেষ সমাদর করিতেন, তাঁহার সভাসদ্‌বর্গের মধ্যে পণ্ডিত কৃষ্ণদেব বিদ্যাবাগীশ, কৃষ্ণদাস সিদ্ধান্ত ও কবি রাজচন্দ্র মজুমদার প্রভৃতি ছিলেন। রাজবল্লভ কর্ম্মঠ, বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ ছিলেন ও পার্সী ভাষায় তাঁহার এতদূর দখল ছিল যে যখন তিনি পার্সীতে কথোপকথন করিতেন তখন অতি অভিজ্ঞ মৌলভীরা ও অবাক্ হইয়া যাইতেন—এমন কি কেহ কেহ তাঁহাকে পশ্চিম প্রদেশবাসী মুসলমান মৌলভী বলিয়াই মনে করিতেন। রাজনগর তাঁহার এক অতুল্য কীর্ত্তি।

স্বজাতির উন্নতি।

স্বজাতির উন্নতি কল্পে তিনি বরাবরই যত্নবান ছিলেন। তিনি পূর্ব্ববঙ্গের বৈদ্যগণকে অনুপনীত দেখিয়া পুনরায় উপনীত করিতে যত্নবান হইয়াছিলেন। রামজীবন কৃত বৈদ্যকুলপঞ্জিকায় লিখিত আছে যে

'বৈদ্যেতে মহারাজ রাজবল্লভ নাম।
সাকিন বিক্রমপুর রাজনগর গ্রাম॥
দেশে দেশে ছিল যত পণ্ডিত প্রধান।
সবে আনি জিজ্ঞাসে শাস্ত্রের প্রমাণ॥
দ্বিজের আজ্ঞায় বৈদ্য পুনঃ উপনীত।
পুনরায় দ্বিজ ভাব যথা পূর্ব্বরীত॥'

পূর্ব্ববঙ্গের বৈদ্যগণের অনুপনীত থাকিবার কারণ আমরা যথাস্থানে বিবৃত করিয়াছি। বল্লালের ডোম কন্যা গ্রহণ হেতু লক্ষ্মণসেন বৈদ্যদিগকে আহ্বান করিয়া

"ঘুচাও ঘুচাও পৈতা বল শূদ্র এবে।
লক্ষ্মণ অনুগত বৈদ্য পৈতা ঘুচাইল।
সেই হইতে বৈদ্যের পৈতা গিয়াছিল॥"

জাতিগত বিষয়ে আমরা বিস্তৃত আলোচনার অধিকারী নহি বলিয়া এখানেই সে বিষয়ে ক্ষান্ত হইলাম। বৈদ্যজাতির অন্যতম কুলজি লেখক গোপালকৃষ্ণ কবীন্দ্রের কুল পঞ্জিকা হইতে রাজবল্লভ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। ইহা হইতেই পাঠকবর্গ বুঝিতে পারিবেন যে রাজবল্লভ দেশ দ্রোহী, হইলেও—কর্ত্তব্য জ্ঞান বিহীন পাষণ্ড ছিলেন না, কেবল অবস্থা বিপর্য্যয়ে পড়িয়া তাঁহাকে দেশদ্রোহী হইতে হইয়াছিল—আর সে ভীষণ স্বার্থ পরতার যুগের কথা চিন্তা করিলে তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে দোষী ও করা যাইতে পারে না।

তিনি বীর ছিলেন—কাপুরুষ ছিলেন না,—কিন্তু হায়! কালচক্রে আমাদের দেশের প্রকৃত ইতিহাসের অভাবে তাঁহাকে তাহাও সাজিতে হইয়াছে। তিনি যে কাপুরুষ ছিলেন না, তাহা মীরণের সহকারীরূপে বিপন্ন রামনারায়ণের সাহায্য কল্পে উদয় নালার রণক্ষেত্রে গমন হইতেই স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যায়। গোপালকৃষ্ণ কবীন্দ্র লিখিয়াছেন:—

"বিক্রমপুরে পরমানন্দ বংশস্থিত।
তন্মধ্যে কৃষ্ণ জীবন শুভক্ষণে জাত॥
কৃষ্ণজীবনের চারিপুত্র, রাজারাম।
ধনিরাম, রাজবল্লভ আর রাম রাম॥
যে কালে মহম্মদ সাহ দিল্লীর পালক।
নবাব মহবৎজঙ্গ বঙ্গাদি শাসক॥
সাহবৎ জঙ্গ নামে তস্য ভ্রাতৃপুত্র।
পাদসাহী দেওয়ান মুর্শিদাবাদে স্থিত॥
তাহার দেওয়ান রাজবল্লভ সুকৃতী।
সর্ব্বকার্য্যাধ্যক্ষ তাঁর মহারাজ খ্যাতি॥
ষোলশত একষট্টি শকাব্দ অবধি।
সাতোত্তর পর্য্যন্ত তাহার রাজোন্নতি॥

বহুবিধ যজ্ঞ আর স্বজাতি পোষণ।
যথাসাধ্য করে নানা দান বিতরণ ॥

*   *   *   *   *   *

অগ্নিষ্টোম অত্যগ্নিষ্টোম যজ্ঞকারী।
মহারাজ রাজবল্লভ দাতা শুদ্ধাচারী ॥"

তালতলার খাল।

তালতলার খাল ও মহারাজ রাজবল্লভের অন্যতমকীর্ত্তি। তিনি যখন ঢাকায় নায়েব সুবেদারের পদে নিযুক্ত ছিলেন তখন স্বীয় বাসগ্রাম রাজনগর হইতে ঢাকা এক দিবসের মধ্যে যাতায়াত করিবার নিমিত্ত এই খাল খনন করাইয়াছিলেন। এই বিখ্যাত পয়ঃপ্রণালী বিক্রমপুরের বক্ষ ভেদ করিয়া 'কীর্ত্তিনাশা' নদীর সহিত 'ধলেশ্বরী' নদীকে সংযুক্ত করিয়াছে। পূর্ব্বে রাজনগর হইতে ঢাকায় নৌকা পথে যাইতে হইলে 'কীর্ত্তিনাশা', মেঘনা ও ধলেশ্বরী ঘুরিয়া যাইতে হইত ইহাতে প্রায় তিন দিবস সময় লাগিত। কিন্তু এই খাল খনিত হওয়ার পর হইতে তাহা অর্দ্ধদিবসে পরিণত হইয়া ছিল।* তালতলা বন্দরের বিপরীত দিকে একটী ইষ্টক

---

* The Ta'lta'la' Kha'l, said to have been dug by Raja Rajballabh to facilitate communication between Rajnagar and Dacca. This water Course extends from Bahar on the Padma' to Táltala' on the Dhaleswari, but has now been allowed to silt up, so that it is only open during four months of the year for large boats. It effects a saving of about twenty or twenty five miles on the outer route between Barisa'l and Dacca, besides avoiding the somewhat perilous navigation of the large rivers.

Hunter's statistical Account of Dacca District Page 23.

কেহ কেহ বলেন যে এই খালটি রাজা রাজবল্লভের পুত্র রাজা রামদাস কর্ত্তৃক খনিত হইয়াছিল।

নির্ম্মিত একতল মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়, কথিত আছে যে রাজবল্লভ রাজনগর হইতে রাত্রির শেষাংশে রওয়ানা হইয়া এই স্থানে আসিলেই প্রভাত হইয়া যাইত এবং প্রাতঃ সন্ধ্যার সময় উপস্থিত হইত, এই ক্ষুদ্র গৃহটি সন্ধ্যাবন্দনাদি নির্ব্বাহের জন্যই নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই ক্ষুদ্র দেব মন্দির মধ্যে, মহারাজার স্থাপিত একটী শিবলিঙ্গ ও "আনন্দময়ী" নামক এক পাষাণময়ী কালিকা মূর্ত্তি স্থাপিতা আছেন, এই উভয় দেবমূর্ত্তি রাজবল্লভ প্রতিষ্ঠাপিত করিয়া তাঁহাদের সেবার নিমিত্ত যে তিনশত বিঘা ভূমি উৎসর্গ করিয়াছিলেন আজ পর্য্যন্ত ও সেই বৃত্তি হইতেই উক্ত দেবতা দ্বয়ের সেবাকার্য্য নির্ব্বাহিত হইতেছে। তালতলার খালের বর্ত্তমান দৈর্ঘ্য প্রায় পনের মাইল হইবে।

রাজবল্লভ সমাজ-সংস্কার বিষয়েও বিশেষ মনোযোগী ছিলেন।

সমাজ সংস্কারে রাজবল্লভ।

তাঁহার কন্যা অভয়ার অষ্টম বর্ষে বিবাহ হইয়াছিল। এই কন্যা রাজবল্লভের সর্ব্ব কনিষ্ঠ সন্তান বলিয়া বিশেষ আদরের ছিল। কিন্তু বিধাতার লীলা মানব বুদ্ধির অগোচর। এই বালিকা বিবাহের অত্যল্প কাল পরে বিধবা হওয়ায় তিনি বাল-বিধবার প্রতি হিন্দু সমাজের অন্যায় অত্যাচার দূর করিবার জন্য ও তাঁহাদের পুনর্বিবাহের নিমিত্ত ভারতবর্ষের নানা স্থানের পণ্ডিত-মণ্ডলীর নিকট দূত প্রেরণ করিয়া মতামত সংগ্রহ করিয়া ছিলেন। সর্ব্বদেশের পণ্ডিত মণ্ডলীই শাস্ত্রানুশীলন দ্বারা বালবিধবাগণের বিবাহ শাস্ত্র সঙ্গত বলিয়া পাতি দিয়াছিলেন, কিন্তু নবদ্বীপের রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের শঠতায় নবদ্বীপের পণ্ডিত মণ্ডলী বিরুদ্ধ মত দেওয়ায় তাহা সম্পাদিত হইতে পারে নাই। কারণ সে কালে নবদ্বীপের পণ্ডিত মণ্ডলীর অনভিমতে কোন কার্য্যই শাস্ত্র সঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হইত না। এই একটী মাত্র মহৎ কার্য্যের সূচনার জন্য ও সমাজ সংস্কারেচ্ছু ব্যক্তিবর্গের হৃদয়ে তাঁহার নাম গৌরবের সহিত অঙ্কিত থাকিবে।
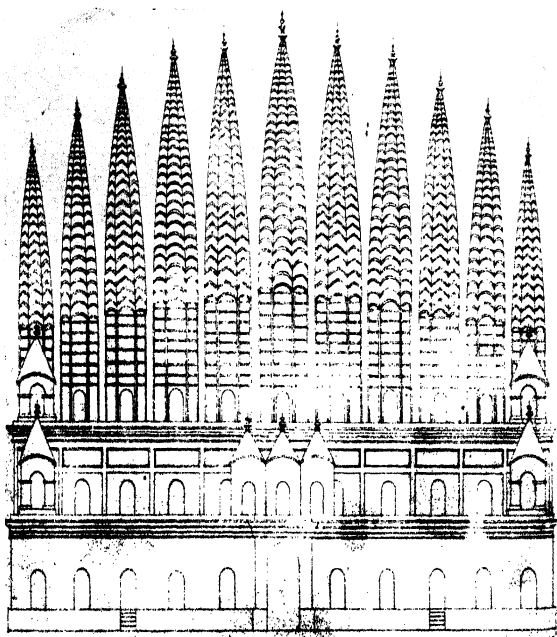
একুশ রত্ন মঠ—সম্মুখের (পূর্ব্বদিকের) দৃশ্য।

মহারাজার অতুল কীর্ত্তি বিলুপ্ত রাজনগরের কাহিনী আমরা এখন বর্ণনা করিব। অত্যুত্তাল তরঙ্গ-মালা-সঙ্কুলা বিভীষিকাময়ী পদ্মার দক্ষিণতটে প্রায় পঁয়ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে রাজনগর নামে এক সমৃদ্ধিশালী গ্রাম বিদ্যমান ছিল। এই গ্রাম ইতিহাস প্রসিদ্ধ বৈদ্য কুলোদ্ভব মহারাজা রাজবল্লভ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। পূর্ব্বে ইহার নাম ছিল বিল দাওনিয়া, তখন উহা বিল পরিপূর্ণ বিরল বসতির একটী ক্ষুদ্র গ্রাম মাত্র ছিল। বিক্রমপুরের গৌরব রামপাল নগরীর ধ্বংসাবসানে এবং দ্বাদশ ভৌমিকের অন্যতম ভৌমিক চাঁদরায় কেদার রায়ের বড় সাধের শ্রীপুর নগরী পদ্মার কুক্ষিগত হইলে পর, রাজ নগরের ন্যায় সুন্দর ও সমৃদ্ধিশালী স্থান কেবল বিক্রমপুরে কেন সমগ্র বঙ্গদেশেও তৎকালে অতি বিরল ছিল।

রাজনগর।

রাজনগর সে সময়ে সত্যসত্যই রাজনগর ছিল। তখন উহা "নবরত্ন" 'পঞ্চরত্ন' 'সপ্তদশরত্ন' বা 'শতরত্ন' ও 'একবিংশ রত্ন' প্রভৃতি সুন্দর সুন্দর সৌধাবলীর দ্বারা পরিশোভিত হইয়া সৌন্দর্য্যে ও স্থপতি— কৌশলের শ্রেষ্ঠতার জন্য বঙ্গদেশে বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। যিনি এসমুদয় অট্টালিকা একবার দর্শন করিয়াছেন, তিনি তাহাদের সৌন্দর্য্য-স্মৃতি হৃদয় হইতে কখনও মুছিয়া ফেলিতে পারিবেন না। কিন্তু হায়! সে সমুদয় ক্ষুদ্র ও বৃহৎ নানা কারুকার্য্য খচিত অট্টালিকা সমূহ চির দিনের জন্য রাক্ষসী পদ্মার উদরে অন্তর্হিত হইয়াছে, আর সে সমুদয় নয়নাভিরাম সৌধাবলী কাহারও দৃষ্টি পথে পতিত হইবে না।

সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বিক্রমপুর কেন, সমগ্র বঙ্গ ভূমির মধ্যেই ইহার কীর্ত্তি-গরিমা সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। তখন এই স্থান ধনে, জনে, মানে, সম্ভ্রমে, বিদ্যায় ও শিক্ষায় দেশের আদর্শ স্বরূপ বিবেচিত হইত।

যখন রাজনগর নির্ম্মিত হয় তখন কি কেহ কল্পনা করিতে পারিয়াছিল যে একদিন ইহার বক্ষোপরি পদ্মার চঞ্চল তরঙ্গ ভীষণ রোলে নৃত্য করিবে! শতাধিক বৎসরের মধ্যে বিক্রমপুরের ভৌগোলিক পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গেলে যুগপৎ বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইতে হয়। সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে পদ্মার এক অতি ক্ষুদ্র শাখা রাজনগরের বহু উত্তর দিক দিয়া ক্ষীণকলেবরে পূর্ব্ব পশ্চিমে প্রবাহিত হইত। সে সময়ে জন সাধারণ ইহাকে "রথখোলার" নদী নামে অভিহিত করিত। ইহার উৎপত্তি সম্বন্ধে এইরূপ জন প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, এই ক্ষুদ্র খালের অবস্থান স্থলে গ্রামবাসী জন-সাধারণের রথোৎসব সম্পাদিত হইত; রথের চক্রের আবর্ত্তনে কালক্রমে উভয় পার্শ্বস্থ ভূমি ক্ষয় প্রাপ্ত হয় ও ক্রমে নিম্ন হইয়া যায় এবং বৃষ্টির জল প্রবাহিত হইতে হইতে খালের আকার ধারণ করিয়া রথখোলার খাল নামে অভিহিত হয়। এই উক্তি কেবল অযৌক্তিক বলিয়া প্রতীয়মান হয় না, কারণ ১৭৮১ সনে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধিকার সময়ে, বোর্ড অব ডাইরেক্টর-গণের অনুমত্যানুসারে তৎকালীন বঙ্গদেশের সার্ব্বেয়ার জেনারেল জেমস রেনেল, এফ্, আর, এস, সাহেব ঢাকার ও তন্নিকট-বর্ত্তী স্থান সমূহের যে ম্যাপ অঙ্কিত করেন তাহাতেও এস্থানে কোনও নদীর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না, সে সময়ে পদ্মা নদী ঢাকা জেলার দক্ষিণ পশ্চিম দিক্ দিয়া প্রবাহিত হইয়া বাখরগঞ্জ জেলার অন্তর্গত মেহেদিগঞ্জ নামক স্থানে মেঘনা বা মেঘনাদ নদীর সহিত সম্মিলিত হইয়াছিল। তখন রাজনগরের মধ্য দিয়া পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিকে একটী খাল থাকায় এস্থানে নানাবিধ দ্রব্যের আমদানী ও রপ্তানী হইত। এদিকে যেমন সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা ও "রাজসাগর" "পুরাতনদীঘী", "কালীসাগর", "কৃষ্ণসাগর, "মতিসাগর" "শিব পাড়ার দীঘী" প্রভৃতি ক্ষুদ্র ও বৃহৎ জলাশয় সমূহ এ স্থানের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিত অন্যদিকে আবার তেমনি

একুশ রত্ন মঠের উত্তর ও দক্ষিণের দৃশ্য।
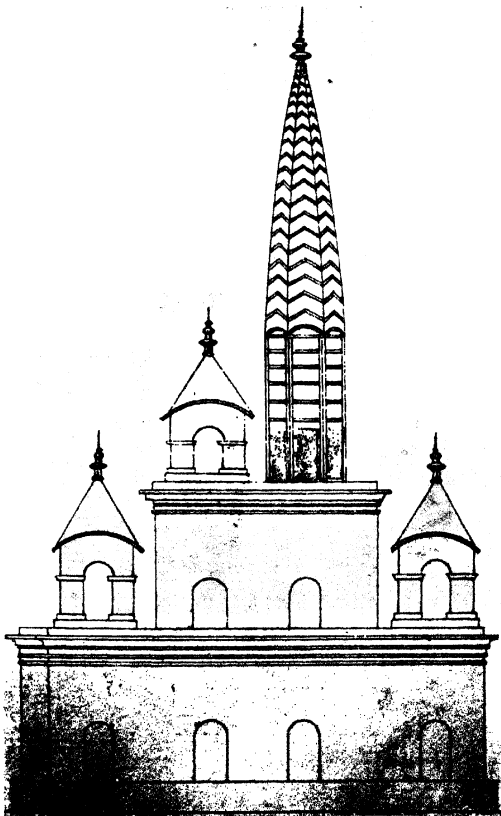
"নারিকেলতা, "মান্দারিয়া," "চাকলাদারপল্লী," "ভরদ্বাজ পল্লী" "রাইয়ত-পাড়া" প্রভৃতি জনপূর্ণ পল্লী সমূহ থাকায় রাজনগর গ্রাম সর্ব্বদাই আমোদ-কোলাহল-মুখরিত থাকিত। সেকালে সাধারণতঃ সকলেরই অবস্থা ভাল ছিল, খাওয়া পরার চিন্তা বড় কাহাকেও একটা করিতে হইত না, সকলের ঘরেই মরাই ভরা ধান থাকিত, কাজেই সকলে হয় লাঠি তরোয়াল খেলা নয়ত গান বাজনা প্রভৃতি নির্দ্দোষ আমোদে দিন কাটাইত। এই নিমিত্তই সেকালের রাজনগর গ্রামে বর্ত্তমানের ভয়ঙ্করী অন্ন [illegible]কেও ব্যতিব্যস্ত থাকিতে হইত না। এস্থানে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, [illegible]প, মালাকার, কাংস্যবণিক্, গন্ধবণিক্, তন্তুবায় প্রভৃ[illegible] মত বিভিন্ন শ্রেণীস্থ লোকের বাস ছিল তদ্রূপ বর্ত্তমান সময়েও বিক্রম[illegible] স্থানও বর্দ্ধিষ্ণু গ্রামে এত বিভিন্ন শ্রেণীস্থ লোকের বাস পরিলক্ষিত হয় না। সেকালের রাজনগর বাসি-[illegible] প্রমোদ ও ব্যায়ামের প্রতি লক্ষ্য ছিল তাহা নহে, [illegible]দের বিশেষ মনোযোগ ছিল। জন সাধারণের মধ্যে যাহাতে শিক্ষা প্রচারিত হয় সে বিষয়ে তাঁহারা বিশেষ মনোযোগী ছিলেন। ছোট বড় সকলেই যাহাতে শিক্ষা লাভ করিয়া নিজ নিজ অবস্থার উন্নতি ও সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান লাভ করিতে পারে এ বিষয়ে তাঁহারা বিশেষ মনোযোগ করিতেন। রাজনগরের প্রতি পল্লীতেই বাঙ্‌লা শিক্ষার জন্য পাঠশালা, পারস্য ভাষা শিক্ষা করিবার জন্য মক্তব ও সংস্কৃত শিক্ষার্থ চতুষ্পাঠী প্রতিষ্ঠিত ছিল। অভিভাবকগণ নিজ নিজ রুচি অনুসারে স্বীয় স্বীয় সন্তানগণকে সুশিক্ষিত করিতেন। তবে পারসী ও সংস্কৃতের আদরই বেশী ছিল, বালকেরা সামান্য বাঙ্‌লা শিক্ষা করিয়া সকলেই মৌলভীর নিকট পারসী ভাষার শিক্ষা লাভার্থ দুই বেলা পুঁথি হস্তে অধ্যয়ন করিতে যাইত। অন্তঃপুরেও শিক্ষার দ্বার অবরুদ্ধ ছিল না। যদি তাহা হইত, তাহা হইলে বিদুষী আনন্দময়ী

ও গঙ্গাদেবীর সুমধুর কবিত্ব ঝঙ্কারে বর্ত্তমান বিদুষী মহিলাগণও গৌরবান্বিতা বোধ করিতেন না।

বিধাতার আশ্চর্য্য বিধান হৃদয়ঙ্গম করা মানব বুদ্ধির অগোচর। বিক্রমপুরবাসীর দুর্ভাগ্য তাই ১২৭৬ সনে কীর্ত্তিনাশার তরঙ্গ-প্রহারে রাজনগর চিরদিনের জন্য লোক লোচনের অদৃশ্য হইয়াছে। আমরা এস্থানে রাজ নগরের দ্রষ্টব্য জলাশয় গুলি ও সুপ্রসিদ্ধ সৌধাবলীর বিবরণ লিপিবদ্ধ করিলাম। ভরসা করি পাঠকগণ ইহা হইতেই মহারাজা রাজবল্লভের বাস গ্রামের একটা ছায়া-চিত্র হৃদয়ে অনুভব করিতে পারিবেন।

রাজনগরের বক্ষভেদ করিয়া যে খালটি পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম দিকে প্রবাহিত ছিল, সেই খাল ধরিয়া পূর্ব্ব দিকে কিছুদূর অগ্রসর হইলেই "রাজসাগর" নামক একটা হ্রদের ন্যায় প্রকাণ্ড সরোবর দৃষ্টিপথে পতিত হইত। এই জলাশয়ের জল অত্যন্ত নির্ম্মল ও সুপেয় ছিল। ইহার চারি তীরেই ইষ্টক নির্ম্মিত সোপানাবলী থাকায় জনপদ বধূগণের জল লইবার পক্ষে বিশেষ সুবিধাও ছিল। এই সরোবরের উত্তর তীরে 'রাজসাগরের হাট" নামক রাজনগরের সুবিখ্যাত বন্দর থাকায় এস্থান সর্ব্বদাই জন-কোলাহল মুখরিত থাকিত। সেকালের সভ্যতা ও রুচি অনুযায়ী এই হাটে সমুদয় দ্রব্যই পাওয়া যাইত। বন্দরের ভিতরে বহু রাস্তা এবং নানাবিধ পণ্যদ্রব্যের দোকান ছিল। রাজসাগরের পশ্চিম তটে স্থপতি-কৌশলের নিদর্শন স্বরূপ নানা কারুকার্য্য খচিত দুইটী দেবমন্দির প্রতিষ্ঠিত ছিল, তাহার একটীতে "মহাপ্রভু" নামক দেবতা ও অপরটীতে "জগন্নাথ দেব" প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। প্রতিদিন ষোড়শোপচারে এই বিগ্রহের অর্চ্চনা ও যথারীতি প্রাতে সন্ধ্যায় শঙ্খ ঘণ্টার গগনভেদী নিনাদে আরতি হইত। এই সরোবরের অন্যান্য তীরে নানা জাতীয় বণিক্ বৃন্দ পরমানন্দে বাস করিত। এই সরোবরের

রাজনগরের একবিংশ রত্ন মঠ।

(চল্লিশ বৎসরের প্রাচীন ফটোগ্রাফ হইতে)
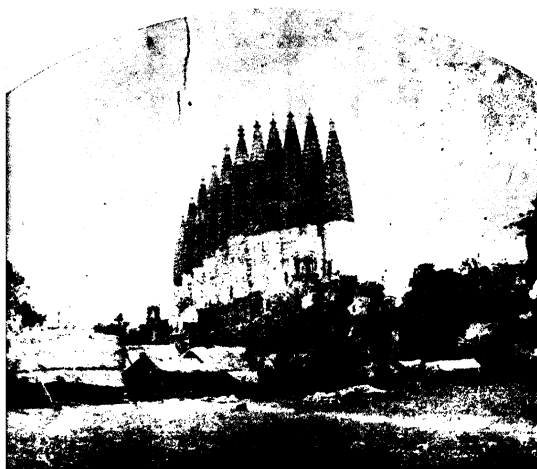
বৃহত্ত্ব সম্বন্ধে একথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, যদি ইহার এক তীর হইতে বন্দুকের আওয়াজ করা যাইত, তবে অপর তীর হইতে তাহা শুনা যাইত না। মৃদু পবন স্পর্শেই ইহার বক্ষে তরঙ্গনিচয় উত্থিত হইয়া ক্রীড়া করিত।

পুরাতন দীঘী।

আমরা পূর্ব্বে যে পথের উল্লেখ করিয়াছি, সেই পথ অনুসরণ করিয়া প্রায় এক মাইল পর্য্যন্ত পশ্চিম দিকে অগ্রসর হইলে পুরাতন দীঘী নয়নগোচর হইত। রাজসাগর অপেক্ষা ইহা আয়তনে ছোট ছিল। এই দীঘীর পশ্চিম তটে চৈত্র সংক্রান্তি হইতে আরম্ভ করিয়া জ্যেষ্ঠ মাসের শেষ তারিখ পর্য্যন্ত দুইমাস কালস্থায়ী একটি মেলা বসিত। এই মেলা "কাল বৈশাখীর মেলা" বলিয়া বিখ্যাত ছিল। ঢাকা জেলাস্থ উত্তর বিক্রমপুরের "কার্ত্তিক বারুণীর মেলা" অপেক্ষা ইহার খ্যাতি ও প্রতিপত্তি কম ছিলনা। প্রাচীন ব্যক্তিদের মুখে অবগত হওয়া যায় যে, এই স্থানে চড়ক পূজায় যেরূপ সমারোহ হইত পূর্ব্ব-বঙ্গের আর কোথাও সেরূপ হইত না। শতাধিক ঢাকের প্রচণ্ড নিনাদে হৃদয়ে এক আশ্চর্য্য ভাবের উদয় হইত। এক বিশাল চড়ক বৃক্ষে ষোড়শ সংখ্যক বলিষ্ঠ যুবক একত্র ঘূর্ণিত হইত, তাহাদিগকে উৎসাহিত করিবার জন্য চতুর্দ্দিকস্থ অগণন দর্শক বৃন্দের কল-কোলাহল ও ঢাকের ভীষণ শব্দে চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিত।

পুরাতন দীঘী ছাড়াইয়া কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলেই সম্মুখে মহারাজ রাজবল্লভের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পুত্র রায় মৃত্যুঞ্জয়ের বাটীর তোরণ দ্বার দৃষ্টি অবরোধ করিত। রাজবল্লভের মৃত্যুর পরে রায় মৃত্যুঞ্জয়ই রাজনগরের মধ্যে ধনে, মানে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। মৃত্যুঞ্জয়ের আবাস বাটীও নানারূপ সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা সমূহে পরিশোভিত ছিল। পুরাতন দীঘীর পশ্চিম তীরের উত্তর দিক হইতে একটী রাস্তা বরাবর পশ্চিম দিকে

গিয়াছিল। এই পথের পার্শ্বে স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ বহু সরোবর ছিল, সে সকলের বিস্তৃত বিবরণ অনাবশ্যক। এই পথটি রাজনগরের "পুরাতন দরজা" নামে অভিহিত ছিল। ইহার পশ্চিম দিকে রাজা রাজবল্লভের পিতা কৃষ্ণজীবন মজুমদারের বাড়ী ছিল। এখানে বহু ছোট বড় অট্টালিকা বিদ্যমান ছিল, কিন্তু তন্মধ্যে "নবরত্ন" নামক রমণীয় প্রাসাদটির কথাই বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য।

একটী চতুষ্কোণ একতল অট্টালিকার হলের চারিদিকে চারিটি ও প্রত্যেক কোণে এক একটী চতুষ্কোণ মঠ ও দুইটি মঠের প্রত্যেকটির মধ্যভাগে এক একটী "ঝিকটী ঘর" (যে ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহের দোচালা ঘরের ন্যায় চাল) সন্নিবিষ্ট। ছাতের মধ্যস্থলে যে মঠটি ছিল তাহার উচ্চতা চতুর্দ্দিকস্থ ঝিকটি ঘর হইতে অধিক ও মাটি হইতে প্রায় শতাধিক হস্ত উচ্চ ছিল। এই অট্টালিকা ইষ্টক ও প্রস্তরে নির্ম্মিত এবং উহার প্রাচীরের গায়ে নানাপ্রকার লতা, পাতা ও ফুল ফল অঙ্কিত থাকায় ইহা বড়ই সুন্দর দেখাইত।

নবরত্ন।

ইহাই রাজা রাজবল্লভের বাড়ীর সিংহ দরজা বা তোরণ দ্বার ছিল। পুরাতন দীঘীর পশ্চিম তটস্থ সুপ্রশস্ত রাজপথ ধরিয়া কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলেই এই সুবিশাল তোরণ দ্বার দৃষ্টি গোচর হইত। এই তোরণ দ্বার একটী ত্রিতল অট্টালিকা। প্রথম তলের নিম্নে সিংহদ্বার, ইহার ছাত অর্দ্ধবৃত্তাকারে নির্ম্মিত ছিল এবং ইহার নিম্নস্থ পথ এতদূর সুপ্রশস্ত ছিল, যে তাহার মধ্য দিয়া অনায়াসে তিনটী হস্তী হাওদা সহ পাশাপাশি ভাবে যাতায়াত করিতে পারিত। এই দ্বারের দুই দিকে দুইটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বেদী ছিল, উহাদের উপর দণ্ডায়মান হইয়া দিবারাত্রি দৌবারিকগণ প্রহরায় নিযুক্ত থাকিত।

একবিংশ রত্ন।

নব রত্ন মঠ।
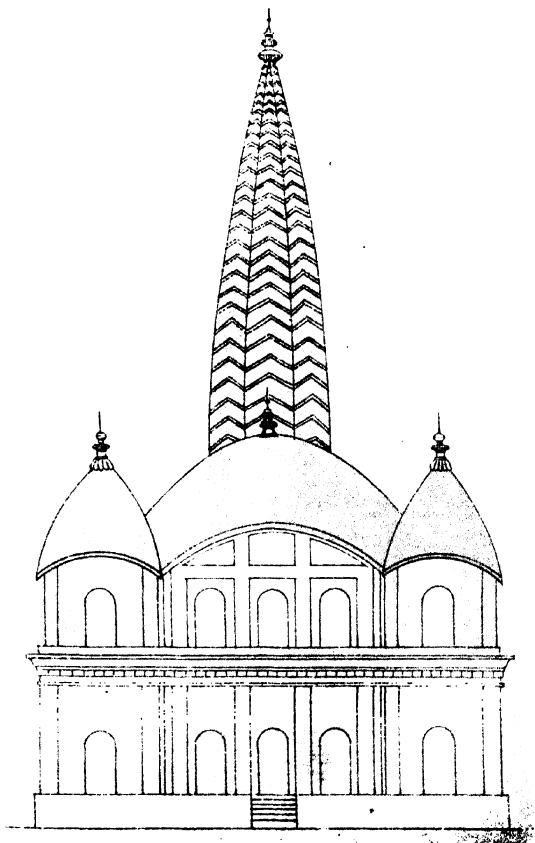
এই তোরণ দ্বার পার্শ্বস্থ উভয়দিকের একতল অট্টালিকার মধ্যে অনেকগুলি প্রকোষ্ঠ ছিল। সে সকল প্রকোষ্ঠে রাজকীয় সৈন্যগণ বাস করিত। এই একতল অট্টালিকার ছাতের প্রতিকোণে এক একটী মঠ ও সম্মুখস্থ দুই মঠের মধ্যাংশে ও সিংহ দরজার উপরে তিনটি "ঝিকটী" ঘর পরস্পর সংলগ্ন ছিল। প্রতিদিন প্রভাতে যখন পূর্ব্ব গগন লোহিত রাগে রঞ্জিত হইয়া উঠিত, যখন বিহঙ্গম কুল বৃক্ষ শাখায় বসিয়া মনের আনন্দে সুমধুর স্বর লহরীতে চারিদিকে সুধা বর্ষণ করিত, তখন এ সকল ঝিকটি ঘর হইতে নহবতের সুমধুর প্রভাতী রাগিণী সানাইয়ের মোহিনী আলাপের সঙ্গে সঙ্গে রাজনগরবাসীর হৃদয়ে অপূর্ব্ব পুলক সঞ্চার করিয়া দিত। দ্বিতলের ছাতের প্রত্যেক কোণে এক একটী মঠ ও ত্রিতলের ছাতের মধ্যদেশে একাদশটি মঠ বিদ্যমান ছিল। ত্রিতলের ছাতের এই একাদশটি মঠের মধ্যস্থিত মঠটি সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ এবং ইহার উভয় পার্শ্বের মঠগুলি ক্রমনিম্ন থাকায় দূর হইতে ইহাকে ধনুকের উপরার্দ্ধের ন্যায় দৃষ্ট হইত।

পশ্চিম দিকের বিস্তৃত প্রাঙ্গণে সেঘরা বা তিনটি প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট একটী দ্বিতল অট্টালিকা বিরাজিত ছিল। উৎসব উপলক্ষে বাদকগণ এস্থান হইতে বাদ্যধ্বনি করিত। সেঘরার উত্তর দিকে কারুকার্য্য খচিত একটী ঝিকটি ঘর ছিল। কথিত আছে যে মহারাজা রাজবল্লভ এক কোটি শিব লিঙ্গ পূজা করিয়া তাহার উপর ঐ ঘরটি নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। এই প্রথম তোরণ দ্বার উত্তীর্ণ হইলেই দ্বিতীয় তোরণ দ্বার। ইহা পশ্চিম দিকে অবস্থিত ছিল। দ্বিতীয় তোরণদ্বার পার হইলেই সম্মুখস্থ বিস্তৃত প্রাঙ্গণের দক্ষিণ ভাগে "রঙ্গমহাল" নামক সুসজ্জিত ও কলা-নৈপুণ্য পূর্ণ বৈঠক খানার দালান দর্শকের নয়নগোচর হইত। ইহার সম্মুখেই সুন্দর একটী মন্দিরে বাসুদেব নামক বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। এই মন্দিরের উত্তর দিকে আর একটী সিংহদ্বার স্থাপিত

ছিল। সেই সিংহ দ্বার পার হইলেই সুপ্রসিদ্ধ "সপ্তদশরত্ন" বা "শতরত্ন" নামক দোলমঞ্চ তৃতীয় প্রাঙ্গণের পুরোভাগে দৃষ্টিগোচর হইত।

সপ্তদশ রত্ন বা শত রত্ন।

একটী উচ্চ চারিতল অট্টালিকা এরূপভাবে নির্ম্মিত ছিল যে প্রত্যেক উর্দ্ধতল তাহার নিম্নতলের মধ্যভাগে অবস্থিত ছিল। এবং প্রতি তলের কোণে এক একটী সমআয়তন চতুষ্কোণ মঠ বিদ্যমান ছিল। সর্ব্বোচ্চ তলে অর্থাৎ চতুর্থ তলের ছাতের মধ্যদেশে মঠের আকারে একটী মন্দির প্রতিষ্ঠিত ছিল, উহা চতুর্দ্দিকস্থ অন্যান্য মঠ অপেক্ষা উচ্চ ছিল। যখন বসন্তের শুভাগমনের সঙ্গে সঙ্গে সেকালের দোলের একটা উন্মাদ উচ্ছৃঙ্খলতা পাড়ায় পাড়ায় জাগিয়া উঠিত ও বাদ্য যন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে দুইদল বাঁধিয়া গানের প্রতিযোগীতা চলিত, সে সত্য সত্যই একটা আনন্দের ব্যাপার ছিল। মৃদঙ্গের তালে তালে হোরীর সুমধুর সঙ্গীত লহরীর সহিত দোল-পূর্ণিমার সেই শুভ্র জ্যোৎস্না পুলকিত নিশীথে ঐ সর্ব্বোচ্চ তলস্থ মন্দিরের মধ্যে রাজবল্লভের স্থাপিত ৺লক্ষ্মীনারায়ণ চক্র কুঙ্কুম রাগে সুরঞ্জিত হইয়া স্বর্ণ-সিংহাসনে দোলায়মান হইতেন। প্রত্যেক তলের এবং প্রত্যেক মঠের নীচেই বাসোপযোগী এক একটী প্রকোষ্ঠ বিদ্যমান ছিল। প্রতি নিম্নতল হইতে তদুর্দ্ধ তলে আরোহণ করিবার জন্য সুপ্রশস্ত সোপানাবলী নির্ম্মিত ছিল। এই হিন্দোল-মন্দিরের অভ্যন্তরে দণ্ডায়মান হইয়া চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিলে নিসর্গের প্রাণারাম পবিত্র সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইতে হইত। বিশাল মহীরুহ রাজি ছোট ছোট গুল্মের ন্যায় এবং অদূরস্থ রথখোলার নদীকে একখানি শুভ্র বস্ত্রের ন্যায় দেখাইত। এই উচ্চ মন্দিরের সর্ব্বোচ্চ মঠ প্রায় ১৫০ দেড় শত হাত উচ্চ ছিল। শত রত্ন মঠের অঙ্গনের একভাগে একতল অট্টালিকায় বৈষয়িক কার্য্যাদি নিষ্পন্ন হইত, ও সেঘরার পার্শ্বস্থ একটী ঝিকটি ঘরে মাতা সর্ব্বমঙ্গলা শরতে পূজিতা হইতেন। পদ্মার
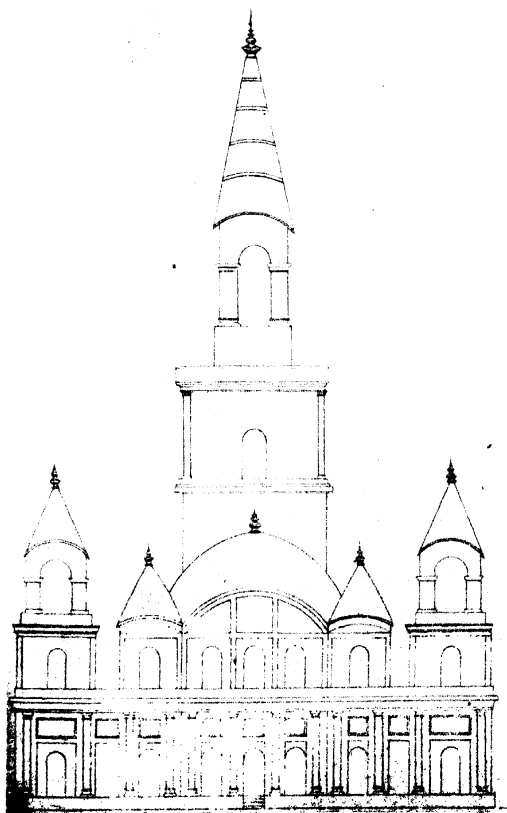
সপ্তদশ রত্ন মঠ (উত্তর দিকের দৃশ্য)।

অপরতীর হইতে লোকে শতরত্ন মঠের অভ্রভেদী চূড়া লক্ষ্য করিয়া পদ্মা নদীতে পাড়ি ধরিত।

এই প্রাঙ্গণেই "পঞ্চরত্ন" নামক সুন্দর শিল্প চাতুর্য্যময় দেবালয় প্রতিষ্ঠিত ছিল। রাজ নগরের মধ্যে শিল্প চাতুর্য্যে ও স্থপতি নৈপুণ্যে ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিল। পাঁচটি দ্বিতল মন্দির একত্র সংযুক্ত ভাবে নির্ম্মিত হওয়ায় ইহাকে পঞ্চরত্ন মন্দির কহিত। এই সকল মন্দিরের একটী মধ্যস্থলে এবং অবশিষ্ট চারিটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মন্দির উহার প্রত্যেকের কোণদেশের সহিত সংলগ্ন ভাবে গঠিত হইয়াছিল। এই পাঁচটী মন্দিরের প্রত্যেকটীর প্রাচীর গাত্রেই নানাবিধ দেব দেবী ও লতা পাতার চিত্র অতি সুন্দর ভাবে অঙ্কিত ছিল। এই মন্দিরের এক কক্ষে সুবিখ্যাত লক্ষ্মী নারায়ণ চক্র, এক কক্ষে রাজরাজেশ্বরী, এক কক্ষে অন্যান্য দেবতাগণ প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। পঞ্চরত্ন মন্দিরের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণ উত্তীর্ণ হইলে অন্তঃপুর খণ্ডে প্রবেশ করা যাইত। অন্তঃপুর খণ্ডের চারিধারে চারিটি সুবৃহৎ সৌধ পরস্পর সংলগ্ন ছিল। প্রত্যেকটি অট্টালিকার ভিতরেই বহু প্রকোষ্ঠ ও সম্মুখে বারান্দা ছিল। উত্তর ভাগের অট্টালিকাটি ত্রিতল ও অন্যান্য অট্টালিকা গুলি একতল ছিল। ত্রিতল অট্টালিকার একটী প্রকোষ্ঠ মহারাজার শয়ন কক্ষ ছিল। তিনি বাড়ী আসিয়া সে স্থানেই বাস করিতেন।

পঞ্চরত্ন মঠ।

রাজ বল্লভের বাড়ীর পশ্চিম দক্ষিণ কোণে তাঁহার গুরু কৃষ্ণদেব বিদ্যাবাগীশের বাস ভবন ছিল। ইহাঁর বাড়ীতেও তোরণ দ্বার এবং মনোহর অট্টালিকা সমূহ বিরাজমান থাকিয়া সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিত।

আমরা পূর্ব্বে রাইয়ত পাড়া, নারিকেলতা পাড়া প্রভৃতি রাজনগরান্তর্গত যে সকল পল্লীর নাম করিয়াছি, সেসব স্থানেও বিস্তৃত সরোবর, মঠ ও বহু সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা বিদ্যমান ছিল। হাণ্টার সাহেব তৎ

সংকলিত ঢাকার Statistical Accountএর একস্থানে রাজা রাজবল্লভ ও তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ রাজনগরের বাড়ীর বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি উহাকে Splendid residence বলিতে কুণ্ঠা বোধ করেন নাই।

১২৭৬ সনে ক্ষুদ্র রথ খোলার নদী ক্রমশঃ বিস্তার লাভ করিতে করিতে বিশাল পদ্মার সহিত মিলিত হইয়া চিরদিনের জন্য রাজনগরের অতুল গৌরব-প্রভা প্রকাশক প্রাসাদাবলী গ্রাস করিয়া ফেলিল। চির দিনের জন্য যাহা পৃথিবীর বুক হইতে মিলাইয়া গিয়াছে—তাহার স্মৃতি আর কত দিন থাকিবে ? মহারাজা রাজবল্লভের এ সকল কীর্ত্তিস্তম্ভ যিনি দর্শন করিয়াছেন তিনি জীবনে তাহা কখনও ভুলিতে পারিবেন না। রাজনগরের এই দারুণ দুর্গতির সময় শ্রীহট্ট নিবাসী জয়চন্দ্র ভট্ট নামক একজন ব্যক্তি রাজনগরের রাজকবি স্বরূপ বাস করিতেছিলেন; তিনি রাজনগরের এই দুর্দ্দশা দেখিয়া মনের দুঃখে যে সুদীর্ঘ কবিতা রচনা করিয়াছিলেন অদ্যাপি তাহা বিক্রমপুরের গ্রামে গ্রামে ভাট কবিগণ স্বরসংযোগে গান করিয়া দর্শকের মনে একটা বিষাদের ভাব জাগাইয়া দেন। আমরা সে গাথা এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :—

(নমো) লক্ষ্মী নারায়ণ, চক্র সুদর্শন
শ্রীপতি শ্রীজনার্দ্দন।
গোলোক-বিহারী গোলোকেশ্বর হরি
বৈকুণ্ঠেতে নারায়ণ ॥
ভক্তাধীন হরি ভক্তের বাঞ্ছাকারী
ভক্তকে করেন উদ্ধার।
অসংখ্য মহিমা, বেদে নাহি সীমা
জীবের বুঝা সাধ্য ভার ॥

পঞ্চ রত্ন মঠ (পূর্ব্বদিকের দৃশ্য)।
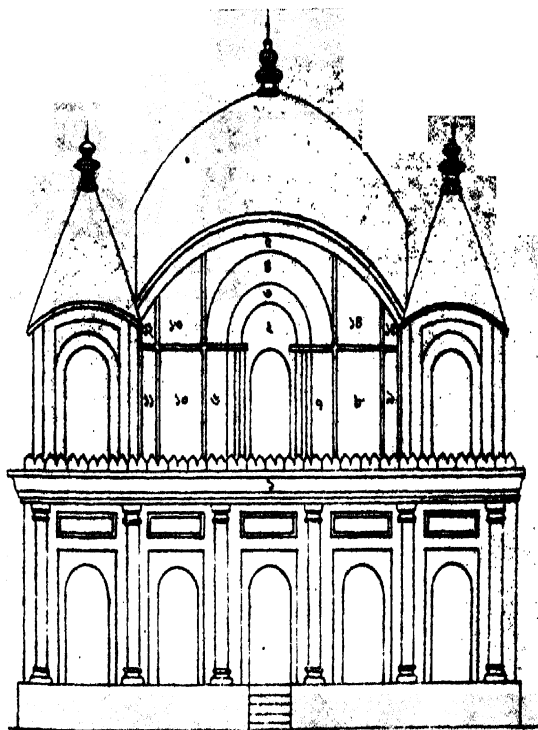
তবে বাস তরে, এক স্থান পরে
স্বজন করিলা হরি।
অই সোণার রাজনগর স্বজিলা শ্রীধর
সুখবাঞ্ছা মনে করি॥

বিপ্র, বৈদ্য, কায়স্থ, বিষয়ী সমস্ত
বাস্ত আছে বহুতর।
(যেমন) মথুরা ব্রজেতে, যমুনা মধ্যেতে
(তেমি) খাল নদী নগর॥

যত দেবলোক, করিয়া কৌতুক,
স্বজিলা ভগবান্।
তেমি ধন্য ধাম, রাজনগর গ্রাম,
দ্বিতীয় করিল নির্ম্মাণ॥

সে স্থানে ভূপতি, নাহি যদু পতি,
দেখে চিন্তাযুক্ত মন।
এই মনে করে, সমুদ্রের তীরে
দ্রুত করিলেন গমন॥

ঘোর যুদ্ধ করি, আপনি শ্রীহরি
জরাসন্ধে কল্লেন বধ।
পুনঃ জন্মে তারে, দিল রাজনগরে,
দ্বিতীয় রাজত্ব পদ॥

মজুমদার কৃষ্ণ, জীবন বিশিষ্ট,
সুতপস্তা ভবার্ণব।
তস্য ঘরে জাত হইল বিখ্যাত
মহারাজ রাজবল্লভ॥

হইল মহারাজ, রাজনগর মাঝ
বৈদ্যব ংশে অবতার।
রাঢ় গৌড় কলিঙ্গ, তুল্য অঙ্গ বঙ্গ
চমৎকার কীর্ত্তিবার॥

জম্মে ভূমণ্ডলে, নিজ বাহুবলে
কীর্ত্তি করেন বহুতর।
বিল দাওনীয়া ভরি, অট্টালিকা পুরী
নির্ম্মাইল নরেশ্বর॥

সব দালান পাকা, চক মিলান বাকা
তুল্য অমর নগর।
শতরত্নাবধি, পঞ্চরত্ন আদি
একুশ রত্ন মনোহর॥

দোল মঞ্চ শোভা, আহা মরি কিবা
সুমেরুর চূড়া প্রায়।
দীঘী সরোবর, সব প্রায় সাগর
স্থানে স্থানে দেখা যায়॥

কত স্থানাস্থান, দেবালয় নির্ম্মাণ
শিবালয়ে স্থাপিত শিব।
কোটি শিব কুড়াশি, তুল্য প্রায় কাশী
দৃষ্টিকর কলির জীব॥

রাজা "লক্ষ্মীনারায়ণ" দেবাদি ব্রাহ্মণ
সেবা করে নিরন্তর।
যাঁর কৃপা বলে রাজত্ব পদ পেলে
আসিয়ে ধরণী পর॥

সিংহ-দরজার নকসা চমৎকার
দেখিয়ে হয় যে শঙ্কা।
(যেন) সমুদ্র মাঝারে, রাজা লঙ্কেশ্বরে
সৃজিল কনক লঙ্কা॥

(যেমনি) রামায়ণে শুনেছি শ্রবণে
প্রত্যক্ষ তা দেখাইল।
তেমি মত সব, রাজা রাজবল্লভ
বিলদাওনীয়া দীপ্তি কৈল॥

রাবণ দোসর রাবণ সোসর
রাবণ প্রতাপ সব।
রাবণ জিনিয়া দিগ্বিজয়ী হৈয়া
মহারাজ রাজবল্লভ॥

সুবে বাঙ্গালায়, সুবে উড়িষ্যায়,
সুবে বর্দ্ধমান বিহার।
নেপাল মথুরা, কর্ণাট ত্রিপুরা,
এমন কীর্ত্তি নাহি আর॥

জানি কোন শাপে জরাসন্ধ ভূপে
জন্মিল্ রাজনগর মাঝ।
যাঁহার কৃপাতে, বাঙ্গালা মুলুকেতে
প্রকাশ পাইল ইংরাজ॥

নবাবী আমল করি বেদখল
ইংরেজকে রাজত্ব দিল।
ধন্য মহারাজ, ডঙ্কা তব মাঝ
রেখে পরলোক হল॥

যদিও নির্জ্জীব কীর্ত্তি তার সজীব,
বর্ত্তমান ভূমণ্ডলে।
সে কীর্ত্তির বাদী কীর্ত্তিনাশা নদী
অকস্মাৎ তরঙ্গ হলে ॥
শুনি পঁচিশ সালে, ভাঙ্গিল দুকূলে
কীর্ত্তিনাশা হয়ে খল।
আড়াকুলবেড়িয়া গোকুল গঞ্জ ভাঙ্গিয়া
মুলফৎ গঞ্জ কল্লে তল ॥
চাঁদ কেদার রায়ের কীর্ত্তি চমৎকার
ভেঙ্গে নিল কোটীশ্বর।
গোবিন্দ মঙ্গল সোণার দেউল
খাকুটিয়াদি বহুতর ॥
পূর্ব্বে এই মত ভেঙ্গে নিয়ে কত,
স্থির ছিল কিয়ৎকাল।
পুনঃ ছিয়াত্তর সালে, ভাঙ্গনি আরম্ভিলে
হইল তরঙ্গ উত্তাল ॥

দেখ দেখ ভাইরে, রাজনগরের হল কি দুর্দ্দশা।
কল্লে মহারাজের কীর্ত্তি নিবৃত্তি কীর্ত্তি নাশা ॥

(যেমন) নলরাজা মহাতেজা
পাপাশ্রিত হল।
দুষ্ট কলি যেয়ে প্রবেশিয়ে
রাজ্যভ্রষ্ট কৈল ॥

হল তদাকার ধরাপর
কলুষ প্রবল।
শৈলে সাগর নগরে কি নদী করে,
হয়ে এত খল॥

যাকে ভবার্ণবে এম্নি ভাবে
বিধি হয়রে বাম।
(তাকে) এরূপে কি দেখ দেখি
করয়ে নির্ণাম।

যেমন চন্দ্রধর প্রতি কর
মনসা বিবাদি।
এনে কালী দহে করে তাহে
উনশত নদী॥

করে মহার্ণব ডিঙ্গা সব
ভাসাল মনসা।
মহারাজার বাদি কীর্ত্তির
হল কীর্ত্তি নাশা॥

(হায়রে) দারুণ বিধি বুঝি নদী—
রূপে কাল হইয়া।
কৈল অসময় কি খণ্ড প্রলয়,
রাজনগর ভাঙ্গিয়া॥

নাহি ভারতবর্ষে বাঙ্গালা দেশে
এমনি কীর্ত্তি আর।
(সেই) সোণার নগর কীর্ত্তি সাগর
করে ছারখার॥

(ওসব) দেখিয়ে লোকে মনের দুঃখে বলে হায়রে হায়।
কল্লেম কি জন্ত অর্জ্জিত বিত্ত নদী লইয়া যায়॥

(অগ্নি) কলরব অসম্ভব
হইল নগরে।
কেহ কোলের ছেলিয়া বিত্ত ফেলিয়া
সরিয়া যাইতে নারে॥

ক্ষুদ্র তালুক দাররা বিত্ত হারা হল হত জ্ঞান।
বলে জীবনে সাধ কি ভবে কিসেরবেমান॥
কেহ বলে ভাই কি হইল রে এই ছিল কি লেখা।
বুঝি এই রাজ্যে আর কার সঙ্গে কার না হইবে দেখা॥
নদীর বেগ অতি রাজ্য প্রতি কি হল আক্রোশ।
যাচ্ছে মহারঙ্গে রাজ্য ভেঙ্গে মধ্যে দিয়ে চোস॥
লোকে কোথা যাবে কি করিবে হয়ে সশঙ্কিত।
(হায়রে) কিবা দশা কীর্ত্তি নাশা কল্লে আচম্বিত॥
এমন চমৎকার কীর্ত্তি আর হবেনা ভুবনে।
এমন সোণার নগর কীর্ত্তি সাগর পাব কোন স্থানে॥
কত দেশ বিদেশী লোক আসি দেখে বলে হায়।
নদী কি তরঙ্গে কীর্ত্তি ভেঙ্গে রাজ্য লয়ে যায়॥
কত দালান পাকা চকমিলান বাঁকা ভাঙ্গিল বহুতর।
প্রথম কুণ্ডের বাড়ী ভেঙ্গে ধরিলেক সুখ সাগর॥
নিল সুখের সাগর দুখ সাগর মহাসাগর ধরে।
নদীর কি প্রতাপ অসম্ভব প্রাণটি কাঁপে ডরে॥
সাধের মতি সাগর মুহূর্ত্তেক পর ভাঙ্গিলরে ভাই।
দেখ কোথা গেল রাউত পাড়া আকশার চিহ্ন নাই॥

নিল রাণীসাগর কৃষ্ণসাগর শুকধাম আর।
(হায়রে) খালে বিলে এক সমান কি করলে একাকার॥
(হায়রে) পুরাণ দীঘী কালবৈশাখী হইত যার পার।
নিল সেই মেলা জুয়া খেলা লাল বাজার বাহার॥
যাচ্ছে ক্রমাগত ভেঙ্গে যত রাজবংশের কীর্ত্তি।
রায় মৃত্যুঞ্জয়ের কীর্ত্তি পরে করিল নিবৃত্তি॥
যখন শতরত্ন হইল পতন চমৎকার নগরে।
হল কাশীতে যে ভূমিকম্প পঞ্চক্রোশী পরে॥
ভট্ট জয়চন্দ্রে পদবন্ধে করিল বর্ণন।
(পরে) পুরাণ হাবেলীর কথা বলি শুন সর্ব্বজন॥
(হায়রে) কীর্ত্তিনাশা কীর্ত্তি সব নিল।
বুঝি এতদিনে মহারাজার নামটি লোপ হল।
সোণার রাজনগর কি জলাকার হইল॥
ভেঙ্গে রায় মৃত্যুঞ্জয়ের হাওলী বাউলি দিয়ে অকস্মাৎ।
পুরাণ হাওলী বেয়ে ধরল একি বজ্রাঘাত॥
(হায়রে) বাবু সবকে করিয়ে অনাথ।
সাধের নবরত্ন পড়ল যখন নদীর মাঝারে॥
যেন নীরাকারে বটপত্র প্রায় ভাসে নীরে।
এমন দেখি নাই আর জগত সংসারে॥
বলেন বাবু সবে বিবাদ করে বিধির হল কোপ।
একে কালে মহারাজের নামটি করলে লোপ॥
(হায়রে) কীর্ত্তিনাশা হয়ে কাল স্বরূপ।
অবনি সোণার মঠ যোল মঠ হইল পতন॥
রাজা লক্ষ্মীনারাণ থাকতে হল এরূপ লাঞ্ছন।
বুঝি দেব ধর্ম্ম নাই কলিতে এখন॥

যদি থাক্‌ত সত্য মাহাত্ম্য ব্রাহ্মণ দেবতার।
তবে কি আর ছিন্ন ভিন্ন হয়রে এ সংসার॥
জানিলাম কলিতে হবে সব একাকার।
হায়রে কীর্ত্তিনাশা কি নিরাশা করলে একেবার॥
একটি চিহ্ন না রাখিল নাম রাখিতে আর।
হায়রে জহ্নু মুনি নাইরে এ সংসার॥
দেখি স্থলে কাঁদে স্থলচর জলে কাঁদে মীন।
আকাশের চন্দ্র সূর্য্য হইল মলিন॥
হায়রে একুশ রতন পড়িল যে দিন।
যত পাখী সব উড়ে উড়ে ঘুরিয়ে বেড়ায়॥
আশা বাসা কীর্ত্তিনাশা ভেঙ্গে নিয়ে যায়।
তারা বসিবার স্থান নাহি পায়॥
কেহ যায়রে হাসের কাঁদি কেহ মিলগায়।
কেহ কেহ পাতনা দিয়ে বসে দিন কাটায়।
বলে নদী নিরে একবার ফিরে বায়॥
ভট্ট জয়চন্দ্রের এই নিবেদন শুন সর্ব্বজন।
কাছার জিলায় ভূমিকম্পে এরূপ করয়॥
তাতে হয়েছে এক আশ্চর্য্য প্রলয়।
জানলেম বিধিকৃত কর্ম্ম যত খণ্ডন না যায়॥
যা হবার তা হয়ে গেছে আমার কি উপায়।
এরূপ মাস্তু আমি পাব আর কোথায়॥

অষ্টম অধ্যায়।

ইংরেজ শাসনকাল।

পলাশীর রণক্ষেত্রে ক্লাইভের বিজয় দুন্দুভির গভীর মন্দ্রের সঙ্গে সঙ্গেই মোগল রাজ-কুল-লক্ষ্মী ইংরেজের অঙ্কশায়িনী হইতে আরম্ভ করিলেন। ১৭৬৪ খ্রীঃ অঃ বক্সারের যুদ্ধে মীরকাসিমের শেষ চেষ্টা, শেষ যত্ন শেষ ক্ষীণআশার দীপ নির্ব্বাপিত হইয়া গেল। ইংরেজের অদম্য শক্তির নিকট নবাবের চেষ্টা যত্ন সকলি ফুরাইল। এই রণাবসানের পর হইতেই দেশের প্রকৃত অধিকার ও প্রকৃত ক্ষমতা বিধাতা আপন হস্তে সৌভাগ্যশালী ইংরেজের ললাটে অঙ্কিত করিয়া দিলেন। দেশের শাসন-কার্য্য সৌকর্য্যার্থ ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড ক্লাইভ অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলাকে অযোধ্যা প্রদেশ ফিরাইয়া দিয়া সা আলমের নিকট হইতে কোম্পানীর জন্য বাঙ্‌লা, বিহার ও ওড়িষ্যার দেওয়ানী গ্রহণ করিলেন। 'দেওয়ানী' অর্থে রাজস্ব সংগ্রহের ক্ষমতা। এই দেওয়ানী গ্রহণের পর হইতে কোম্পানী কর্তৃক ঢাকা প্রদেশের শাসন সংরক্ষণের কার্য্যাদি নির্ব্বাহিত হইতে থাকে। কোম্পানীর কর্ম্মচারীগণও প্রথমে নবাবী আমলের ন্যায় রাজকর আদায়ের নিমিত্ত হুজুরি ও নিজামত এই দুইটি বিভাগ স্থাপন করিয়াছিলেন। হুজুরি বিভাগ প্রাদেশিক দেওয়ানের অধীন এবং দেওয়ান খানা মুর্শিদাবাদে স্থাপিত থাকে, এবং পূর্ব্বের ন্যায় ঢাকা নগরে ডেপুটি দেওয়ানের কার্য্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। নিজামতের সেরেস্তা ও এ প্রদেশের রাজস্ব সংগ্রহ-ভূমির বন্দোবস্ত প্রভৃতি আবশ্যকীয় গুরুতর কর্ম্মের ভার ও ডেপুটি দেওয়ানের হাতে ছিল। ফৌজদারী ও দেওয়ানী বিচার কার্য্য ও

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দেওয়ানী গ্রহণ।

নিজামতে ছিল। ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দে রেভেনিউ বোর্ড কর্ত্তৃক একজন রাজস্ব পরিদর্শকের পদ সৃষ্ট হয়—হুজুরি ও নিজামত বিভাগের কার্য্য প্রণালীর উপরও তাহার সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব থাকে। ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে ওয়ারেন হেষ্টিংস যখন বঙ্গদেশের গবর্ণরের পদ গ্রহণ করিয়া আসেন তখন তিনি রাজস্ব পরিদর্শকের পদগুলি উঠাইয়া দিয়া তৎপরিবর্ত্তে কালেক্টরের পদ সৃষ্টি করেন।

সেই বৎসরই দেওয়ানী আদালত সৃষ্টি হইয়া কালেক্টর তাহার সর্ব্বময় কর্ত্তারূপে নিযুক্ত হন। এ সময়েই পরম অত্যাচারী নির্দ্দয় প্রকৃতির রাজস্ব কর্ম্মচারী রেজার্খা বিতাড়িত হইয়া তৎপদে মিডলটন সাহেব নিযুক্ত হন।

ঢাকার প্রাদেশিক মন্ত্রী সভার গঠন।

১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে পূর্ব্ব বিভাগের জন্য ঢাকায় এক মন্ত্রী সভার গঠন হয়। ইহার অধীনে স্থানে স্থানে নায়েব নিযুক্ত হয়, এ সকল নায়েবেরা ইজারাদারদের নিকট হইতে রাজস্ব সংগ্রহে প্রবৃত্ত হন। সে সময়ে এই মন্ত্রী সভার শেষ আবেদন (appeal) শুনিবার ও ক্ষমতা ছিল। ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে মন্ত্রী সভা উঠিয়া যায় এবং ডে (Day) সাহেব ঢাকার ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টারের পদে ও মিঃ ডানকেনসন (Duncanson) জজ নিযুক্ত হন, ইহারাই ঢাকার প্রথম জজ ও ম্যাজিষ্ট্রেট ক্যালেক্টার।

ইংরেজ কর্ত্তৃক ফরাসী ও পর্ত্তুগীজদের কুঠি অধিকার।

১৭৭৮ এবং ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ঢাকানগরীস্থ পর্ত্তুগীজও ফরাসীদিগের কুঠিগুলি অধিকার করিয়া ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী নিজ হইতে বাণিজ্য চালাইতে থাকেন। ওলন্দাজ ও ফরাসীবণিকগণ কর্ত্তৃক ঢাকার যথেষ্ট শিল্পোন্নতি হইয়াছিল, তাহারা ইউরোপের বিভিন্ন প্রদেশে ও জাপানে বস্ত্র প্রেরণ করিত। ১৭৮১ সালে ইংরাজেরা ওলন্দাজ দিগের কুঠি দখল করিয়া তাহাদের অধ্যক্ষকে

বন্দী করে। ফরাসীগণ ১৬৮৮ সালে বাঙ্‌লাদেশে আসিয়া ১৭২৬ সাল হইতে ঢাকায় ব্যবসা আরম্ভ করে। ১৭৭৮ সালে ইংরেজ ইহাদের কুঠি অধিকার করিয়া ১৭৮৩ সালে প্রত্যর্পণ করিয়াছিলেন। আবার ১৭৯৩ সালে উহা ফিরাইয়া দিয়াছিলেন। ১৮০৩ সালে তৃতীয় বার ফরাসী কুঠি দখল করিয়া নানাপ্রকার অসুবিধায় বাধ্য হইয়া উহা ১৮১৫ সালে ফরাসীদিগকে ফিরাইয়া দেন। ১৮৩০ সালে ফরাসী গবর্ণমেণ্ট ঢাকা বাসীদিগকে কুঠি বিক্রয় করিয়া ফেলেন। ঢাকার প্রাচীন সময়ে মলমলখাস, ঝুনা, রং, আব্‌-রবান্‌, রহমান, সরকারআল, খাসা, শুব্‌নাম, আলবল্লী, তন্‌জেব, তরহ-উন্দাম, নয়নসুখ, বদন-খাস, শর্‌ কন্দ, সরবতী, শর-বুটি, কামিজ, ডুরিয়া, চারখানা, জামদানি প্রভৃতি যে কত প্রকার নয়ন-মন-মোহ-কর শিল্প চাতুর্য্যময় বস্ত্রনিচয় নির্ম্মিত হইত তাহার ইয়ত্তা ছিল না—সে সকল বস্ত্রের খ্যাতি দেশ বিদেশে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু হায়! এখন সারা ঢাকার সহর ঘুরিয়া আসিলেও একখানা মস্‌লিন মেলা দুষ্কর। ঢাকার প্রাচীন সমৃদ্ধির সময় ঢাকানগরী পনের মাইল পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল, এখনও সে সকল ধ্বংসাবশেষের প্রাচীন দৃশ্য দেদীপ্যমান। ১৮১৭ সালে ইংরেজের কুঠি বন্ধ হইলে, ইউরোপে কাট্‌তি বন্ধ হওয়ায় ক্রমশঃ ঢাকার বস্ত্র শিল্পের অধঃপতন হইতে থাকে। ধীরে ধীরে ইউরোপের সস্তা কাপড় চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়া বস্ত্র শিল্প নষ্ট করিয়া ফেলিল। শিল্পগৌরব-সম্পন্ন ঢাকার এই শিল্প অবনতির সঙ্গে সঙ্গে ইহার নাগরিক সমৃদ্ধি ও বহু পরিমাণে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। ১৮০০ সালে ঢাকার জনসংখ্যা ছিল প্রায় দুইলক্ষ, বিশপহিবার ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে ৯০,০০০ হাজার লোক দেখিয়া ছিলেন, ১৮৩৮ সালে ক্রমশঃ ব্যবসার প্রসারতা হ্রাস হওয়ায় উহা ৬৮ হাজারে পরিণত হয়। ১৭৯৯ সাল হইতেই ঢাকার বস্ত্র ব্যবসায়ের অবনতি হইতে

ঢাকার প্রাচীন শিল্প।

থাকে। ঢাকার এই বিনষ্ট প্রায় শিল্প সমৃদ্ধি পুনরায় কবে যে প্রাচীন—গৌরবে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবে তাহা নির্ণয় করা মানব বুদ্ধির অগোচর। ঢাকা এখন আবার প্রাদেশিক রাজধানীতে পরিণত হইয়াছে ক্রমশঃ ইহার নাগরিক সমৃদ্ধিও বৃদ্ধি পাইতেছে, এই উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আবার ইহার বিলুপ্ত শিল্প গৌরব মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবে কি ?

ঢাকার শাসন সংরক্ষণের সঙ্গে সঙ্গে বিক্রমপুরের শাসন শৃঙ্খলার দিকেও কোম্পানীর মনোযোগ আকর্ষিত হইয়াছিল। পূর্ব্বে আবদুল্লাপুর প্রভৃতি স্থানের স্থানীয়কাজী এবং পরিশেষে বড় বড় মোকদ্দমা ইত্যাদি যেমন 'জাহাঙ্গীর নগরে, আসিয়া নিষ্পত্তি করিতে হইত, তদ্রূপ ইংরেজের বাঙ্গালা অধিকার ও কোম্পানীর দেওয়ানী গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে মাম্‌লা মোকদ্দমা ইত্যাদি ঢাকার নবপ্রতিষ্ঠিত বিচারালয়ে নিষ্পত্তি হইত। উহাতে বিক্রমপুরবাসীগণের যথেষ্ট যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইত। তখনকার সময়ে ঢাকা আসা ও নেহাৎ সুগম ছিলনা, পানের নৌকাও গহণার নৌকাই মোকদ্দমাবাজ জনসাধারণকে বহন করিয়া আনিত।

বিক্রমপুরের সর্ব্বপ্রথম বিচারালয়ের এইরূপ দূরত্ব নিবন্ধন এবং নানা প্রকার অসুবিধার নিমিত্ত গ্রাম্য সমাজশক্তি বিশেষ পুষ্টিলাভ করিয়াছিল। তখনকার দিনে বহু মাম্‌লা মোকদ্দমা পঞ্চায়েতী প্রথানুযায়ীই নিষ্পন্ন হইত, গ্রাম্য নেতৃবৃন্দ যাহা মীমাংসা করিয়া দিতেন তাহাই সকলে নত মস্তকে গ্রহণ করিত। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় সামাজিক শাসন দ্বারাই নিষ্পন্ন হইয়া যাইত। তখনকার দিনে এত কোর্টফি, উকীলের বায়না, ও মিথ্যা সাক্ষীর প্রাদুর্ভাব ছিল না, পঞ্চায়েতী সভার নিকট কেহ কোনও রূপ মিথ্যা কথা বলিতে সাহসী হইত না, কারণ 'চালপড়া, ক্ষুরপড়া' ইত্যাদির ভয়ও যথেষ্ট ছিল। সমাজ যে অদম্য শক্তি প্রভাবে দেশের জনসাধারণকে একতা শৃঙ্খলে বাঁধিতে সক্ষম হইয়াছিল, এ যুগে

বিচারালয় স্থাপন।

তাহা স্বপ্ন-কাহিনী বলিয়া মনে হয়। সত্য ও ধর্ম্মের নিকট সেকালে প্রত্যেকেই পরাজিত হইতে চাহিত, নবীন ইংরেজী বিদ্যার ছল চাতুরী তাহারা জানিত ও না তাহা অবলম্বন করিতেও চাহিত না। ইংরেজের সুশাসন প্রভাবে ক্রমশঃ এ সকল পঞ্চায়েতী সভা ও সমাজ শাসন লুপ্ত হইতে লাগিল। ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে সর্ব্বপ্রথমে বিক্রমপুরস্থ মুন্সীগঞ্জ গ্রামে মহকুমা স্থাপিত হয়, তখন সেখানে জন ফ্রেন্স (John French) নামক একজন ইংরেজ মহকুমার ভার প্রাপ্ত কর্ম্মচারী নিযুক্ত হন। ইনিই মুন্সীগঞ্জের সর্ব্বপ্রথম বিচারক বা ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী। ইহার কিয়ৎকাল পরে বিখ্যাত পোড়াগাছা গ্রামে একটী মুন্সেফী বিচারাগার প্রতিষ্ঠিত হয়, ৺গোবিন্দচন্দ্র বসু মহাশয় তথাকার প্রথম মুন্সেফ নিযুক্ত হন, ১৮০৫ খৃষ্টাব্দের ১৪ই মার্চ্চ তারিখে এই মুন্সেফী আদালত ঢাকা নগরীতে স্থানান্তরিত হয় এবং গোবিন্দ-বাবু বিক্রমপুরের কার্য্য সুসম্পাদনার্থ এডিসনাল মুন্সেফের (Additional munsiff) পদে নিযুক্ত হন।

মুন্সীগঞ্জে মহকুমা স্থাপন।

পোড়াগাছা ও বহরের মুন্সেফী আদালত।

পুনরায় ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ইহা ঢাকা হইতে স্থানান্তরিত হইয়া বহর গ্রামে আইসে—সেখানে ৺ নিত্যানন্দ গাঙ্গুলি সর্ব্বপ্রথম মুন্সেফের পদে নিযুক্ত হন। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে বহর গ্রামে ছোট আদালত (Small causes Court) প্রতিষ্ঠিত হয় এবং জৈনসার গ্রামবাসী প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মা অভয়কুমার দত্তগুপ্ত মহাশয় উহার প্রধান বিচারক বা জজের পদে নিযুক্ত হন। বিক্রমপুরে সর্ব্বপ্রথম মুন্সীগঞ্জ, শ্রীনগর, রাজাবাড়ী ও মুলফৎগঞ্জে থানা প্রতিষ্ঠাপিত হয়, প্রত্যেক থানায় একজন করিয়া দারোগা ও দুইজন করিয়া হেড কনেষ্টবল থাকিত।

থানা ও ফাঁড়ি।

সে সময়ে কেদারপুরে ফাঁড়ি বা আউট পোষ্ট প্রতিষ্ঠাপিত ছিল। লৌহজঙ্গে আবকারী বিভাগের একটী আফিস ছিল। ইংরেজ শাসনের সুশৃঙ্খল প্রভাবে দেশের যে কতদুর উন্নতি হইয়াছে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। পূর্ব্বে লোকে চোর ডাকাত ও বাটপারের ভয়ে সর্ব্বদা সশঙ্কিত চিত্তে কালযাপন করিতেন, ধন সম্পত্তি মৃত্তিকাভ্যন্তরে প্রোথিত করিয়া রাখিতেন, কিন্তু এখন আর সেরূপ ভীতচিত্তে কাহাকেও বাস করিতে হয় না। চারিদিকেই শান্তি বিরাজিত, প্রতি গ্রামে গ্রামে চৌকিদার দফাদার প্রভৃতি থাকায় সহজে কোনওরূপ অত্যাচার উৎপীড়ন হইতে পারে না। ইংরেজ-শাসন-নীতির সাম্যতা প্রযুক্ত এখন ছোট বড় সকলই সমান।

যে মুন্সীগঞ্জে * পূর্ব্বে একটীমাত্র বিচারালয় ছিল এখন সেই মুন্সীগঞ্জে পাঁচটি মুন্সেফী আদালত ও একটী স্মল কজ কোর্ট হইয়াছে (Small cause Court) এই কোর্টে জজ সাহেব বৎসরে তিনবার আসিয়া বিচার কার্য্য সমাধা করিয়া থাকেন। এখন ক্ষুদ্র মুন্সীগঞ্জ মহকুমা উকীল মোক্তারে পরিপূর্ণ ও মোকদ্দমাবাজ জনসাধারণের কল কোলাহলে দিবানিশি মুখরিত। বিক্রমপুরে এখন সর্ব্বশুদ্ধ চারিটি সব-রেজেষ্টরী আফিস হইয়াছে, পূর্ব্বে এক মুন্সীগঞ্জেই একটী ছিল এখন রাজাবাড়ী, শ্রীনগর, লৌহজঙ্গেও তিনটি রেজেষ্টরী আফিস অবস্থিত। থানাও এখন শ্রীনগর, রাজাবাড়ী, মুন্সীগঞ্জ ও লৌহজঙ্গে এই চারিস্থানে হইয়াছে তন্মধ্যে লৌহজঙ্গের থানাটি এই এক বৎসর মাত্র হইল প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছে। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে বিক্রমপুরস্থ জৈনসার,

* ঢাকায় মোগল শাসন দৃঢ় হইলে মুন্সীগঞ্জে ফৌজদারী আদালত সৃষ্টি হয়। মুন্সীগঞ্জের এই ফৌজদারী আদালত বহুদিন হইতেই প্রসিদ্ধ। মোগলদিগের সময়ে এখানে মুন্সীহায়দর হোসেন বলিয়া একজন ফৌজদার থাকিতেন তাঁহারই নামানুযায়ী ইহার নাম মুন্সীগঞ্জ হইয়াছে।

রাজাবাড়ী, মুলফৎগঞ্জ, কাঁচাদিয়া ও সোণারঙ্গ এই পাঁচটি মাত্র গ্রামে ডাকঘর ছিল, কিন্তু এখন শিক্ষা ও সভ্যতার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রায় প্রতি গ্রামেই এক একটী ডাকঘর স্থাপিত হইয়াছে।

ডাকঘর।

ইংরেজ রাজত্বের মধ্যে ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহের গোলযোগ ব্যতীত এ সময় পর্য্যন্ত ঢাকা জেলায় আর কোনও রাজকীয় বিশৃঙ্খলা হয় নাই। তৎকালীন ঢাকা কলেজের অধ্যক্ষ ব্রেনাণ্ড (Brenand) সাহেবের দৈনন্দিন লিপি হইতে জানিতে পারা যায় যে মিরাটের সিপাহীগণের বিদ্রোহের সংবাদ ঢাকার সৈনিকবৃন্দের কর্ণগোচর হইলে পর তাহারা একটু উত্তেজনার ভাব প্রকাশ করিয়াছিল সে সময়ে ঢাকা নগরে ৭৩ নং দেশীয় পদাতিক সৈন্য দুইদলে অবস্থান করিত। কর্ত্তৃপক্ষ প্রথমতঃ উহাদের অসন্তুষ্টিতে বিশেষ মনোযোগ প্রদান করেন নাই, কিন্তু ক্রমশঃ ঐ উত্তেজনার ভাব বৃদ্ধি পাওয়ায় গবর্ণমেণ্ট ভাবী অমঙ্গল বুঝিতে পারিয়া নগর রক্ষার্থ একদল সৈনিক পাঠাইলেন। নগরের প্রায় ষাটজন ইউরোপীয় ও ইউরেশীয়ান অধিবাসীও ভাবী বিপদাশঙ্কায় সখের সৈন্য বিভাগে নাম লিখাইয়াছিলেন। ২০শে নভেম্বর তারিখ পর্য্যন্ত কোনও বিশেষ ঘটনা ঘটে নাই। কিন্তু ঐ দিবসই সংবাদ পাওয়া গেল যে চট্টগ্রামের সিপাহীগণ বিদ্রোহী হইয়া ধনাগার লুণ্ঠন করিয়া প্রায় তিন লক্ষ টাকা লইয়া গিয়াছে, এ সংবাদে গবর্ণমেণ্ট ঢাকার সিপাহীগণকে নিরস্ত্র করিবার মন্তব্য স্থির করিলেন ও পরদিবস ভোর প্রায় পাঁচটায় সময় সিপাহীদিগকে নিরস্ত্র করিবার নিমিত্ত ইউরোপীয়গণ উপস্থিত হইলেন। কমিশনার, জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট প্রভৃতির উপস্থিতে নির্দ্দিষ্ট সঙ্কেতানুযায়ী প্রথমে ধনাগারের প্রহরীদিগের হস্ত হইতে অস্ত্র গ্রহণ করা হইল। সিপাহীগণ এ ব্যাপারে

ঢাকায় সিপাহী বিদ্রোহ।

বিশেষ অসন্তুষ্টি প্রকাশ করিয়াছিল, এমন কি কোন কোন সিপাহী এই গর্হিত কার্য্যের নিমিত্ত তাঁহাদের উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীকে ভর্ৎসনা করিতেও পশ্চাৎপদ হয় নাই। অতঃপর নৌসৈনিকগণ লালবাগের দিকে গমন করিল, প্রথম অবস্থা দেখিয়া আশা করা গিয়াছিল যে কোনওরূপ গোলযোগ উপস্থিত হইবে না, অতি সহজেই সিপাহীগণ গবর্ণমেণ্টের প্রস্তাবে স্বীকৃত হইয়া তাহাদের অস্ত্রশস্ত্রসমূহ প্রত্যার্পণ করিবে, কিন্তু কার্য্যকালে তাহা সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইল না। সিপাহীগণ বাধা দিতে প্রস্তুত হইল, সুতরাং উভয় পক্ষে একটু সামান্য রূপ যুদ্ধ বাঁধিল, ঐ যুদ্ধে সিপাহীগণের পক্ষে চল্লিশজন হত হইয়াছিল, অবশিষ্ট সিপাহীগণ মৈমনসিংহ ও শ্রীহট্টের দিকে পলায়ন করে, কিন্তু অবশেষে ইহাদের মধ্যে কতকজন ধৃত হইয়া প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিল। বোধ হয় বিদ্রোহী সিপাহীগণের কেহ কেহ ভুটানে পলায়ন করিয়া জীবন রক্ষা করিতে পারিয়াছিল। এই সামান্য লড়াইয়ে ইংরেজ পক্ষে একজন হত ও প্রায় ১৩ জন লোক আহত ব্যতীত আর কোনও দুর্ঘটনা ঘটে নাই।

সিপাহী বিদ্রোহের কোনওরূপ গোল যোগে বিক্রমপুরবাসীদিগকে বিপদাপন্ন হইতে হইয়াছিল এইরূপ কোনও কথা শুনিতে পাওয়া যায় না।

বিক্রমপুরে বিদ্রোহের কথা।

তবে জনপ্রবাদ হইতে জানিতে পারা যায় যে পরাজত সিপাহীগণ পলায়ন কালে বিক্রমপুরের কোন কোন গ্রামের মধ্য দিয়া যাইবার সময় সামান্য পরিমাণে লুণ্ঠন ও অত্যাচারাদি করিতে ছাড়ে নাই। এখনো পল্লীবৃদ্ধগণ পাশার বৈঠকে ও দাবার চালের সঙ্গে সঙ্গে হুকার ধুম উদ্গীরণ করিতে করিতে ঢাকার এই সামান্য কালা গোরার লড়াইর কথা অতিরঞ্জিত ভাষায় বর্ণনা করিয়া পল্লীস্থ বালক, যুবক ও মহিলাগণের নিকট বাহাদুরি লইতে ছাড়েন না!

নবম অধ্যায়।

প্রাচীন সাহিত্য।

বিক্রমপুরের শ্যামল শোভা সম্পদের মধ্যে কলকণ্ঠ বিহঙ্গগণের সুমধুর স্বর লহরী যেমন সকলকে মুগ্ধ করিয়া আসিতেছে, তদ্রূপ একদিন বিক্রমপুরের পদ্য-সাহিত্য-কাননেও কোমল বল্লরীর অভাব ছিল না; উহাতে একদিন সুন্দর সৌরভ পরিপূর্ণ প্রসূন রাজিও গুচ্ছে গুচ্ছে ফুটিয়াছিল। সত্য সত্যই একদিন বিক্রমপুরের কবিতা-কুঞ্জে পাপিয়া কোকিল ঝঙ্কার দিয়াছিল, সত্য সত্যই একদিন রমণীকণ্ঠের সহিত পৌরুষোচিত ভীম ভৈরব নিনাদ শ্রুত হইয়াছিল। প্রেমের সুমধুর গুঞ্জনের সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধ-গীতির যে কঠোর বিজয়ধ্বনি ঝঙ্কারে ঝঙ্কারে বাজিয়া উঠিয়াছিল আজ বহুবর্ষ পরে সে সমুদয় আলোচনার যোগ্য ও উপভোগ্য। বিজয়-গৌরব-দৃপ্ত প্রকৃতির লীলাভূমি জ্ঞান বিজ্ঞানের পীঠস্থান বিক্রমপুর যে সাহিত্য সেবায়ও স্বকীয় গৌরব অক্ষত রাখিতে পারিয়াছিল, সে কল্পনায়ও আমাদের মনে এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দের উদ্রেক হইতেছে এবং যতই তাহার আলোচনা করিতেছি—ততই ধন্য হইতেছি।

কাব্য সাহিত্য।

যে সময় আলোয়াল কবির 'পদ্মাবতী' ও ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যা-সুন্দরাদি' পশ্চিম বঙ্গে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল তখন পূর্ব্ব-বঙ্গের নিভৃত প্রদেশে আতটপ্লাবী পদ্মার তরঙ্গধৌত বিক্রমপুরেও কয়েকখানা কাব্য বিরচিত হইয়াছিল। আমরা এস্থলে সে সমুদয় কাব্যের ও তাহাদের রচয়িতাবর্গের সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত বিবৃত করিলাম। "মায়াতিমির চন্দ্রিকা" ও "যোগকল্প লতিকা" প্রণেতা লালা রামগতির বাড়ী বিক্রমপুর পরগণার পদ্মানদীর দক্ষিণ তীরস্থ জপসা গ্রামে

ছিল। বৈদ্যবংশোদ্ভব বেদগর্ভসেন পাঠাভ্যাস হেতু নিজ পৈত্রিক বাসগ্রাম ইট্‌না পরিত্যাগ করিয়া বিক্রমপুরে আগমন করেন এবং তথায় সত্যবন্ত দাশের কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া বিলদায়নীয়া (রাজনগর) জপ্‌সা, ভোজেশ্বর প্রভৃতি কতিপয় গ্রামের ভূসম্পত্তি অর্জ্জন করিয়া বিলদায়নীয়াতে নিবাস স্থাপন করেন। বেদগর্ভের পঞ্চম স্থানীয় বংশধর গোপীরমণ সেন একজন সৌভাগ্যশালী পুরুষ ছিলেন, মিঃ বিভারেজ প্রণীত বাখরগঞ্জের ইতিহাসেও তাঁহার নাম উল্লিখিত আছে। গোপীরমণের দ্বিতীয় পুত্র 'দেওয়ান' কৃষ্ণরাম নবাব সরকারের চান্দ প্রতাপ পরগণায় রাজস্ব আদায় করিতেন বলিয়া সেকালে 'দেওয়ান' উপাধি ভূষণে ভূষিত হইয়া বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। এই কৃষ্ণরামের পুত্র লালা রামপ্রসাদের পাঁচটী পুত্র জন্মগ্রহণ করে, তন্মধ্যে লালা রামগতি ও লালা জয় নারায়ণ উত্তরকালে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। রামগতি একজন উচ্চ শ্রেণীর সাধক ও সুকবি ছিলেন। ইনি নিজ গ্রন্থে আত্মপরিচয় সম্পর্কে যাহা লিখিয়াছেন আমরা এখানে তাহা উদ্ধৃত করিলাম;—

লালা রামগতি রায়।

"ব্রহ্মপুত্র মহাতীর্থ পূর্ব্বেতে প্রচার।
পশ্চিমেতে পদ্মাবতী বিদিত সংসার॥
মধ্যেতে বিক্রমপুর রাজ্য মনোহর।
ব্রাহ্মণ পণ্ডিত তাহে সদ্‌জ্ঞানী বিস্তর॥
বিশিষ্ট অম্বষ্ঠ জাতি বসতির স্থান।
জপ্‌সা নামেতে গ্রাম তথায় প্রধান॥
শ্রীরামপ্রসাদ রায় বিখ্যাত তাহাতে।
বৈদ্যশ্রেষ্ঠ লালা খ্যাতি পেল নিজামতে॥

জপ্‌সা উত্তম গ্রাম বসতি আলয়।
রামগতি নামে তার প্রধান তনয়॥

রামগতি অত্যন্ত সাধু চরিত্রের লোক ছিলেন। ইনি পঞ্চাশ বৎসর বয়স অতিবাহিত হইলে যোগানুশীলনের নিমিত্ত প্রথমে কলিকাতা কালীঘাটে ও পরিশেষে ৺কাশীধামে অবস্থিতি করেন। নব্বুই বৎসর বয়সে ইহাঁর মৃত্যু হয়। কাশীর মহাশ্মশানে তাঁহার দেহভস্মের সহিত তদীয় সাধ্বী সহধর্ম্মিণী ও অনুমৃতা হন। কথিত আছে যে বাল্যকালে রামগতি তাঁহার খুল্ল পিতামহ রঘুনন্দনের বাগানের আম চুরি করিয়া খাইতেন, একদিন তাঁহাকে ভৎর্সনা করায় রামগতি আবদার করিয়া বলিয়াছিলেন "দাদা মহাশয়, এখন আমগুলি আমরাই খাই, তুমি কাশী যাও।" জ্ঞানহীন সরল শিশুর আবদার বৃদ্ধের নিকট শাস্ত্রের মত কার্য্যকারী হইল, পরদিন প্রত্যুষে সকলে বিস্ময়ের সহিত দেখিল যে গেরুয়া পরিয়া বৃদ্ধ রঘুনন্দন প্রীতিফুল্ল মুখে কাশী যাত্রা করিয়াছেন। খুল্ল পিতামহের এই দেবমূর্ত্তি বালক রামগতির সরল শুভ্র হৃদয়ে গাঢ়তররূপে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল, তিনিও ধনজন-পরিপূর্ণ-সংসারের মধ্যে নিস্পৃহভাবে থাকিয়া কর্ত্তব্য পালন করিয়া গিয়াছেন।

লালা রামগতির "মায়াতিমির চন্দ্রিকা" বঙ্গভাষায় উজ্জ্বল কীর্ত্তি। এই গ্রন্থ সংস্কৃত "প্রবোধ-চন্দ্রোদয়" নাটকের পন্থানুযায়ী লিখিত। যখন বিদ্যাসুন্দরের মধুর পদাবলীর প্রেমতরঙ্গে বাঙলাদেশ হাবুডুবু খাইতে ছিল—যে সময়ে হাঠে, মাঠে, ঘাটে, 'কেমন মালীর বোনগো তুমি, দাও দেখি গাঁথিয়ে মালা' ও 'ভাল মালা গাঁথে ভাল মালিয়ারে—ইত্যাদি শীর্ষক গীতাবলী বক্তৃত হইত, অশ্লীলতার আবরণ যে যুগে ছিল না, সেই সময় রামগতি সাময়িক স্রোতের বিরুদ্ধে এই ধর্ম্মের রূপক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থে যোগ ক্রিয়াপে

হয়, তাহার বিবিধ কূট ব্যাখ্যা, যোগের অবস্থা বর্ণন, সংসারের অনিত্যতা ইত্যাদি বিষয়ক নানাবিধভাবে পরিপূর্ণ। প্রত্যেক কবিতারই সংসারের অনিত্যতা ও অসারতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন, সংসারকে তিনি সমুদ্রের সহিত তুলনা করিয়া লিখিয়াছেন ;—

সংসার সমুদ্র ঘোর অলঙ্ঘ্য অপার।
মায়া-নীর হীন তীর পরম দুস্তর॥
শোকের তরঙ্গ তাহে দুঃখের লহরী।
মকর কুম্ভীর তাহে রোগ আদি করি॥
রত্নলোভে যত্ন করি তাহাতে মজিলে॥
রত্ন না পাইলে আর তরঙ্গে ডুবিলে॥

সংসারে, ধন, সম্পদ ও যৌবন অচিরস্থায়ী তাই কবি বলিয়াছেন ;—

স্বপ্নবৎ সম্পদ না রহে চিরদিন
যৌবন কুসুম সম প্রভাতে বিলীন॥

কি সুন্দর! মানুষের সুখ, শান্তি, পাপ, পুণ্য সমুদয়ই মনের উপর নির্ভর করে, সেই মনকে সম্বোধন করিয়া তিনি বলিয়াছেন ;—

ওরে মন কু-গমন কু-পথের পথী।
কু-পথে যাইতে বল কে তোমার সাথী॥
বুদ্ধি নাশে হস্ত পদ বান্ধিয়া তোমার।
ধৈর্য্যতার গিরি বুকে চাপাইব ভার॥
ক্ষমার মন্দিরে বন্দি করিয়া রাখিব।
চেতন প্রহরী তথা সতর্ক করিব॥
যখন নয়ন জলে অধর তিতিবে।
আপনার কর্ম্মফল তখন পাইবে॥
নহেতো অবোধ মন আপনা ভাবিয়া।
ছাড়ত কু-পথ চল সুপথ ধরিয়া॥"

এই গ্রন্থের প্রত্যেকটি কবিতাই প্রবৃত্তির সংযমও কঠোর উপদেশাত্মক। ইহা দ্বারা রচয়িতার হৃদয়ের বল ও সৎসাহসের বিশেষরূপে পরিচয় পাওয়া যায়। মনের জীব সভায় গমন ও সেই সভার বর্ণনাও অতি সুন্দর যথা ;—

"কোপে অতি শীঘ্রগতি মন চলি যায়।
যথা বসে নানা রসে সদা জীব রায়॥
তনু যার সুবিস্তার দিব্য রাজধানী।
হৃদি তার রম্যপুরী তথায় আপনি॥
অহঙ্কার হয় যার মোহের কিরীটি।
দম্ভ পাটে বৈসে ঠাটে করি পরিপাটী॥
পুষ্প চাপ উগ্রতাপ লোভ অনিবার।
দুই মিত্র সুচরিত্র বান্ধব রাজার॥
শান্তি ধৃতি ক্ষমানীতি শুভশীলা নারী।
মানকরি রাজপুরী নাহি যায় চারি॥
পতিব্রতা ধর্ম্মরতা অবিদ্যা মহিষী।
পতিকাছে সদা আছে রাজার হিতৈষী।
নারীসঙ্গে রতিরঙ্গে রসের তরঙ্গে।
এইরূপে কামকূপে জীব আছে রঙ্গে॥

অধ্যায়গুলির শেষে সংস্কৃত কাব্যের অনুকরণে লিখিত হইয়াছে, যথা "ইতি মায়াতিমির চন্দ্রিকায়াং জীব চৈতন্য প্রসঙ্গে দ্বিতীয় কলা নাম দ্বিতীয়োল্লাসঃ"। রামগতির ন্যায় চরিত্রবান সাধক কবি অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়।

আনন্দময়ী। এই মহীয়সী বিদুষী মহিলা কবি, সাধক রামগতির আরাধনার ধন। আনন্দময়ীর মাতার নাম কাত্যায়নী দেবী। রামগতি নিজহস্তে কন্যার শিক্ষার ভার গ্রহণ করিয়া কন্যাকে

সুশিক্ষিতা করিতে সম্পূর্ণরূপে পারগ হইয়াছিলেন। ১৭৫২ খৃঃ অব্দে আনন্দময়ী জন্ম গ্রহণ করেন। ১৭৬১ খৃঃঅব্দে পয়োগ্রাম নিবাসী প্রভাকর বংশীয় রূপরাম কবিভূষণের পুত্র অযোধ্যা রাম কবীন্দ্রের সহিত এই বিদুষী রমণীর শুভ পরিণয় কার্য্য সুসম্পাদিত হয়। আনন্দময়ীর স্বামী অযোধ্যা রাম সংস্কৃত শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী এবং পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন, কিন্তু তদীয় পত্নীর বিদ্যাবত্তায় এবং কবিত্ব সৌরভে অযোধ্যা রামের পাণ্ডিত্য জ্যোতিষ্মান পূর্ণিমার চন্দ্রের নিকট খদ্যোতের ক্ষীণ আলোক রশ্মির ন্যায় ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িয়াছিল।

আনন্দময়ীর বিদ্যাবত্তার সম্বন্ধে এইরূপ কথিত আছে যে রাজনগর গ্রামবাসী পণ্ডিত শ্রেষ্ঠ কৃষ্ণধন বিদ্যাবাগীশের পুত্র পণ্ডিত হরি বিদ্যালঙ্কার আনন্দময়ীকে সংস্কৃতে শিবপূজা পদ্ধতি লিখিয়া দিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে স্থানে স্থানে ভ্রম থাকায়, আনন্দময়ী বিদ্যাবাগীশ মহাশয়কে পুত্রের অধ্যয়ন সম্বন্ধে অমনোযোগী বলিয়া ভর্ৎসনা করিতে ক্রটি করেন নাই।

মহারাজা রাজবল্লভ যখন অগ্নিষ্টোম যজ্ঞ করেন, তখন তিনি যজ্ঞের প্রমাণ ও যজ্ঞকুণ্ডের প্রতিকৃতি চাহিয়া রামগতি সেনের নিকট পত্র লিখেন, সেই সময়ে রামগতি সেন মহাশয় পুরশ্চরণে নিযুক্ত থাকায় স্বয়ং পুস্তক হইতে প্রমাণাদি উদ্ধৃত করিয়া দিতে অসমর্থ হন। তিনি এ বিষয়ের ভার কন্যা আনন্দময়ীর উপর অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত রহিলেন; কারণ কন্যার বিদ্যাবত্তার সম্বন্ধে তাঁহার প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল। আনন্দময়ী যথা সময়ে পিতৃ আদেশানুযায়ী সমুদয় প্রমাণ ও প্রতিকৃতি স্বহস্তে লিখিয়া পাঠাইয়া ছিলেন। পরে রাজ সভায় এই বিষয়ের আলোচনা হইলে সকলেই তাহা বিশ্বাস করিলেন, কারণ আনন্দময়ীর পাণ্ডিত্য তখন সর্ব্বজন বিশ্রুত ছিল, বিশেষ সভায় পণ্ডিত কৃষ্ণধন বিদ্যাবাগীশ মহাশয় আনন্দময়ীর অধ্যাপক ছিলেন।

আমরা এখন আনন্দময়ীর কবিত্ব সম্বন্ধে পরিচয় দিব। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে তিনি তদীয় খুল্লতাত জয়নারায়ণকে "হরিলীলা" গ্রন্থ প্রণয়ন সম্বন্ধে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন; আমরা এস্থলে "হরিলীলা' হইতে আনন্দময়ীর রচনার একটু আভাষ দিতেছি। সওদাগর পুত্র চন্দ্রভানুর সহিত সুনেত্রার বাসি বিবাহ উপলক্ষে কবির বর্ণনা শুনুন।

"হের চৌদিগে কামিনী লক্ষেলক্ষে।
সমক্ষে, পরক্ষে, গবাক্ষে, কটাক্ষে॥
কতি প্রৌঢ়ারূপা ওরূপে মজন্তি।
হসন্তি, খলন্তি, দ্রবন্তি, পতন্তি।
কত চারুবক্ত্রা সুবেশা, সুকেশা।
সুনাসা, সুহাসা, সুবাসা, সুভাষা॥
কত ক্ষীণ-মধ্যা, সুভাঙ্গা সুযোগ্যা।
রতিজ্ঞা, বশীজ্ঞা, মনোজ্ঞা, মদজ্ঞা॥
দেখি চন্দ্রভানে, কত চিত্তহারা।
নিকারা, বিকারা, বিহারা, বিভোরা॥
করে দৌড়াদৌড়ি, মদমত্ত প্রৌঢ়া।
অনূঢ়া, বিমূঢ়া, নবোঢ়া, নিগূঢ়া॥
কোন কামিনী কুণ্ডলে গণ্ড ঘৃষ্টা।
প্রহৃষ্টা, সচেষ্টা, কেহ ওষ্ঠদষ্টা॥
অনঙ্গাস্ত্রবিদ্ধা, কত স্বর্ণ বর্ণা।
বিকীর্ণা, বিশীর্ণা, বিদীর্ণা, বিবর্ণা॥
কারো ব্যস্ত বেণী নাহি বাস বক্ষে।
কারো হার চূর্ণান্ পরিভ্রষ্ট কক্ষে॥
* * * * *

কারো বাহুবল্লি কারো স্কন্ধ দেশে।
রহিয়া সাধুবাক্য বক্তে প্রকাশে॥
সুকক্ষে, নিতম্বে উর হেমকুম্ভে।
এভাবে ও ভাবে হাটিতে বিলম্বে॥
তাহে দোলিতা লাজভারি ভরেতে।
পরে হেলি দুলি অনঙ্গ জরেতে॥
সুনেত্রাকে কেহ, কেহ চন্দ্র ভানে।
করে সেক তোয়ে সবে সাবধানে॥
সহস্তে ঢালিছে সর্ব্ববারি অঙ্গে।
ঝনৎ ঝনৎ গলৎ গলৎ পড়ে নীর অঙ্গে॥
সখী চন্দ্রভানে বলে চাতুরীতে।
এ রত্নের মালা কাকের গলেতে॥
শুনি চাতুরী দম্পতি হেট মাথে।
চলাচল গলাগল সখী সর্ব্বতাতে॥

আমাদের দেশে পূর্ব্বে বিবাহ, অন্নপ্রাশন ইত্যাদি মাঙ্গলিক উৎসবে রমণীগণ সকলে মিলিয়া সমস্বরে সঙ্গীত করিতেন, তাহাদের উলুধ্বনি সহকারে এই সমুদয় সঙ্গীতের মধুর সৌন্দর্য্য একদিন সত্য সত্যই বিশেষ উপভোগ্য ছিল, কিন্তু হায়! কালবশে তাহা অন্তঃহিত হইতে চলিয়াছে। পূর্ব্বে এবং বর্ত্তমান সময়েও অধিকাংশস্থলেই আনন্দময়ীর বিরচিত সঙ্গীতই গীত হইত। এখনও বিক্রমপুর হইতে এই প্রথা একেবারে উঠিয়া যায় নাই। আমরা এখানে তাহার একটী উল্লেখ করিলাম।

বিবাহের গান,—

যাত্রা করি রঘুনাথ করিলেন গমন।
জানকী করিতে বিয়া চলেন নারায়ণ।

পঞ্চশব্দে বাদ্যবাজে জনক রাজার বাড়ী।
রঘুনাথ করিবেন বিয়া জনক কুমারী॥
সর্ব্বলোকে বলে ধন্য সীতার জননী।
তাহানে দিবেন সেবা দেব রঘুমণি॥
নারীগণে বলেন রাণী শুন গো বচন।
সীতারে সাজাও সাজে কৌশল্যানন্দন॥
সীতারে সাজায় রাণী রত্তি করি দূর।
কঙ্কন মেখলা দিল পঞ্চম নূপুর॥
নাসায় বেসর দিল শিরে শিরোমণি।
ঠেকীতে তরুয়া যেন ধরিয়াছে ফণী॥
তাহার পরে পরাইল তার কেয়ূর।
আভরণ জলে সীতার শশী করি দূর॥
মণিময় আভরণ পরাইল শেষে।
রঘুনাথ বরিতে গেল মনের হরিষে॥
বিচিত্র সেউতিপুষ্প সীতাদেবী থিটে।
গগনে ঠেকিয়া পৈল রামের মুকুটে॥
বিচিত্র পঙ্কজ পুষ্প গন্ধ মনোহর।
উদয়ে ফুলের জ্যোতিঃ জিনি নিশাকর॥
পঙ্কজের দল জিনি জানকীর হাত।
ভ্রমর গুঞ্জরে পাশে হাসেন রঘুনাথ॥
ভ্রমর বলে শশী নরলোদর পদ্মবর।
শশধর হৈলে হেথা আসিত চকোর॥
রাম বামে জানকীর বিবাহ হইল।
কৃত্তিকা সহিত যেন শশী লুকাইল॥

বিবাহ হইল, সীতার রাম বামে বসি।
লাজে লুকাইল তখন শরদের শশী ॥
বিবাহ হইল সাঙ্গ যজ্ঞ সমাপন।
পাণিগ্রহ সাঙ্গ কৈল কৌশল্যানন্দন ॥
অপূর্ব্ব বসন্ত ঋতু মদনের সখা।
যাহে নব নব কুসুমের দেখা ॥
বিকসিত রসাল-মঞ্জরী নানা মতে।
ফলিত মল্লিকা কলি কত শতে শতে ॥
স্তবকের ভরে নত কুসুমের লতা।
যেন গুরু কুচভরে নিতম্ব নিলতা ॥
পৃথিবী রজত ময় হইয়াছে কিশোরে।
কিংশুকে ভুবন পূর্ণ স্বর্ণ অলঙ্কারে ॥
কুসুমের বনে কত কত অলিকুল।
গুণ গুণ শব্দ করে গন্ধেতে আকুল ॥
মলয় কন্দর হইতে মন্দ সমীরণ।
বিরহিনীর যম হেতু বহে ঘন ঘন ॥
কারো হার খুলি ঘুরায় বারে বার।
কেহ খসাইয়া পুনঃ দেয় অলঙ্কার ॥
কদলি বেদীতে রাম জানকী আনিয়া।
কত নাট কত জাট করে বিনাইয়া ॥
শুভক্ষণে দূর্ব্বা অর্ঘ্য দিয়া রঘুপতি।
সীতা সঙ্গে ঘরে চলেন অতি হৃষ্ট মতি ॥

অন্ন প্রাশনের গীতের নমুনা,—

"ছয় মাসের রঘুনাথ জননীর কোলে।
কেলী করে দেখে রাজা মন কুতূহলে ॥

নব শশী জিনি কান্তি বাড়ে দিন দিন।
কত পূর্ণ শশী মুখ হেরিয়া মলিন॥
অন্ন প্রাশনের হেতু কৈলা অনুমতি।
আসিলেন বশিষ্ঠ ঋষি অতিহৃষ্ট মতি॥
শুভতিথি বার আর নক্ষত্র বিহিত।
বিচারিয়া শুভক্ষণ কহেন পুরোহিত॥
নানামত করিলেন মঙ্গল রচন।
নানাস্থানে নাচে গায় যত রামা গণ॥

স্বামী চন্দ্রভান ব্যবসায় উপলক্ষে ডিঙ্গা সাজাইয়া শ্বশুরের সহিত প্রবাসে গমন করিয়াছেন, তখন বিরহিনী সুনেত্রা বিরহব্যথায় ব্যথিতান্তঃকরণে বলিতেছে :—

—আসি দেখহ নয়নে।
হীন তনু সুনেত্রার হয়েছে ভূষণে॥
হয়েছে পাণ্ডুর গণ্ড, রুক্ষ কেশপ্রতি।
ঘরে আসি দেখ নাথ এসব দুর্গতি॥
রহিয়াছি চির বিরহিনী দীন মনে।
অর্পণ করিয়া আমি তোমা পথ পানে॥

* * * *
* * * *

ভাবি যাই যথা আছ হইয়া যোগিনী।
না সহে এ দারুণ বিরহ আগুনি॥
যে অঙ্গে কুঙ্কুম তুমি দিয়াছ যতনে।
সে অঙ্গে মাখিব ছাই তোমার কারণে॥
যে দীর্ঘ কেশেতে বেণী বাঁধিছ আপনি।
তাতে জটাভার করি হইব যোগিনী॥

শীতভয়ে যে বুকেতে লুকায়েছ নাথ।
বিদারিব সে বুক করিয়া করাঘাত॥
যে কঙ্কণ করে দিয়াছিলা হৃষ্ট মনে।
সে কঙ্কণ কুণ্ডল করিয়া দিব কাণে॥
তব প্রেমময় পাত্র ভিক্ষা পাত্র করি।
মনে করি হরি স্মরি হই দেশান্তরী॥
তাতে মাতা প্রতিবন্ধ বাহিরিতে নারি।
আর তব শ্লাপ্যধন বিষম যৌবন।
লুকাইয়া নিয়া ফিরি দরিদ্র যেমন॥

প্রাচীন যুগের কবিগণ সকলেই অশ্লীলতা দোষে দুষ্ট ছিলেন, আনন্দময়ী ও যুগগত সংকীর্ণতার স্তর অতিক্রম করিয়া বর্ত্তমান যুগের সুরুচির কল্পনা পূর্ব্বক কবিতা সুন্দরীকে সেই পথে চালিত করিতে পারেন নাই। কবি জয় নারায়ণের চণ্ডীতে দশ অবতারের স্তোত্রের পংক্তি দুইটি ও আনন্দময়ীর রচিত।

এইরূপ গল্প প্রচলিত আছে যে, জয় নারায়ণ একদিবস কাব্যরচণায় এতদুর দৃঢ় মনঃ সংযোগ করিয়াছিলেন যে বেলা দ্বিতীয় প্রহর উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও তাঁহার স্নানাহারের কথা মনে ছিল না। আনন্দময়ী খুল্লতাতকে স্নানাহারাদি করিতে অনুরোধ করিলেন। কবি জয়নারায়ণ বলিলেন যে আর অতি সামান্য অবশিষ্ট আছে, ভগবানের দশ অবতার সংক্ষেপে বর্ণনা হইলেই তিনি উঠিবেন। কিন্তু ভ্রাতষ্পুত্রীর ঐকান্তিক অনুরোধ তিনি উপেক্ষা করিতে না পারিয়া অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাধ্য হইয়া স্নানাহার করিতে গমন করিলেন। ইত্যবসরে আনন্দময়ী লিখিলেন,

"জলজ বনজ যুগ যুগতিন রাম।
খর্ব্বাকৃতি বুদ্ধদেব কল্কি সে বিরাম॥

এত সংক্ষেপে আর কেহই এরূপভাবে ভগবানের দশরূপ বর্ণনা করেন নাই।

স্ত্রীলোকের কেশের বর্ণনা অনেকেই করিয়াছেন কিন্তু—

"কুটিল কুন্তল তার, বন্ধন শঙ্কায়।
নিতম্বে পড়িয়া পদ ধরিবারে ধায়॥

এরূপ সুন্দর ও স্বাভাবিক বর্ণনা বঙ্গ ভাষায় অতি বিরল, আমরা আনন্দময়ীর কবিত্ব প্রতিভা দেখিয়া যেরূপ পুলকিত হইয়াছি, তাহা ভাষায় বুঝাইতে অক্ষম, এই বিদুষী রমণীর কাব্যালোচনা করিলে বিস্মিত ও পুলকিত হইতে হয় শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত দীনেশ চন্দ্র সেন "বঙ্গভাষাও সাহিত্য" নামক গ্রন্থে সত্যই লিখিয়াছেন যে "আনন্দময়ীর রচনার শব্দ বৈভব ও পাণ্ডিত্য দর্শনে তাঁহাকে আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের বি,এ, এম এ উপাধিধারিণী মহিলাগণ অপেক্ষা কোনও অংশেই ন্যুন বলিয়া অনুমিত হয় না।" বিক্রমপুরকে ধন্য যে একদিন তাহার এক ক্ষুদ্র গ্রামে ঈদৃশ মহিমময়ী মহিলা কবি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; আমাদের বিবেচণায় রমণী কবিগণের কাব্য সমালোচনা করিতে হইলে, সমুদয় বঙ্গীয় কুল ললনাগণই একবাক্যে আনন্দময়ীকে তাঁহাদের শীর্ষ স্থানীয়া এবং তদীয় গৌরব প্রভায় গৌরবান্বিতা মনে করিতে কুণ্ঠিতা হইবেন না।

আনন্দময়ী যেরূপ সুশিক্ষিতা ছিলেন, তদ্রূপ বিনীতা ও ধর্ম্মপরায়ণা ছিলেন। পতির প্রতি তাঁহার অচলা ভক্তি ও শ্রদ্ধা ছিল। পতির মৃত্যু সময়ে আনন্দময়ী পিত্রালয়ে ছিলেন, যখন তিনি এই হৃদয়-বিদারক সংবাদ শুনিতে পাইলেন, তখন আর তাঁহার পুত্র, কন্যা, ভাই ভগ্নী কাহারো নিমিত্ত মমতা রহিল না, আত্মীয় স্বজনকে বলিয়া সত্বরে অনুমৃতার আয়োজন করিলেন। পরিশেষে স্বামীর কাষ্ঠ পাদুকা হৃদয়ে ধারণ করিয়া জলন্ত চিতায় ঝাঁপ দিয়া পতির অনুগামিনী হইলেন। যত দিন পর্য্যন্ত মহিলা কবিগণের কাব্যের আদর থাকিবে, ততদিন

পর্য্যন্ত আনন্দময়ীর কবিত্ব প্রতিভা উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের ন্যায় কাব্যগগন আলোকিত করিবে।

গঙ্গাদেবী।

গঙ্গামণি দেবী লালা রামপ্রসাদের কন্যা ও লালা জয়নারায়ণ ও লালা রামগতির ভগিনী। পূর্ব্ববঙ্গের প্রায় সর্ব্বত্রই বিবাহ অন্নারম্ভ ইত্যাদি মঙ্গলানুষ্ঠানে গ্রাম্য মহিলাগণ সমবেত হইয়া সঙ্গীতাদি করিয়া থাকেন। তাহাদের ঘন ঘন উলুধ্বনি ও সমবেত কণ্ঠের উচ্চ সঙ্গীত রবে সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে, যে বাড়ী হইতে এই সঙ্গীত ধ্বনি উত্থিত হইতেছে সে স্থানে কোন না কোন মঙ্গলানুষ্ঠান হইবেই হইবে। গঙ্গাদেবী বিবাহ কালে গাহিবার উপযুক্ত বহু মঙ্গল গান রচণা করিয়াছিলেন, এক সময়ে সে সকল সঙ্গীত বিশেষ আদরের ও ছিল, কিন্তু কাল বশে গঙ্গামণির সে সমুদয় সুমধুর সঙ্গীতাবলী বিলুপ্ত প্রায়। বাবু রমাকান্ত সেন অধুনা বিলুপ্ত "নির্ম্মাল্য" নামক মাসিক পত্রে গঙ্গামণি দেবীর যে একটী খণ্ডিত গান প্রকাশ করিয়াছিলেন আমরা এখানে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম, ইহা হইতেই পাঠকও পাঠিকাবর্গ তাঁহার রচনা নৈপুণ্য ও কবিত্ব শক্তির অনুধাবনা করিতে পারিবেন। এই গানটীতে সীতার বিবাহ বর্ণিত হইয়াছে। যথা—

"জনক নন্দিনী সীতা হরিবে সাজায় রাণী।
শিরে শোভে সিঁথিপাত, হীরা মণি চুণী॥
নাসার অগ্রেতে মতি বিম্বাধর পরি।
তরুণ নক্ষত্র ভাতি জিনি রূপ হেরি।
মুকুতা দশন হেরি লাজে লুকাইল।
করীন্দ্রের কুম্ভ মাঝে মজিয়া রহিল॥
গলে দিল থরে থরে মুকুতার মালা।
রবির কিরণে যেন জলিছে মেখলা॥

কেয়ুর কঙ্কণ দিল আর বাজুবন্ধ।
দেখিয়া রূপের ছটা মনে লাগে ধন্দ।
বিচিত্র ফলিত শঙ্খ কুল পরিচিত।
দিল পঞ্চ কঙ্কণ পৈছি বেষ্টিত॥
মনের মত আভরণ পরাইয়া শেষে।
রঘুনাথ বরিতে যান মনের হরিষে॥"

আমাদের দেশে প্রায় ১৫০ শত বৎসর পূর্ব্বে রমণীরা কিরূপ অলঙ্কার পরিয়া সেকালের পুরুষ দিগের মন ভুলাইতেন ইহা হইতে তাহার একটা সংক্ষিপ্ত পরিচয় পাওয়া যায়।

শ্রীযুক্ত রমাকান্ত সেন মহাশয় ১৩০৪ সালের জ্যৈষ্ঠের 'ভারতীতে' লিখিয়াছেন—"দুঃখের বিষয় এই যে রাজনারায়ণ "পার্ব্বতী পরিণয়" নামক যে সংস্কৃত কাব্যগ্রন্থ প্রণয়ণ করিয়াছিলেন তাহা আর এখন পাই বার উপায় নাই।" লালা রাজনারায়ণ জয়নারায়ণ ও রামগতির অন্যতম ভ্রাতা, ইহা দ্বারা বুঝিতে পারা যায় যে এই পরিবারের প্রতি মাতা বীণা-পাণি ও চঞ্চলা কমলা উভয়েরই কৃপা দৃষ্টিপাত ছিল। এই সমুদয় গ্রন্থ ১৬৯৪ শকে ও তৎপূর্ব্বে বিরচিত হইয়াছিল। "হরিলীলা" গ্রন্থে লিখিত আছে যে—

"অত্রিপুত্র অগ্নিনেত্র ষড়াননানন।
বসুমতী শাকে পুঁথি হল সমাপন॥

ইহার পরে আবার লিখিত আছে ;

নারায়ণ প্রভু পদে করি দৃঢ় মন।
যোড়শ চোয়াত্তৈ শাকে পুস্তক লিখন॥

অতএব ১৩৫ বৎসর পূর্ব্বে এ সমুদয় কাব্য বিরচিত হইয়াছিল।

ইনি কবি রামগতির কনিষ্ঠ সহোদর। জয়নারায়ণের প্রকৃতি তাঁহার ভ্রাতার চরিত্র হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকারের ছিল। জয়নারায়ণ রায় গুণাকর

ভারতচন্দ্রের শিষ্য,—তাঁহারি অনুকরণে জয়নারায়ণের চণ্ডীকাব্য বিরচিত হইয়াছে। লালা রামগতি যখন যোগানুশীলনে নিরত—জয়নারায়ণ তখন সেই গৃহের প্রান্তে বসিয়াই আদিরসের তীব্র মদিরা পানে মত্ত। জয়নারায়ণ চণ্ডীকাব্যের প্রথম ভাগে ভারতচন্দ্রের স্থায় শিব-বিবাহাদির ব্যাপার সন্নিবেশিত করিয়াছেন। মহাদেবের যোগভঙ্গ করিতে ঋতুরাজ সদলবলে আগমন করিয়াছেন, হরিত শোভাসম্পদশালিনী কুসুমমাল্যধারিনী ধরিত্রী দেবী নবীন সৌন্দর্য্যে সুসজ্জিতা হইয়াছেন, কামদেব তাহার সেনাপতি। কবির বর্ণনা এখানে কিরূপ সুন্দর হইয়াছে পাঠকগণ দেখুন! কবি বলিতেছেন—

কবি জয়নারায়ণ।

মহেশে করিতে জয় ঋতুপতি সাজিল।
দামামা ভ্রমর রব সদলে বাজিল॥
নব কিশলয়েতে পতাকা দশ দিশেতে।
উড়িল কোকিল সেনা সব চারি পাশেতে॥
ত্রিগুণ পবন হয় যোগগতি বেগেতে।
ফুলধনু পিঠে, ফুল শর কর পরেতে॥
ভ্রমাইয়া ভাঙ্গে আড় হেরি আঁখি কোণেতে।
কুমুদ কবচ হাতে কিরীট সাজে শিরেতে॥
বাম-বাহু রতি গলে, রতি বাহু গলেতে।
ভুবনমোহন করু হর মনমোহিতে॥
বায়ুবেগে উত্তরে সকলে হিমগিরিতে।
আগমন মদন সকল ঋতু সহিতে॥
কুসুম প্রকাশ গিরিবন উপবনেতে।
নানা ফুল ফুটিল ছুটিল রব পিকেতে॥

ছুটিল মানিনী মান, লাগিল ধ্বনি কাণেতে।
মৃত তরু জীবিত নবীন ফুল পাতেতে॥
থর থর কেতকী কাঁপিছে মৃদু বাতেতে।
অকালে অশোক ফুটে শেফালিকা দিনেতে॥
ললিত মালতী ফুটে যূথিকার ডালেতে।
বকুল কদম্ব নাগকেশরের পরেতে॥
মধুকর রব তুলি ডাকে মন মদেতে।
কুহরিছে কোকিলসমূহ পাঁচ স্বরেতে॥
বনলতা মাধবীর নতশির ভূমেতে।
পলাশ টগর বেল নত ফুল ভরেতে॥

এইরূপ ললিত পদাবলীতে গ্রন্থের কলেবর পূর্ণ। জয়নারায়ণের রতিবিলাপ অত্যন্ত মনোহর, আমরা উহা উদ্ধৃত করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না; যথা—

অন্য নায়িকার ঘরে, নিশীথে বঞ্চিয়া তোরে
মোর কাছে এসেছিলা তুমি।
খণ্ডিতা অধীরা হৈয়া, মন রাগ না সহিয়া
মন্দ কাজ করেছিনু আমি॥
রঞ্জনের মালা নিয়া, দু'হাতে বন্ধন দিয়া
কর্ণ-উৎপল তারি দিলে।
সে অভিমান মনে, করিয়া আমার সনে
রসরঙ্গ সকলি ত্যজিলে॥
আর দুঃখ মনে জলে, একদিন নৃত্যকালে,
পদের নূপুর খসে ছিল।
ত্বরা তুমি দিতে পার, বিলম্ব হইল তার
দিতে দিতে তালভঙ্গ হৈল॥

তাতে আমি মান করি, নৃত্য গীত পরিহরি
বসিয়া রহিনু মৌনী হয়ে।
যত সাধ কৈলা তুমি, পুন না নাচিনু আমি
তাতে রৈলে বিরস শুইয়ে॥ ইত্যাদি।

জয়নারায়ণ চণ্ডীকাব্য মধ্যে মাধব ও সুলোচনার উপাখ্যান সন্নিবিষ্ট করিয়া গ্রন্থভাগ অতীব সুন্দর করিয়াছেন। এই উপাখ্যান আদিরস-খচিত হইলেও একেবারে শ্লীলতা বিরুদ্ধ নহে, নিম্নোক্ত পংক্তিগুলি কবিত্ব সৌরভে সুরভিত, কবি লিখিয়াছেন—

"শরীর থাকিলে দেখা সখার অবশ্য।
কমল ভ্রমরে দেখ তাহার রহস্য॥
শিশিরে কমল মজি থাকে সুলক্ষণা।
বর্ষাকালে পাই হয় জীবনে বাসনা॥
দিনে দিনে লতা করি ভেদিয়া উঠিয়া।
হইয়া কলিকা, সখা সহায়ে ফুটিয়া॥
প্রফুল্ল হইয়া প্রেমে মনের উল্লাস।
মিলে আসি পূর্ব্ব ভৃঙ্গ, মনে বহু আশ॥
পুন পদ্মিনীর মধু মধুকর পিয়ে।
অবশ্য যে দেখা হয় যদি দুই জিয়ে॥

চণ্ডীকাব্য ব্যতীত জয়নারায়ণ ও তাঁহার ভ্রাতষ্পুত্রী আনন্দময়ী গুপ্তা 'হরিলীলা' নামক একখানা গ্রন্থ প্রণয়ণ করিয়াছিলেন। হরিলীলা ১৭৭২খ্রীঃ অব্দে রচিত হয়। ইহা সত্যনারায়ণের ব্রতকথা হইলেও কবি জয়নারায়ণও তদীয় বিদুষী ভ্রাতষ্পুত্রীর কবিত্ব প্রভাবে ক্ষুদ্রত্বের সীমা লঙ্ঘন করিয়া একখানা সুমধুর বৃহৎকাব্যে পরিণত হইয়াছে। আমরা পূর্ব্বে জয়নারায়ণের কবিত্ব দেখাইবার জন্য 'চণ্ডীকাব্য' হইতে বহু অংশ উদ্ধৃত করিয়াছি, এক্ষণে তাঁহার লেখার সহিত তদীয় ভ্রাতষ্পুত্রীর

রচনার পার্থক্য দেখাইবার জন্যও কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম। জয়নারায়ণের রচনা সহজ ও সরল, আর আনন্দময়ীর ভাষা সংস্কৃতবহুল ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ।

আচল ধরিয়া টানিছে নাগর,
টানিয়া ছাড়ায় সুন্দরী।
মানভঙ্গ করি সম্মুখে আনিল
নাগর যতন করি ॥
সোণার নাগর, নাগরী ছন্দ
হেরিয়া করিল রঙ্গ।
স্বত্ব ত্যাগেতে, করিলা দান
আপনার বর অঙ্গ ॥
কাণে মুখ রাখি, কহিছে নাগর,
হৈল নাকি মানভঙ্গ !"

চন্দ্রভাণ প্রবাসে যাইতেছেন, পতিগতপ্রাণা সুনেত্রা সেই পথের পানে চাহিয়া আছেন, কি সুন্দর স্বাভাবিক রচনা, কবি বলিতেছেন,—

"উষাকালে যাত্রা করি যায় চন্দ্রভাণ।
সজলনয়নে ধনী পাছেতে পয়ান ॥
যতদূর চলে আঁখি চাহে দাঁড়াইয়া।
সুধাকর যায় ইন্দীবর তাড়াইয়া ॥
নিশি ভরি কুমুদিনী কৌতুকে আছিল।
রবি অবলোকনে মুখ মলিন হইল ॥"

বিক্রমপুরস্থ কাঁচাদিয়া গ্রামে শিবচন্দ্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এখন কাঁচাদিয়া গ্রাম পদ্মার বিশাল সলিল-গর্ভে চিরনিহিত। এককালে কাঁচাদিয়া গ্রাম বিক্রমপুরের মধ্যে বিশেষ খ্যাতিপন্ন ছিল, সে সময়ে ঐ গ্রামে বহু সম্রান্ত ভদ্রসন্তান বাস করিতেন। শিবচন্দ্রের

পিতা গঙ্গাপ্রসাদ সেন গ্রামের মধ্যে একজন খ্যাতিমান লোক ছিলেন। ইঁহার তিন পুত্র শিবচন্দ্র, শম্ভুচন্দ্র ও কৃষ্ণচন্দ্র প্রত্যেকেই জনসমাজে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। শিবচন্দ্র কবিত্বে, শম্ভুচন্দ্র শিল্প-নৈপুণ্যে তৎকালে বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিলেন। কনিষ্ঠ কৃষ্ণচন্দ্র অগ্রজদ্বয়ের স্থায় জনগৌরবে খ্যাত না হইলেও কৃতিত্বে নিতান্ত ন্যূন ছিলেন না। শিবচন্দ্র স্বরচিত "সারদা-মঙ্গল" গ্রন্থে যে আত্ম-পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, আমরা এখানে তাহা উদ্ধৃত করিলাম।

শিবচন্দ্র সেন।

বৈদ্যকুলে জন্ম হিঙ্গুসেনের সন্ততি।
সেনহাটি গ্রামে পূর্ব্বপুরুষ বসতি॥
রামচন্দ্র নাম গুণধাম প্রতিষ্ঠিত।
যশে কুলে কীর্ত্তিতে বিখ্যাত বিরাজিত॥
রত্নেশ্বর গুণধর তাহার তনয়।
রতন স্বরূপ কুলে হইল উদয়॥
তাঁহার তনয় হৈল ভুবন বিখ্যাত।
রাম নারায়ণ সেন ঠাকুর আখ্যাত॥
সেন ঠাকুরের পুত্র তুলনা অতুল।
রাম গোপাল নাম উভয় শুদ্ধকুল॥
গঙ্গাদেবী দত্ত পুত্র এহেন পবিত্র।
শ্রীগঙ্গাপ্রসাদ সেন নাম সুপবিত্র॥
বিক্রমপুরেতে কাঁচাদিয়া গ্রামে ধাম।
ধন্বন্তরি বংশে জন্ম প্রাণনাথ নাম॥
তাঁহার তনয়া মহামায়া নাম তাঁর্।
সালঙ্কারে সুপাত্রে কন্যা কৈল দান॥

গঙ্গার প্রসাদ সেন ঠাকুর কীর্ত্তিমান।
জনমিল তাঁহার এই তিন সন্তান ॥
শিবচন্দ্র শম্ভুচন্দ্র কৃষ্ণচন্দ্র নাম।
সম্প্রতি বসতি স্থান কাঁচাদিয়া গ্রাম ॥

শিবচন্দ্রের পূর্ব্বপুরুষেরা সেনহাটি গ্রামবাসী ছিলেন, পরে বিবাহ-সূত্রে বিক্রমপুরে অবস্থান করেন। শিবচন্দ্রের বংশ লোপ পাইয়াছে; কিন্তু তাঁহার ভ্রাতার বংশধরগণ অদ্যাপিও কামারখাড়া (স্বর্ণগ্রাম) গ্রামে বাস করিতেছেন। ইঁহাদের সকলেই কৃতী। কীর্ত্তিনাশার ভীষণ তরঙ্গ-প্রহারে বহুকীর্ত্তিশালীর কীর্ত্তি অতলজলে চিরকালের জন্য নিমজ্জিত হইয়া গিয়াছে সত্য; কিন্তু কবিগণের অমর কবিতাবলী আজিও লোকের মুখে মুখে জীবিত থাকিয়া উত্তরোত্তর তাঁহাদের গৌরব-গরিমা এবং নশ্বর জগতে স্থায়ী কি, তাহাই জনসাধারণকে প্রচার করিয়া দিতেছে।

শিবচন্দ্রের কবিতাবলী সরল ও মনোরম, শিক্ষিত ও অশিক্ষিত কাহারও বুঝিতে গলদ্‌ঘর্ম্ম হইতে হয় না। শিবচন্দ্র সেন কৃত দুইখানা গ্রন্থ আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি, তন্মধ্যে 'সারদা-মঙ্গল'-রামায়ণ বৃহৎও শ্রেষ্ঠ, ইহা মুদ্রিত হইয়াছিল; কিন্তু সে মুদ্রিত গ্রন্থ পাওয়া দুষ্কর, বহু পরিশ্রমে উহার একখণ্ড সংগ্রহ করিয়াছি। সত্যনারায়ণের পাঁচালী মুদ্রিত ও সাধারণের সহজপ্রাপ্য। বিক্রমপুরের বহু গ্রামে অদ্যাপি উহা পাঠ করিয়াই সত্যনারায়ণের পূজাদি হইয়া থাকে। সারদামঙ্গল গ্রন্থখানিকে রামায়ণের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ বলিলেই সঙ্গত হয়। রামায়ণের বর্ণিত ঘটনাবলী ইহাতে সংক্ষেপে অথচ সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে। প্রাচীন কবিগণের কাব্যনিচয়ের ন্যায় ইহা অশ্লীলতা-দুষ্ট নহে, মহিলাগণ এবং বালকগণও ইহা অনায়াসে পাঠ করিতে পারে। সেকালের রুচির হিসাবে শিবচন্দ্রের কাব্যের এইরূপ নৈতিক শ্রেষ্ঠতা ও একেবারে উপেক্ষণীয় নহে। ভাষা সহজ ও সরল, অথচ ভাব পরিপূর্ণ। আমার

এস্থলে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম। গৌতমী রঘুকুলপতি শ্রীরামচন্দ্রের চরণস্পর্শে মানবতনু লাভ করিয়া স্তব করিতেছেন ;—

"তুমি নারায়ণ, তুমি পঞ্চানন,
তুমি ব্রহ্ম গণপতি ;
তুমি সৃষ্টিকারী, তুমি গিরিধারী,
তুমি গতি হীনের গতি।
তুমি নিরাকার, তুমি বিশ্বকার,
সকল স্বরূপ তুমি।
তুমি গদাধর, তুমি শশধর,
তুমি জল, গিরি ভূমি।"

এরূপ সুন্দর ও সরল ভক্তিপূর্ণ স্তব বাঙ্‌লা ভাষায় অতি অল্পই পাঠ করিয়াছি। মন্থরার চিত্র এ গ্রন্থে অতি স্বাভাবিকরূপে চিত্রিত হইয়াছে। রামচন্দ্রের অভিষেক-সংবাদ শ্রবণে কৈকেয়ী আনন্দিতা ; কিন্তু মন্থরা উহাতে বিরস ও ম্লান, কৈকেয়ী মন্থরার এরূপভাব দর্শনে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোরে কেন হেন দেখিতে পাই ?

আরক্ত বদন নয়ন ঘোর।
কি ব্যাধি জন্মিছে অন্তরে তোর॥"

তখন মন্থরা বলিল—

"রামচন্দ্র রাজা রাজ্যেতে হয়।"

কৈকেয়ীর পবিত্র হৃদয় এ সংবাদে আনন্দোৎফুল্ল হইয়া উঠিল, তিনি মন্থরাকে বলিলেন,

"কি শুনালি কাণে অমৃত বাণী।
রামচন্দ্র রাজা রাজ্যেতে হবে।
নয়ন ভরিয়া হেরিব কবে॥

কি শুনালি কাণে অমৃতময়।
প্রাণ দেই তোরে হেন মনে লয়॥"

এই বলিয়া কৈকেয়ী—

"গলে হার হীরামণি কাঞ্চনে।
দিয়াছিল রাজা অতি যতনে॥
মন্থরার গলে দিয়া সে হার।
আনন্দ হরিষে দিছে জোকার॥"

কিন্তু মন্থরা কি করিল?

"মন্থরা কোপেতে ছিঁড়ি সে হার।
কটু কহে কত মত প্রকার॥
* * * * * *
রামচন্দ্র হবে রাজ্যের পতি।
রাজমাতা হবে কৌশল্যা সতী॥
দশ বান্দীর এক বান্দী হ'য়ে।
খাইবি কি সুন্দর রূপ ধুয়ে॥
রাজা ছিল তোর বাধ্য কেবল।
কাজে কাজে বুঝা গেল সকল॥
তোর পুত্র রাখি দেশ অন্তরে।
কৌশল্যার পুত্রে ভূপতি করে॥"

মন্থরার অনবরত উত্তেজনায় সরলহৃদয়া চঞ্চলা কৈকেয়ীর হৃদয় পরিবর্ত্তিত হইল, তখন তাহার সে রাক্ষসী-মূর্ত্তি কেমন হইল?

"ঘন ঘন ঘন শ্বাস নাসায় সরে।
থরতর জল নয়নে ঝরে॥
থর থর কাঁপিছে ত্রাসে।
ঝর ঝর করি রোদন আসে॥

কট্ কট্ করি দশন কাটে।
ফর্ ফর্ পরাণ ফাটে ॥
টানি টানি টানি ভুষা ফেলায়।
ক্ষণে ক্ষণে একাগ্রে চায় ॥
কান্দি কান্দি কহে শোনলো ধাই।
তুমি বিনা মোর বান্ধব নাই ॥"

সরল ও মধুর ধ্বন্যাত্মক শব্দের ইহা একটী সুন্দর দৃষ্টান্ত। জানকীর রূপ-বর্ণনায় ও কবি কম কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন. নাই, অশ্লীলতা-বর্জ্জিত এইরূপ সুন্দর রূপ-বর্ণনা অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। জানকীর রূপ-বর্ণনায় কবি লিখিতেছেন ;—

* * * * *

"অতসী কুসুম তার জিনিয়া বরণ।
প্রতিবিম্ব দেখা যায় যেমন দর্পণ ॥
কোটি শরদের শশী জিনিয়া বদন।
অঞ্জনের গর্ব্ব ভঙ্গ কুন্তল শোভন ॥
সাবধানে সখীগণ বান্ধিছে সরসে।
মুক্ত হইলে অঙ্গ ঢাকি ধরণী পরশে ॥
তিলফুল জিনি নাসা, সুদীর্ঘ নয়ন।
কামধনু জিনি ভুরু খঞ্জন গঞ্জন ॥
বিম্বফল জিনিয়া সুন্দর ওষ্ঠাধর।
লাবণ্যেতে মনোহর রতির নাগর ॥
অপরূপ রূপবতী ভুবনমোহিনী।
হরির কমলা কিংবা হরের ভবানী ॥

জগতে বিশ্বাসঘাতকতা এবং বন্ধুত্বে অপব্যবহার বড়ই যন্ত্রনাদায়ক হইয়া ওঠে এবং তাহা ভুক্তভোগী মাত্রেই বুঝিতে পারেন যে, কতদূর

অসহ্য হইয়া পড়ে। সুগ্রীবের দুর্ব্যবহারে ব্যথিত হৃদয়ে শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণকে বলিতেছেন :—

দেখ ভাই, সুগ্রীব রাজার ব্যবহার।
চারি মাসে না জিজ্ঞাসা কৈল একবার॥
অন্যায়ে বালিরে মারি তাহার কারণে।
বুঝিলাম সে আমারে ভুলিয়াছে মনে॥

কবির রচনাশক্তি ও কবিত্ব বুঝাইবার নিমিত্ত আর অধিক উদ্ধৃত করা নিষ্প্রয়োজন। এখন কবির পাঁচালী সম্বন্ধে দুই এক কথা বলিব। পাঁচালীখানাও 'সারদামঙ্গলের' ন্যায় মধুর ভাষায় রচিত। এইরূপে গ্রন্থারম্ভ হইয়াছে ;—

একদিন নারায়ণ যুধিষ্ঠির সাথ।
মহারঙ্গে বন্ধু সঙ্গে পুরী হস্তীনাত॥
নানামতে কৌতুকেতে আছে গদাধর।
মনে পৈল কলি রৈল বলির নগর॥
দ্বাপরের অন্তে তার রাজ্য প্রাপ্তি হবে।
ভাবি মনে নারায়ণে কহিছে পাণ্ডবে॥
চল ভূপ অপরূপ শুনিতে সুশ্রাব।
বলি পাশ ইতিহাস ধর্ম্মের প্রস্তাব॥'

কলির আগমনে মানব-চরিত্র পরিবর্ত্তনও সুন্দর দেখান হইয়াছে, যথা ;—

"শিরে নারী করে ধরি জননীর কেশ।
মাতা প্রতি কটূ অতি অশেষ বিশেষ॥
অলা বুড়ি আঁটকুড়ি নাহি তোর যম।
কত আর লব ভার পাপিষ্ঠা অধম॥

পক্ক কেশী শ্বাস কাশি পেঁচক লোচনী।
দন্তহীনা কুরূপিণী পাপিনী তাপিনী ॥
নারী প্রতি ভক্তি অতি মিষ্ট কথা কয়।
সাবধান ওলো প্রাণ ব্যামো পাছে হয় ॥
দীর্ঘকেশ কটিদেশ সিংহের আকার।
পদ্ম আঁখি পদ্মমুখী পদ্মিনী আমার ॥

নারায়ণকে অবজ্ঞা করায় ঘাটে জামাতার সহিত সাধুর নৌকা ডুবিয়া গিয়াছে, এই অসম্ভাবিত বিপদে সাধু-পত্নী বিলাপ করিতেছেন :—

"ওহে প্রভু প্রাণনাথ, বজ্রাঘাত অকস্মাৎ
নিজনারী পরেতে হানিলা।
যাইতে প্রবাস পথে, কত বুঝাইনু তাতে
ঘাটে আসি সব বিস্মরিলা ॥
চিরকাল পরবাস, মনেতে করেছি আশ,
দেখিব বদন-শশধর।
আশানদী হৈল দুর, যৌবনের গর্ব্ব চুর
হেলাতে করিলা প্রাণেশ্বর ॥
নারীর জীবন পতি, পতি রমণীর গতি
নারীর বসন ভূষা পতি ॥

'সারদামঙ্গল' ও সত্যনারায়ণের' পাঁচালী চিরদিন শিবচন্দ্রের বিজয়-বৈজয়ন্তী বঙ্গীয় সাহিত্যাকাশে উড্ডীন রাখিবে।

দ্বিজ রামকৃষ্ণ।

দ্বিজ রামকৃষ্ণ বিক্রমপুরের একজন প্রাচীন কবি, লালা রামগতি ও জয়নারায়ণ সেন প্রভৃতিরও প্রায় এক শতাব্দী পূর্ব্বে তিনি আবির্ভূত হইয়াছিলেন। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য'

নামক পুস্তকের পরিশিষ্টে ইহাঁর লিখিত সত্যনারায়ণের পাঁচালীর যে হস্তলিপির উল্লেখ করিয়াছেন, ঐ হস্তলিপি ১১৪২ সনের, আমরা কিন্তু ইহা অপেক্ষাও প্রায় ৫০ বৎসরের পুরাতন হস্তলিপি দেখিয়াছি। মুলচর গ্রামে সত্যনারায়ণ পূজা উপলক্ষে ইহাঁর পুথি পঠিত হইয়া থাকে, অন্ত কোনও গ্রামে উহা পঠিত হয় কিনা জানি না। উক্ত গ্রামবাসী চক্রবর্ত্তী বংশোদ্ভব ব্রাহ্মণগণ দ্বিজ রামকৃষ্ণকে তাঁহাদের বংশোদ্ভব বলিয়াই বর্ণনা করেন। লেখক পাঁচালী মধ্যে কোনও রূপে নিজের পরিচয় না দেওয়ায় তাঁহার বাড়ী কোন্ গ্রামে ছিল তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন, তবে তিনি যে বিক্রমপুরবাসী ছিলেন একথা নিশ্চিত এবং তাঁহার রচনা দৃষ্টে ও শব্দ প্রয়োগ দ্বারাও তাহাই অনুমিত হয়। রামকৃষ্ণের রচনা বড়ই মনোরম, এখানে কলাবতীর বিবাহ সজ্জার চিত্রটী তুলিয়া দিলাম :—

"কেহ হাতে ঝাড়ী, তুলিয়াছে বারি
আসনে আনিছে কন্যা।
রজকী আসিয়া ক্ষুর হাতে নিয়া
ছোয়াইছে অগ্রে কন্যা॥
পরে যতজন করিছে মার্জ্জন
রূপে আরো রূপ ধরে।
কেশ এলাইয়া পাছে দাঁড়াইয়া
বসাইল আওসারে॥
সখীগণ যত উল্লাসিত সবে
বেশ বানাইতে আইল।
সুরেখা সুমিত্রা ষোড়শী সুনেত্রা
রতি ভগবতী শশী।
বিজয়া বিশাখা পূর্ণচন্দ্র রেখা
সুলোচনা উমা শশী।

সকলে মিলিয়া কেশ আলুইয়া
বান্ধিয়াছে সু-কবরি,
সিন্দুরের বিন্দু, শরতের ইন্দু
কপালে পড়িছে ঝরি।
কজ্জল প্রোজ্জল করিছে উজ্জল
চন্দনে তিলক দিছে।
কি দিব উপমা, মুখের চন্দ্রিমা
নিশানায় ভূমে শোভিছে॥
সব সখি মিলি তুলিল আগুলি
বিচিত্র বসন পরায়।
আভরণ যত স্থানে স্থানে কত
আটিয়া দিয়াছে গায়।
বাহির খণ্ডেতে স্নান করাইতে
আসনে কুমার আনি।
সুবাসিত জলে স্নান করাইলে
নিত্য অনুসারে মানি॥
বিচিত্র বসন পরাইল পুন
চন্দন লেপিছে গায়,
বিচিত্র আসনে, রাখিল তখনে
হরষে মঙ্গল গায়॥"

রচনায় কোনও রূপ মৌলিকত্ব কিংবা বক্তব্য বিষয়ে কোনও রূপ নূতনত্ব নাই বলিয়া আর বেশী উদ্ধৃত করিলাম না। মোটের উপর গ্রন্থখানা পাঠকের ও শ্রোতার মনাকর্ষণ করিয়া থাকে।

এতদ্ব্যতীত ভরাকৈর নিবাসী দ্বিজ রামপ্রসাদ রচিত একখানা সত্যনারায়ণের পাঁচালী দেখিতে পাওয়া যায়, ঐ গ্রন্থকার দ্বিজরাম

কৃষ্ণের সমসাময়িক, বক্তব্য-বিষয় * সেই এক কলাবতীর উপাখ্যান, তাহা ছাড়া রচনার ভিতরে তেমন কোনও বিশেষত্ব দেখিতে পাওয়া যায় না, দুঃখের বিষয় যে বিক্রমপুরের অতি প্রাচীন বাঙলা-সাহিত্য অন্ধকার সমাচ্ছন্ন। এক সত্যনারায়ণের পাঁচালী ও শনির পাঁচালী ব্যতীত তেমন উল্লেখযোগ্য কোনও গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায় না—বোধ হয় আমাদের শৈথিল্যেই এরূপ হইয়াছে,—তাহা ছাড়া আর কি বলিব! এতদ্ব্যতীত পদ্যে মহারাজা রাজবল্লভের জীবন-চরিত-প্রণেতা রাজনগর নিবাসী ৵ গুরুদাস গুপ্ত মহাশয়ের নামও উল্লেখযোগ্য, দুঃখের বিষয় যে এই গ্রন্থখানা এখন দুষ্প্রাপ্য। চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্গত পরৈকোড়া গ্রামনিবাসী উমাচরণ রায় মহাশয় গুরুদাস গুপ্তের পুস্তকের সহায়তায়ই রাজবল্লভের জীবনী রচনা করিয়াছিলেন, তিনি লিখিয়াছেন "বিক্রমপুর রাজনগরনিবাসী মৃত গুরুদাস গুপ্তের বিরচিত পদ্য পুরিত শ্রীমন্মহারাজের জীবন চরিতের অত্যন্ত জীর্ণ শীর্ণ পুরাতন এক গ্রন্থ পাইয়া তাহার বাহুল্যাংশ বর্জ্জন পুরঃসর স্থূলাংশ উদ্ধার পূর্ব্বক যথাসাধ্য যত্ন শ্রম সহকারে এই জীবন চরিত প্রকাশ করিলাম।"

কবি রাজেন্দ্র দাস।

কবিরাজেন্দ্র দাসের পরিচয় প্রথমে আমরা শ্রদ্ধাস্পদ সাহিত্য-সেবক শ্রীযুক্ত রসিক চন্দ্র বসু মহাশয় লিখিত এবং ১৩০৭ সনের (প্রদীপ) পত্রে প্রকাশিত কবি রাজেন্দ্র দাস শীর্ষক প্রবন্ধে পাই। গ্রন্থের ভাষা দৃষ্টে তিনি তাঁহাকে পূর্ব্ববঙ্গবাসী একজন প্রাচীন কবি বলিয়াই ব্যক্ত রহিয়াছেন, আমরা কিন্তু কবির ভাষা দৃষ্টে তাঁহাকে বিক্রমপুরবাসী বলিয়াই গ্রহণ করিলাম। রাজেন্দ্র দাসের মহাভারত শকুন্তলার উপাখ্যান হইতেই প্রকৃত প্রস্তাবে আরম্ভ হইয়াছে। লেখক যে একজন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন, তাহা তাঁহার রচনা দৃষ্টেই বুঝিতে পারা যায়, কারণ কবির আখ্যান মধ্যে

* নব্যনূর ২য় বর্ষ, ৯ম সংখ্যা ১৩১১।

ভট্টিকাব্য ও অভিজ্ঞান শকুন্তল-নাটক হইতে গৃহীত বহু ভাবের বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। রচনা প্রাঞ্জল ও মধুর। আমরা এখানে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম, যথা—

"শীতল পবন বহে, সুগন্ধি বহে বাস
ফল ফুলে বৃক্ষ সব নাহি অবকাশ।
মন্দ মন্দ বায়ুএ বৃক্ষ সব নড়ে।
ভ্রমরের পদ ভরে পুষ্প সব পড়ে।
নব নব শাখা গাছি অতি মনোহর।
থোপা থোপা পুষ্প নড়ে গুঞ্জরে ভ্রমর।
নির্ম্মল বৃক্ষের তলে পুষ্প পড়ি আছে।
লম্ফে লম্ফে বানর বেড়ায় গাছে গাছে।
হেন জল না দেখলাম নাহিক কমল।
হেন পথ না দেখলাম নাহিক ভ্রমর।
হেন ভৃঙ্গ নাহি চেনা ডাকে মত্ত হৈয়া।
কেবা মোহ না যায়রে সে সব দেখিয়া।"

কবি রাজেন্দ্র দাস গ্রন্থারম্ভের পূর্ব্বে একটী অভিনব উপাখ্যানের অবতারণা করিয়াছেন, প্রস্তাবটীতে একটু নূতনত্ব আছে, উহা এইরূপে আরম্ভ হইয়াছে :—

"অর্জ্জুনের পৌত্র রাজা পরীক্ষিত সুত।
জন্মেজয় নামে রাজা অত্যন্ত অদ্ভুত॥
একদিন সভা করি বসিল রাজন॥
দৈব যোগে আসিলেন ব্যাস তপোধন।
করোযোড় করি রাজা করি নিবেদন।

* * * * * *

কুরু পাণ্ডবেরে কেনে না কৈলা নিষেধ ॥
আপনে নিষেধ যদি করিতা সত্বরে।
তবে কেন দুই দলে যুদ্ধ করি মরে ॥
মুনি বলে জন্মেজয় কহি তোমায় ভেদ।
এক খানি কথা তোমাকে করি যে নিষেধ ॥
কালি যে প্রভাতে এথা আসিবে বিমান।
সর্ব্বথায় না রাখিবা আপনার স্থান ॥
তবে যদি রাখ তাহা শুভ করি মনে।
কদাচিত সেই রথে নহিবা আরোহণে ॥
যদি আরোহণ হও ভ্রমণের তরে।
কদাচিত না যাইবা মৃগ অনুসারে ॥
যদি মৃগয়াতে যায় নিজ বুদ্ধি হানে।
তিন দিকে ভ্রমিয়া না যাও দক্ষিণে ॥
যদি বা দক্ষিণে যাও না মানিয়া কথা।
রাজপুরী দেখি তবে না যাইবা তথা ॥
তবে যদি অন্তপুরী যায় কদাচিত।
রাজকন্যা দেখি না চাহিবা তার ভিত ॥
তবে যদি কাম দৃষ্টে ত্যাগিতে না পার।
তবে জানি তারে আনি পাটেশ্বরী কর ॥”

যথা সময়ে রথ আসিল, প্রবৃত্তি-বসে জন্মেজয় ব্যাসদেবের কোন কথাই রক্ষা করিতে না পারিয়া ঐ কন্যাকে রাজপুরে আনয়ন করতঃ পাটেশ্বরী করিলেন। এক দিবস রাজা জন্মেজয় পিতৃশ্রাদ্ধ করিয়া নূতন পাটরাণীর সহিত সিংহাসনে বসিয়া ব্রাহ্মণদিগকে যখন দক্ষিণা দিতেছেন, তখন বিভাণ্ডকসুত ঋষ্যশৃঙ্গ দক্ষিণা গ্রহণের জন্য আগমন করিলেন,

"দুইখানা শৃঙ্গ আছে মুনির কপালে।
তাহা দেখি মহাদেবী হাসে কুতূহলে॥
মহাদেবীর হাস্তে মুনি হাসিলা কটাক্ষে।
অলক্ষিতে জন্মেজয় দেখিলা তাহাকে॥"

জন্মেজয় অব্[illegible]রী ঋষির এইরূপ ব্যবহার দর্শনে কোপান্বিত হইয়া
" " ঝাড়ি লৈয়া হাতে,
মুনি প্রতি ক্ষেপিয়া মারিল নরনাথে।"

ঋষ্যশৃঙ্গও রাজার দুর্ব্যবহারে ক্রোধান্বিত হইয়া অভিশাপ প্রদান করিলেন যে,—তুমি বনমধ্যে প্রাপ্ত বেশ্যাসহ ক্রীড়ামত্ত, অতএব তোমার সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপিয়া পীড়া হউক, প্রাণে মারিলে চন্দ্রবংশ নাশ হয় বলিয়াই তোমাকে 'রোগ্যা' হইয়া থাকিবার শাপ প্রদান করিলাম। জন্মেজয়ের অনুশোচনায় ঋষ্যশৃঙ্গের দয়া হইল, তিনি বলিলেন যে ব্যাসদেবের অনুগ্রহে তোমার শাপ মোচন হইবে। ব্যাসদেবের কৃপায় তদীয় শিষ্য বৈশম্পায়ন প্রমুখাৎ, মহাভারত শ্রবণ করিয়া পরিশেষে তিনি রোগমুক্ত হইলেন। এই উপাখ্যানের পর শকুন্তলার প্রস্তাব হইতেই রাজেন্দ্র দাস মহাভারত আরম্ভ করিয়াছেন। রাজেন্দ্র দাস স্বীয় গ্রন্থমধ্যে সন তারিখ জাতি নিবাস ইত্যাদির কোনও রূপ উল্লেখ না করায়, আমাদের বাধ্য হইয়াই নীরব থাকিতে হইল। শ্রীযুক্ত রসিকচন্দ্র বসু মহাশয় ইহার রচনা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে, "রাজেন্দ্র দাসের রচনা সংক্ষিপ্ত, রসাল, বিবিধ ছন্দোবদ্ধ ও রাগরাগিনীযুক্ত। ইহাতে দীর্ঘচ্ছন্দ, খর্ব্বচ্ছন্দ, পদবন্ধ (পয়ার) প্রভৃতি ছন্দ এবং ভাটিয়ালি, পট্‌মঞ্জরী প্রভৃতি রাগিণী ব্যবহৃত হইয়াছে।"

এতদ্ব্যতীত দ্বিজ কালিদাসের রচিত একখানি সূর্য্যব্রতের পাঁচালি দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার আরম্ভ এইরূপ ;—

বিক্রম রাজ্যেতে বৈসে দ্বিজ একজন।
দুঃখিত করিয়া বিধি করিলা সৃজন॥
তাঁর পত্নী পতিব্রতা রূপে গুণে ধন্যা।
কয় দিন অভ্যন্তরে জন্মে দুই কন্যা॥
কুন্তী সমে জ্যেষ্ঠা কন্যা কনিষ্ঠা পার্ব্বতী।
ত্রিভুবন জিনি কন্যা রূপে গুণে অতি॥

এখানে বিক্রম রাজ্যেতে বিক্রমপুরকে বুঝাইতেছে।

আমরা উপসংহারে একটী নিরক্ষর কবির সঙ্গীত উদ্ধৃত করিলাম। কবিত্ব যে কেবল শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নহে, অশিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যেও যে তাহার বিকাশ, এই সঙ্গীতটীই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। পশ্চিম বঙ্গে যেরূপ মাঠে ঘাটে কৃষাণদের মুখে 'ওরে রামশশী হ'বি বনবাসী' ইতি শীর্ষক একটী গ্রাম্যগীত শুনিতে পাওয়া যায়, তদ্রূপ বিক্রমপুরে, নিম্ন-শ্রেণীর জনসাধারণের মধ্যে, বিশেষতঃ নাবিকদিগের মুখে এই সঙ্গীতটী প্রায়ই শুনিতে পাওয়া যায়।

নিরক্ষর কবির গান।

ও প্রাণ কানাইও, দারুণ বছরের কালে (১)
নারীর পতি বৈদেশ গেলে,
নারীর পরাণ বাইরম বাইরম করে, ওপ্রাণ কানাইও!
তেলের বাটী গামছা হাতে
নাইতে যাই যমুনার ঘাটে,
কলসী ভাসাইয়া নিল সোতে! (২)
(ও প্রাণ কানাইও ইত্যাদি)

---

(১) যৌবন সময়ে। (২) স্রোতে

বন্ধু যদি হাপন অইত (৩)
অই কল্‌সী আইন্যারে দিত
সুধামুখে তুল্যারে দিতাম পান
(ও প্রাণ কানাইও ইত্যাদি)

কি খেনে বাড়াইলাম পাও,
খেয়া ঘাটে নাইরে নাও (৪)
পাট্‌নীরে খাইছে বনের বাঘে!
(ও প্রাণ কানাইও ইত্যাদি)

আমি ত অবলা নারী
তরুতলে বাড়া বান্দী (৫)
দুই তনু ভাসাইয়া পরে ঘাম!
(ও প্রাণ কানাইও ইত্যাদি)

আমার বাড়ীর উপর দিয়া
পড়সী পাড়ায় বইছ যাইয়া
আমারে শুনাইয়া কইছ কথা!

শেষোক্ত পংক্তি কয়টীর সঙ্গে চণ্ডীদাসের মধুর কবিতা

"আমারি বঁধুয়া আন বাড়ী যায়
আমারি অঙ্গিনা দিয়া'র"

সহিত এই নিরক্ষর কবির কবিতার কি সুন্দর সাদৃশ্য রহিয়াছে! আমরাও কবি হৃদয়ের সার্ব্বভৌমিকত্ব দেখাইবার জন্যই এই গীতটী উদ্ধৃত করিলাম। এতদ্ব্যতীত যাত্রাওয়ালা, কবিওয়ালা, ও হোলি গায়কগণের দ্বারা ও বিক্রমপুরের প্রাচীন সাহিত্যের পুষ্টি হইয়াছিল। কবিওয়ালাগণের মধ্যে ভৈরবমজুমদার, রামকানাই ভুঁইমালী, রামরূপ আচার্য্য, চণ্ডী আচার্য্য প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

(৩) হইত। (৪) নৌকা। (৫) খান ভানা।

প্রাচীনের তিমির গর্ভে প্রবেশ করিলে বহু রত্নের সন্ধান পাওয়া যায়। কিন্তু দুঃখের বিষয় সে বিষয়ে আমরা একেবারেই পশ্চাৎপদ। সে কালের গদ্য রচনা কিরূপ ছিল, তাহা সে কালের সাক্ষীর জবানবন্দী হইতেই পাঠকবর্গ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন, এতদ্ব্যতীত গদ্যে রচিত আমরা অপর কোনও পুথি সংগ্রহ করিতে পারি নাই। একালেও যেমন ষোড়শবর্ষীয় বালক হইতে প্রৌঢ় বয়স্ক ব্যক্তিকেও কবিতা লিখিতে যত্নবান্ দেখিতে পাওয়া যায়, সেকালেও তদ্রূপই ছিল। বাঙ্‌লাদেশ কবিতার দেশ, এদেশে গদ্যের নিরস চাষের দিকে সহজে বড় কেহ অগ্রসর হইতে চাহেন না। ইহা, সৌভাগ্য কি দুর্ভাগ্য, তাহার সাক্ষী দেশের ইতিহাস।

দশম অধ্যায়।

বর্ত্তমান সাহিত্য ও সাহিত্যসেবীগণ।

স্বর্গীয় গিরিশচন্দ্র বসু।

বিক্রমপুরের বর্ত্তমান যুগের সাহিত্যালোচনা করিতে হইলে সর্ব্ব প্রথমে মুন্সী কাশীনাথ দাশগুপ্তের ও তৎপরেই স্বর্গীয় গিরিশচন্দ্র বসু মহাশয়ের নাম উল্লেখযোগ্য। শ্রীনগর থানার অন্তর্গত মালখানগর গ্রামে ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দের আশ্বিন মাসে গিরিশবাবুর জন্ম হয়। এই মহাত্মার পিতার নাম ৺ শম্ভুচন্দ্র বসু। মালখানগরের বসুবংশ বিক্রমপুরে বিশেষ সম্মানিত এবং অতি প্রাচীনকাল হইতেই ইঁহারা বিক্রমপুরবাসী। এই বংশের আদি-পুরুষ ৺ দেবীদাস বসু ঢাকা প্রদেশের নাওয়াড়া মহলের কানুনগো ছিলেন এবং তাঁহার কাছারীর জন্য মালখানগর গ্রামে তিনি এক সেঘরা অর্থাৎ তিন কামরাযুক্ত ইষ্টক-গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। সেই সেঘরার মধ্যদ্বারের উপরি ভাগে তিনখানা বাঙ্গালাভাষায় খোদিত ইষ্টক ফলক ছিল, তাহার একখানা বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। অবশিষ্ট দু'খানিতে যাহা লিখিত আছে, আমরা এস্থানে তাহার অবিকল অনু-লিপি প্রদান করিলাম।

গিরিশচন্দ্র বসু।

নং ১

বাদসাহ আওরঙ্গজেব আলমগীর আমলে নওয়ার আমিরুল ওমরা দেওয়ান বাদসাহ হাজিসফি খাঁ শ্রী * * * *

নং ২

শ্রীগোবিন্দচরণ আসেবন্দ শ্রীদেবীদাস বসু কানোনগোই নাওয়াড় এতমাম শ্রীকৃষ্ণাই খাসনবিশ সন ১০৮৭ বাঙ্গলা মাহে চৈত্র।
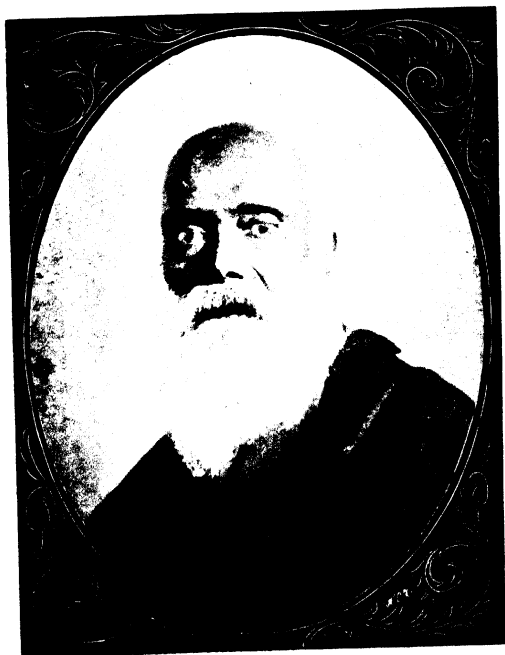
স্বর্গীয় গিরিশ চন্দ্র বসু।

গিরিশ বাবুর মাতুল স্বর্গীয় রায় রামলোচন ঘোষ বাহাদুর প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার ও সুবক্তা ৺ মনোমোহন ঘোষ ও শ্রীযুক্ত লালমোহন ঘোষের পিতা। রামলোচন বাবু বহুকাল পর্য্যন্ত নদীয়ার সদরআলা পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। মাতুল রামলোচনের অন্নেই গিরিশচন্দ্র প্রতিপালিত ও শিক্ষিত হইয়াছিলেন। গিরিশ বাবুর বয়স যখন আট বৎসর, তখন তাঁহার মাতুল রামলোচন বাবু ভাগিনেয়কে ইংরেজী শিক্ষার জন্য হিন্দুস্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দেন। মেধাবী গিরিশচন্দ্র স্বকীয় পরিশ্রম ও অধ্যবসায় বলে যথা সময়ে হিন্দুস্কুল হইতে সিনিয়ার স্কলারসিপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তৎকালীন কলেজের চল্লিশ টাকা বৃত্তি লাভ করেন। কিন্তু দৈবদুর্বিপাকবশতঃ তিনি কেবল এক বৎসর কাল এই বৃত্তিভোগ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন; কারণ এ সময়ে তাঁহার পিতার মৃত্যু হওয়ায় সাংসারিক বিপর্য্যয় হেতু অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাধ্য হইয়া কলেজ পরিত্যাগ করিতে হয়। মহাত্মা ডেভিড হেয়ার সাহেব তাঁহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। একবার গিরিশ বাবুর অত্যন্ত মরণাপন্ন পীড়া হয়, হেয়ার সাহেব সে সময়ে অনবরত ষোল রাত্রি পর্য্যন্ত অনিদ্রায় থাকিয়া বিশেষ স্নেহের সহিত প্রিয়তম ছাত্রের শয্যাপার্শ্বে বসিয়া শুশ্রূষা করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানযুগে গুরু শিষ্যের মধ্যে এতাদৃশ নৈকট্য সম্বন্ধ অতিশয় বিরল।

গিরিশ বাবু ছাত্রজীবনে যেরূপ প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন, ভবিষ্যৎ জীবনেও তাহার কোন ব্যতায় পরিলক্ষিত হয় নাই। ছাত্রাবস্থাতেই ইনি ইংরেজীতে ও বাঙ্গালাতে সুন্দর সুন্দর প্রবন্ধাদি লিখিতেন। সে সময়ে কলিকাতা হেদুয়ার নিকটস্থ সিমলা নিবাসী ৺ কাশীপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়ের সাহায্যে "হিন্দু-ইন্‌টেলিজেন্সার" নামক একখানা ইংরেজী সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। বঙ্গদেশে ইহাই সর্ব্ব প্রথম ইংরেজী সংবাদপত্র এবং ইহাতেই সর্ব্বাগ্রে রাজনৈতিক বিষয়ের আলোচনা হইয়াছিল। প্রথিতযশা স্বর্গীয় হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের "হিন্দুপ্রেট্রিয়ট"

পত্র ইহার কতিপয় বৎসর পরে প্রকাশিত হয়। গিরিশ বাবু মফঃস্বলে থাকিয়া এই পত্রের ও সহকারী সম্পাদকের কার্য্য-নির্ব্বাহ করিতেন। সর্ব্বপ্রথম বঙ্গদেশে ইংরেজী পত্রিকার প্রচারক ও সম্পাদক বলিয়াও ইঁহার নাম বাঙ্গলার ইতিহাসে স্মরণীয় হওয়া উচিত।

তৎকালে ইংরেজীভাষায় প্রবন্ধাদি রচনা করিয়া ইনি যেমন সুখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন, বঙ্গভাষায়ও তিনি তদ্রূপ প্রবন্ধাদি রচনা করিয়া প্রতিপত্তি লাভ করিতে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। তখন গুপ্তকবির রাজত্ব, উত্তরকালের প্রসিদ্ধ লেখকগণের নিবন্ধাদির সহিত ইঁহার বহু প্রবন্ধ ও ৺ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সম্পাদিত "প্রভাকর" ও "রসরাজ" পত্রে প্রকাশিত হইত।

সে বিপ্লবের যুগে পাঠাবস্থায়ই খৃষ্টান মিশনরীদিগের সহিত গিরিশ বাবুর ধর্ম্ম সম্বন্ধে মতানৈক্য হয়। তৎকালে পাদ্রী কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল, তিনি হিন্দু-ধর্ম্ম-নিষ্ঠ 'শব্দ কল্পদ্রুম' প্রচারক স্বর্গীয় মহাত্মা রাধাকান্ত দেবকে উদ্দেশ করিয়া একখানা ব্যঙ্গ নাটক প্রণয়ন করেন। গিরিশ বাবু এই নাটকের উত্তর স্বরূপ একখানা সুন্দর পুস্তক রচনা করিয়া কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়কে এবং তদীয় সহোদর খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী বিপ্রদাস বাবুকে উপযুক্ত মুষ্টিযোগের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

এই সময়ে বিখ্যাত মিশনরী ডফ্ সাহেব তৎকালীন বিখ্যাত 'হরকরা' পত্রে এই মর্ম্মে এক পত্র প্রকাশ করেন যে, "তিনি একজন হিন্দু বালককে খ্রীষ্টিয় ধর্ম্মে দীক্ষিত করায় হিন্দুগণ তাঁহাকে মারধর করিতে চাহে। গিরিশ বাবু এই মিথ্যা অভিযোগের বিরুদ্ধে "ম্যাকবাম্বু" নাম সহি করিয়া এক সুদীর্ঘ নিবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

ইনি পাঠ্যাবস্থার পরে গবর্ণমেণ্টের বহু বিভাগে কার্য্য করিয়াছিলেন। যখন দেশব্যাপী নীলের গোলমাল এবং চতুর্দ্দিক বিপর্য্যস্ত,

তখন ইনি কৃষ্ণনগর এলাকার দারোগা ছিলেন। "হিন্দু-পেট্রিয়ট" পত্রে সে সময় "কৃষ্ণনগরের চাষা" স্বাক্ষরিত যে সমুদয় চিঠি পত্রাদি প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা ইঁহারই লিখিত।

১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন নানা কারণে গবর্ণমেণ্টের কার্য্য ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। শেষ বয়সে কিছুকাল মুর্শিদাবাদের নবাবের "প্রাইভেট সেক্রেটারী" ও স্বর্গীয় মহাত্মা কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের ম্যানেজারের কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন।

"নবজীবন" পত্রে ইঁহার লিখিত "সে কালের দারোগার কাহিনী" শীর্ষক প্রবন্ধগুলি মৃত্যুর কিছুকাল পূর্ব্বে পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। গ্রন্থখানি অতিশয় চিত্তাকর্ষক, ইহাতে তৎকালীন সামাজিক রীতি নীতির সহিত চোর ডাকাতের ঘটনাগুলি অতিশয় সরল ও কৌতূহলোদ্দীপক ভাষায় বিবৃত হইয়াছে। মনস্বী শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় এই পুস্তকের ভূমিকা লিখিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত "সিরাজউদ্দৌলা" সম্বন্ধে "জন্মভূমি" মাসিক পত্রে ধারাবাহিক রূপে ইঁহার কয়েকটী অতি সারগর্ভ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ইঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রবধূর চিকিৎসার্থ যখন ঢাকা নগরীতে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন সেখান হইতে "শক্তি" নামক একখানি সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু জন সাধারণের অনুৎসাহে তাহা অঙ্কুরেই বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল। ইনি অতি নিরহঙ্কারী ও অমায়িক স্বভাবাপন্ন কর্ম্মনিষ্ঠ সাধুপুরুষ ছিলেন। বৃদ্ধ বয়সেও ইঁহার অধ্যয়ন-স্পৃহা এত প্রবল ছিল যে, প্রতিদিন অপরাহ্নে ঢাকার 'নর্থব্রুক হলে' গমন করিয়া সংবাদ পত্রাদি ও খ্যাতনামা গ্রন্থকারগণের পুস্তকাদি পাঠ করিতেন। নিজকে প্রকাশ করিতে ইনি বড়ই সঙ্কুচিত হইতেন। স্ত্রী-শিক্ষা প্রচার ও জন সাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তৃতির জন্য ইঁহার খুব উৎসাহ ছিল। এই মহাত্মার চেষ্টায় মালখানগর

গ্রামে উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়, পোষ্টাফিস এবং বালিকা-বিদ্যালয় ইত্যাদি স্থাপিত হইয়াছে। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে ৭৪ বৎসর বয়সে ইনি ঢাকা নগরীতে পরলোক গমন করিয়াছেন। গিরিশ বাবুর ছেলেরা সকলেই কৃতবিদ্য, তাঁহদের স্বর্গীয় পিতৃদেবের ইংরেজী ও বাঙ্গালা সমুদয় রচনা সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করা উচিত। মালখানগরবিদ্যালয়ে ইঁহার তৈল-চিত্র রক্ষিত আছে।

শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ গুপ্ত।

শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ গুপ্ত।

স্বর্গীয় বসু মহাশয়ের পরেই শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ গুপ্তের নাম বিশেষ রূপে উল্লেখ যোগ্য। এই অশীতিপর বৃদ্ধের জ্ঞানগৌরব ও মধুর বাক্যাবলী শ্রবণ করিলে বিস্মিত ও পুলকিত হইতে হয়। প্রাচীন কালের অর্থাৎ শতবর্ষ পুর্ব্বের বিক্রমপুরের সমাজ, শিক্ষা ও সভ্যতা সম্বন্ধে ইহার অভিজ্ঞতা বিশেষ প্রশংসনীয়। ১২৩০ সনের ৯ই বৈশাখ যশোহর জেলার অন্তর্গত ইতিনা গ্রামে গুপ্ত মহাশয় জন্ম গ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম ৺নীলমণি গুপ্ত। শৈশবেই পিতৃ-বিয়োগ হওয়ায় ইনি স্বীয় জননীর সহিত বিক্রমপুরের কাঁচাদিয়া গ্রামে মাতুলালয়ে বাস করিতে থাকেন, এখানে আসিবার অত্যল্প কাল পরেই তাঁহার মাতৃ-বিয়োগ হয়। স্বর্গীয় প্রখ্যাত-নামা গুরুপ্রসাদ সেন ইঁহার মাসতুতো ভাই ছিলেন। গুরুপ্রসাদ বাবুর জননী অতিশয় সদাশয়া এবং সদ্গুণান্বিতা মহিলা ছিলেন। তাঁহার স্নেহাঞ্চলে বর্দ্ধিত হইয়াই ইঁহারা উভয়ে উত্তরকালে যশস্বী হইয়াছেন। গুপ্ত মহাশয়ের মাতুল স্বর্গীয় রাধানাথ সেন মহাশয় ময়মনসিংহে প্রসিদ্ধ উকীল ছিলেন—তাঁহার নিকট থাকিয়াই ইঁহার ইংরেজী ও বাঙ্গালা শিক্ষা দীক্ষা সমাপ্ত হয়। যৌবনের প্রারম্ভে ইনি কিছুদিন ময়মনসিংহ হার্ডিঞ্জ স্কুলে শিক্ষকতা করিয়া-

শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ দত্ত।

ছিলেন, এই সময়ে সুবিখ্যাত ব্যারিষ্টার আনন্দমোহন বসু ইঁহার ছাত্র ছিলেন।

১২৬৪ সালে দ্বারকা বাবুর প্রথম পুস্তক "হেমপ্রভা" তাঁহার ময়মনসিংহ থাকা কালীনই প্রকাশিত হয়। "হেমপ্রভা" প্রকাশিত হইবার অন্যূন দশ বৎসর পূর্ব্বে যদিও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের লিখিত "বেতালপঞ্চবিংশতি" প্রকাশিত হইয়াছিল, তথাপি সমাস-সমন্বিত এবং সংস্কৃত মূলক কঠিন শব্দ সমূহে পূর্ণ "বেতালপঞ্চবিংশতির" সহিত তুলনায় ইহার ভাষা বিশেষ প্রশংসার্হই বলিতে হইবে, কারণ "হেমপ্রভার" ভাষা সহজ ও সরল, আর ইহাও কম উল্লেখ যোগ্য নহে যে "হেমপ্রভা" কোনও পুস্তকের অনুবাদ বা অনুকরণ নহে, ইহা মৌলিক বলিয়াও ইহার বিশেষত্ব উল্লেখ যোগ্য। আমরা এস্থানে ঐ গ্রন্থ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"রমণীয় বসন্ত কালের আগমনে সুগন্ধ গন্ধবহের সুশীতল সঞ্চালনে দশদিক আমোদিত করিয়া ফেলিল; সমুদয় তরু, লতা, কিশলয় মুকুলমুঞ্জরিতে সুশোভিত হইয়া উঠিল, বনপ্রিয়গণ ডালে ডালে বসিয়া কুহু কুহু স্বরে পৃথিবীস্থ তাবল্লোকের মন হরণ করিল।"

হেমপ্রভা, ২৩ পৃষ্ঠা দ্বিতীয় সংস্করণ।

'কাদম্বরী' প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থে যেমন এক মূল গল্পের মধ্যেই শাখা প্রশাখায় আরও বহু গল্পের সংযোজন দেখিতে পাওয়া যায় 'হেমপ্রভাও' তদ্রূপ ভাবে বিরচিত। যখন বঙ্কিমচন্দ্রের অমর লেখনী বঙ্গভাষার পুষ্টি সাধনে ব্রতী হয় নাই, যখন বঙ্গ সাহিত্য-কাননে কলকণ্ঠ বিহঙ্গগণের মধুর সঙ্গীত লহরীতে চারিদিক প্রতিধ্বনিত হয় নাই, তখন সুদূর পূর্ব্ববঙ্গের নিভৃত প্রদেশ হইতে যে সুরতানলয় সংযুক্ত সঙ্গীত ধ্বনি উত্থিত হইয়াছিল তাহা কি বিক্রমপুরবাসির গৌরবের বিষয় নহে? অতি অল্প সময়ের মধ্যেই "হেমপ্রভার" দ্বিতীয়বার মুদ্রাঙ্কন হয়। তৎ-

কালীন বঙ্গভাষানুবাদক সমাজ (Vernacular literature Society) হইতে এই পুস্তক রচনার জন্য গুপ্ত মহাশয় পারিতোষিক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সুবিখ্যাত অধ্যাপক কাউয়েল সাহেব এই সময়ে তাঁহার রচনা পাঠে প্রীত হইয়া যে একখানি প্রশংসা পত্র লিখিয়াছিলেন অদ্যাপিও তাহা গুপ্ত মহাশয়ের নিকট বর্ত্তমান আছে, আমরা বাহুল্য ভয়ে এখানে প্রকাশিত করিলাম না।

"হেমপ্রভা" প্রকাশিত হইবার চারিবৎসর কাল পরে ১২৬৮ সালে ইঁহার "বিক্রমোর্ব্বশী" নামক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়, ইহা কালিদাস প্রণীত "বিক্রমোর্ব্বশী" নামক নাটকের উপাখ্যান ভাগ অবলম্বনে রচিত হইয়াছিল। 'হেমপ্রভার' ন্যায় এই পুস্তকও বঙ্গীয় সাহিত্য সমাজে খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। দ্বারকা বাবু হার্ডিঞ্জ স্কুলের শিক্ষকতার পর কিছুকাল কলিকাতায় বাস করেন; সে সময়ে যোড়াসাঁকো ব্রহ্মমন্দির শিক্ষিত বাঙ্গালীদিগের মিলনের কেন্দ্র স্বরূপ ছিল। গুপ্ত মহাশয়ও এই দলে মিশিতেন। এই মিলনের ফলেই তাঁহার "ত্রিসন্ধ্যা-স্তোত্র" নামক একখানা ঈশ্বর বিষয়ক ক্ষুদ্র কবিতা গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। উহা ১২৭০ সনে প্রথম মুদ্রিত হয়। ইহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে মধুসূদনের অমিত্রাক্ষরে বিরচিত "তিলোত্তমা-সম্ভব" কাব্য বঙ্গ সাহিত্যে এক যুগান্তর উপস্থিত করে। তখন অমিত্রাক্ষর ছন্দ অনুকরণ করা দূরে থাকুক বরং জন সাধারণের নিকট তাহা যথেষ্ট অবজ্ঞাত হইয়াছিল, "ছুছুন্দরীবধকাব্য" নামক শ্লেষোদ্দীপক কবিতাই ইহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। সেই তীব্র সমালোচনার দিনে অমিত্রাক্ষর ছন্দে "ত্রিসন্ধ্যা-স্তোত্র" রচনা করা যেমন একদিকে বিস্ময়কর ব্যাপার, অপর দিকে তদ্রূপ প্রকৃত গুণগ্রাহিতার এবং অতুল প্রতিভার ও পরিচায়ক বটে। মাইকেল এই কবিতা পুস্তকখান পাঠ করিয়া বিশেষ প্রীত হইয়াছিলেন এবং নিজে উপযাচক ভাবে ইঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আনন্দ

প্রকাশ করেন এবং কবিতা রচনায় তাঁহাকে বিশেষভাবে উৎসাহিত করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি গুপ্ত মহাশয়কে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহা দৈব দুর্ব্বিপাক বশতঃ ভস্মীভূত হওয়ায় আমরা এখানে প্রকাশিত করিতে পারিলাম না। পাঠকবর্গের কৌতূহল তৃপ্তির জন্য উক্ত পুস্তকের "সায়ংস্তোত্র" হইতে আমরা এস্থানে কতিপয় পংক্তি উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"সুধাংশুর রশ্মি-জালে, হৃদয়-আকাশ-
শশি! হইয়াছে মরি কিবা সুরঞ্জিত
এবে দিক্‌চয়! আহা! যেই ভাগ্যবান্
হৃদয়-আকাশে দেখে মোহন-মূরতি
তব পরকাশ, ধন্য তাহার জীবন!
কি সুন্দর রূপ তব—অনুপমনীয়,
জুড়ায় তাপিত প্রাণ বারেক দেখিলে।
ওরূপ আকর হ'তে পাইয়াছে প্রভা
প্রভাকর—মনোহর রূপ বনশ্রেণী,
কুসুম, সাগর, গিরি, নদ, মেঘমালা;
মনোহর রূপ পাইয়াছে সুধানিধি।
না জানি তুমি হে নাথ, কতই সুন্দর!
তোমার করুণা, দেব, কহিতে কে পারে?
কে পারে বর্ণিতে তব অনন্ত মহিমা?
দেখিয়া তোমার স্নিগ্ধ-মানস-রঞ্জন-
অনুপম রূপ দশদিকে পরকাশ,
কত যে হইনু সুখী, কি আর বলিব?"

যখন বঙ্গভাষায় আদিরসের কবিতারই ছড়াছড়ি ছিল, সে সময়ে এরূপ সুরুচি সঙ্গত জগদীশ্বরের মহিমা জ্ঞাপক গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়া

ভাষার পুষ্টিসাধনে ও রুচি পরিবর্ত্তনে যে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিল তাহা কে অস্বীকার করিবে ?

এই তিনখানি পুস্তক ব্যতীত দ্বারকাবাবুর আরও কতকগুলি অপ্রকাশিত রচনা আছে, তন্মধ্যে "ষড়ঋতু-স্তোত্র" উল্লেখ যোগ্য। "ষড়ঋতু-স্তোত্রের" মধ্যস্থ "বর্ষা—স্তোত্র" হইতেও এখানে কয়েকটী পংক্তি উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"সাগর উদ্দেশে খরস্রোতবেগে তৃণ
শত শত চলিয়াছে ভাসি সঙ্গমিয়া
একে অন্যে,—পুনঃ ছাড়াছাড়ি; উপদেশ
এই ইথে;—"এসংসারে তব প্রিয়জন
যতরে মানব, ভাই, বন্ধু, দারা, সুত
সম্পর্ক এদের সাথে, অতি অল্পদিন।
নিশ্চয় যাইতে হ'বে ছাড়ি কিছুদিন
পরে; সিন্ধু যথা আমাদের চিরাশ্রয়
তোমাদের চিরাশ্রয় সেই শেষগতি,
এ বাক্যে হে চিরাশ্রয়, কত যে আনন্দ
মনে কি আর বলিব, এমন সৌভাগ্য
হবে মম, পাব প্রভু তোমা হেন ধনে
মিশিব তোমার সঙ্গে ভুলিব আনন্দ!
ইহা হ'তে প্রার্থনীয় কিবা আর আছে ?"

এতদ্ব্যতীত "সোমপ্রকাশ," "প্রভাকর" "পরিদর্শক" ও 'মানঞ্চ' পত্রে তাঁহার বহু রচনা প্রকাশিত হইয়াছিল। গুপ্ত মহাশয় এখন স্থবির প্রায়, কিন্তু এখনও 'সাহিত্যালোচনা করিতে তিনি অত্যন্ত ভালবাসেন। ইঁহার পূর্ব্ববাস গ্রাম কাঁচাদিয়া পদ্মার কুক্ষিগত হওয়ার পর ১২৭৯ সনে আসিয়া কামারখাড়া (স্বর্ণগ্রামে) গ্রামে বাস করিতেছেন।

শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর সি, আই, ই।

রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর সি, আই, ই।

ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগণার অন্তর্গত ভরাকর গ্রামে ১২৫০ সনের শ্রাবণ মাসে রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুরের জন্ম হয়। ইঁহার পিতার নাম ৺শিবনাথ ঘোষ। ইঁহারা উচ্চ বংশীয় কায়স্থ পদ্মনাভের সন্তান বলিয়া সুপরিচিত। রায় বাহাদুরেরা তিন সহোদর ছিলেন। ইনিই সর্ব্বজ্যেষ্ঠ, অল্প বয়সেই অন্য দুই ভাই মৃত্যুমুখে পতিত হন।

শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন ঘোষ।

রায় বাহাদুরদের আদি বাসস্থান যশোহর জেলায় ছিল। ইঁহার বৃদ্ধ পিতামহ ৺রামপ্রসাদঘোষ মহাশয় যশোহর পরিত্যাগ করিয়া বিক্রমপুরান্তর্গত কাঁটালিয়া গ্রামে বাসস্থান মনোনীত করেন, কিন্তু কালক্রমে কাঁটালিয়া গ্রাম পদ্মার কুক্ষিগত হইলে রায় বাহাদুরের পিতামহ ৺প্রাণকৃষ্ণ ঘোষ ভরাকর গ্রামে আবাসমণ্ডপ স্থাপন করেন। ইঁহার পিতামহ ৺প্রাণকৃষ্ণ ঘোষ মহাশয় একজন অতিশয় নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব ছিলেন। রায়বাহাদুর তাঁহার স্বরচিত "ভক্তিরজয়" নামক গ্রন্থ ইঁহারই চরণে উৎসর্গ করিয়াছেন।

কালীপ্রসন্ন বাবুর বয়স এখন ৬৬ বৎসর। এই প্রবীণ বয়সেও তাঁহার অমৃতময়ী লেখনীর বিরাম হয় নাই।

রায় বাহাদুরের পিতা ৺শিবনাথ ঘোষ মহাশয় বরিশালে পুলিশের দারোগা ছিলেন। পারস্য ভাষায় তাঁহার যথেষ্ট দখল ছিল। কালীপ্রসন্ন বাবুর ভরাকরের বাটীতে সেকালের ধরণের একটী মক্তব (অর্থাৎ পারসী, আরবী শিক্ষার চতুষ্পাঠী) এবং ব্যাকরণের টোল ছিল। এই মক্তবে দুইজন মুন্সী (দুই সহোদর) একজনে ছয়মাস অপরজনে ছয়মাস এইরূপ ভাবে পড়াইতেন। রায় বাহাদুরের পিতা নিজব্যয়ে ইহাদিগকে খাইতে দিতেন ও নিজের বাড়ীতে থাকিতে দিতেন।

কালীপ্রসন্ন বাবুর বয়স যখন কেবল তিন বৎসর, তখন তিনি মক্তবে ভর্ত্তি হন। কিন্তু সর্ব্ব প্রথমে তিনি পারসী শিখিতে আরম্ভ করেন নাই।

পঞ্চম বর্ষে পদার্পণ করিলে তাঁহার বিদ্যারম্ভ-সংস্কার হইল। এই অল্প বয়সেই মেধাবী বালক সমগ্র 'শিশুবোধক' ও রামায়ণ মহাভারত কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। বয়ঃবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তিনি মুন্সীদ্বয়ের কাছে ফার্‌সী ও কাশীপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য নামক একজন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের নিকট ব্যাকরণ পড়িতে আরম্ভ করেন। পারসী শিক্ষা তাঁহার বহুদূর অগ্রসর হয় নাই, কারণ ইতিমধ্যে মক্তবের একটী মুন্সীর চরিত্র ঘটিত কোন কলঙ্কের কথা রাষ্ট্র হইয়া পড়ায়, রায় বাহাদুরের পিতা তাহাকে বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দেন, কাজেই মক্তব উঠিয়া যায়।

ইহার পর রায় বাহাদুর পিতা কর্ত্তৃক বরিশালে নীত হ'ন এবং পিতার অনুমতিক্রমে বরিশালের ইংরেজী স্কুলে ভর্ত্তি হইলেন। তখন বরিশালে গবর্ণমেণ্ট স্কুল স্থাপিত হয় নাই। প্রটেষ্টাণ্ট রোমানকাথলিক্ পাদরীদের স্থাপিত দুইটী বেসরকারী স্কুল ছিল। এই প্রসঙ্গে রায় বাহাদুর বলেন যে "পাদরীরাই আমাদের দেশে সর্ব্ব প্রথমে বিদ্যা ও সেই সঙ্গে অবিদ্যা আনিয়াছেন"।

যখন তাঁহার দশ বৎসর বয়স, তখন তিনি বরিশাল পরিত্যাগ করিয়া ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে ভর্ত্তি হন ও চৌদ্দ বৎসর বয়সে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উপস্থিত হন; কিন্তু নানা প্রতিকূল কারণে উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই।

এই পঠদ্দশাতেই ইনি অবসর মত পণ্ডিতের নিকট সংস্কৃত ব্যাকরণ ও কাব্যাদির অনুশীলন করিতেন। কলেজ পরিত্যাগের পর ইনি কেবল মাত্র পনের বৎসর বয়সে জ্ঞানচর্চ্চার নিমিত্ত কলিকাতা আগমন করেন। বর্ত্তমান সময়ের মত তখন ঢাকা হইতে কলিকাতা আগমন সহজ

ছিলনা। তখন এখনকার মত রেল, ষ্টীমার ছিলনা। সুন্দরবন দিয়া বাঘ কুমীরের বিকট গ্রাসে জীবন বিসর্জ্জনের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা বুকে লইয়া কলিকাতায় যাইতে হইত। কিন্তু জ্ঞান-পিপাসু কালীপ্রসন্নের নিকট সমুদয় বাধা বিঘ্ন তুচ্ছ বলিয়া বোধ হইল, তিনি গঙ্গার অনুসরণ-কারী ভগীরথের ন্যায় জ্ঞান-লক্ষ্মীকে নিজ করতলগত করিবার জন্য বীরের মত নিঃসঙ্কোচে কলিকাতায় আসিয়া উপনীত হইলেন। সাধারণ মনুষ্যের সহিত কর্ম্মবীরের এখানেই প্রভেদ।

ইনি ক্রমাগত সাতবৎসর কাল কলিকাতায় অবস্থান করেন। এই সময় তিনি কোনও স্কুলে ভর্ত্তি না হইয়া নিজের পছন্দানুযায়ী জ্ঞানগর্ভ পুস্তকাদি ক্রয় পূর্ব্বক, রোজ প্রায় সতের ঘণ্টা পড়িতেন। এই বিষয়ে স্বর্গীয় সুলেখক শ্রীনিবাস বন্দোপাধ্যায় মহাশয় "প্রদীপে" রায় বাহাদুরের যে জীবন চরিত লিখিয়াছিলেন তাহার একস্থানে লিখিয়াছেন যে *"সাধক ভক্ত যে চোখে আপনার ইষ্টদেবতাকে দেখেন, তিনিও নিজের মনোনীত গ্রন্থখানিকে সেই চোখে দেখিয়া থাকেন। বইখানা ছোট একখানা কাষ্ঠাসনের উপরে রাখিয়া প্রথমে ভক্তিভরে তৎসম্মুখে প্রণাম করেন। পরে তাহা উজ্জ্বল দীপালোক-সাহায্যে এই আসনের উপরেই রাখিয়া পড়িতে আরম্ভ করেন। বইখানা একবার শেষ হইলে, তাহাই উপর্য্যুপরি আরো তিন চারিবার কখন কখন তার চেয়েও বেশী পড়িয়া থাকেন। প্রথমবার বা দ্বিতীয়বার পড়িবার সময়ে পুস্তকের প্রয়োজনীয় বিষয় সম্বলিত প্যারাগ্রাফ বা পংক্তির ধারে অতি সূক্ষ্মাগ্র পেন্সিল দ্বারা চিহ্ন করেন পরে তৃতীয় বা চতুর্থবার অধ্যয়ন করিয়া সেই চিহ্নগুলি অতি যত্নে মুছিয়া ফেলেন। তিনি বলেন "বই কদর্য্য করা আমি ভালবাসি না।"

---

* রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর 'প্রদীপ' দ্বিতীয় ভাগ, অষ্টম সংখ্যা ১৩০৬, শ্রাবণ।

তরুণ বয়সের প্রথম অবস্থায় ইঁহার বাঙ্গালার প্রতি তাদৃশ অনুরাগ ছিল না। কারণ সে সময় তিনি সভা সমিতিতে নিরবচ্ছিন্ন ইংরেজীতেই বক্তৃতা করিতেন। ঐ সময়ে আমেরিকার প্রসিদ্ধ মিশনরী মনস্বী ডল্ সাহেবের সহিত কালীপ্রসন্ন বাবুর বিশেষ পরিচয় ও সৌহার্দ্দ হয়। একদিন ডল্ সাহেব কালীপ্রসন্ন বাবুকে বলিলেন, "ইংরেজীতে তোমার বক্তৃতা শুনিয়া আমি মুগ্ধ হইয়াছি বটে, কিন্তু তবুও উহা তোমাদের পরের ধন; উহার সহিত কোনও দিন তোমাদের প্রাণের সম্পর্ক হইতে পারিবে না। তুমি শক্তিশালী প্রতিভাবান্ ব্যক্তি; তাই বলি, যদি স্বদেশ ও স্বজাতির উন্নতি করিতে চাও, তবে মাতৃভাষার আশ্রয় লও। মাতৃভাষার অনুশীলনভিন্ন পৃথিবীর কোন জাতি মহৎ হইতে পারে না"।*

ডল সাহেবের এই সদুপদেশ মনস্বী কালীপ্রসন্নের হৃদয়ে বিদ্যুতের ন্যায় কার্য্য করিল। ইহার পর হইতেই তিনি অতুল উৎসাহে ও অসাধারণ অধ্যবসায় সহকারে মাতৃভাষার সেবায় প্রবৃত্ত হইলেন। জাতীয়ভাষার উন্নতি ভিন্ন জাতীয় জীবন যে কখনও উন্নত হইতে পারে না, ইহা বুঝিয়াই তিনি বঙ্গভাষার উন্নতি-কল্পে মনোনিবেশ করিলেন এবং অতুল উৎসাহ ও অক্লান্ত পরিশ্রমের সহিত পাণিনি প্রভৃতি ব্যাকরণ ও বহুবিধ সংস্কৃত গ্রন্থ পড়িয়া আয়ত্ত করিয়া লইলেন।

বঙ্গভাষায় রায় বাহাদুরের সর্ব্ব প্রথম গ্রন্থ "নারীজাতি বিষয়ক প্রস্তাব"। তৎকালীন সুপ্রতিষ্ঠিত "হিন্দুপেট্রিয়ট" এই গ্রন্থের সমালোচনায় এরূপ লিখিয়াছিলেন যে "মাইকেলের কবিতার ন্যায় মাধুর্য্যে ও ওজস্বীতায় এই গ্রন্থ গদ্য সাহিত্যে এক যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে। কালীপ্রসন্ন বাবুর দ্বিতীয় গ্রন্থ "পার্কারের জীবনচরিত ও আমেরিকান সভ্যতার ইতিহাস।" ইহা প্রকাশিত হইতে পারে নাই, কারণ এই অমূল্য পুস্তকখানার পাণ্ডুলিপিখানি অপহৃত হইয়াছিল।

* 'জন্মভূমি' ষষ্ঠভাগ আষাঢ় ১৩০৩ ৭ম সংখ্যা।

ইহার অল্প পরে তাঁহার "সঙ্গীতমঞ্জরী" নামক কবিতা-গ্রন্থ ও কৌলীন্য প্রথার দোষ ও দুর্গতি সম্বন্ধে 'সমাজশোধিনী' নামক পুস্তক বাহির হয়। তাঁহার চতুর্থ অনুষ্ঠান 'শুভসাধিনী'। ইহা একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা। প্রত্যেক কাগজখানির মূল্য ছিল এক পয়সা মাত্র। এই ক্ষুদ্র কাগজখানি প্রায় চারি বৎসর জীবিত ছিল।

১২৮১ সনে ইঁহার সম্পাদিত সুপ্রসিদ্ধ মাসিক পত্র 'বান্ধব' প্রকাশিত হয়। 'বান্ধবের' প্রতিপত্তির কথা সর্ব্বজন বিদিত। বঙ্গে যেমন অমর বঙ্কিমের 'বঙ্গদর্শন' একদিন বাঙ্গালীকে জাতীয় ভাষায় নবীন উদ্দীপনায় উদ্দীপিত করিতেছিল, তদ্রূপ কালীপ্রসন্নের 'বান্ধব' ভাষার অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে সকলকে বিমুগ্ধ করিয়াছিল।

এই 'বান্ধব' হইতেই তাঁহার 'প্রভাত-চিন্তা', 'নিভৃত চিন্তা' ও 'ভ্রান্তি-বিনোদ' গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। অতঃপর তাঁহার 'প্রমোদলহরী' 'ভক্তির জয়' 'নিশীথ চিন্তা' প্রভৃতি অমূল্য গ্রন্থসমূহ প্রকাশিত হইয়া বঙ্গভাষার গলে অতুল্য মণিখচিত হার পরাইয়া দেয়। 'কোমল-কবিতা', 'আদর্শলিপি', 'বর্ণপাঠ' প্রভৃতি কয়েকখানা স্কুলপাঠ্য পুস্তকও তিনি প্রণয়ন করিয়াছেন।

"বান্ধব" প্রকাশিত হইবার অব্যবহিত পরে তিনি ঢাকা ভাওয়ালের স্বর্গীয় রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণের পিতা স্বর্গীয় কালীনারায়ণ রায় কর্ত্তৃক জয়দেবপুরের মন্ত্রিত্বের পদে নিযুক্ত হন।

আজ কয়েক বৎসর হইল 'বান্ধব' নবপর্য্যায়ে প্রকাশিত হইয়াছিল এবং তাহাতে ইঁহার লিখিত 'কিশোর গৌরাঙ্গ', 'ছায়াদর্শন', 'মা না মহাশক্তি', 'জানকীর অগ্নি পরীক্ষা' 'স্বামী না ত কি?' ইত্যাদি অনেক জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল; কিন্তু হায়! ইহা পুনরায় দেখিতে দেখিতে কালের অতলতলে ডুবিয়া গিয়াছে।

রায়বাহাদুর দেখিতে স্থূলকায় ও উজ্জ্বল বিস্ফারিত নেত্র। ইনি সদালাপী, মিষ্টভাষী। এই বয়সেও ইঁহার স্মরণশক্তি অসাধারণ; কোন্

পুস্তকের মধ্যে কোন্ বিষয় আছে,সেই বই কোন্ আলমারীর কোন্ থাকে আছে, এ সব তিনি অতি সহজে তাঁহার অজ্ঞ ভৃত্যকেও বলিয়া দেন।

বর্ত্তমান সময়ে তিনি প্রধানতঃ দর্শন, নীতি ও ধর্ম্ম-বিষয়ক গ্রন্থই পড়িয়া থাকেন। ইঁহার পুস্তকালয়ে ইংরেজী, বাঙ্গালা, সংস্কৃত প্রভৃতি বহুসংখ্যক বহি আছে।

ইংরেজীতে যেমন ইনি সুবক্তা ছিলেন, বাঙ্গালাতেও তদ্রূপ অনেকগুলি সুন্দর সুন্দর বক্তৃতা দিয়াছেন। যিনি ইঁহার উদ্দীপনাপূর্ণ জ্বালাময়ী বক্তৃতা শুনিয়াছেন, তিনিই বিমুগ্ধ হইয়াছেন। কথিত আছে, একবার ৺রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুর ঢাকা অবস্থান কালে রায়-বাহাদুরের বক্তৃতা শ্রবণে এতদূর প্রীতিলাভ করিয়াছিলেন যে, তৎক্ষণাৎ সভাস্থলেই উপযাচক হইয়া তাঁহার সহিত আলাপ করিয়াছিলেন। রায়-বাহাদুর যে কেবল বিক্রমপুর ও পূর্ব্ববঙ্গের গৌরব তাহা নহে, সাহিত্য-রথী বঙ্কিমচন্দ্রের পরে তিনিই একমাত্র বঙ্গীয় সাহিত্যের নেতা—একথা বলিলে একবিন্দুও অতিশয়োক্তি করা হয় না। জগদীশ্বরের অনুকম্পায় ইনি আরও কিছুকাল জীবিত থাকিয়া মাতৃভাষার ও মাতৃভূমির নাম উজ্জ্বল করুন, ইহাই আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা।

সমাজ সংস্কারক স্বর্গীয় রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়।

সমাজ-সংস্কারক

রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়।

স্বর্গীয় রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় মহাশয় বিক্রমপুরে সাহিত্যসেবী বলিয়া যত না বিখ্যাত, সমাজ-সংস্কারকরূপে তিনি তাহাপেক্ষা অনেক বেশী বিখ্যাত। এই মহাত্মার মহজ্জীবনী পর্য্যালোচনা করিলে পুলকিত হইতে হয়। কৌলিন্য প্রধান বঙ্গদেশে, কুলীনসন্তান রাসবিহারীর এই কুপ্রথার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়া কেবল সৎসাহসের পরিচয় নহে, মহত্ত্বেরও বটে। কৌলীন্যপ্রথার কুৎসিত আচরণ এখন আর নূতন করিয়া কাহাকেও বুঝাইবার আবশ্যক নাই। যে জঘন্য বর্ব্বর-প্রথায় রাশি রাশি কুলীনকন্যা আজীবন অবিবাহিতা থাকিয়া 'যমবরণ' নামে অভিহিতা হইত, যে বীভৎস পাশবিক অনুষ্ঠানে চল্লিশ পঞ্চাশজন রমণী একটী বাস্তুভিটা পরিশূন্য অশীতিপর বৃদ্ধের গলদেশে বরমাল্য অর্পণ করিতে বাধ্য হইত, যে অত্যাচারে কুসুম-কোমলা সুকুমারী বালিকা অকালে শুকাইয়া যাইত এবং যে কৌলিন্য-রক্ষার জন্য পিতামহীকল্পা স্খলিতদশনা বর্ষীয়সী রমণী তদীয় দৌহিত্রপ্রতিম বালকের সহিত পরিণীতা হইত, যে অত্যাচার দর্শনে অমর কবি হেমচন্দ্রের লেখনী হইতে গৈরিক নিঃস্রাবের ন্যায় উন্মত্ত আবেগে অগ্নিমুখী বাণী নির্গত হইয়াছিল, সে অত্যাচারের কথা অধিক আর কি লিখিব? হে পাঠক! এখনো কি তাহা তোমার কাণে বাজে না? অই শোন, এখনও সে ভীম ভৈরব রব নীরব হয় নাই, এখনও শুনিতেছি, কবি গাহিতেছেন,—

"আরে কুলাঙ্গার হিন্দু দুরাচার—
এই কি তোদের দয়া, সদাচার?
হয়ে আর্য্যবংশ অবনীর সার
রমণী বধিছ পিশাচ হয়ে।

* * * *

দেখরে নিষ্ঠুর হাতে লয়ে মালা
কুলীন সধবা অনূঢ়া অবলা
আছে পথ চেয়ে পতির উদ্দেশে,
অসংখ্য রমণী পাগলিনী বেশে—
কেহবা করিছে বরমাল্যদান
মুমূর্ষুর গলে হয়ে হয়ে ম্রিয়মাণ
নয়নে মুছিয়া গলিত বারি।”

যে দীন কুলীন ব্রাহ্মণসন্তান সমাজের এই জঘন্য প্রথা দূর করিবার জন্য নিজ স্বার্থ ও মর্য্যাদা তুচ্ছজ্ঞান করিতেও পরাঙ্মুখ হন নাই,—যিনি জন-সাধারণ কর্ত্তৃক পাগল নামে অভিহিত হইয়াও নিজ কর্ত্তব্য পথ হইতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হন নাই, তাঁহাকে দেবতা বলিব না মানুষ বলিব? আজ যদি রাসবিহারী পাশ্চাত্য কোন দেশে জন্মগ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার নাম ইতিহাসে, স্বর্ণ-অক্ষরে গ্রথিত থাকিত, বর্ষে বর্ষে তাঁহার স্মৃতিসভা বসিত, দুর্ভাগ্য বঙ্গদেশে রাসবিহারী জন্মিয়াছিলেন, তাই তিনি জীবনে একদিনের জন্যও বিশেষ সম্মান ও শ্রদ্ধা পান নাই; কিন্তু এমন একদিন আসিবে, হয়ত আমরা দেখিতে পাইব না, যখন রাসবিহারীর নাম গ্রহণ করিয়া সকলে ধন্য হইবে, জগদীশ্বর করুন সে শুভদিন যেন শীঘ্রই বঙ্গদেশে আবির্ভূত হয়।

রাসবিহারী বাঙ্গালা ১২৩২ সনের ১৩ই মাঘ বুধবার বিক্রমপুরের অন্তর্গত তারপাসা গ্রামে ফুলীয়ার মুখুটি সু-প্রসিদ্ধ বিষ্ণুঠাকুরের বংশে জন্মগ্রহণ করেন।

পশ্চিমবঙ্গের বেলঘড়িয়া গ্রামে রাসবিহারীর পৈত্রিক বাসস্থান ছিল। তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তীগণ তারপাশা গ্রামে বিবাহ করেন এবং সেই সূত্রে মাতার মাতামহ কর্ত্তৃক স্থাপিত হইয়া তারপাশা তাঁহারও

আবাসস্থল হয়। অতি শৈশবেই ইনি পিতৃহীন হন। তখন ইঁহার শিক্ষার ভার পিতৃব্য তারকচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের উপর অর্পিত হয়। বাল্যকালে কোনও বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতে না পারায় বাঙ্গালা-শিক্ষাও তাঁহার অদৃষ্টে ভালরূপ ঘটিয়া উঠে নাই। পিতৃব্য মহাশয় স্বকীয় দরিদ্রতা নিবারণের কোনও সহজ উপায় দেখিতে না পাইয়া অর্থের বিনিময়ে তাঁহার আটটী বিবাহ দেন। তিনি তাঁহার 'আত্মজীবন-চরিতে' লিখিয়াছেন, "আমি বাল্যকাল হইতেই বহু বিবাহের বিদ্বেষী ছিলাম, সুতরাং সম্বন্ধ লইয়া ঘটক আসিলেই নানাস্থানে পলাইয়া থাকিতাম। বহুবিবাহে সম্মতি থাকিলে বোধ হয় আমাকে শতাধিক রমণীর পাণি-গ্রহণ করিতে হইত।" ইহার পরে গুণধর পিতৃব্য মহাশয় ভ্রাতষ্পুত্রের বিবাহে অনভিমত দেখিয়া, প্রায় তিনশত টাকার ঋণভার দিয়া ইঁহাকে পৃথক করিয়া দেন। ঋণ-পরিশোধের জন্য এবং পরিবার প্রতিপালনের নিমিত্ত বাধ্য হইয়াও ইঁহাকে আরও ছয়টী রমণীর পাণিগ্রহণ করিতে হয়। ইহাতে অর্থাভাব কিয়ৎপরিমাণে দূর হইলে, চাকরি পাইবার অভিপ্রায়ে নিজের চেষ্টায় সাধারণরূপে বাঙ্গালা লেখাপড়া শিক্ষা করিলেন। কিয়ৎকাল পরে ময়মনসিংহের কোনও জমিদারের কৃপায় পরগণে হোসেনসাহীর এক তহশীলদারী কার্য্যগ্রহণ করিয়া অতিকষ্টে পরিবার প্রতিপালন করেন।

বাল্যকাল হইতেই রাসবিহারীর বঙ্গভাষায় কবিতা ও সঙ্গীত ইত্যাদি রচনা করিবার অভ্যাস ছিল। তিনি প্রথমতঃ "রমণীরমণ" নামক একখানা পদ্যগ্রন্থ রচনা করেন, তাহা বিক্রমপুর কালীপাড়ার প্রসিদ্ধ জমিদার বাবু শ্যামাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় চৌধুরী মহাশয়ের সাহায্যে ও যত্নে মুদ্রিত এবং প্রকাশিত হয়। ইহা ব্যতীত 'বিদ্যাবিধি' ও 'শৈশবজ্ঞান-চন্দ্রিকা' নামক আরও দুইখানি কবিতা-পুস্তক প্রণয়ন করেন, তাহা বহুদিন পর্য্যন্ত বিদ্যালয়ের পাঠ্যরূপে নির্দ্ধারিত ছিল। তৎপর স্বর্গীয়

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের "সীতার বনবাস" জনসমাজে প্রচারিত হইলে, উহার সারাংশ গ্রহণ করিয়া পদ্যে ইনি "সীতার বনবাস" রচনা ও প্রকাশ করেন, রাসবিহারীর এই রচনা অতিশয় স্বাভাবিক ও শ্রুতিমধুর ভাবপূর্ণ ছিল।

এই সময়ে সমাজের নানাবিধ দুরবস্থা দর্শনে, তাঁহার হৃদয় ব্যথিত হয় এবং ১২৭৫ সনের বৈশাখ মাসে "বল্লালসংশোধিনী" নামে কৌলীন্য-সংস্কার সম্বন্ধীয় একখানা ক্ষুদ্র পুস্তক মুদ্রিত করেন। এই সংস্কার ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করায়, তাঁহাকে বাধ্য হইয়াই তহশীলদারীর কর্ম্মটী পরিত্যাগ করিতে হইল। এ পুস্তক রেজেষ্টরী করিবার নিমিত্ত যখন ইনি সব-রেজেষ্টরী আফিসে গমন করেন, তখন পুস্তকের মর্ম্ম অবগত হইয়া বহুলোকেই তাঁহাকে ক্ষিপ্ত বলিয়া মনে করিয়াছিল, কারণ সকলেই জানিত যে, তিনি একজন উচ্চ শ্রেণীর কুলীন ব্রাহ্মণ এবং বহুবিবাহ তাঁহার নিজের ব্যবসায়।

ইহার পরে ইনি বিক্রমপুরের প্রধান প্রধান শ্রোত্রিয় এবং বংশজ সমাজে উপস্থিত হইয়া উক্ত পুস্তক বিতরণ ও মৌখিক বক্তৃতা করিতে আরম্ভ করিলেন। চতুর্দ্দিকে এইরূপ জনরব প্রচারিত হইল যে, তাঁহার জ্ঞাতী এবং বিপক্ষেরা সুযোগ পাইলে তাঁহাকে হত্যা করিতেও কুণ্ঠিত হইবে না। প্রথম প্রথম অনেকে এই মহাত্মাকে ম্লেচ্ছ বলিয়া অভিহিত করিতেও দ্বিধা বোধ করিতেন না; কিন্তু পরিশেষে ইঁহার সাত্বিক আচারব্যবহার দর্শন করিয়া ও ইঁহার মহদুদ্দেশ্য স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিয়া সকলেই অন্তরে অন্তরে ইঁহার অমানুষিক তেজ ও দৃঢ়তা দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন। একদিকে অটল অচলের ন্যায় সমাজ মস্তক উত্তোলন করিয়া দণ্ডায়মান, অপর দিকে ক্ষুদ্র দরিদ্র রাসবিহারী তদীয় 'বল্লাল সংশোধনী' হস্তে তাহার গায়ে আঘাত দিতেছেন,—সমাজ এই পঙ্গুর গিরিলঙ্ঘন প্রয়াস দেখিয়া কি আশ্চর্য্য হইবে না?

যাঁহারা এক সময়ে রাসবিহারীকে দেবতার ন্যায় জ্ঞান করিতেন, তাঁহারাই আবার তাঁহাকে অপমানসূচক বাক্য প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিলেন। রাসবিহারী লোকের নিন্দা গ্লানি কিছুই গ্রাহ্য করিতেন না, সকলকে অতি বিনীত ভাবে বলিতেন, "আপনারা এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানা একবার অনুগ্রহ পূর্ব্বক পড়িয়া দেখুন, তাহার পর আমাকে যাহা ইচ্ছা বলিতে হয় বলুন।" যদি তাঁহাকে কেহ বলিতেন "মহাশয়, আপনি নিজে বহুবিবাহ করিয়া আবার বহুবিবাহের নিন্দা করিতেছেন কেন?" তদুত্তরে রাসবিহারী বলিতেন "ভুক্তভোগী ব্যতীত প্রকৃত মর্ম্ম কে বুঝিতে পারে?"

এই সময়ে ইনি কৌলীন্য-সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে শ্রোত্রিয় ও বংশজ-দিগের কন্যাপণ নিবারণের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হওয়ায়, তদীয় কর্ম্মক্ষেত্র আরও প্রশস্ত হইয়া উঠিল। অতঃপর কন্যাপণ ও বহুবিবাহ-নিবারণ মানসে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া তিনি একখানা প্রতিজ্ঞা পত্র প্রণয়ন করিয়া তাহাতে সমাজের প্রতিপত্তিশালী লোকদের নাম স্বাক্ষর করাইবার জন্য নানাস্থানে বক্তৃতা, ভ্রমণ ও বড় বড় বিবাহ সভায় উক্ত দু'টি বিষয় সম্বন্ধে বহু বাক্‌বিতণ্ডা করিতে থাকেন এবং এসময়ে নানাবিধ বাঙ্গালা সংবাদপত্রে বল্লালী সংশোধন ও কন্যাপণ নিবারণ সম্বন্ধে বিবিধ প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করেন।

রাসবিহারী কৌলীন্য-প্রথার বিরোধী ছিলেন না, তাঁহার ইচ্ছা ছিল না যে, কৌলীন্য-প্রথা একেবারে দেশ হইতে উঠিয়া যায়। তিনি বলিতেন "উচ্চ ও নীচ বংশের উচ্চতা ও নীচতা সকল সময়ে সকল সমাজে চিরদিন আছে ও থাকিবে।"

মেল-পর্য্যায় ভঙ্গ করিয়া বহুবিবাহ লোপ ও কন্যাপণ নিবারণ করাই তাঁহার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। রমণীজাতির ক্লেশ নিবারণে চির-উৎসাহী জগদ্বিখ্যাত স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়, নীলদর্পণের গ্রন্থ-

সাহেব ও কলিকাতাস্থ "ভারতবর্ষীয় সনাতন-ধর্ম্ম রক্ষিণী সভা" তাঁহার মতের পৃষ্ঠপোষক হইলেন এবং 'এডুকেশন গেজেট', 'সোমপ্রকাশ' 'হিন্দুহিতৈষিণী', 'ঢাকাপ্রকাশ' প্রভৃতি সংবাদপত্রের সম্পাদকগণও তাঁহার স্বপক্ষে লেখনীচালনা করিতে লাগিলেন।

কলিকাতার উক্ত সভার এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরামর্শানুসারে গবর্ণমেণ্টের নিকট একটী আবেদন পত্রে পূর্ব্ব ও পশ্চিম বঙ্গের বহু নাম স্বাক্ষর করা হইল; কিন্তু এই সময়ে পাপাত্মা শিয়ার আলী কর্ত্তৃক তদানীন্তন গবর্ণর জেনেরল লর্ড মেয়োর প্রাণ-সংহার হওয়াতে সেই দেশব্যাপী বিষাদ কোলাহলের মধ্যে আর আবেদন পত্র গবর্ণমেণ্ট সমীপে উপস্থিত করা হইল না।

এই সময়ে স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় কৌলীন্য-প্রথার বিরুদ্ধে দুইখানা উৎকৃষ্ট পুস্তক প্রকাশ করিয়া রাসবিহারীর উৎসাহ ও বল বৃদ্ধি করিয়াছিলেন।

১২৮২ সনের ২৪শে অগ্রহায়ণ তারিখে "পর্য্যায়" ভঙ্গ করিয়া ইনি স্বীয় কন্যার বিবাহ দিলেন; কুলীন-সমাজে ইহাই সর্ব্বপ্রথম "বিপর্য্যায় বিবাহ"।

এই সময়ে পূর্ব্ববঙ্গের সাহিত্যরথী শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয়ের পরামর্শে ইনি কৌলীন্য-প্রথার বিরুদ্ধে কয়েকটি সঙ্গীত রচনা করেন। সেই গানগুলি সাহিত্যের সৌন্দর্য্যে বঙ্গভাষায় অমর হইবে আশা করা যায়। রাসবিহারীর সঙ্গীতগুলি তাহাদের অন্তর্নিহিত বিষাক্ত বিদ্রূপ ও মৌলিকতার নিমিত্ত চিরদিন বঙ্গসাহিত্যে অক্ষয় হইয়া থাকিবে। এখনও রৌদ্র-দগ্ধ প্রান্তরে বসিয়া কৃষক ক্ষেত্রে কাজ করিতে করিতে গাহিয়া ওঠে, "বহুদিন পরে এসেছি চিনি না শ্বশুরবাড়ী", নিশীথ রাত্রে নদীবক্ষে ক্ষেপণী ফেলিতে ফেলিতে মাঝি গাহিতে গাহিতে যায়,—

"সুখ ভাল ভাই দেবীবরের ইজারায়।"

এক সময়ে এই সঙ্গীতগুলি হাটে, মাঠে, ঘাটে সর্ব্বত্র গীত হইত, এখনও পূর্ব্ববঙ্গের বহুস্থানে এই গানগুলি মহা উৎসাহের সহিত গীত হইয়া থাকে।

ঢাকার প্রসিদ্ধ পাদ্‌রী মিঃ লঙ্‌সাহেব মহোদয় রাসবিহারীর প্রস্তাব ও মহদুদ্দেশ্য জ্ঞাত হইয়া বিক্রমপুরে উপনীত হন এবং বিক্রমপুরবাসী পণ্ডিতগণকে আহ্বান করিয়া ভাগ্যকুলের কুণ্ড-বাবুদের বাড়ীতে একটী সভা করেন। রাসবিহারী ঐ সভায় কন্যাপণ ও কৌলীন্য-বিষয়ক বক্তৃতা প্রদান করিয়া সাহেবকে ও সভামণ্ডলীকে বিমুগ্ধ করিয়াছিলেন। মিঃ লঙ্ সাহেব পণ্ডিত মহাশয়দিগের মতামত জিজ্ঞাসা করেন, তদুত্তরে তাঁহারা বলেন যে একমাসের মধ্যে ইহার উত্তর দিবেন; কিন্তু পরিশেষে পণ্ডিতেরা আর কোনও উত্তর দেন নাই।

অতঃপর রাসবিহারী বিক্রমপুরের বিভিন্ন গ্রামসমূহ, যশোহর, বাখরগঞ্জ, ফরিদপুর ইত্যাদি নানাস্থানে পরিভ্রমণ করিয়া ঘোরতর আন্দোলন করিতে আরম্ভ করিলেন, কিন্তু তিনি একতা ও অর্থাভাবে কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। তৎপর তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া পুনরায় গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন পত্র প্রেরণ করা কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করিলেন। তদনুযায়ী গবর্ণর জেনারেল মিঃ লর্ড নর্থব্রুক সাহেব বাহাদুর যখন ঢাকানগরীতে শুভ পদার্পণ করেন, তখন কতিপয় গণ্যমান্য লোকের সাহায্যে উক্ত গবর্ণর জেনারেল সাহেবের নিকট নিম্নলিখিত আবেদন পত্র প্রেরণ করেন, ঐ সময়ে বরিশাল জেলা হইতেও আর একখানি দরখাস্ত প্রেরিত হইয়াছিল।

To

His Excellency the Viceroy & Governer General of India.

May it please your Lordship.

We the undersigned subjects of Her gracious Majesty in the District of Dacca & its vicinity beg most respectfully to approach your Lordship with this humble memorial with a sanguine hope that the subject of great interest concerning the present state of Hindu females which your memorialists bring to notice may meet with your excellency's kind consideration.

The most detestable system of Polygamy which obtains among Hindus more especially among the Koolin Brahmoins of Bengal has been the cause of great mischief to the Community and of distress and misery to the poor and helpless females whose condition makes them to the object of your Lordship's pity.

The Koolin Brahmins make marriage as their profession & marry wives for a vain consideration of a trifling money but never take care or interest of their wives.

The present system of Polygamy is not warranted by any authority, nay it is repagnent to the rules of Hindu law, & inconsistent with the details of morality and conscience.

The system does never obtain among any other nations. It has taken its root so deep among Hindus in Bengal, that it has become totally impossible for the community to exert to uproot it, without the interference to put a stop to this system except in case of barren-

ness, unchastity of the wife as permitted by the rules of Hindu law.

And your memorialists as in duty bound shall ever pray.

এই আবেদন পত্রের পাণ্ডুলিপির সহিত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রেরিত এবং তাহাতে বহুসংখ্যক কুলীন, শ্রোত্রিয় বংশজ প্রধান প্রধান বৈদ্য কায়স্থগণের নাম স্বাক্ষর করান হইয়াছিল। ঐ আবেদন পত্রের সহিত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বহুবিবাহ বিষয়ক প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড পুস্তক, ভারতবর্ষীয় সনাতন ধর্ম্মরক্ষিণী সভার কৌলীন্যবিষয়ক বক্তৃতা, ফরিদপুরের কৌলীন্য-সংশোধিনীর পুস্তক প্রভৃতি দেওয়া গিয়াছিল। মহামতি গবর্ণর জেনারাল বাহাদুর ঐ আবেদন পত্রের প্রথমতঃ নিম্নলিখিতরূপ উত্তর দান করিয়াছিলেন।

Sylhet Camp
Dated 10th August.

To
Babu Rash Behari Mukhopadhya
Dacca.

Sir,

By order of the Governer-General your letter of the 3rd instant with the papers annexed here-with has been forwarded to the Secretary of India Government, Home department for proper order.

Yours Obediently
Captain Baring
Private Secretary to the Governer
General.

কিন্তু পরিশেষে হিন্দুর সামাজিক ব্যাপার হইতে দূরে থাকা গবর্ণমেণ্ট নানা কারণে সঙ্গত বিবেচনা করিলেন। তখন আর রাজদ্বারের ভিখারী হওয়া নিষ্ফল বোধে পূর্ব্বের ন্যায় সামাজিকদের দ্বারে দ্বারে বক্তৃতা প্রদান ও গান করিতে আরম্ভ করিলেন।

কিন্তু মেলভঙ্গের প্রস্তাব-মত কাহাকেও কার্য্য করিতে অগ্রগণ্য হইতে না দেখিয়া ১২৮৪ সনে মেলভঙ্গ করিয়া নিজের পুত্র ও কন্যার বিবাহ দিলেন। বঙ্গের কৌলীন্যসংস্কারের ইতিহাসে ইহা একটী স্মরণীয় দিন। এই বিবাহে পূজ্যপাদ বিদ্যাসাগর মহাশয় উপস্থিত থাকিবেন বলিয়াছিলেন; কিন্তু শারীরিক অসুস্থতাবশতঃ উপস্থিত থাকিতে পারেন নাই।

ইহার অল্প পরে ১২ জন নৈকষ্য কুলীনও মেলভঙ্গ করিয়া আপনাপন কন্যার বিবাহ দেন এবং আটজন শ্রোত্রিয় চির-প্রচলিত প্রথানুসারে কুলীনে কন্যা সম্প্রদান না করিয়া, শ্রোত্রীয়েরই সহিত কার্য্য করিলেন।

রাসবিহারীর চেষ্টা একেবারে বৃথা হয় নাই, কারণ বর্ত্তমান সময়ে বহু-বিবাহ ও মেলবন্ধন শিথিল হইয়া আসয়াছে; আর কিছুদিন বাদে তাঁহার চেষ্টা পূর্ণরূপে সফল হইবে,—কিন্তু হায়! রাসবিহারী তাহা দেখিলেন না।

১৩০১ সনের ২৮শে চৈত্র বাহাত্তর বৎসর বয়সে এই মহাপুরুষের মৃত্যু হয়। জীবনের শেষপ্রান্তে উপনীত হইয়া যখন দেখিলেন যে, তাঁহার উৎসাহদাতা পৃষ্ঠপোষকগণ একে একে পশ্চাৎপদ হইতেছেন, তখনও এই কর্ম্মবীর পীড়িত ও জীবনান্ত অবস্থায় বুভুক্ষু আত্মীয়বর্গের অন্নসংস্থান চেষ্টায় তাম্রকূট পাত্রস্থলী ও জীর্ণ যষ্টি করে লইয়া লোকের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেন, তখনো ইনি কুলীন-কন্যাগণের কথা ভুলিয়া যান নাই। তখনো কক্ষতল হইতে একখণ্ড কীটদষ্ট "বল্লাল সংশোধিনী" বাহির করিয়া সমবেত লোকদিগকে পড়িয়া শুনাইতেন এবং

ক্ষুদ্র বক্তৃতা দ্বারা স্বীয় মতের সমর্থন করিতে প্রয়াস পাইতেন ও স্বরচিত দু'একটী হাস্যোদ্দীপক সঙ্গীত ভগ্নকণ্ঠে গান করিয়া 'মধুরেণ সমাপয়েৎ' করিতেন। আমরা এখানে তাঁহার রচিত কয়েকটী সঙ্গীত প্রকাশ করিলাম।

(কেনগো কালি নেংটা ফির-সুর)

(আহা) গেলরে ভারত রসাতলে, কিছু বিচার নাইকো
হিন্দুর দলে।
অনিয়মের বাধ্য হয়ে সকল স্বেচ্ছাচারে চলে,
এ পাপ সমাজের কেউ কর্ত্তা নাইকো সাধ্য কি কে কারে
বলে,
জমীদার ধনীগণ আছে দুষ্ট লোকের করতলে।
দেখ শ্রেষ্ঠ লোকের অন্নকষ্ট মতির হার বানরের
গলে।
বিদ্যাশূন্য ভট্টাচার্য্য কতই কুকাজ তলে তলে।
তখন ধরণী কয় কিরূপে ফাটি গলিত তোমার নয়ন
জলে।

শিশুবরের প্রতি বর্ষীয়সী কন্যার উক্তি।

(কৃষ্ণকান্ত পাঠকের সুর)

আর আমার কাজ কি বিয়ের সাজ পরিয়ে বৃদ্ধকালে।
শিশুবরের পাশে, কোনবা রসে ঘোমটা দিব পাকা চুলে।
গায়ে দিয়ে নামাবলী, গাই শিব-নামাবলী, নিয়েছি মালার থলি
হাতে তুলে।
ভাল ফল্‌লো ফল বল্লালীতে, মিল্‌লো বর এক
কচ্‌মা ছেলে॥

(হায়) লাঠি ভর করিয়ে, এ শিশুবরকে নিয়ে, কেমনে
ঘুরবো আমি কলাতলে।
বলবো বা কি, বল্‌বে বা কি, বল্‌বে বা কি এয়োকুলে ॥
আমার এ অন্তঃকালে, ওর শুভদৃষ্টি হ'লে ছেলেটি ডরবে
এ চাঁদ মুখ দেখিলে।
নিয়ে দুগ্ধের বর, কল্লে ঘর, ডাক্‌বে সে ঠাকুর-মা বলে ॥

বৃদ্ধ বরের প্রতি বালিকাকন্যার উক্তি।

(ঐ সুর)

যাইলো সই অসুরে বরে হেরে ডরে ম'রে।
দিলে কাশটা সে আকাশটা ফাটে কাঁপে লাঠির
বাঁশটা ধ'রে।
দেখি পাটে সে মাথাটা ঠেকে পাটে বসেছে ঠাট করে।
মোটকা সব ঘটকা এসে, শুনালে চোটকা ভাষে,
বুড়োটা ঠোঁট কাঁপায়ে হাস্য করে।
আমি অন্তরেতে ডরিলো তার মন্ত্র কইতে দন্ত নরে।

কুলীনকন্যাগণের বিবাহ-দর্শনার্থিনী প্রতিবেশিনীগণের উক্তি।

(গুরু চিন্তা কর মনরে দিনতো বয়ে যায়—গানের সুর)

আয় লো আমরা কুলীন বাড়ীর বিয়ে সবাই দেখ্‌তে যাই।
তোরা এমন বিয়ে দেখিস্‌ নাই।
শুনেছিস্‌ দানসাগর বিয়ে; ওদের বিয়ের ঘটে তাই।
নৈলে নিদেন পক্ষে বৃষোৎসর্গ, একটী বৎস চা'রটী গাই ॥

দিবে এক বরেই চা'রটি মেয়ে লোকের মুখে শুন্‌তে পাই।
আহা ওদের কেমন কঠিন হিয়া পিতামাতার দয়া নাই॥

রাগিণী বসন্ত—তাল যৎ।

বহুদিন পরে এসেছি চিনি না শ্বশুর বাড়ী।
কোন্ পথে যাইব মাগো বিশ্বনাথ বাড়রীর বাড়ী।
যারা ছিল ছেলে পিলে, তাদের হ'ল ছেলে পিলে,
বিয়ে ক'রে গেলেম ফেলে, বয়ে গেল বছর কুড়ি!
বাড়ী ঘর তার নাহি চিনি, কেবল শ্বশুরের নামটী জানি;
উত্তরেতে বাগান খানি, সুপারি সব সারি সারি॥
দ্বিজ রাসবিহারী বলে, আরত হাসি রাখ্‌তে নারি।
তুমি যারে মা বলিলে সে বটে তোমারি নারি॥
(এই গীতটি কোনও সত্য ঘটনাবলম্বনে লিখিত হইয়াছিল।)

কোনও শতাধিক বিবাহকারী কুলীন রাসবিহারীর আনীত প্রতিজ্ঞা পত্রে নামস্বাক্ষর করার প্রস্তাব কটু ভাষায় প্রত্যাখ্যান করিলে, তিনি তন্মুহূর্ত্তে এই সঙ্গীতটী রচনা করিয়া সকলের নিকট গান করিয়া সেই কুলীনপ্রবরকে অপদস্থ করিয়াছিলেন।

বাউলের সুর—তাল খেম্‌টা।

সুখ ভাল ভাই দেবীবরের ইজারায়।
বল্লালের জমিদারী তহশীলদারী দেয় আমায়॥
(দেখ) চারি কুড়ি ঘর, সতীন প্রজা আছে মোর পরগণায়,
(ভোলা মন মনরে) তাতে মাঠে পথে বাজে লোকে কত বাজে,
জমা করে যায়।

(আবার) মফঃস্বলে কোন আমলা যদি বা মাম্‌লা বাঁধায়,
প্রজার ভাই আসিয়ে, পায় ধরিয়ে,
দিয়ে বারবরদারী নিয়ে যায়॥

রাসবিহারীর জীবিতাবস্থায় তাঁহার সম্বন্ধে নিম্নলিখিত গানটি বিক্রমপুরের কুলীনকন্যারা দ্বিতীয় বিবাহ ইত্যাদি উপলক্ষে গান করিতেন; অদ্যাপি সেই লক্ষ্ণৌ ঠুংরী গান অবলাকণ্ঠে ধ্বনিত হইয়া থাকে।

যদি বেঁচে থাকে মোদের রাসবিহারী,
তবে সুখে রবে কুলীন কুমারী।
বাড়ী-ঘর ত্যাজে, সমাজে সমাজে
একাজে ও কাজে করে দৌড়াদৌড়ি।
উপবাস রয়ে, উপহাস সয়ে,
উপদেশ দিয়ে ফিরে বাড়ী বাড়ী॥

ললিত—আড়া।

কুল-মেয়ে কেন কান্দ গো বিরলে।
কি দোষে হয়েছ দোষী কি চুরি করিলে॥
বল কোন দুরাচারে, তুমি সরলা বালারে;
এ কঠোর কারাগারে; অবিচারে দিলে॥
নেত্রে বহে বারি বিন্দু, মলিন বদন-ইন্দু,
নাই কোন সিন্দূর বিন্দু, সুন্দর কপালে।
কেন যেন কাঙালিনী, থাক দিবসযামিনী;
কেউ তোমার কি নাই দুঃখিনী, এ মহীমণ্ডলে।
দিন কাটাও দাসী ভাবে, ভ্রাতৃবধূ পদ সেবে,

নিশায় কাতর ভেবে ভেবে, কোন্ পাপ ফলে।
অনাথা কুলীনের মেয়ে, কি খেদ তব হৃদয়ে,
দেখ কেন রয়ে রয়ে, সধবা সকলে॥

ঝিঝিট—কাওয়ালী।

বল্লালী তুই যারে বাংলা ছেড়ে।
ডুব্‌লো ভারত কদাচারে, সোণার বাংলা যায়রে ছারে খারে।
ভ্রুণ-হত্যা সঙ্গে করে, ব্যাভিচার তুই যারে মরে;
পাপ-স্রোতে ভাসালিরে বঙ্গ-মায়ে অপার পাথারে।
কমলিনী সমাজ সব কুলীনের মেয়ে,
অনাথিনীর বেশে থাকে মলিনা হ'য়ে,
(এরে) ওদের দশা মনে হলে, দুঃখেতে পাষাণ গলে,
কেউ নাই ওদের ধরাতলে, সদা মনানলে জ্বলে মরে।
শ্রোত্রিয় বংশজ বংশ গেলরে নিপাত,
(এরে) কুমারী কুলীনকুমারী করে অশ্রু-পাত,
(এরে) বিদ্যাশূন্য বৃহস্পতি, তারা বলে সমাজপতি,
ঘটক সনে করে যুক্তি দম্ভে কাঁপায় বঙ্গ পদ-ভরে।

ললিত—আড়া।

মেল ভাঙ্গ মেল ভাঙ্গ কুলীন সবে।
তবে সে মঙ্গল হবে, সমাজেতে রবে হে গৌরবে।
মেলে মেলে নাহি মিল, এখে কিরে ফল বল,
মিল মেলে মেলে মিল, জাতিকুল সকলি রহিবে।
ঘরে ঘরে কুল-মেয়ে দুখে ভেসে যায়,

(এরে) কেমনে দেখ নয়নে পাষাণের প্রায়,
(এরে) বল বল খড়্‌দ ফুলে, কি গৌরবে আছ ভুলে
দেশ নাশিলে সমূলে, আর কতকাল রবে এ গৌরব।
যত অন্ন দানে কুল কন্যাগণ (এরে)
মূক শুকপাখী সম করেছ পোষণ (এরে)
তাতে কেন হ'য়ে ব্যাধি, সে পাখী জীবন্তে বধ,
ওদের কিবা অপরাধ, কেন এত বাদ সাধ তবে।

(অনূঢ়া কুলীন কন্যাগণের উক্তি।)

জীব সাজসমরে—সুর।

মন দুঃখ ক'ব কায়,
দুঃখ কে বুঝিবে এই দুঃখময় ধরায়।
পিতা কপাল দোষে,
কাপালিক প্রায়, লিপ্ত আছেন কুল-লক্ষ্মীর সেবায়,
আজন্ম পালিয়ে এসব কুল-মেয়ে,
বলি দিবে কুলময়ীর পায়॥
আমরা অবলা যুবতী, কি হইবে গতি,
না দেখি সুহৃদ ত্রিভুবনে, কঠিন পিতা-মাতা তায়,
স্নেহ-মমতায় জলাঞ্জলি দিলে দু'জনে,
(কেবল) ভ্রাতৃজায়াগণের দাস্যবৃত্তি করে,
পোড়া উদর পো'ষ আজীবন ভরে,
আছি ভ্রাতার মন চেয়ে, ভ্রাতা পাছে কোন ত্রুটি পায়।
সদা মরি মনস্তাপে,
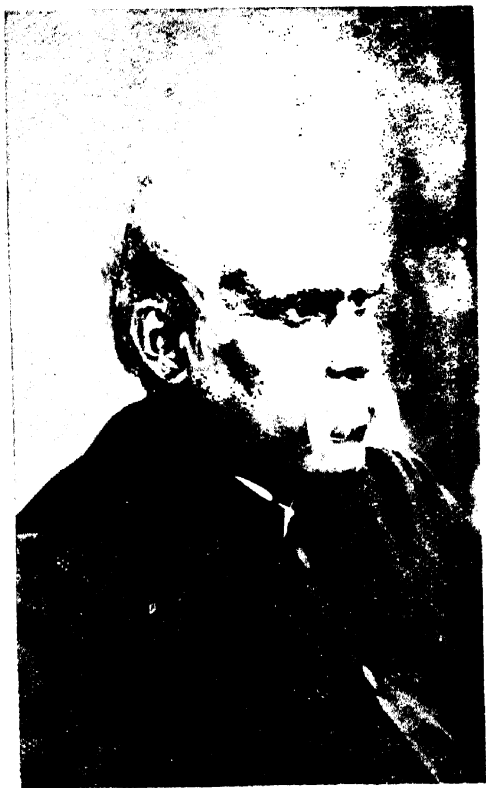
স্বর্গীয় দ্বারকা নাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

না জানি কি পাপে পাপিনী জন্মেছে বিধাতায় (তাতে)
পাপ ভেবে চিতে, পাপিনীদের হাতে,
দেবে দ্বিজে নাহি অন্ন খায়।
(হায়) মোদের যে যমপতি, সবার করে গতি,
চক্ষু খেয়ে নাহি দেখে এ যুবতী,
বুঝি মড়া দেবীবরে যেয়ে যম ঘরে,
(নিতে) বারণ করে যম রাজায়।

(মরণোন্মুখ পিতার প্রতি অনূঢ়া কন্যার উক্তি।)

(পারব না রাজসভায় যেতে—সুর)

কার পানে বা চাবে পিতা এ দুঃখিনী কুল মেয়ে,
কি ধন দিয়ে যাও হে তুমি,
রেখে যাও হে কার আশ্রয়ে।
ভ্রাতা নহে ভ্রাতার মত, সে যে জায়ার অনুগত,
(আর) দাসী হয়ে রবে কত, ভ্রাতৃ-বধুর মুখ চেয়ে।
অনাথিনী তনয়ারে, আজীবন পালন করে,
শেষে পিতঃ কার করে যাও হে তা'রে সমর্পিয়ে।
চির দুঃখ ভোগের তরে, কেন পুষেছিলে মোরে,
(এখন) তুমি চল্লে তোমার ঘরে, দুঃখিনীরে ভাসাইয়ে।

স্বর্গীয় দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

১২৫২ সালে ইং ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই বৈশাখ, বিক্রমপুরের অধীন মাগুরখণ্ড গ্রামে দ্বারকানাথ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম ৺কৃষ্ণপ্রাণ গঙ্গোপাধ্যায়, মাতার নাম উদয়তারা দেবী। কৃষ্ণপ্রাণ

গাঙ্গুলী অতি দরিদ্র ছিলেন, বিশেষ কষ্টের সহিত কোনওরূপে তাঁহার সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ হইত। কাজেই শৈশবেই দ্বারকানাথকে দারিদ্র্যের কষাঘাত সহ্য করিতে হইয়াছে। বাল্যকাল হইতেই দ্বারকানাথ একগুঁয়ে দুর্দ্দান্ত, তেজস্বী ও সাহসী ছিলেন। মানব-চরিত্রে যেমন ভাল-মন্দ উভয়ই বিদ্যমান দেখিতে পাওয়া যায়, তদ্রূপ ইঁহার চরিত্রেও একগুঁয়েমি, দুর্দ্দান্তপনা প্রভৃতি কতকগুলি দোষ বিদ্যমান থাকিলেও অপর দিকে ইনি কোমল হৃদয়, দয়াবান ও পরোপকারী ছিলেন। সাত বৎসর পর্য্যন্ত পাঠশালায় বিদ্যাভ্যাস করেন, তৎপর ফরিদপুর ইংরেজী বিদ্যালয়ে পড়িতে যান। সেখানে পীড়িত হওয়ায় দেশে প্রত্যাগমন করেন এবং কালীপাড়া গ্রাম হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষা দেন; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই। ইহার পরে তিনি সোণারঙ্গ ও ফরিদপুরের অধীন উলপুর এবং লোনসিং গ্রামের মধ্য-ইংরেজী বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের কাজ করেন। লোনসিং গ্রামে অবস্থান কালে ইনি 'অবলা-বান্ধব' প্রকাশ করেন। যৌবনের প্রারম্ভ হইতেই ইনি স্ত্রীজাতির উন্নতি কল্পে বিশেষ যত্নবান্ ছিলেন, 'অবলা-বান্ধব' তাহারই ফল। ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় গমন করেন এবং তথা হইতে 'অবলা-বান্ধব' প্রকাশিত করেন। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের মহিলার আসন নির্দ্দেশ লইয়া তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করেন এবং তাহার মীমাংসা করিয়া ক্ষান্ত হন।

১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে কুমারী অকৃয়েডের সাহায্যে হিন্দু-মহিলা-বিদ্যালয় স্থাপনে যত্নপরায়ণ হন। অতঃপর ভারত-সভা স্থাপনে সাহায্য করেন এবং জীবনের শেষ পর্য্যন্ত তাহার সহকারী সম্পাদকের কার্য্য করেন। কলিকাতায় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ স্থাপনেও ইনি বিশেষ সাহায্য করেন এবং জীবনের শেষাংশে ইহার সম্পাদক ছিলেন। শ্রীযুক্তা কাদম্বিনী বসু বি, এ মহাশয়া ইঁহার পত্নী ছিলেন। এই মহিলার বিশ্ব বিদ্যালয়ের উপাধি-

প্রাপ্তি উপলক্ষে কবি হেমচন্দ্র কবিতায় অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। ইংরেজী ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে জুন সোমবার বাঙ্‌লা ১৩০৫ সনের ১৪ই আষাঢ় ইনি পরলোক গমন করেন। ইঁহার 'সুরুচির কুটির' নামক স্ত্রী-শিক্ষা-প্রদ উপন্যাস এক সময়ে অতি উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছিল।

"না জাগিলে সব ভারত ললনা,
এ ভারত আর জাগে না জাগে না"

ইতি শীর্ষক বিখ্যাত গানটি ইঁহারই রচিত। ইঁহার স্বাধীন ও উদার মত এবং স্ত্রীজাতির উন্নতিকল্পে যত্ন ও চেষ্টা দেশের মঙ্গলেচ্ছু যুবক-মাত্রেরই অনুকরণীয়। বিক্রমপুরের সাহিত্য-সেবিগণের মধ্যে ইঁহার স্থান অতি উচ্চে। 'কবিগাথা', 'কবিতা-কুসুম' প্রভৃতি কয়েক খানা বিদ্যালয়-পাঠ্য কবিতা গ্রন্থও ইনি সঙ্কলন করিয়াছিলেন। দেশের "জাতীয় সঙ্গীত" সংগ্রহ করিয়া ইনিই সর্ব্বপ্রথম শিক্ষিতদিগের হস্তে অর্পণ করেন। ইঁহার রচিত কয়েকটী স্বদেশী সঙ্গীত অতীব সুন্দর।

স্বর্গীয় আনন্দচন্দ্র মিত্র।

বিক্রমপুরস্থ বজ্রযোগিনী গ্রামে ইনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। আনন্দ-চন্দ্র বঙ্গদেশের মধ্যে একজন সুকবি বলিয়া বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়া গিয়াছেন। ইঁহার প্রণীত 'হেলেনা কাব্য' একদিন বঙ্গভাষায় বিশেষ আশার সঞ্চার করিয়াছিল। 'পথিক'-ভণিতায় ইঁহার অনেক সুন্দর সুন্দর গান আছে। ইনি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের একজন বিশিষ্ট সভ্য ছিলেন ও কলিকাতা কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটেই বাস করিতেন। 'ভারত মঙ্গল', 'মিত্রকাব্য', 'পাঠসার' প্রভৃতি ইঁহার রচিত বহু স্কুলপাঠ্য ও কাব্য গ্রন্থ আছে। আনন্দচন্দ্র সঙ্গীত-রচনায় বিশেষ পটু ছিলেন। জাতীয় সঙ্গীত, সামাজিক সঙ্গীত, ঐতিহাসিক সঙ্গীত, প্রভৃতি ইঁহার রচিত বহু

মনোহর সঙ্গীত বঙ্গভাষায় ইঁহাকে অক্ষয় করিয়া রাখিবে। ১৩১০ সালে কলিকাতা নগরীতে ইনি পরলোক গমন করিয়াছেন। ইঁহার রচিত "ভারত শ্মশান মাঝে আমি রে বিধবাবালা" এই সঙ্গীতটি একদিন বঙ্গের সর্ব্বত্র সমভাবে গীত হইত। পূর্ব্ববঙ্গের কবি-সমাজে ইনি অতি উচ্চ শ্রেণীর কবি ছিলেন। দেশের হিতের জন্যও ইঁহার বিশেষ মনোযোগ ছিল। রাজা রামমোহন রায়ের আবির্ভাবে যে ধর্ম্মযুগের প্রবর্ত্তন হয়, তদবলম্বনেই ইনি পূর্ব্বোক্ত "ভারত-মঙ্গল" নামে মহাকাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন।

স্বর্গীয় কৃষ্ণকান্ত পাঠক।

অধুনা ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত দক্ষিণ বিক্রমপুরের কাসাভোগ গ্রামে অনুমান ১২২৮-১২২৯ সালে কৃষ্ণকান্ত জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম চিন্তামণি ঠাকুর। ৭০ বৎসর বয়সে কৃষ্ণকান্তের মৃত্যু হয়। কথকতা করা ইঁহার ব্যবসায় ছিল। ইঁহার রচিত গীত ও নূতন সুর অতি মনোহর। আজ কয়েক বৎসর হইল, ইনি পরলোক গমন করিয়াছেন, বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্তও ইঁহার গান করিবার বিশেষ শক্তি ছিল। এখানে আমরা তাঁহার রচিত এবং পূর্ব্ববঙ্গের সঙ্গীতপ্রিয় ব্যক্তিমাত্রেরই প্রিয়তম সঙ্গীত 'জানি কার রূপ সাগরে ঝাঁপ দিয়ে ও গৌর হয়েছে' শীর্ষক সঙ্গীতটি এবং অপর দুইটি গান উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

রাগিণী মনোহরসাই—তাল লোভা।

জানি কার রূপসাগরে ঝাঁপ দিয়ে ও গৌর হয়েছে।
তারে ধরবে বলে, ঝাঁপ দিলে, থাই পেলে না ন'দে উঠেছে॥
কারে জানি বাসতো ভাল, সে মনের মত ছিল,
সদা ওর মন ছিল সেই রূপের কাছে;
ও পেলে না সে কল, তাইতে বিকল অন্তরে ওর দাগ লেগেছে॥

বুঝি ওর মন পুড়ে যায়, নেইকো স্থির ভ্রমি বেড়ায়,
তাপিত প্রাণ শীতল হয় স্থান কোথায় আছে ;
তার প্রেমানলে দগ্ধ হৃদয়, নয়নে নিশানা আছে।
নাইকো ওর দুখের অন্ত, হয়েছে পথ-শ্রান্ত,
সদা মন-ভ্রান্ত নয়ন-জল পড়েছে।
কৃষ্ণকান্ত বলে শান্তি নাই তার,
যাবজ্জীবন তাবৎ আছে ॥

রাগিণী ও তাল ঐ।

কোথা জানি কার কে ছিল এ গৌররায় ॥
ওরে যেমন কেমন কেমন ভাবের মতন দেখা যায়।
নব প্রেম-রস-সিন্ধু-তরল-তরঙ্গে, ভেসে ছিল একা নয় সে,
কে যেন ছিল সঙ্গে,
পরে সে যেন কোন্ ঘাটে রলো, ও একা এল নদীয়ায় ॥
কখন হাসে, কখন কাঁদে, কখন কখন নাচে,
সকলই তার কাছে।
সে এল কি না পাছে, তাইত ফিরে ফিরে চায় ॥
কি মরি, নব হেমাঙ্গ বিচ্ছেদ-রসে মাখা,
সতত যতন করে না পায় তা'র দেখা,
(ওগো) যার যাতনা সেই সে জানে, অন্যে কি তা জানতে পায় ॥
অভিনব ভাবোদগম তিলে তিলে, কি করি কি
মন প্রাণ কেড়ে নিলে নিলে,
কৃষ্ণকান্ত বলে, এতকাল ছলে প্রাণ জ্বালায়ে যায় ॥

রাগিণী ও তাল ঐ।

হরি, আমার মানস-সন্তাপ নাশিতে যদি
তোমার অতি দুঃখ হয়।

তবে কেন দুঃখ পাবে, যা হয় আমার হবে,
তুমি সুখে থাক, সুখময় ॥
অন্তরে অন্তরে সন্তান সন্ততি,
অশান্ত সমাজে সতত বসতি,
আমার নাই অন্য গতি; (ওহে) ব্রজ-জন-পতি,
দিবে কি শ্রীপদে আশ্রয় ॥
পড়েছি বিপাকে আপন কর্ম্ম-পাকে,
তুমি বিনা আর কে খণ্ডাবে তাকে,
মরম-বেদনা নিবেদি তোমাকে,
তুষানলে দহে এ হৃদয়।

স্বর্গীয় রাজমোহন আম্বলী।

বিক্রমপুর কাইচাইল গ্রামে ইঁহার বাস স্থান ছিল। আজ কয়েক বৎসর হইল ইনি পরলোক গমন করিয়াছেন। ইঁহার শ্যামাসঙ্গীত-গুলি পূর্ব্ববঙ্গের ঘরে ঘরে অতি আদরের সহিত গীত হইয়া থাকে। উপস্থিত মত সঙ্গীত-রচনায়ও ইনি বিশেষ সিদ্ধহস্ত ছিলেন। ইঁহার রচিত বহু শ্যামা-সঙ্গীত অপ্রকাশিত ভাবে লোকের কণ্ঠে কণ্ঠে অদ্যাপিও গীত হইয়া আসিতেছে। আমরা এখানে তাঁহার রচিত দুইটী সঙ্গীত প্রকাশ করিলাম।

পূরবী—একতালা।

দিন যায় দীনতায়, ভাব না মন তায়, কর না তা'র উপায়।
দিনের দিন হয় তনু হীন ক্ষীণ,
কবে হ'বে আর এ দীনের দিন,
মানে না দিন ক্ষণ শমন প্রবীণ, কবে নিয়ে যায়।

পরিবারের প্রতি সদা টানে মন,
কেশে ধরে আবার টানি'ছে শমন,
কোথা যাই বল একা রাজমোহন, কব কা'য় হায় হায়!

নিম্নলিখিত সঙ্গীতটি জনৈক বর্ষীয়সী রমণীর নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিলাম; বিক্রমপুরের স্থানে স্থানে বিবাহোপলক্ষে এইটী গীত হইয়া থাকে।

বেহাগ।

দেগো তোরা জয়ধ্বনি এয়োগণে!
পার্ব্বতীর বিয়া হ'বে শিবের সনে।
আন গৌরী-ঈশাণে, তৈল হরিদ্রা মাখ ছেনে*
স্নান করাও জল এনে, সাজাও যতনে।
কর সবে জোটনা, যে যা জান এয়োজনা
শিবে যেন গৌরী বিনে অন্য নাহি জানে।
আকুলা চালিতার মূল, দিয়া বাঁধ গৌরীর চুল
গৌরী নিয়ে সদা কোলে, থাকে যেন শিব ভুলে,
গৌরী আজ্ঞা মত চলে, রাখে নজরে নজরে।
শুভলগ্নে শুভক্ষণে, মিলন করাও দুইজনে
সপ্তপাক ঘুরাও গৌরীর চৌধারে।
বাজী বন্দুক ছাড়ে যারা, ভানুমতী ঘুরাক তারা
চিনি সন্দেশ, ভাজাপোড়া দেওগো জলপানে
আইয়ো (এয়ো) গণে।

* ছানিয়া।

স্বর্গীয় প্রসন্নকুমার চট্টোপাধ্যায়।

সাধক কবি প্রসন্নকুমার।

রাজাবাড়ী থানার নিকটবর্ত্তী বাহেরক বা বায়রক গ্রামে ১২৫৫ সালের ১৭ই মাঘ বুধবার সাধক কবি প্রসন্ন কুমার জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবেই ইঁহার পিতৃবিয়োগ হয়; সে সময়ে প্রসন্নকুমার এক বৎসরের শিশু ছিলেন। পিতার মৃত্যুর পরে পৈত্রিক সম্পত্তি যাহা কিছু ছিল, সে সকল তাঁহার অল্পবয়স্কা সংসারজ্ঞান-বিহীনা জননীর উপরে রক্ষণাবেক্ষণের ভার পড়ে, অভিভাবকহীনা বিধবার সম্পত্তি দেখিয়া জনৈক প্রতিবেশী তাহা অন্যায় রূপে দখল করিয়া লইলেন, বক্রী যাহা কিছু ছিল, তাহা রাক্ষসী পদ্মার গর্ভে বিলীন হইয়া গেল। চারিদিক হইতে সংসারের ভীষণ বিভীষিকা আসিয়া এই ক্ষুদ্র নিঃস্ব পরিবারকে ঘিরিয়া ধরিল। এই ভীষণ দুঃসময়ের সময় তাঁহার এক মাতুল প্রায় পাঁচ বৎসর কাল পর্য্যন্ত ইঁহাদের ভরণপোষণ করেন; কিন্তু যখন প্রসন্নকুমারের ছয় বৎসর বয়স সে সময়ে ডিব্রুগড়-প্রবাসী তাঁহাদের হিতাকাঙ্ক্ষী সেই মাতুলের মৃত্যু হয়। এইরূপ ভয়ানক নিরাশ্রয় অবস্থায় পড়িয়া অবশেষে উপায়ান্তর না দেখিয়া তাঁহার জননী বাধ্য হইয়া জনৈক দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়ের বাটীতে থাকিয়া বালকের শিক্ষাদীক্ষা ও লালনপালনের পথ কতকটা সুগম করেন। অন্নকষ্টে প্রপীড়িত হইয়া তের বা চৌদ্দ বৎসর বয়সেই তিনি চাকরী লইতে বাধ্য হন, কিছুদিনের জন্য পুলিশ কর্ম্মচারীর অধীনে থাকিয়া লেখাপড়ার কার্য্য করিয়াছিলেন, কিন্তু শারীরিক দুর্ব্বলতা বশতঃ তাহা করিতে অক্ষম হইয়া বিদ্যাভ্যাসে মনোনিবেশ পূর্ব্বক বহুকষ্টে ঢাকা নর্ম্যাল বিদ্যালয় হইতে দ্বিতীয় বার্ষিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, এখানেই তাঁহার বিদ্যাশিক্ষার শেষ হয়। ইহার পরে ঢাকা জেলার নানা স্থানের বঙ্গ বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা

করিয়া ১৩০৬ সনের ১০ই জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার তিনি পরলোক গমন করিয়াছেন।

অতি শৈশব হইতেই ইনি কাব্যানুরাগী ও সঙ্গীতানুরাগী ছিলেন, এমন কি ১৩।১৪ বৎসর বয়সের সময়েই তিনি যাত্রা, কবি ও হোলির গান ইত্যাদি রচনা করিয়া দলে মিশিয়া গান করিতেন। দারিদ্র্যের দারুণ কষাঘাতে শৈশব হইতেই তাঁহার হৃদয়ে বৈরাগ্যের ছায়া অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল। আজীবন তিনি দারিদ্রের সহিত সংগ্রাম করিয়া গিয়াছেন। বিদ্যালয়ের কার্য্য করিয়া প্রাপ্ত সামান্য বেতনে তাঁহার পরিবারের অন্ন সংস্থান হইত না, চাকর রাখিবার সঙ্গতি না থাকায় ঢাকা থাকিবার সময় তিনি নিজে বুড়ীগঙ্গা হইতে জল তুলিয়া আনিতেন; সারা জীবন তাঁহার হৃদয়ে সমভাবে ধর্ম্মভাব বিরাজিত ছিল। তাঁহার রচিত গীতসমূহের মধ্যে শ্যামা সঙ্গীতই অধিক। কত শত গীত যে তাঁহার মুখে মুখে রচিত হইয়া বিস্মৃতি-গর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে, তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। চিরদিন দরিদ্রতার মুকুট পরিয়া সংসার-রঙ্গভূমে বিচরণ করায় এ সকল অমূল্য সঙ্গীতগুলির মুদ্রণকার্য্য হইয়া ওঠে নাই,—যে দুইখানা মুদ্রিত পুস্তক পাওয়া যায়, তন্মধ্যস্থ সঙ্গীতগুলি প্রায় সমুদয়ই তাঁহার প্রৌঢ় বয়সের রচনা।

প্রসন্নকুমার তেজস্বী ও নিঃস্বার্থ প্রকৃতির লোক ছিলেন; আপনাকে প্রকাশ করিতে বড়ই সঙ্কুচিত হইতেন। তিনি কালীনামের সাধক ছিলেন, নিজের অভাব অভিযোগ যাহা কিছু, সে সমুদয়ই সঙ্গীতের দ্বারা জগজ্জননীর নিকট জানাইয়াই তাঁহার তৃপ্তি ছিল। কাহারও তোষামোদের ধার তিনি ধারিতেন না—এজন্য অনেকেই তাঁহাকে "পাগ্‌লা পণ্ডিত" নামে অভিহিত করিত। তিনি সর্ব্বদা গৈরিক বসন ও রুদ্রাক্ষের মালা ব্যবহার করিতেন। আমরা এখানে তাঁহার মুদ্রিত পুস্তক হইতে একটী গান তুলিয়া দিলাম।

মাতৃপদ চিন্তন।

"কোন্ প্রাণে মা মা বিনে আর অন্য ডাকে ডাকি তোরে?
মা ডাকের মত ডাক কিবা আছে আর এ সংসারে?

* * * * *

জন্মমাত্র মা বুঝেছি, তার পরে আর সব চিনেছি
মায়ের কৃপায় বেঁচে আছি মা বিনে কি মুখে সরে?
মাতগো মা আমার ছায়া, তাইতে তোমার এত মায়া,
কতই অগাধ অপার তোমার দয়া, প্রসন্ন তাই আশা করে।"

ইনি উপস্থিত ভাবে যে কিরূপ সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহী সঙ্গীত রচনা করিতে পারিতেন, আমরা এখানে বঙ্গ-সাহিত্য-সমাজে সুপরিচিত প্রসিদ্ধ লেখক শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর করের লিখিত "মানব হৃদয়ের অব্যক্ত ভাব"* শীর্ষক প্রবন্ধ হইতে তাহার একটী প্রকৃত ঘটনা তুলিয়া দিলাম। তিনি লিখিয়াছেন "সাধক কবি স্বর্গীয় প্রসন্নকুমার চট্টোপাধ্যায় এক দিন মধ্যাহ্ন সময়ে ঢাকার শাখারীবাজার দিয়া চলিয়া যাইতেছেন। ইহার কিছুকাল পূর্ব্বে একজন যুবক শঙ্খবণিকের মৃত্যু হইয়াছে। জ্ঞাতিবন্ধুরা আসিয়া সমবেত হয় নাই বলিয়া, শবটি বাটীর বাহিরে রাজপথের এক পার্শ্বে পড়িয়া রহিয়াছে। মৃত যুবকের স্ত্রী, ভগ্নী প্রভৃতি রমণীরা গৃহে থাকিয়া গবাক্ষ দ্বার দিয়া শবের প্রতি দৃষ্টিপাত ও অজস্র অশ্রুপাত করিতেছেন। হতভাগিনী জননী বাহিরে আসিয়া শবের পার্শ্বে ধূলায় পড়িয়া গড়াগড়ি দিতেছেন। প্রখর রৌদ্রে নিজের মস্তক ফাটিয়া যাইতেছে, তাহাতেও ভ্রূক্ষেপ নাই। কিন্তু শবের মস্তকে ও মুখে রৌদ্র লাগিতেছে বলিয়া হোগ্‌লা দ্বারা তাহা আবৃত করিতেছেন। * * * * কবি শবকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন;—

* সাহিত্য ১৭শ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা।

"আজ কোন মনের খেদে এ দুপুর রোদে শয্যা ত্যজে
বাইরে শুয়েছ ?
ঐ না তোমার রম্য গৃহ ? পড়ে কেন হোগলাতে
বাহিরে ? কি দুঃখে শয্যা ত্যজেছ ?
ঐ না ভগ্নী, ভার্য্যা আদি কাঁদি কাঁদি হায়! গৃহ হ'তে
তোমায় উঁকি দিয়ে চায় ?
আর এই বিষম রৌদ্রের মাঝ অভাগিনী মায় শিয়রে
পড়িয়ে ধূলায় লোটায়!
এতকাল কষ্টে লালিত যতনে, সে দেহের ও দশা
সহে কি মার প্রাণে ?
ঢাকা দিচ্ছেন মা হোগ্‌লা টেনে টেনে, কেমনে তা
দেখে সহিছ ?

এই সঙ্গীতটি কি মাতৃস্নেহের জলন্ত চিত্র নহে? প্রসন্নকুমারও তাঁহার পিতার ন্যায় একাধিক বিবাহ করেন—ইঁহারা স্বভাব কুলীন, ভঙ্গ হন নাই। ইঁহার তিন বিবাহ, তন্মধ্যে প্রথমা পত্নীর গর্ভে এক কন্যা, দ্বিতীয়ার গর্ভে চারি পুত্র, তৃতীয়া নিঃসন্তান ছিলেন। কত নগণ্য কবির কবিতাও সঙ্গীত আজকাল বিজ্ঞাপনের জোরে প্রসিদ্ধ লাভ করিতেছে, কিন্তু হায়! সাধক কবির কবিতা ও সঙ্গীত কয়জনে পাঠ করেন? বিক্রমপুরবাসী অনেকে তাঁহার নামও শুনিয়াছেন কিনা তাহাই সন্দেহস্থল। কবি যথার্থই গাহিয়াছেন "Full many a flower is 'born to blush unseen." ময়মনসিংহে—গৌরিপুরের প্রসিদ্ধ দানশীল এবং সাহিত্যানুরাগী ভূম্যাধিকারী শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী মহাশয়ের অর্থানুকূল্যে প্রসন্নকুমারের কবিতা-গ্রন্থ তাঁহার মৃত্যুর পর প্রকাশিত হইয়াছিল।

স্বর্গীয় শীতলাকান্ত চট্টোপাধ্যায়।

শীতলাকান্ত চট্টোপাধ্যায়

বিক্রমপুরান্তর্গত পশ্চিমপাড়া গ্রামে ১২৬৩ সনে শীতলাকান্ত চট্টোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা স্বর্গীয় কাশীকান্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ঢাকা জজ আদালতের একজন খ্যাতনামা উকীল ও সে যুগের হিন্দু-সমাজের প্রধান নেতা ছিলেন। ইঁহার দ্বারাই ঢাকার, সনাতন ধর্ম্মরক্ষিণী সভা" ও পূর্ব্ববঙ্গের মুখপত্র "হিন্দুহিতৈষী" পত্রিকা প্রবর্ত্তিত হয়। কাশী-কান্তের চারিপুত্র শ্যামাকান্ত, নবকান্ত, নিশিকান্ত ও শীতলাকান্ত। শীতলাকান্তই সর্ব্ব কনিষ্ঠ। শৈশব হইতেই ইনি অত্যন্ত রুগ্ন ছিলেন। সে সময়ে কেহই ইঁহার জীবনের আশা করে নাই। চিরজীবন রুগ্ন শরীর লইয়াও ইনি যে অতুল কীর্ত্তি ও যশ রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা আশ্চর্য্য বলিয়াই মনে হয়। বাল্যকালে গ্রাম্য পাঠশালা ও চতুষ্পাঠীতে বাঙ্‌লা ও সংস্কৃত অধ্যয়ন করিয়া তিনি ঢাকা গভমেণ্ট স্কুলে ভর্ত্তি হন এবং সেখান হইতে মাসিক দশ টাকা বৃত্তি সহ প্রথম শ্রেণীতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এফ, এ পরীক্ষার ৩।৪ মাস পূর্ব্বেই মস্তিষ্ক রোগের জন্য লেখা-পড়া বন্ধ করিতে বাধ্য হন। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পূর্ব্বেই অর্থাৎ ১৫ বৎসর বয়স হইতেই ইনি একজন সুলেখক বলিয়া খ্যাতিলাভ করেন ও ঢাকায় "ঈষ্ট" পত্রিকা এবং তাঁহার জেষ্ঠভ্রাতা ৺নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত "মহাপাপ বাল্যবিবাহ" নামক মাসিক পত্রে বহু ইংরেজী ও বাঙ্‌লা প্রবন্ধাদি লিখিতেন। ১৭ বৎসর বয়সে প্রকাশ্যভাবে ইনি ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করেন। ২০ বৎসর বয়স হইতেই ইনি নানাবিধ জনহিতকর কার্য্যে প্রবৃত্ত হন, সে সময়ে তিনি "ঢাকা জন-সাধারণ সভার" সহকারী সম্পাদক ও ছাত্রসভার (Dacca Institute) ও ভারত সভার (Indian Association)

স্বর্গীয় শীতলাকান্ত চট্টোপাধ্যায়।

প্রতিনিধি হইয়া ময়মনসিংহ, সেরপুর ও আসাম প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণ করিয়া শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গের হৃদয়ে স্বদেশপ্রীতি জাগাইয়া তুলেন। অতঃপর বাগ্মীবর সুরেন্দ্রবাবুর অনুরোধে পঞ্জাবের স্বদেশহিতৈষী সর্দ্দার দয়ালসিংহ কর্ত্তৃক প্রকাশিত 'ট্রিবিউন' নামক সংবাদপত্রের সম্পাদকতা গ্রহণ করেন—তখন তাঁহার বয়স ১৯।২০ বৎসর মাত্র। ইঁহার সম্পাদনে 'ট্রিবিউন' বিশেষ খ্যাতিলাভ করে। দুই বৎসর কাল "টিবিউন" পত্রের সম্পাদকতা করিয়া ১৮৮২ সালে শীতলাকান্ত বাবু উক্তপদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ১৮৮৪ সালে এলাহাবাদে ৪।৫ মাস কালমাত্র অধ্যয়ন করিয়া ওকালতী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন; কিন্তু এই ব্যবসায়ে তাঁহার শ্রদ্ধা না থাকায় কিছুকাল মাত্র মীরাটের জজ আদালতে ওকালতী করিয়া সে ব্যবসা পরিত্যাগ পূর্ব্বক কয়েক মাস ১৫০৲ টাকা বেতনে "বিহার হেরল্ড" পত্রের সম্পাদকতা করিয়া পুনরায় ২০০৲ টাকা বেতনে "ট্রিবিউনের" সম্পাদকতা লইয়া লাহোর-প্রবাসী হন। পঞ্জাব প্রদেশের বহু জনহিতকর কার্য্য তাঁহারি অমর লেখনী পরিচালনায় সম্পাদিত হইয়াছে। ইঁহারি চেষ্টায় পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু সংস্কার সাধিত হয়, ইনিই উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্টার লার্পেণ্ট সাহেবের উৎকোচ গ্রহণ-বিষয় প্রমাণিত করিয়া গভর্মেণ্ট দ্বারা কমিশন বসাইয়া তাঁহাকে কর্ম্মচ্যুত করাইতে সমর্থ হন।

এক সময়ে অমৃতসরের পুলিসের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ওয়ারবার্টন সাহেবের ও তাঁহার অধীনস্থ পুলীশ কর্ম্মচারিগণের অত্যাচারে তৎপ্রদেশান্তর্গত প্রজাবর্গ উত্যক্ত হইয়া উঠিয়াছিল; সে সময়ে শীতলাকান্ত বাবু নির্ভীক ভাবে সাহেবের কুকীর্ত্তি সকল ট্রিবিউনে প্রকাশ করিয়া গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, তাঁহার এই আনীত অভিযোগের কতকগুলি যথার্থ প্রমাণিত হওয়ায় সাহেব গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইলেন, অবিশিষ্ট অভিযোগগুলি লইয়া সাহেব, তখন ট্রিবিউনের সম্পাদক বলিয়া শীতল

বাবুর বিরুদ্ধে মোকদ্দমা রুজু করেন, এই মোকদ্দমায় চারিদিকে হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছিল, স্থানীয় শ্বেতাঙ্গগণ চাঁদা করিয়া পুলিশ সাহেবের পক্ষালম্বন করিয়াছিলেন—এদিকে, পঞ্জাববাসীগণও কৃতজ্ঞতাভরে এই স্বনামধন্য পুরুষসিংহের সাহায্যকল্পে অল্প কয়েক দিনের মধ্যে ৩।৪ সহস্র টাকা সংগ্রহ করিয়া শীতলবাবুকে দিতে আসেন, নিঃস্বার্থ পরোপকারী ও স্বদেশহিতৈষী শীতলাকান্ত উহার এক কপর্দ্দকও নিজে গ্রহণ না করিয়া পত্রিকার সত্বাধিকারী সর্দ্দার দয়াল সিংহের হস্তে অর্পণ করিলেন—কিন্তু পরে এই মোকদ্দমা আপোষে মিটিয়া গিয়াছিল। এই ঘটনায় তাঁহার নাম দেশবিদেশে বিখ্যাত হইয়া পড়ে—অক্ষয় যশ, দেশীয় নরনারীর আন্তরিক প্রীতি ও পূজা এবং বিলাতের মহামতি ডিগবী, হিউম, কেইন, নিনবার্ট প্রভৃতি মহোদয়গণের নিকট হইতে ইনি বহু প্রশংসাসূচক লিপি প্রাপ্ত হইতেন। তাঁহারা শীতলবাবুকে "My dear Friend," "My dear brother" ইত্যাদি মধুময় সম্বোধনে পত্রাদি প্রেরণ করিতেন।

শীতলাকান্ত বাবুর সম্পাদানে ট্রিবিউন এতদূর প্রসিদ্ধি লাভ করে যে, দেশবিদেশে ইহা "The terror of Punjab, "The banner of the people" ইত্যাদি আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিল। দেশীয় রাজন্যসমাজে ও ইঁহার এতদূর সম্মান ও প্রতিপত্তি লাভ হইয়াছিল যে, একবার নাভার রাজা তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া স্বীয় রাজধানী হইতে ২৫।৩০ মাইল পথ অগ্রসর হইয়া অভ্যর্থনা করিয়া আনিবার নিমিত্ত স্বীয় মন্ত্রী ও অন্যান্য কর্ম্মচারীদিগকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। গভর্মেণ্ট কর্ত্তৃক কাশ্মীরের মহারাজের ক্ষমতা বহু খর্ব্ব হইলে "ট্রিবিউন" পত্রে শীতলবাবু কাশ্মীর মহারাজের পক্ষাবলম্বন করিয়া গভর্মেণ্টের বিরুদ্ধে কয়েকটি প্রবন্ধ লিখেন, কাশ্মীরের মহারাজা ইহাতে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বহু টাকা পুরস্কার দিতে চাহেন, ইহাতে শীতলবাবু মহারাজাকে লিখিয়া পাঠান যে, আমি
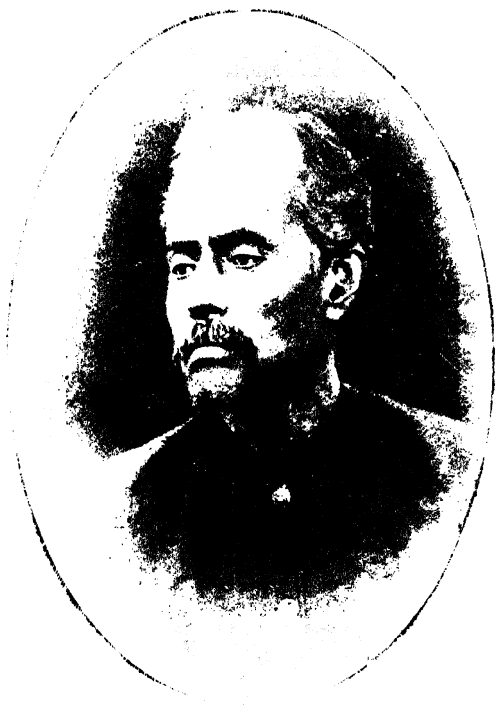
স্বর্গীয় নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়।

কোনও পুরস্কারের লোভে আপনার পক্ষ সমর্থন করি নাই, স্বীয় কর্ত্তব্য মাত্র করিয়াছি, এমন কি মহারাজার কোনও ত্রুটি দেখিলেও তদ্বিরুদ্ধে লিখিতে কুণ্ঠিত হইবনা।" ১৮৯১ খ্রীঃ অঃ শিরঃপীড়ার জন্য ইনি "ট্রিবিউনে"র সম্পাদকতা পরিত্যাগ করেন, সে সময়ে কাশ্মীরের মহারাজা তাঁহার দ্বারা একখানি পত্রিকা বাহির করিতে মনস্থ করেন কিন্তু শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন তাহাতে অস্বীকৃত হন। তিনশত টাকা বেতনের 'ট্রিবিউনে'র সম্পাদকতা পরিত্যাগ করিয়া মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে বিশেষ অর্থক্লেশ অনুভব করিতে হইয়াছিল। সুদূর পাঞ্জাব প্রবাসে থাকিয়াও তিনি স্বদেশ, স্বজাতি ও মাতৃভাষাকে ভুলিয়া যান নাই। সেখান হইতেও তিনি "বনকুসুম," 'তত্ত্ববোধিনী", ভারতী", 'নব্যভারত', 'সমালোচক' ও 'সমদর্শী' প্রভৃতি পত্রিকায় প্রবন্ধ ও কবিতাদি লিখিতেন। তাঁহার লিখিত হার্ব্বার্টস্পেন্সারের অজ্ঞেয় বাদের প্রতিবাদ, 'পাঞ্জাব-ভ্রমণ' এবং শিক্ষা সমাজ ও ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় গভীর পাণ্ডিত্য পূর্ণ প্রবন্ধগুলি বাঙ্গালা সাহিত্যের গৌরব স্থল।

বিক্রমপুরের এই খ্যাতিমান পুরুষসিংহ প্রায় ৪ বৎসর রোগযন্ত্রণা ভোগ করিয়া ১৩০৪ সনের ২রা মাঘ কেবলমাত্র ৪১ বৎসর বয়সে আত্মীয় স্বজন, বন্ধুবান্ধব, স্বদেশে ও প্রবাসের জন সাধারণকে কাঁদাইয়া পরলোক গমন করিয়াছেন। শীতলাকান্ত বাবু গিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার অমর কীর্ত্তি-কাহিনী স্বদেশী বিদেশী প্রত্যেকের হৃদয়ে, বিশেষ বিক্রমপুর বাসীর অন্তরে গৌরবের সহিত চির জাগরুক থাকিবে। এই মহাত্মা সত্যপ্রিয়তা, অধ্যবসায়, সৎসাহস এবং তেজস্বিতার জ্বলন্ত মূর্ত্তি ছিলেন। নশ্বর জগতে ইঁহার অক্ষয় কীর্ত্তি অবিনশ্বর।

স্বর্গীয় নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়।

ইনি শীতলাকান্ত বাবুর মধ্যমভ্রাতা। বর্ত্তমান যুগের সমাজ-সংস্কারক দিগের মধ্যে ইঁহার নাম ও উল্লেখ যোগ্য। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চমাসে ইঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা স্বনাম খ্যাত ডাক্তার নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক ঢাকানগরে যে "বাল্য-বিবাহ-নিবারণী" সভা সংস্থাপিত হইয়াছিল, ইনি তাহার ও তৎসভা হইতে প্রকাশিত "মহাপাপ বাল্যবিবাহ" নামক মাসিক পত্রের সম্পাদক ছিলেন। নবকান্ত বাবুর সঙ্কলিত "সঙ্গীত-মুক্তাবলী" নামক গানের বহি বাঙ্‌লা সাহিত্যের এক গৌরবের জিনিষ বলিতে হইবে। ইঁহার পূর্ব্বে এ বিষয়ে আর কেহই হস্তক্ষেপ করেন নাই। এতদ্ব্যতীত ইনি "ভারতীয় জীবনী মুক্তাবলী" শীর্ষক একখানা অসম্পূর্ণ গ্রন্থ রাখিয়া পরলোক গমন করিয়াছেন।

কবি শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র রায়।

সুবিখ্যাত কবি গোবিন্দ চন্দ্রের নাম জানেন না, বর্ত্তমান যুগে এমন কোনও বাঙ্গালীই নাই। ইঁহার রচিত "নির্ম্মল সলিলে বহিছ সদা তটশালিনী সুন্দর যমুনেও" এবং 'কতকাল পরে বল ভারতরে' শীর্ষক সঙ্গীত দু'টি জগদ্বিখ্যাত। এমন হৃদয়োন্মাদকারী সুমধুর জাতীয় সঙ্গীত বাঙ্‌লা ভাষায় অতি অল্পই আছে। ইনি দক্ষিণ বিক্রমপুরস্থ কানোরগ্রামনিবাসী। ঢাকার সুপ্রসিদ্ধ উকীল শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র রায় মহাশয় ইঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা। গোবিন্দবাবু বহুদিন আগ্রা-প্রবাসী ছিলেন। তাঁহার অমর লেখনী প্রসূত যমুনা-লহরী, জাতীয় সঙ্গীত এবং গীতি কবিতা (৪খণ্ড) বঙ্গ সাহিত্যে অপূর্ব্ব রত্ন। গোবিন্দ বাবু সর্ব্বপ্রথমে কাশী প্রবাসী হন সেখানে বিষয় কর্ম্ম করিবার

কবি শ্রীযুক্ত গোবিন্দ চন্দ্র রায়।

সঙ্গে সঙ্গে কিছু কিছু হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা শিক্ষা করেন। প্রায় ৩০।৪০ বৎসর পূর্ব্বে আগ্রার তৎকালীন জজ সাহেব জে, বি, আয়রণ সাইড মহোদয়ের সহধর্ম্মিণী দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হইলে সকল প্রকার চিকিৎসায় কোনও রূপ ফল না হওয়ায় অবশেষে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় জজ পত্নী আরোগ্য লাভ করেন। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় স্ত্রীর আরোগ্যলাভ দৃষ্টে জজ সাহেবের উক্ত চিকিৎসা প্রণালীর উপর যথেষ্ট শ্রদ্ধা জন্মে, তিনি নিজ ব্যয়ে একটী চিকিৎসা সমিতি গঠন করিয়া তাহাতে ১০০৲ টাকা মাসিক বৃত্তি দিয়া তিনজন বাঙ্গালী হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক নিযুক্ত করিয়াছিলেন, কবি গোবিন্দবাবুও সেই তিন জনের মধ্যে একজন ছিলেন।

গোবিন্দ বাবুর সুপ্রসিদ্ধ 'যমুনা-লহরী' ও তাঁহার আগ্রা প্রবাস কালে বিরচিত। পুস্তক প্রণয়ন ব্যতীত ইনি সে সময়কার প্রকাশিত 'পল্লব' ও 'আলোচনা' প্রভৃতি মাসিক পত্রেও প্রবন্ধাদি লিখিতেন। স্বাধীনভাবে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করিয়াও বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। এখন গোবিন্দবাবুর বয়স প্রায় ৭২।৭৩ বৎসর। এ বয়সেও তিনি সুস্থ সবল আছেন। তিনি এখন আগ্রা-প্রবাসী।

শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ সেন।

শ্রীনাথ বাবু বিখ্যাত "ভাষাতত্ত্ব" নামক গ্রন্থ প্রণেতা। ভাষাতত্ত্ব বঙ্গ সাহিত্যের এক অমূল্য রত্ন। বাঙ্গলা বিভক্তি, প্রত্যয়াদি যে সংস্কৃতের প্রাকৃতাকার বা উচ্চারণ ব্যতিক্রম তাহা এবং সংস্কৃত ও বাঙ্গ্লার মৌলিক একত্ব এই গ্রন্থে অতিশয় বিচক্ষণতার সহিত প্রদর্শিত

হইয়াছে। 'ভাষাতত্ত্ব' এই দুই খণ্ড শ্রীনাথবাবুর প্রায় দ্বাদশ বৎসর গবেষণার ফল। বঙ্গ ভাষায় এইরূপ সারগর্ভ গ্রন্থের সংখ্যা অতি অল্প। আমাদের প্রাচীন ব্যাকরণে কয়েকটী উচ্চারণ ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হয়, যেমন 'র' 'ল' য়ের ভেদ; কিন্তু কোন্ কোন্ স্থলে 'র'এর উচ্চারণ 'ল' হয় এবং কেন হয় তাহার কোন কারণ প্রদর্শিত হয় নাই। ঐ সকল পুস্তক দেখিয়া যে ইউরোপে Grimm's Laws নামে উচ্চারণ ব্যতিক্রমের নিয়ম সকল প্রকটিত হইয়াছে, তাহাও ঐরূপ কোন স্থলে কেন হয় তাহার হেতু বিহীন। কিন্তু 'ভাষাতত্ত্বে' প্রদর্শিত হইয়াছে যে, কোন কথিত ভাষায় যে সকল শব্দ নিত্য ব্যবহৃত অর্থাৎ যে সকল শব্দের মুহুর্মুহু ব্যবহার হয় সেই সকল স্থানেই উচ্চারণ ব্যতিক্রমের নিয়ম প্রযোজ্য, অন্য স্থলে নয়। আর ঐ প্রকার ব্যতিক্রম কেন হয় তাহার কারণও এই গ্রন্থে প্রদর্শিত হইয়াছে। প্রাচীন প্রাকৃত ব্যাকরণে উচ্চারণ ব্যতিক্রমের স্থল প্রদর্শিত না থাকায় তাহার এই ফল হইয়াছিল যে কালিদাসাদির সময়ে প্রাকৃত রচনা করিতে হইলে, তাঁহারা রীতিমত উচ্চ অঙ্গের সংস্কৃত রচনা করিয়া তাহাতে উচ্চারণ ব্যতিক্রমের অন্ধ নিয়মানুসারে 'গ' স্থানে 'অ', 'র' স্থানে 'ল', 'স', স্থানে 'হ' ইত্যাদি বসাইয়া সংস্কৃতকে কল্পিত প্রাকৃতাকার দান করিয়া প্রাকৃত রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাহাতে কি নিত্য-ব্যবহৃত শব্দ, কি ক্বচিৎ ব্যবহৃত উচ্চ সাহিত্যিক শব্দ, সকল শব্দেই উচ্চারণ ব্যতিক্রম করিয়া দিয়াছেন। এই প্রকার প্রাচীন এবং আধুনিক প্রাকৃত ও সংস্কৃত ভাষার মৌলিকত্ব সকল প্রকাশ করিয়া শ্রীনাথবাবু ভাষা-ক্ষেত্রে এক নূতন মত উপস্থিত করিয়াছেন। শ্রীনাথবাবুর নিবাস কামারখাড়া (স্বর্ণগ্রাম)।

এতদ্ব্যতীত অন্যান্য জীবিত ও মৃত গ্রন্থকারগণের মধ্যে যাঁহাদের নাম উল্লেখযোগ্য এস্থলে তাঁহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করিলাম। বর্ণানুক্রমে নাম লিখিত হইল।

৺ অতুলানন্দ গুপ্ত—কৌয়রপুর—নারীধর্ম্ম, আদর্শ যোগিনী।

শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র গুপ্ত কাব্যতীর্থ—কৌয়রপুর—গল্প-গাথা।

,, অমলেন্দু গুপ্ত—কামারখাড়া (স্বর্ণগ্রাম) ওলাউঠা চিকিৎসা।

,, অম্বিকাচরণ ঘোষ—কোরহাটি—বিক্রমপুরের ইতিহাস।

,, অবিনাশচন্দ্র গুপ্ত এম, এ, বি এল—কৌয়রপুর—শিক্ষাসমাচার সম্পাদক।

,, আনন্দকিশোর সেন—মধ্যপাড়া—পল্লী-বিজ্ঞান সম্পাদক।

শ্রীমতী আশালতা সেন—পালং—উচ্ছ্বাস নামক কবিতা পুস্তক রচনা করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত কামাখ্যা মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়—পঞ্চসার—স্ত্রীশিক্ষা সম্পর্কিত কয়েকখানা গ্রন্থ।

,, কামাখ্যাচরণ ভট্টাচার্য্য—মূলচর—উদ্দীপনা।

৺ কাশীকুমার দত্তগুপ্ত—জৈনসার—ডাক্তারী চিকিৎসা সম্বন্ধীয় ইঁহার কয়েকখানা গ্রন্থ আছে। ঢাকা নগরে এককালে ইনি একজন প্রসিদ্ধ চিকিৎসকরূপে পরিচিত ছিলেন।

৺ কামিনীকুমার চক্রবর্ত্তী—রাউতভোগ—কৃষক, গোবরে পদ্মফুল ও শুভঙ্করী।

,, কালীপ্রসন্ন দাশগুপ্ত—নয়না—রামকান্তদাশের জীবনী।

শ্রীযুক্ত কুমুদবন্ধু দাশগুপ্ত M. R. A. S.—বালিগাঁ—কৃষিপরিচয়, The united world, Paddy, Delhi durbar.

,, গঙ্গাপ্রসাদ দাশগুপ্ত—ইছাপুর—ভগ্নআশা।

৺ গোলকচন্দ্র সেন—সোণারঙ্গ—সত্যনারায়ণের পাঁচালী ও শনির পাঁচালী।

শ্রীযুক্ত গোবিন্দ চন্দ্র দাস—ব্রাহ্মণগাঁ—ইঁহার পূর্ব্ব নিবাস ঢাকা ভাওয়াল। সম্প্রতি কয়েক বৎসর ইনি বিক্রমপুরস্থ ব্রাহ্মণগাঁ

গ্রামে বাটী নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতেছেন। গোবিন্দবাবুর কবি-খ্যাতি বাঙ্গালী মাত্রেরই সুপরিচিত। এইরূপ স্বভাব কবি বঙ্গভাষায় আর কেহ আছেন কিনা সন্দেহ। সরল ও ও সরস গ্রাম্য ভাষায় অথচ কবিতার গাম্ভীর্য্য ও সৌন্দর্য্য রক্ষা করিয়া কবিতা রচনা করিতে আমরা আর কাহাকেও দেখিতে পাই না। ইঁহার ছন্দ ও ভাব সম্পূর্ণ নূতন। অর্থ-বোধের জন্য টীকা ও অন্বয়ের দ্বারে ঘুরিতে হয় না। পড়িবা মাত্রই চন্দনের মৃদু মধুর সৌরভের ন্যায় পবিত্র গন্ধে পাঠকের দেহ ও মন পুলকিত করে। 'প্রেম ও ফুল', 'কুঙ্কুম', 'চন্দন', 'ফুলরেণু' প্রভৃতি ইঁহার কয়েকখানা কবিতা গ্রন্থ আছে। বঙ্গীয় কবি সমাজে গোবিন্দবাবুর স্থান অতি উচ্চে। বর্ত্তমান সময়ে 'নব্যভারতে' ইঁহার কয়েকটী অতি সুমধুর উদ্দীপনা পূর্ণ কবিতা প্রকাশিত হইয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গে বর্ত্তমান যুগে গোবিন্দ-বাবুই শ্রেষ্ঠ কবি—একথা আমরা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি।

শ্রীযুক্ত জ্ঞানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল,—কাঠাদিয়া সিমুলিয়া —'ভারতী', আরতি, 'প্রদীপ' ইত্যাদি মাসিক পত্রে ইঁহার বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে।

,, চিত্তরঞ্জন দাশগুপ্ত বি, এ, বারএটল,—তেলিরবাগ—চিত্ত-রঞ্জন বাবুর নাম আজ কাল ভারতের সর্ব্বত্র সুপরিচিত। ইনি একজন বিচক্ষণ আইনজ্ঞ।

আইনের নিরস আলোচনার মধ্য দিয়াও ইঁহার কবি-প্রতিভা বিকশিত। 'মালঞ্চ' নামক বিখ্যাত কাব্য গ্রন্থখানা ইঁহার রচিত, ভাব মাধুর্য্যে ও সৌন্দর্য্য গৌরবে বঙ্গ ভাষায় ইহা চিরকাল আদৃত থাকিবে। চিত্তরঞ্জন বাবুর 'মালিকা' শীর্ষক আর একখানা অমুদ্রিত কাব্য গ্রন্থ আছে। চিত্ত বাবু

উদার ও মহৎ। আলিপুর বোমা মোকদ্দমার আইনের সূক্ষ্ম তত্ত্বানুসন্ধান ও অভিজ্ঞতার দ্বারা যেরূপে শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষকে কারামুক্ত করিয়াছেন, তাহা বঙ্গবাসী মাত্রেই অবগত আছেন।

৺ চন্দ্রকুমার রায়—রাজনগর—মহারাজ রাজবল্লভের জীবনী সংগ্রহ।

শ্রীমতী জগৎলক্ষ্মী সেন—কামারখাড়া (স্বর্ণগ্রাম)—একখানা কাব্যগ্রন্থ।

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য—কামারখাড়া (স্বর্ণগ্রাম)—গুরুদক্ষিণা, বাহবা হুজুগ ইত্যাদি।

৺ নবকুমার গুপ্ত—গোবিন্দ-মঙ্গল—আখ্যানমালা, নীতি-কৌমুদী।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম বি, এ,—ব্রাহ্মণগাঁ—প্রেম ও প্রকৃতি। প্রবাসী, প্রদীপ, অর্চ্চনা, ভারতী প্রভৃতি পত্রের সুপ্রসিদ্ধ লেখক।

" প্রসন্নকুমার গুহ—বজ্রযোগিনী—রামপাল।

৺ প্যারীমোহন সেন—বোলঘর—'চক্রদত্ত' গ্রন্থের অনুবাদ।

শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার বিদ্যারত্ন—আটপাড়া—সাহিত্য-প্রবেশ ব্যাকরণ, শিশু-প্রবেশ ব্যাকরণ ইত্যাদি। ইঁহার বহু স্কুল-পাঠ্য গ্রন্থ আছে। বাঙ্‌লা-ব্যাকরণের মধ্যে সাহিত্য-প্রবেশের স্থান অতি উচ্চে।

" পরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—মালপদিয়া—'ভারতী,' 'প্রবাসী' প্রভৃতি মাসিক পত্রে ইঁহার লিখিত বহু সারগর্ভ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। ইনি একজন চিন্তাশীল সুলেখক।

" বরদাকান্ত সেন—কৌয়রপুর—'ভারত ভ্রমণ', 'হীরাপ্রভা', 'অতুলচন্দ্র' 'প্রতিভা', 'হেমপ্রভা', 'চাঁদের বিয়ে' ও 'আমার গান ও কবিতা' শীর্ষক ইঁহার কয়েক খানা সুন্দর সুন্দর গ্রন্থ আছে। এক সময়ে বঙ্গীয় সাহিত্য সমাজে ইনি সুলেখক বলিয়া প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত ঘোষ—হাঁসাইল—কয়েকখানি ছোট ছোট গল্প ও পদ্য গ্রন্থ আছে।

৺ বৈকুণ্ঠনাথ সেন—সোণারঙ্গ—বিক্রমপুরের রাস্তা, ঘাট স্কুল প্রভৃতি হিতানুষ্ঠানের জন্য ইনি বিশেষ মনোযোগী ছিলেন। হাণ্টার সাহেবের সংকলিত ঢাকার 'Statistical account' নামক গ্রন্থ রচনায় বৈকুণ্ঠ বাবু বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন।

৺ মহেশচন্দ্র গুপ্ত—বিদগাঁ—কুলাবলী।

শ্রীযুক্ত মনোমোহন সেন—সোণারঙ্গ—'খোকার দপ্তর', 'শিশুতোষ' 'বাসন্তী' প্রভৃতি কয়েকখানা গ্রন্থ ইঁহার রচিত। হাস্যোদ্দীপক কবিতা ও সঙ্গীত রচনায় ইনি সিদ্ধ হস্ত।

,, মুকুন্দলাল চক্রবর্ত্তী—'ঢাকা-প্রকাশ' সম্পাদক।

৺ মনোরঞ্জন দাশগুপ্ত—তেলিরবাগ—ইঁহার রচিত একখানা নাটক এক সময়ে কলিকাতা ন্যাশানাল থিয়েটারে অভিনীত হইয়াছিল। মনোরঞ্জন বাবুর রচিত বহু সঙ্গীত ও আছে। ইনি প্রখ্যাত-নামা স্বর্গীয় কালীমোহন দাশ মহাশয়ের পুত্র।

শ্রীযুক্ত রসিকলাল গুপ্ত—মধ্যপাড়া—'নব্যজাপান' ও 'মহারাজা রাজ-বল্লভের জীবন-চরিত'।

৺ রাজকিশোর দাস—কোঁয়রপুর—বিবিধপ্রবন্ধ।

শ্রীযুক্ত রেবতীমোহন সেন—মূলচর—বহু ধর্ম্মবিষয়ক সঙ্গীত।

শ্রীযুক্ত রাজকুমার সেন এম. এ.—গারুড় গাঁও—'বান্ধব' পত্রে ইঁহার ফলিত জ্যোতিষ সম্বন্ধে কয়েকটী সুন্দর নিবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল।

৺ লক্ষীকান্ত চক্রবর্ত্তী—রাউতভোগ—বিচ্ছেদ-বিলাসকাব্য।

শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—নয়না—শ্রীকৃষ্ণ-চরিত।

,, শরচ্চন্দ্র সেনগুপ্ত—পাটাভোগ—প্রেম ও ভক্তি।

৺ শ্রীনাথ ভট্টাচার্য্য—কামারখাড়া (স্বর্ণগ্রাম) এককালে 'ভারতমিহির' পত্রে ইঁহার বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। ইঁহার রচিত বহু স্কুল পাঠ্য গ্রন্থ আছে।

৺ শম্ভুনাথ দাশগুপ্ত—বিদগাঁ—'মাধব-মালতী' যাত্রার পালা।

,, শ্রীনিবাস বন্দ্যোপাধ্যায়—'খোকা বাবুর প্রসঙ্গে'। এতদ্ব্যতীত 'ভারতী', 'আরতি' 'প্রদীপ' 'অতিথি' ইত্যাদি মাসিক পত্রে ইঁহার বহু সারগর্ভ বৈজ্ঞানিক সন্দর্ভ প্রকাশিত হইয়াছিল।

৺ ষোড়শীবালা দেবী—পাটাভোগ—অমরবালা (উপন্যাস)।

৺ সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী—টঙ্গিবাড়ী—ইনি বর্ত্তমান যুগের একজন প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক। ইঁহার রচিত 'ললনা-সুহৃদ', দাম্পত্য-সুহৃদ', 'রায়-পরিবার' প্রভৃতি গ্রন্থ বাঙ্গালার ঘরে ঘরে শিক্ষিত নর-নারী কর্ত্তৃক আদৃত হইয়া আসিতেছে। ইঁহার অকাল মৃত্যু বিক্রমপুরের কেন, সমগ্র বাঙ্গালাদেশের পক্ষেই যথেষ্ট ক্ষতির কারণ হইয়াছে।

সৈয়দ এমদাদ আলী-নবনূর সম্পাদক।

শ্রীমতী সুশীলাসুন্দরী সেন—মূলচর—অশ্রু মালিকা।

,, সুরমাসুন্দরী ঘোষ—বজ্রযোগিনী-রঞ্জিনী, সঙ্গিনী ইত্যাদি গ্রন্থ-প্রণেত্রী।

শ্রীযুক্ত হরকুমার মুখোপাধ্যায়—নাগরভাগ—ইনি একজন সুকবি ও সুলেখক, বহু মাসিক পত্রাদিতে ইঁহার কবিতা ওপ্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইয়াছে।

,, হরিপ্রসন্ন দাশগুপ্ত—সোণারঙ্গ—বহুমাসিক পত্রে ইঁহার কবিতা প্রকাশিত হইয়াছে।

বিক্রমপুরের বর্ত্তমান সাহিত্য-সম্পদ আশাপ্রদ নহে। কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণ এবিষয়ে সম্পূর্ণ অমনোযোগী, ইহা নিতান্ত দুঃখের বিষয়।

সাহিত্য জাতীয় জীবনের প্রতিবিম্ব স্বরূপ। সেই সাহিত্যের সেবায় শিক্ষিত ব্যক্তিগণের মনোযোগ আকর্ষিত না হইলে ইহার উন্নতি কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে? নবীন শিক্ষা ও সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে বিক্রমপুরের বর্ত্তমান সাহিত্যও নবীন সৌন্দর্য্যে সজ্জিত হইয়া বিক্রমপুরের গৌরব বৃদ্ধি করিতে সক্ষম হইবে, ইহাই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, আমরা সে শুভদিনের প্রত্যাশায় রহিলাম।

একাদশ অধ্যায়।

বিক্রমপুরের মৃত ও জীবিত প্রখ্যাতনামা পণ্ডিতগণের নাম ও প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের সংক্ষিপ্ত জীবনী।

বিক্রমপুর চিরদিনই পাণ্ডিত্য গৌরবে গৌরবান্বিত। সুদূর অতীতের পাল ও সেন রাজাগণের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত ইহার সেই বিখ্যাত জ্ঞান-গরিমা এখনও সমানভাবে অক্ষুন্ন রহিয়াছে। কত প্রাজ্ঞ ব্যক্তি যে এস্থানে জন্মগ্রহণ করিয়া দেশ দেশান্তরে জ্ঞানালোক বিকীর্ণ করিয়াছিলেন, কে তাহার সন্ধান লইয়াছে? কাল-সাগরের তরঙ্গায়িত অশান্ত বক্ষে কত সৌরভ-গর্ব্বিত ফুল্ল-শতদলই না অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে! আমরা কি তাহা হৃদয়ে অনুভব করিয়াছি? বসন্ত-কুসুমের মত তাঁহারা ঝরিয়া গিয়াছেন, কিন্তু এখনো সে মৃদু-সৌরভ পাইতেছি। গগনের কোন্ সুদূর সীমান্তে তারার মত তাঁহারা ফুটিয়া উঠিয়াছিলেন এখনো শতাব্দীর পর শতাব্দী চলিয়া যাইতেছে; অতীতের অন্ধ তমসাচ্ছন্ন গগন হইতে তাঁহাদের ক্ষীণ-রশ্মি সুশীতল সুধা বর্ষণ করিতেছে।

পশ্চিম বঙ্গে যেমন নবদ্বীপ, জ্ঞান-বিজ্ঞানের পীঠ স্থল, পূর্ব্ববঙ্গে বিক্রমপুর সেইরূপ জ্ঞান-বিজ্ঞানের পীঠস্থানরূপে চির পরিচিত। ন্যায়-শাস্ত্র, জ্যোতিষশাস্ত্র, ব্যাকরণ, কাব্য, অলঙ্কার, বেদ, আয়ুর্ব্বেদ প্রভৃতি সমুদয়ই এস্থানে শিক্ষা দেওয়া হইত, এখনো হইয়া থাকে, কিন্তু সে পূর্ব্ব গৌরব গরিমা বহু পরিমাণে হ্রাস হইয়াছে। বিক্রমপুরের পণ্ডিত মণ্ডলীর ভারতের নানাস্থানে নিমন্ত্রণ হইত। তাঁহারা গ্রন্থ রচনায়, অধ্যয়ন অধ্যাপনায় এতদূর প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন যে, সে প্রাচীন

যুগে যখন যাতায়াত বিশেষ সুগম ছিল না, তখনও ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে ছাত্রগণ অধ্যয়নার্থ বিক্রমপুরে আগমন করিত। বিক্রমপুরের বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণ জ্যোতিষ শাস্ত্রে সুপ্রসিদ্ধ। ধামারণ, ধলছত্র ও ফতেজঙ্গপুরের বৈদিক আচার্য্য ব্রাহ্মণগণ এ বিষয়ে সর্ব্বত্র সুপরিচিত।

আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষার নিমিত্ত বিক্রমপুর নবদ্বীপ হইতেও শ্রেষ্ঠ ছিল। প্রসিদ্ধনামা পণ্ডিতগণ ছাত্রগণকে আহার, বাসস্থান ও বস্ত্রাদি দ্বারা পরিপোষণ করিয়া পুত্র নির্ব্বিশেষে শিক্ষা প্রদান করিতেন। চরক, সুশ্রুত, নিদান প্রভৃতি বহু গ্রন্থের টীকা টিপ্পনী সেই সময়ে বৈদ্য আয়ুর্ব্বেদাচার্য্যগণ ছাত্রগণের শিক্ষা বিধানার্থ রচনা করিয়াছিলেন।* বর্ত্তমান যুগে যে সমুদয় চিকিৎসকগণ খ্যাতিলাভ করিয়াছেন, তাঁহাদেরও প্রায় সকলেই বিক্রমপুরের নির্জ্জন শ্যামল-বিটপীবল্লরী সমাচ্ছন্ন পল্লী কুটীরের ক্ষুদ্র প্রাঙ্গণে বসিয়াই শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। স্বর্গীয় মহাত্মা গঙ্গাপ্রসাদ সেন, অন্নদাপ্রসাদ সেন, নীলাম্বর সেন, পীতাম্বর সেন, মহামহোপাধ্যায় দ্বারকানাথ সেন, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত বিজয়রত্ন সেন, প্রাজ্ঞ শ্রীযুক্ত দুর্গাপ্রসাদ সেন, প্রত্যেকেই বিক্রমপুরে শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। এক মহামহোপাধ্যায় দ্বারকানাথ সেন ব্যতীত আবার ইঁহাদের প্রত্যেকের মাতৃভূমিই বিক্রমপুর। আমরা এখানে মৃত ও জীবিত পণ্ডিতমণ্ডলীর একটী নামের তালিকা এবং প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ ব্যক্তিবর্গের সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশ করিলাম।†

---

* Taylor সাহেব যথার্থই লিখিয়াছেন যে "Medicine is more generally studied than astronomy, and Bickrampore claims the distinction of being the place where most of the popular medical works of the country were written. (Topography of Dacca P. 273.)

† বিক্রমপুরের পণ্ডিতমণ্ডলীর সচিত্র জীবনচরিত ও কার্য্যাবলীর পরিচয় স্বতন্ত্র গ্রন্থে প্রকাশ করিবার বাসনায় এ গ্রন্থে কেবল তাঁহাদের নামোল্লেখ করিয়াই ক্ষান্ত রহিলাম।

নাম	বাসগ্রাম
৺ আনন্দচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার	বজ্রযোগিনী।
„ প্রসন্নকুমার তর্করত্ন ৺	„
মহামহোপাধ্যায় প্রসন্নকুমার তর্কনিধি	„
শ্রীযুক্ত শশীভূষণ স্মৃতিরত্ন	„
„ অম্বিকাচরণ কৃতিরত্ন	„
৺ কমলাকান্ত সার্ব্বভৌম	কাঠাদিয়া।
„ গোলকচন্দ্র সার্ব্বভৌম	„
„ সারদাচরণ তর্কপঞ্চানন	পয়সাগাঁও।
„ পীতাম্বর বিদ্যাভূষণ	„
„ কিঙ্কর চক্রবর্ত্তী	„
„ গঙ্গাচরণ ন্যায়রত্ন	নওগাঁ।
„ কালীকান্ত শিরোমণি	„
„ কালীচরণ তর্কালঙ্কার	„
„ জগচ্চন্দ্র সার্ব্বভৌম	„
„ আনন্দচন্দ্র শিরোমণি	„
„ হরিশ্চন্দ্র তর্করত্ন	„
„ কালীচন্দ্র তর্কালঙ্কার	তারপাশা।
„ চন্দ্রকিশোর তর্কচূড়ামণি	বয়রাগাদী।
„ রামমাণিক্য বিদ্যালঙ্কার	„
„ নৃসিংহ শিরোমণি	„
„ ঈশানচন্দ্র স্মৃতিপঞ্চানন	বিদগাঁ।
„ আনন্দচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার	„
„ কালীনাথ তর্কভূষণ	„
শ্রীযুক্ত বামনদাস বিদ্যারত্ন	মাইজ দিয়া।

নাম	বাসগ্রাম
শ্রীযুক্ত কাশীকান্ত ন্যায়পঞ্চানন	তস্কর।
,, মহেশ্বর ন্যায়লঙ্কার	ধলছত্র।
,, দীননাথ বিদ্যাবাগীশ	,,
,, তারকচন্দ্র সাংখ্যসাগর	,,
,, গঙ্গাচরণ বিদ্যারত্ন	গুণগাঁও।
,, ব্রজনাথ তর্করত্ন	ইছাপুর।
,, তারিণীচরণ ন্যায়বাচস্পতি	,,
,, কাশীকান্ত ন্যায়পঞ্চানন	,,
,, গুরুনাথ তর্কবাগীশ	,,
৺ দুর্গাপ্রসাদ তর্কালঙ্কার	কাঠিয়াপাড়া।
,, হরিদাস সার্ব্বভৌম	,,
,, জগদ্বন্ধু শিরোমণি	হরপাড়া।
,,কালীচন্দ্র তর্কালঙ্কার	,,
শ্রীযুক্ত রজনীনাথ তর্কপঞ্চানন	,,
৺ ভবানীপ্রসাদ বিদ্যালঙ্কার	বাশাইল।
,, গঙ্গাচরণ তর্কবাগীশ	,,
,, দুর্গাচরণ সার্ব্বভৌম	,,
,, হরিপ্রসাদ তর্করত্ন	,,
,, হেরম্বনাথ ন্যায়রত্ন	,,
,, কৃষ্ণচন্দ্র তর্কালঙ্কার	,,
শ্রীযুক্ত অভয়াচরণ বিদ্যারত্ন।	,,
৺ কালীচরণ তর্কবাগীশ	মূলচর।
,, নন্দকুমার বিদ্যালঙ্কার	,,
শ্রীযুক্ত কাশীশচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার	,,

নাম	বাসগ্রাম
৺ মদনমোহন সার্ব্বভৌম	আরিয়ল।
শ্রীযুক্ত হরিমোহন শিরোমণি	„
৺ নীলকণ্ঠ শর্ম্মনম্	„
„ কৃষ্ণদাস ”	„
„ কৃষ্ণদেব „	„
„ উদয়রাম বিদ্যাভূষণ	কাঁচাদিয়া।
„ রামচন্দ্র সিদ্ধান্ত পঞ্চানন	„
„ রূপরাম ন্যায়বাগীশ	„
শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ ন্যায়রত্ন	বাইন খারা।
৺চন্দ্রনারায়ণ ন্যায়বাগীশ	নওগাঁ।
„ কালীশঙ্কর সিদ্ধান্তবাগীশ (ন্যায়ের ভাষ্যকার)	„
„ ঈশান চন্দ্র তর্কবাগীশ	„
„ সারদা চরণ তর্কপঞ্চানন	„
„ গঙ্গাচরণ ন্যায়রত্ন	„
„ কালীকান্ত শিরোমণি	„
„ কালীচরণ তর্কালঙ্কার	„
„ জগচ্চন্দ্র সার্ব্বভৌম	„
„ আনন্দ চন্দ্র শিরোমণি	„
„ হরিশচন্দ্র তর্করত্ন	„
„ কালীকান্ত শিরোমণি	পুড়াপাড়া।
„ নন্দকুমার বিদ্যালঙ্কার	„
„ দীননাথ ন্যায়পঞ্চানন	„
„ জগবন্ধু তর্কবাগীশ	„
„ জগচ্চন্দ্র সার্ব্বভৌম	ফুরশাইল (ফুরশালী)

নাম	বাসগ্রাম
শ্রীযুক্ত কালাচাঁদ বিদ্যালঙ্কার	,,
শ্রীযুক্ত অদ্বৈত চন্দ্র ন্যায়রত্ন	,,
মহামহোপাধ্যায় ৺রাসমোহন সার্ব্বভৌম	রজ্‌দি।
৺চন্দ্রকুমার তর্কালঙ্কার	কামারখাড়া।
,, গোলক চন্দ্র সার্ব্বভৌম	হোগ্‌লা।
,, জগদ্বন্ধু ন্যায়পঞ্চানন	মেদিনীমণ্ডল।
,, মৃত্যুঞ্জয় ন্যায়ভূষণ	,,
শ্রীযুক্ত কাশীশ্চন্দ্র বিদ্যারত্ন	,,
৺ দুর্গাচরণ তর্করত্ন	কালীপাড়া।
,, বিশ্বেশ্বর চক্রবর্ত্তী	,,
,, কাশীশ্বর তর্কালঙ্কার	,,
,, রামকানাই ন্যায় পঞ্চানন	,,
,, কাশীশ্চন্দ্র তর্কালঙ্কার	আকিয়াধল।
,, গোলকচন্দ্র সার্ব্বভৌম	চিত্রকরা।
,, অভয়াচরণ চমৎকার	অজ্ঞাত।
শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন	শ্যামসিদ্ধি।
,, রাজমোহন বিদ্যানিধি	ধামারণ।
৺গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন	,,

দক্ষিণ বিক্রমপুর।

৺চন্দ্রনারায়ণ ন্যায় পঞ্চানন	ধানুকা।
,, জগদানন্দ তর্ক বাগীশ	,,
,, রাধাকান্ত শিরোমণি	,,
,, বলরাম বাচস্পতি	,,

নাম	বাসগ্রাম
,, কৃষ্ণরাম তর্কপঞ্চানন	,,
,, হরিশ্চন্দ্র ন্যায়রত্ন	,,
শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত তর্করত্ন	,,
৺ঈষাণচন্দ্র তর্কবাগীশ	রাজনগর।
মহামহোপাধ্যায় তারিণীচরণ শিরোমণি	ভোজেশ্বর।
শ্রীযুক্ত গঙ্গাচরণ ন্যায়রত্ন	মাঞ্জিসার।
,, কালীকিশোর স্মৃতিরত্ন	কার্ত্তিকপুর।

আয়ুর্ব্বেদাচার্য্যগণ।

৺কালীদাস কবিরত্ন	সোণারঙ্গ।
শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন সেন কবীন্দ্র	,,
৺কালীশঙ্কর কবিভূষণ	পাটাভোগ।
,, কালীকুমার কবিভূষণ	বেলতলী।
,, পীতাম্বর কবিরত্ন	ঘটেশ্বর।
,, কালীপ্রসাদ কবিসাগর	ব্রাহ্মণদিয়া।
,, গৌরীনাথ সেন	খাওগাঁ।
শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসাদ দাশগুপ্ত	চুড়াইন।
৺ হরিচরণ দাশ গুপ্ত	,,
,, রাজনারায়ণ কবিরত্ন	বানারী।
,, রামদুর্লভ সেন	রাজপুর।
,, রাজকিশোর গুপ্ত	,,
,, রাজনারায়ণ কবিরত্ন	বিদগাঁ।
শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র দাস গুপ্ত কবীন্দ্র	,,
,, দ্বারকানাথ	

নাম	বাসগ্রাম
শ্রীযুক্ত হরিমোহন সেন কবীন্দ্র	বেজগাঁ।
শ্রীযুক্ত ভগবানচন্দ্র দাশগুপ্ত	বাসিরা।
৺ গঙ্গাপ্রসাদ সেন	কুমরপুর।
,, অন্নদাপ্রসাদ সেন	,,
,, নিশিকান্ত সেন	,,
শ্রীযুক্ত দুর্গাপ্রসাদ সেন	,,
৺ রামরাজা দাশগুপ্ত	,,
,, হরচন্দ্র সেন	শাওগাঁ।
,, মহিমচন্দ্র সেন	গাউপাড়া।
শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসন্ন সেন	,,
,, কৃষ্ণানন্দ সেন	ভরাকৈর।
,, ভগবানচন্দ্র সেন	,,
,, কালীকুমার সেন	বেলতলী।
মহামহোপাধ্যায় বিজয়রত্ন সেন	কামারখাড়া (স্বর্ণগ্রাম)।
শ্রীযুক্ত হরিমোহন সেন বি, এ,	আউটসাহী।
,, বরদাকান্ত সেন কবিরত্ন	মূলচর।

অতঃপর আমরা বিক্রমপুরের কতিপয় মৃত ও জীবিত কৃতী ব্যক্তির সংক্ষিপ্ত জীবনী আলোচনা করিলাম। মহজ্জীবনী চিরকালই সাধারণের পথ-প্রদর্শক, কাজেই এ আশা করা বোধ হয় অসঙ্গত নহে যে, এ সকল মহাত্মাগণের কর্ত্তব্যময় জীবনীর পুণ্য-কাহিনী পাঠকের প্রীতিপ্রদ হইবে।

স্বর্গীয় সূর্য্যকুমার গুডিভ চক্রবর্ত্তী এম, ডি।

১২৩০ সনে বিক্রমপুরস্থ কনকসার গ্রামে ডাক্তার গুডিভ চক্রবর্ত্তী জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে ইঁহার নাম সূর্য্যকুমার রাখা হইয়াছিল।

ডাক্তার গুডিভ সূর্য্যকুমার চক্রবর্ত্তী, এম, ডি।

সূর্য্যকুমারের পিতা রাধামাধব চক্রবর্ত্তী ঢাকার সদর কোর্টের উকীল ছিলেন এবং প্রথম বয়সে যথেষ্ট অর্থও উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। কিন্তু বায়ুরোগগ্রস্থ হওয়াতে তাঁহাকে অল্প কাল পরেই কার্য্য পরিত্যাগ করিতে হয়। সূর্য্যকুমারের পিতা যেরূপ অর্থোপার্জ্জন করিতেন, ব্যয়ও তদনুরূপ করিতেন, কাজেই রোগে উপার্জ্জন বন্ধ হওয়ায় যে সামান্ত টাকা সঞ্চিত ছিল, তাহা অল্পকাল মধ্যেই ফুরাইয়া গেল, কাজেই ছেলে কয়টিকে নিয়া তিনি অতি কষ্টে দিনপাত করিতে লাগিলেন।

সূর্য্যকুমারের যখন কেবল দেড় বৎসর বয়স, তখন তাঁহার মাতৃ-বিয়োগ হয়, তাঁহার বড় দুই ভাই ও একটী বোন্ ছিল। সকলের বড় ভাই জমিদারের সরকারে সামান্য বেতনে কর্ম্ম করিতেন, তিনি যাহা কিছু পাইতেন তদ্বারাই অতি কষ্টে তাঁহাদের দুটী অন্নের সংস্থান হইত। কিন্তু হায়! সংসারে লোকের শান্তি সুখ কয়দিন? সূর্য্যকুমারের যখন আট বৎসর বয়স, তখন তাঁহার পিতার মৃত্যু হইল এবং তাহার এক বৎসর পরে তাঁহার বড় ভাইর ও মৃত্যু হইল।

বড় ভাইর মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বে সূর্য্যকুমার ও তাঁহার মধ্যম ভ্রাতা, লেখাপড়া শিখিবার জন্য কুমিল্লা গিয়াছিলেন। সেখানে প্রথমে তত্রত্য গভর্মেণ্ট স্কুলের পণ্ডিত মধুসূদন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাসায় এবং তাহার পরে উক্ত বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক কালিদাস মজুমদারের বাসায় থাকিয়া গভর্মেণ্ট স্কুলে লেখাপড়া করিতেন, ঐ বাসায় তাঁহারা দুই ভাই দুই বেলা দুটী খাইতে পাইতেন, অন্যান্য খরচের জন্য বড় ভাইর নিকট হইতে কিছু কিছু সাহায্য পাইতেন। কিন্তু জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার এইরূপ মৃত্যুতে তাঁহারা বড়ই বিপদে পড়িলেন। এমন কি সে সময়ে কালিদাস মজুমদারের বাসায় থাকার সুবিধা না হওয়ায় তাঁহাদিগকে সে বাসাও ছাড়িতে হয়। এরূপ ঘোর বিপদের সময় স্বর্গীয় দীননাথ সেন মহাশয়ের পিতা গোলকনাথ মুন্সী ইঁহাদিগকে আশ্রয় দেন। এই নূতন

আশ্রয়ে দুটি ভাই খাইতে পাইতেন এবং স্কুল হইতে দুই টাকা করিয়া বৃত্তি পাইতেন, এই সামান্য টাকা দ্বারা তাঁহারা তাঁহাদের আবশ্যকীয় ব্যয় ইত্যাদি চালাইতেন।

সে সময়ে জে, আলেকজেণ্ডার নামে একজন দয়ালু সাহেব কুমিল্লার কালেক্টার ছিলেন, তিনি লেখা পড়ায় সূর্য্যকুমারের অনুরাগ দেখিয়া নিজে মাসিক পাঁচ টাকা সাহায্য দিয়া তাঁহাকে কলিকাতার হেয়ারস্কুলে পড়িবার জন্য পাঠাইয়া দেন। আজকাল যেমন এণ্ট্রান্স, এফ এ, বি এ, প্রভৃতি পরীক্ষা আছে, তখন এ সকল কিছুই ছিল না, কেবল দুইটী মাত্র পরীক্ষা ছিল,—জুনিয়ার ও সিনিয়ার স্কলারসিপ্ পরীক্ষা। সূর্য্যকুমার ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে জুনিয়ার স্কলারসিপ্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তি পাইলেন এবং মেডিকেল কালেজে ভর্ত্তি হইলেন।

এইচ গুডিভ্ সাহেব নামক একজন সহৃদয় সাহেব তখন মেডিকেল কালেজের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি সূর্য্যকুমারের পড়া শুনায় মনোযোগ ও স্বভাব চরিত্রগুণে অত্যন্ত স্নেহ ও যত্ন করিতেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে বালকের মধ্যে যে মহত্ত্বের বীজ লুক্কায়িত আছে, তাহা উপযুক্ত শিক্ষার গুণে অঙ্কুরিত হইয়া উঠিলে একদিন সুফল প্রসব করিবে।

১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে গভর্মেণ্টের বৃত্তি লইয়া সূর্য্যকুমার চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষার্থ ডাক্তার গুডিভের তত্ত্বাবধানে বিলাত গমন করেন। সূর্য্য কুমার লণ্ডনে পঁহুছিয়া কালেজে ভর্ত্তি হইলেন এবং একান্ত একাগ্রতার সহিত অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার জ্ঞান চর্চ্চার জন্য এতদূর অনুরাগ ছিল যে কলেজের ছুটীর সময় প্যারিস, ভিয়েনা, বার্লিন, হিডেলবর্গ প্রভৃতি অনেক স্থানে গমন করিয়া সেখানকার খ্যাতনামা অধ্যাপক দিগের সহিত সাক্ষাৎ ও তাঁহাদের নিকট নানা বিষয় শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন।

১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে সূর্য্যকুমার প্রশংসার সহিত ডাক্তারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। বিলাতের তৎকালীন প্রধান প্রধান অধ্যাপকগণ এক বাক্যে তাঁহার সুখ্যাতি করিয়াছিলেন। সূর্য্যকুমার প্রথমে কলিকাতা মেডিকেল কালেজের অধ্যাপক হইয়া এ দেশে আইসেন, পাঁচ বৎসর পরে বাঙ্গালা দেশের মেডিকেল সার্ভিসে (Medical service) এ চাকরী পান। তাঁহার পূর্ব্বে আর কেহই কভেন্যাণ্ট সার্ভিসে প্রবেশ করিতে পারেন নাই। এ বিষয়ে সূর্য্যকুমারই আমাদের দেশে প্রথম।

সূর্য্যকুমার বিলাতে ডাক্তার গুডিভের প্রভাবে খ্রীষ্ট ধর্ম্ম গ্রহণ করেন এবং তথায় একটী ইংরেজ রমণীর পাণি-গ্রহণ করেন।

তাঁহার পুত্র কন্যা এখন এ দেশেই বাস করিতেছেন। তাঁহার দুই পুত্র সিভিলিয়ান। একজন বঙ্গদেশে অপর জন বোম্বাই প্রদেশে গভর্মেণ্টের উচ্চ পদে নিযুক্ত আছেন। ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে সূর্য্যকুমার পর-লোক গমন করেন।

সূর্য্যকুমার একজন অতি বিচক্ষণ চিকিৎসক ছিলেন। দেশের লোক যাহাতে সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি লাভ করিতে পারে, সে বিষয়ে তাঁহার যথেষ্ট মনোযোগ ছিল। তিনি বলিতেন যে বালক ও যুবকগণের শারীরিক ও মানসিক উন্নতি সমভাবে সাধিত হইলে দেশের প্রকৃত উন্নতি হইবে।

বাল্যকাল হইতেই সূর্য্যকুমার অতি শান্ত প্রকৃতির ছিলেন, কখনও কাহারও সঙ্গে কলহ করিতেন না। দেশের প্রতি তাঁহার অচলা ভক্তি ছিল। দেশীয় লোক কিংবা কোন আত্মীয় কোন কার্য্যের জন্য তাঁহার নিকট গেলে তাহা তিনি অচিরে সম্পাদন করিতে প্রয়াস পাইতেন। তিনি যদিও আর কখনো কনকসার গ্রামে আইসেন নাই, তথাপি কনকসার গ্রামবাসী কোন লোক পাইলে দেশের সমুদয় অভাব অভিযোগ মনোযোগের সহিত শুনিতেন।

অনারেবল
স্বর্গীয় গুরুপ্রসাদ সেন এম্ এ, বি এল।

দরিদ্রের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া নিজ চেষ্টায় যাঁহারা লক্ষপতি হইয়া গিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে স্বর্গীয় মহাত্মা গুরু প্রসাদ সেন মহাশয়ের নাম বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। ইনি ১২৪৯ সনের ৮ই চৈত্র বিক্রমপুরস্থ ডোমসার নামক এক ক্ষুদ্র গ্রামে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, ইঁহার পিতা কাশীচন্দ্র সেন উচ্চবংশোদ্ভব কুলীন বৈদ্য সন্তান, গুরুপ্রসাদ বাবুর বয়স যখন এক বৎসর তখন তাঁহার পিতৃ বিয়োগ হয়। ইঁহার জননী সারদাসুন্দরী তখন নিরুপায় হইয়া কাঁচাদিয়া গ্রামে স্বীয় জ্যেষ্ঠ সহোদর রাধানাথ সেন মহাশয়ের আশ্রয় গ্রহণ করেন; এই মহীয়সী রমণী অতিশয় বুদ্ধিমতী এবং পরদুঃখকাতরা ছিলেন, গুরুপ্রসাদ বাবুর ভবিষ্যৎ জীবনে তাঁহার মাতার এ সমুদয় সদ্ গুণাবলীর প্রভাব সুন্দররূপে প্রতিফলিত হইয়াছিল। তিনি ভবিষ্যৎ জীবনে যে এতদূর উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন তাহাও তাঁহার মাতার, সুশিক্ষার গুণে। সে সময়ে বিক্রমপুরে ইংরেজী শিক্ষার প্রচলন হয় নাই। প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ গ্রামে পার্সীশিক্ষার জন্য এক একটী মক্তব ছিল। ঐ সকল মক্তবে এক একটী মুন্সীর অধীনে থাকিয়া নিকটবর্ত্তী গ্রাম সমূহের বালক বৃন্দ বাঙ্লা ও পার্সী শিক্ষা করিত। গুরুপ্রসাদ বাবুর বাল্যকালে ও এইরূপ একটী মক্তবে বিদ্যাশিক্ষার সূত্রপাত হয়। তাঁহার মাতুল রাধানাথ সেন সে সময়ে বিদ্বান ও বুদ্ধিমান বলিয়া পরিচিত ছিলেন, তিনি ময়মনসিংহের জজ আদালতে ওকালতি করিয়া যথেষ্ট অর্থোপার্জ্জন করিতেন, তাঁহার নিজের কোনও পুত্র সন্তান ছিল না। তিনি তাঁহার এই ভাগিনেয় গুরুপ্রসাদ সেন ও তাঁহার অপর ভগ্নীর গর্ভজাত সন্তান সুকবি শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ গুপ্তকে পুত্রনির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করিয়া আসিতেছিলেন, গুপ্ত মহাশয়ও

স্বর্গীয় অনারেবল গুরুপ্রসাদ সেন।

গুরুপ্রসাদ বাবুর ন্যায় শৈশবে পিতৃহীন হইয়া ইতঃপূর্ব্বে তাঁহার মাতুলের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই স্থানে উক্ত দুই মাস্‌তুতো ভ্রাতা একত্র এক পরিবারে প্রতিনিয়ত প্রতিপালিত হওয়ায় উভয়ের মধ্যে যেরূপ ভালবাসা জন্মিয়াছিল তদ্রূপ স্নেহও ভালবাসা এক মাতৃগর্ভজাত সহোদর ভ্রাতৃদ্বয়ের মধ্যেও অধিকাংশ স্থলে দৃষ্ট হয় না। দ্বারকা বাবু গুরুপ্রসাদ বাবু হইতে বয়োজ্যেষ্ঠ। ইঁহাদের মাতুল রাধানাথ সেন মহাশয় যদি ও স্বয়ং ইংরেজী বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন না, কিন্তু পারস্ত ভাষায় তাঁহার বিলক্ষণ অধিকার ছিল, তখন বঙ্গদেশে কেবল ইংরেজী বিদ্যার ক্ষীণ আভা চতুর্দ্দিকে প্রকাশ পাইতে আরম্ভ হইয়াছিল, রাধানাথ সেন মহাশয় উক্ত আলোকে ভাগিনেয় গুরুপ্রসাদকে আলোকিত করিতে কৃত সংকল্প হইলেন, গুরুপ্রসাদ মক্তব ছাড়িয়া ইংরেজী বিদ্যা অর্জ্জন করিতে যত্নবান হইলেন। ইনি বাল্যাবধি অতিশয় মেধাবী ছিলেন। যে বয়সে অন্য বালকগণ খেলিয়া বেড়ায় গুরুপ্রসাদের অধ্যয়নে একান্ত মনোযোগিতা সে সময় হইতেই পরিলক্ষিত হয়, তখন আজকাল কার মত গ্রামে গ্রামে ইংরেজী বিদ্যালয় ছিলনা, বর্ত্তমান সময়ের মত প্রতি গ্রামে ইংরেজী শিক্ষিতের সংখ্যাও দেখা যাইত না, গুরুপ্রসাদ এমন দিনে ইংরেজী শিখিতে আরম্ভ করেন, ইহার বহুপরে বিক্রমপুরে কালীপাড়ার বাবু দিগের যত্নে তাঁহাদের বাসস্থানে একটী ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল, বাবু ত্রিপুরা চরণ দাশ সেই বিদ্যালয়ের প্রথম শিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ইঁহার সুশিক্ষা গুণে বিক্রমপুরে এক যুগান্তর উপস্থিত হয়। সেই সম্বন্ধে স্বর্গীয় প্রসিদ্ধ কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের প্রবর্ত্তিত 'প্রভাকরে' যে কবিতা প্রকাশিত হইয়াছিল তাহার কয়েক পংক্তি নিয়ে উদ্ধৃত করা গেল।

'ত্রিপুরাচরণ দাস
'দিলেন সুন্দর চাষ

বেগের সে বেগ হত
মলিন কুলিন যত
গাঙ্গুলী লাঙ্গুলী হল সার।'

সে সময়ে বিক্রমপুরের মধ্যে বেগে গ্রামে কুলীন ব্রাহ্মণগণের বাসস্থান ছিল। ইঁহারাই তৎকালীন বিক্রমপুরস্থ হিন্দু সমাজের নেতা ছিলেন। কি দীন, কি ধনী, সমাজস্থ ছোট বড় সকলেরই ইঁহাদের আদেশ প্রতিপালন করিয়া চলিতে হইত। গুরুপ্রসাদ বাবুর ইংরেজী শিক্ষা স্বীয় মাতুল রাধানাথ সেন মহাশয়ের উপার্জ্জন স্থল ময়মনসিংহে আরম্ভ হয়। এই স্থান হইতেই তিনি বিশেষ পারদর্শিতার সহিত প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, ইহার পর যথাক্রমে ঢাকা কালেজ হইতে এফ্ এ পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া বিশ টাকা বৃত্তি লাভ করেন ও পরিশেষে কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কালেজ হইতে বি এ ও এম এ পরীক্ষায় ঢাকাবিভাগের সর্ব্বোচ স্থান অধিকার করেন। তাঁহার পূর্ব্বে বিক্রমপুরে কেহ বি, এ পরীক্ষায় পাশ করেন নাই। এই সময়ে তাঁহার মেধা শক্তির কথা সর্ব্বত্র এরূপ ভাবে রাষ্ট্র হইয়াছিল যে বিক্রমপুরের ভিন্ন গ্রামস্থ যে অধিবাসিবর্গ দলে দলে তাঁহাকে দেখিতে আসিত। গুরুপ্রসাদ উক্ত বাবু সর্ব্ব প্রথমে প্রেসিডেন্সী কালেজের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। পরে বি, এল পরীক্ষায় পাশ করিয়া প্রথমে কৃষ্ণ নগরে ও পরে বেহার অঞ্চলে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হইয়া বাঁকিপুর গমন করেন। গুরুপ্রসাদ বাবু চিরকালই তেজস্বী পুরুষ ছিলেন, অন্তের নিকট আপনার ব্যক্তি গত স্বাধীনতা ও স্থায় বুদ্ধি কোন দিনই বিসর্জ্জন দেন নাই। কোন এক ক্ষুদ্র কারণে পাটনার তদানীন্তন ম্যাজিষ্ট্রেটের সহিত তাঁহার মতানৈক্য হওয়ায় তিনি চিরদিন ভিক্ষা করিয়া খাইব তথাপি অপরের দাসত্ব করিবনা এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া সরকারী কার্য্য পরিত্যাগ করেন। এই ঘটনা হইতেও তাঁহার যথেষ্ট স্বাধীন চিত্ততার পরিচয়

পাওয়া যায়। তখনকার দিনে চাকুরীজীবি বাঙ্গালীর পক্ষে এইরূপ একটা উচ্চ পদের আশায় জলাঞ্জলী দেওয়া কম আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। অতঃপর তিনি বাঁকিপুরে ওকালতী ব্যবসায় আরম্ভ করেন। এই বাঁকিপুরই তাঁহার জীবনের কর্ম্মক্ষেত্র হইয়াছিল। এই বেহার অঞ্চলেই তিনি ত্রিশ বৎসরের অধিক কাল যাপন করিয়া ইহার অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়া গিয়াছেন, আইনের কুট তর্কে তাঁহার সূক্ষ্মবুদ্ধি দেখিয়া একদিকে যেমন লোকে বিস্ময়াবিষ্ট হইত, অপর দিকে তেমনি প্রত্যেক দেশ হিতকর কার্য্যে তাঁহার অক্লান্ত পরিশ্রম, চেষ্টা ও যত্ন দেখিয়া লোকে মুগ্ধ হইত। পাটনা অঞ্চলে গুরুপ্রসাদ বাবুর যাইবার পূর্ব্বে বেহারীগণ নীলকর সাহেব দিগের অত্যাচারে সর্ব্বদা জর্জ্জরিত থাকিত। তাঁহারি যত্নে নীলকর দিগের অত্যাচার একরূপ নিবারিত হয়। শুনিয়াছি রাজ পুরুষ গণের খামখেয়ালীতে বেহারীগণ অনেক সময় অন্যায়রূপে উত্যক্ত হইতেন, কিন্তু গুরুপ্রসাদ বাবুর ঐকান্তিক চেষ্টায় ও যত্নে এবং তীব্র প্রতিবাদে শীঘ্রই সে সকল প্রশমিত হয়, আজকাল তারিখে[illegible] Land holder's Association" নামে বেহার প্রদেশে পূর্ব্বে ই[illegible]াণের যে রাজনৈতিক সর্ব্ববিধ আলোচনা সভা, উহাও গুরুপ্রসাদ [illegible] বহু চেষ্টায় ও যত্নে স্থাপিত হইয়াছিল।

[illegible] তিনি আজীবন ইহার সম্পাদক থাকিয়া বেহার অঞ্চলের [illegible]হু হিতানুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন। বেহারের অভাবও অভিযোগ [illegible]নাইবার জন্য তিনি "Behar Herald" নামক ইংরেজী সংবাদ পত্র প্রতিষ্ঠাপিত করিয়া গিয়াছেন, তাহা জীবিত থাকিয়া অদ্যাপি তাঁহার গৌরব ঘোষণা করিতেছে। এখানি বেহার প্রদেশের সর্ব্ব প্রথম কাগজ। তৎপূর্ব্বে কি ইংরাজী কি হিন্দী কোন ভাষাতেই কেহ কোন সংবাদ পত্র প্রকাশ করেন নাই। গুরুপ্রসাদ বাবু যতদিন জীবিত ছিলেন গভর্ণমেণ্টের সামান্য অত্যাচার ও অবিচারে তিনি

এরূপ তাব্র প্রতিবাদ করিয়া উহাতে প্রবন্ধাদি লিখিতেন যে গভমে'ণ্টও বিচলিত না হইয়া থাকিতে পারিতেন না।

কেবল রাজনৈতিক আন্দোলনেই তাঁহার জীবন অতিবাহিত হয় নাই, সর্ব্ব বিষয়েই তাঁহার সূক্ষ্ম দৃষ্টি প্রধাবিত হইত। বেহার প্রদেশে সুশিক্ষার অভাব দেখিয়া তাঁহার প্রাণ ব্যথিত হইয়াছিল। তিনি সেই স্থানে এক বিদ্যালয় স্থাপিত করেন। সেই বিদ্যালয়ের পরিচালনার ভার পরিশেষে কোনও সুযোগ্য ব্যক্তির হস্তে অর্পণ করেন ও উহা পরিশেষে বর্ত্তমান T. K. Ghosh's Academyর সহিত মিলিত হয়। দীন দরিদ্রের জন্য গুরু প্রসাদ বাবুর হৃদয় বথার্থই কাঁদিত, তিনি বহু গরিবের সন্তানকে প্রতিপালন ও নিজের ব্যয়ে নিজের বাসাতে রাখিয়া বহুশিক্ষার্থীর শিক্ষার সমুদয় ব্যয়ভার বহন করিয়াছেন। চিরকাল বেহার প্রবাসে জীবনাতিবাহিত করিয়াও তিনি শস্য শ্যামলা বঙ্গ জননীর স্নেহ বিস্মৃত হন নাই। দূরে রহিয়াও মাতৃভূমির সর্ব্ববিধ আন্দোলনেও হিতানুষ্ঠানে যোগদান করিতেন। পূর্ব্ব বঙ্গ হইতে গুরুপ্রসাদ বাবু এক বার লাটের আইন সভার সদস্য হইয়াছিলেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি সুবিধা বিক্রমপুরস্থ কাঁচাদিয়া গ্রামে গুরুপ্রসাদ বাবুর মাতুলালয় ছিল সহজও গ্রাম পদ্মার কুক্ষিগত হইলে পর কাচাদিয়া গ্রামবাসিগণ কামারখাড়া নামক গ্রামে আসিয়া স্ব স্ব বাসস্থান নির্ম্মাণ করেন। গুরুপ্রসাদ বাবুও সেই সঙ্গে কামারখাড়া বাস বাটী নির্ম্মাণ করেন। গুরুপ্রসাদ বাবু এক সময়ে সরল বিশ্বাসী ব্রাহ্ম ছিলেন, এমন কি উক্ত ধর্ম্মে দীক্ষিত পর্য্যন্ত হইয়া ছিলেন। সময়ে তাঁহার সে মত কতকাংশে পরিবর্ত্তিত হইলেও তিনি হিন্দু সমাজের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ ছিলেন না। সমাজের মঙ্গল জনক কোন কার্য্য সম্পাদনেই তিনি ভীত হইতেন না, গুরুপ্রসাদ বাবু শিক্ষার নিমিত্ত তাঁহার পুত্রও জামাতৃবৃন্দকে ইংলণ্ডে প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং নিজেও প্রাচীন বয়সে ভ্রমণোদ্দেশ্যে তথায়

গমন করেন। ইংরাজী ভাষায় যদিও তিনি কয়েক খানা পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন, তথাপি বাঙ্‌লা সাহিত্যের প্রতি তাঁহার ঔদাসীন্য ছিল না। সেকালের সুবিখ্যাত 'সোমপ্রকাশ' পত্রে তিনি যে সকল প্রবন্ধাদি লিখিয়া গিয়াছেন, তাহাই ইহার উৎকৃষ্ট প্রমাণ।

১৩০৭ সালের ২৮শে আশ্বিন বাঁকিপুরে এই মহাপুরুষের দেহান্ত হয়।

সাধু কালীকান্ত চক্রবর্ত্তী।

ফুল যেমন আপনার সৌরভে সকলকে মোহিত করিয়া সহসা আপনার অস্তিত্ব হারাইয়া ফেলে, তেমনি বিক্রমপুরে একদিন যে সমুদয় মহাত্মাগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, আমাদের অসাবধানতায় তাঁহাদের অনেকের পুণ্য-জীবন-কাহিনীই অখ্যাত অজ্ঞাত রহিয়া লুপ্ত হইয়া যাইতেছে। শীর্ষোক্ত মহাত্মা ও তাঁহাদেরই একজন। বর্ত্তমান যুগে এইরূপ চরিত্রবান্ মহাত্মা অতি অল্পই দেখিতেই পাই, কিন্তু দুঃখের বিষয় আমরা তাঁহার বিষয় কিছুই জানিনা। ১২২০ সনের ১৪ই আশ্বিন কোন বিক্রমপুরান্তঃর্গত আকশা গ্রামে কালীকান্ত জন্মগ্রহণ করেন, উক্ত গ্রাম তখন ঢাকা জেলার অন্তর্গত ছিল কিন্তু এখন উহা ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত পালংথানার অধীন। কালীকান্তের পিতা রামজয় চক্রবর্ত্তী দরিদ্র ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ছিলেন, যাহা কিছু ব্রহ্মোত্তর ছিল তাহা দ্বারাই সাংসারিক ব্যয় ও চতুষ্পাঠির ব্যয় ইত্যাদি নিষ্পন্ন করিতেন। কিন্তু দেবের দুর্বিপাক এমনি যে, কালীকান্ত ভূমিষ্ঠ হইবার অব্যবহিত পরেই গৃহদাহ হইয়া গৃহস্থিত সমুদয় দ্রব্য-সামগ্রী ও দলিলাদি নষ্ট হইয়া গেল। তখন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা—দেশে সুশাসন একেবারেই ছিল না, কাজেই চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের অদৃষ্টে আর সে সকল জমি লাভের কোনও আশাই রহিল না। এইরূপে দরিদ্রতা রাক্ষসী আসিয়া তাঁহাকে গ্রাস করিলে তিনি বাধ্য হইয়াই চতুষ্পাঠির ছাত্রগণকে বিদায় দিয়া কার

ক্লেশে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। শৈশব হইতেই দারিদ্র্যের কোলে কালীকান্ত প্রতিপালিত হইতে আরম্ভ করেন। তাঁহার বাল্যশিক্ষা সে সময়কার প্রথানুযায়ী গ্রাম্য গুরু মহাশয়ের নিকট হইতেই আরম্ভ হয়। অসাধারণ অধ্যবসায় গুণে অল্পকাল মধ্যেই বাঙ্‌লা লেখা পড়া সমাপন করিয়া কিছুকাল চতুষ্পাঠিতে অধ্যয়ন করতঃ তিনি ঢাকায় আগমন করেন।

ঢাকায় তাঁহার কোনও আত্মীয় স্বজনই ছিল না—কাজেই প্রথমে ঢাকা আসিয়া তিনি অত্যন্ত কষ্টে পতিত হন, কিন্তু জগদীশ্বর চিরদিনই দরিদ্রের সহায়, শীঘ্রই তাঁহার কষ্ট দূর হইয়া গেল। সে সময়ে উত্তর বিক্রমপুরের বেতকা গ্রাম নিবাসী হরিশ্চন্দ্র বসু মহাশয় ঢাকা নগরে ডেপুটি কালেক্টর ছিলেন, ইনি দয়া দাক্ষিণ্য গুণে তৎকালে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন, বহু দরিদ্র ভদ্র সন্তান তাঁহার বাসায় থাকিয়া লেখা পড়া শিখিতেন, কালীকান্তের দুরবস্থার বিষয় জ্ঞাত হইয়া হরিশ বাবু সাদরে তাঁহাকে আপনার বাটীতে আশ্রয় দিলেন। সে আজ প্রায় ৮০ বৎসরের কথা,তখন বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় ইংরেজী লেখা পড়া শিখিবার এত সুবিধা ছিল না—এক কলিকাতা ব্যতীত অন্য কোথাও ইংরেজী শিক্ষার সহজও সুগম উপায় না থাকায় সেকালে ইংরেজী শিক্ষা একটা গৌরবের বিষয়ও ছিল। তখন রাজ কার্য্যাদি সমুদয়ই পারস্য ভাষায় সম্পাদিত হইত। ডেপুটি বাবুর বাসায় থাকিয়া তিনি অল্পকালের মধ্যেই পার্সী ও উর্দ্দু ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেন।

এ সংসারে দরিদ্রের মনের সাধ অনেক সময় মনেতেই মিলাইয়া যায়। কালীকান্তের অদৃষ্টে ও তাহাই হইল, লেখাপড়া শিখিবার শত সাধ সত্বেও তাঁহাকে দরিদ্রতার কষাঘাতে দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইতে হইল। ১২৪৪ সনে তিনি সর্ব্বপ্রথমে গভর্মেণ্ট সেটেলমেণ্ট আফিসে পাঁচ টাকা বেতনে মোহরের কার্য্যে নিযুক্ত হন, পরে নিজ সাধুতা ও কার্য্যতৎপরতা বশতঃ

অত্যল্পকাল মধ্যেই মহাফেজ ও মহাফেজ হইতে তৎকালীন ম্যাজিষ্ট্রেট এবারক্রম্বি সাহেবের অনুকম্পায় নায়েব নাজিরী ও উহা হইতে ক্রমে এক শত টাকা বেতনে প্রথম শ্রেণীর দারোগার পদে নিযুক্ত হ'ন। সে সময়ে পুলিশের অত্যাচার ও ক্ষমতা যে কত বেশী ছিল তাহা বর্ত্তমান কালের পুলিশ কর্ম্মচারীদের ব্যবহার হইতেও কতকটা অনুমান করিয়া লওয়া যায়। তখন ডেপুটি, মুন্সেফ প্রভৃতি ও ঘুষ লইতে ফিরিতেন না, কিন্তু এই মহাত্মা অত্যাচার অবিচার করা দূরে থাকুক এক পয়সা উৎকোচ ও গ্রহণ করিতেন না। হাজারে হাজারে টাকা এমন কি একবার একত্রে পঁচিশ হাজার টাকা ও ঘুষ লইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত করা হইয়াছিল কিন্তু তিনি তাহা পুরীষ বৎ পরিত্যাগ করিয়া ছিলেন। উপঢৌকন বা উৎকোচ দূরের কথা, মফস্বলে কোন বিষয়ের তদন্ত করিতে যাইতে হইলে আহার্য্য দ্রব্যাদি পর্য্যন্ত নিজ সঙ্গে করিয়া লইতেন। পাঁচ টাকা বেতনের সামান্য কার্য্য করিবার সময় ও তাঁহার প্রকৃতি যেরূপ কোমল, হৃদয় যেমন মহৎ ছিল দুইশত টাকার বেতনে উন্নীত হইয়াও তাঁহার চরিত্রের কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। দারোগা হইতে পরে তিনি ডিটেক্‌টিভের পদে উন্নীত হন তখন তাঁহার বেতন হয় ২০০৲ শত টাকা। এপদে নিযুক্ত হওয়ার পর হইতে আর তাঁহাকে পুলিশের পোষাক পরিতে হইত না তখন তিনি সরকারী কর্ম্মোপলক্ষে চোগা, চাপকান ইত্যাদি ব্যবহার করিতেন। খুনি, ডাকাতি, জাল, জুয়াচুরি প্রভৃতি গুরুতর মোকদ্দমা যাহা নিম্নস্থ কর্ম্মচারী দ্বারা নিষ্পন্ন হইত না তাহা ছাড়া সামান্য কার্য্য তাহাকে করিতে হইত না। ফকির, বৈষ্ণব, চাষা ইত্যাদির ছদ্মবেশে তিনি যে কত দুষ্কার্য্যের নিষ্পত্তি করিয়া দোষীগণকে ধৃত করতঃ কৃত-কার্য্যতার জন্য গভর্মেণ্ট হইতে ৫০৲ টাকা, কখন কখন ১০০৲ টাকা কখন বা ৫০০৲ টাকা পর্য্যন্ত পুরস্কার পাইয়াছেন। দরিদ্র ব্রাহ্মণ সন্তান কালীকান্তের এইরূপ সাধুতার কথা তখন সর্ব্বত্র রাষ্ট্র হইয়া

গিয়াছিল, এমন কি তাঁহার এই দেবতুল্য চরিত্র সম্বন্ধে ভিক্ষুকগণ পর্য্যন্ত দ্বারে দ্বারে গাহিত :—

"ধন্য কালীকান্ত, যাঁহার গুণের অন্ত
করা কিছু নাহি যায়।
যিনি হাজারে হাজারে রিস্‌ফত কতবারে
ঠেলিয়া ফেলিলেন পায়॥
দেখ, জঘন্য নগন্য আমলা কত জন
ঘুষ খেয়ে সদা কাজ করে।
বাবু পুরীষ সমান এই সব জ্ঞান
করিতেন নিরন্তরে॥
দেখ, দশমুদ্রা বেতনে কত অভাজনে
পাকা দালান গড়িতেছে।
বাবু এত মোশারায় হেরি সমুদায়
যেমনি প্রায় তেমনি আছে॥"

কালীকান্ত অত্যন্ত চরিত্রবান, পরোপকারী ও সাধু প্রকৃতির লোক ছিলেন। পর নিন্দা, পরচর্চ্চা ও পরের অমঙ্গল কখনও চিন্তা করেন নাই। নির্দ্দোষী যাহাতে খালাস পায় এবং দোষী যাহাতে দণ্ড ভোগ করে এই সদিচ্ছায় প্রণোদিত হইয়া তিনি সমুদয় কার্য্য করিতেন।

৪১ বৎসর পর্য্যন্ত গভর্মেণ্টের কার্য্যকরিয়া ১২৫৮ সনে ৬৫ বৎসর বয়সে কালীকান্ত পেন্সান গ্রহণ করেন। পেন্সান গ্রহণের অব্যবহিত পরেই তিনি কাশীধামে গমন করেন। বিশ বৎসর পর্য্যন্ত কাশী বাস করিয়া ১৩০৫ সনের ১৬ই বৈশাখ তারিখে কালীকান্ত ৮৫ বৎসর বয়সে স্বর্গধামে গমন করিয়াছেন। দুই দিবস পূর্ব্বে সামান্য জ্বর হয়, দ্বিতীয় দিবস উহা ভোগ করিয়া সন্ধ্যার সময় এ নশ্বরদেহ ত্যাগ করেন। জীবনে কালীকান্ত সুখী হইয়া যাইতে পারেন নাই, শৈশবে দরিদ্রতা,

স্বর্গীয় রজনীনাথ রায়।

পিতৃবিয়োগ, ভ্রাতৃগণের মৃত্যু, পত্নী-বিয়োগ পুত্র-বিয়োগ, দৌহিত্র-বিয়োগ, কনিষ্ঠা কন্যা ও দৌহিত্রীর অকাল বৈধব্য ইত্যাদি শোকে তিনি জর্জ্জরিত ছিলেন। কালীকান্ত গিয়াছেন—কিন্তু আজও তাঁহার নির্লোভতা ও সাধু-ব্যবহারের কথা স্মরণ করিয়া লোকে অশ্রুপাত করে। যদি অন্যান্য পুলিশ কর্ম্মচারীগণের মত উৎকোচ গ্রহণ করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিতেন, তাহা হইলে হয়ত তিনি তাঁহার এক-মাত্র পুত্র তরণীকান্তকে অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী করিয়া যাইতে পারিতেন, কিন্তু কেহ কি তাঁহার নাম ভুলেও স্মরণ করিত? কীর্ত্তিশালী সাধু-চরিত্র ব্যক্তির স্মৃতি ধরা বক্ষ হইতে কখনও অপসৃত হয়না, কালী-কান্তের জীবনী হইতেই তাহা আমরা বিশেষ বুঝিতে পারি। কালী-কান্তের একমাত্র পুত্র তরণীকান্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয় ও বঙ্গীয় সাহিত্য সমাজে সুপরিচিত,—মাঝে মাঝে 'প্রবাসী', 'নব্যভারত' ও 'বিষ্ণুপ্রিয়া' পত্রিকাতে তাঁহার লিখিত প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হয়, তরণীবাবুর তাঁহার এই সাধুচরিত্র জনকের বিস্তৃত জীবনীটি লিখিয়া প্রচার করিলে পুত্রের উপযুক্ত কর্ত্তব্য হয় নাকি?

স্বর্গীয় রজনীনাথ রায়।

রজনীনাথ বিক্রমপুরের সুসন্তান। ইনি বিক্রমপুরের অধীন গাও-দিয়া গ্রামে ১২৫৬ সালের ১লা পৌষ (ইং ১৫ই ডিসেম্বর, ১৮৪৯) জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকাল হইতেই তিনি ধীর, স্থির এবং কর্ত্তব্য পরায়ণ ছিলেন, লেখাপড়ার দিকে একাগ্রতা অতি শৈশব হইতেই তাঁহার ছিল। ঢাকা হইতে ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে এণ্ট্রান্স পাস করিয়া তিনি, অঘোরনাথ, সারদানাথ ও শ্রীনাথ প্রভৃতি বর্ত্তমান কালের প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের সহিত কলিকাতায় অধ্যয়ন করিতে আসেন। সেই পাঠ্যাবস্থায় তাঁহার হৃদয়ের

কতদূর দৃঢ়তা ছিল তাহা নিম্নোদ্ধৃত ক্ষীরোদ বাবুর লেখা হইতেই পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন। তিনি রজনীনাথ শীর্ষক "নব্যভারতে" প্রকাশিত প্রবন্ধে লিখিয়াছেন ;—"পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে পূর্ব্ববাঙ্গলার লোকের প্রতি কলিকাতা অঞ্চলের লোকের কত ঘৃণা ছিল এখন তাহা অনুভব করা যায় না, প্রতিদিন ক্লাশে যাইয়া দেখিতাম বাঙ্গালেরা আগে আসিয়া প্রথম আসন অধিকার করিয়াছে। সৎপথে যাঁহাদের আনিতে না পারি, কৌশলে তাহাদের পরাভব করার রোগ আমাদের যথেষ্ট আছে। আসনে বই রাখিয়া তাঁহারা বাহিরে যাইতেন, আমরা বই গুলি স্থানান্তর করিয়া তাঁহাদের আসন দখল করিয়া বসিয়া থাকিতাম। একদিন এই উপলক্ষে বিবাদ হয়। আমি বলিয়াছিলাম, "বাঙ্গালের প্রথম আসনে প্রয়োজন কি ? মুখস্ত করিয়া তৃতীয় বিভাগে পাশ হইলেই তাহারা কৃতার্থ।"

এই উক্তি তেজস্বী রজনীনাথের মহৎ হৃদয়ে অসহ্য হইয়াছিল—তিনি এই গ্লানি নীরবে সহ্য করিলেন না—ইহার উত্তরে গম্ভীর ভাবে বলিয়াছিলেন—' If not the first I shall be one of the first." হৃদয়ে যাহার দৃঢ়তা আছে তাহার সফলতা অনিবার্য্য। রজনীনাথ ইহার অন্যতম উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। কথায় ও কাজে তিনি এক দেখাইলেন, দুই বৎসর পর এফে পরীক্ষায় ও চারিবৎসর পরে বি-এ পরীক্ষায় তিনি প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। জননীর প্রতি ভক্তি, ঈশ্বরে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস, সর্ব্বোপরি কর্ত্তব্যপরায়ণতা তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল। তৎকালীন হেয়ার স্কুলের প্রধান শিক্ষক, সঙ্গীতপ্রিয় রজনীনাথের নিকট নিম্নলিখিত গানটি শুনিতে বড়ই ভাল বাসিতেন।

"গর্ভ্ভ হইতে যেমন ধরায় ধরা হতে পুনরায়
লয়ে স্নেহে রাখ সবে এতে কি আছে সংশয় !
এখন যেমন অতুল যতন, মরণ অন্তেও তেমন
পরকালে স্নেহকোলে রবে তব স্নমুদয়।"

এরূপ নিরহঙ্কার কর্ত্তব্যপরায়ণ বিলাসশূন্য নির্লিপ্ত জীবন অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। স্বকীয় প্রতিভাবলে অতুল সম্পত্তির অধিকারী হইয়াও তিনি কখনও গর্ব্বিত হন নাই। দরিদ্রের সন্তান—যথেষ্ট সম্পত্তি সঞ্চয় করিয়াছিলেন, কিন্তু ভোগশক্তি তাঁহার ছিল না। বন্ধু-প্রীতি তাঁহার একটা অসাধারণ গুণ ছিল। যখন দরিদ্র ছিলেন তখন পদব্রজে ছয় ক্রোশ পথ হাঁটিয়া বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন। আবার অতুল সম্পত্তির অধিকারী হইয়াও দ্বিপ্রহরের প্রখর রৌদ্রে দরিদ্র বন্ধুর দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া নিমন্ত্রণ করিতে আসিতেন। আজকালকার দিনে এইরূপ বন্ধু-প্রীতি সুদুর্লভ।

কর্ত্তব্যকেই তিনি ধর্ম্ম বিবেচনা করিতেন। শরীর অসুস্থ হওয়ায় বিদায় লইয়া শরীর শোধরাইবার জন্য স্বাস্থ্যকর স্থানে গমন করিয়াছিলেন, কিন্তু সেখানেও কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত, সেখানেও আফিসের রাশি রাশি কাগজ পত্র। গভর্মেণ্ট তাঁহার মতামত অতিশয় মূল্যবান বলিয়া বিবেচনা করিতেন। রাজভৃত্য বলিয়া তিনি কখনও গভর্মেণ্টের অনুচিত মন্তব্যের প্রতিবাদ করিতে পশ্চাৎপদ্ হন নাই। লর্ড কর্জ্জন যখন কনভোকেশনের বক্তৃতায় উপদেশ স্থলে দেশীয়দিগের নিন্দা করিয়াছিলেন তখন রজনীনাথ মৃত্যুশয্যায়; কিন্তু কর্ম্মবীর পুরুষসিংহের নিকট এ অন্যায় অসত্য মন্তব্য বড়ই হৃদয়ে বাজিল, তিনি সেই মৃত্যুশয্যায় বসিয়াও সংবাদ পত্রে সেই বক্তৃতার তীব্র প্রতিবাদ করিবার জন্য লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন। এইরূপ কর্ত্তব্যজ্ঞান ও গুরুতর শারীরিক পরিশ্রমে সহজেই তাঁহার শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িল। তাঁহার বড় ইচ্ছা ছিল যে পেন্সেন লইয়া আপনাকে দেশের ও দশের কার্য্যে নিয়োজিত করিবেন। কিন্তু হায়! নিষ্ঠুর কাল তাঁহার সেই মহৎ আশা সফল করিতে দিল না। তিনি ভগ্ন শরীরে শয্যাগতাবস্থায় সর্ব্বদাই বন্ধুবান্ধবের নিকট আক্ষেপ করিয়া বলিতেন যে "হায়! যখন জগতের কোন কার্য্য

করিতে পারিব না, তখন ভগবান্ কেন আমাকে বাঁচাইয়া রাখিলেন? বড় আশা করিয়া ছিলাম পেন্‌সান লইয়া দেশের কার্য্যে আপনাকে নিয়োজিত করিব, কিন্তু সে সকল আশা বিফল।হইল”—এই কথা বলিতে বলিতে তাঁহার নয়ন যুগলে দর দর ধারে অশ্রুবারি প্রবাহিত হইত।

সমাজ-সংস্কারে তিনি বিশেষ মনোযোগী ছিলেন। বিধবা-বিবাহ, অসবর্ণ-বিবাহ, কৌলীন্য-প্রথা রহিত করা ইত্যাদি সর্ব্ব বিষয়ে তিনি অগ্রগামী ছিলেন। এ সমুদয় ব্যাপারে হিন্দু-সমাজের নিকট গ্লানি ভাজন হইলেও তিনি যে ধর্ম্ম ও সমাজের লোক ছিলেন তাঁহার পক্ষে তাঁহার এ সমুদয় প্রথা প্রচলনের চেষ্টা নিন্দনীয় বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। স্ত্রী-শিক্ষা যাহাতে দেশে বিশেষরূপে প্রচলিত হয় এ চেষ্টা তাঁহার খুব বেশী ছিল। যখন স্বর্গীয় দুর্গামোহন দাশ মহাশয় বঙ্গ মহিলার উচ্চ শিক্ষার নিমিত্ত মিস্ আক্রেয়ডকে লইয়া বিদ্যালয় স্থাপিত করেন, রজনীনাথও তাঁহার পৃষ্ঠ পোষক ছিলেন—ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনকারীর মধ্যে তিনিও একজন। প্রেসিডেন্সী কালেজে ছেলেদের সঙ্গে মেয়েদের সমান আসনে পড়িবার অধিকার সম্বন্ধে যে দুই মহাত্মা যুদ্ধ করেন, তিনিও তাহার অন্যতম। তাঁহার কন্যাগণের মত সুশিক্ষিতা কন্যা দুর্লভ—শ্রীযুক্তা অমিয়া বানার্জ্জী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় দ্বিতীয় ও এফে পরীক্ষায় তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়াছিলেন।

দেশের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি তাঁহার চিরদিনই ছিল। বৃদ্ধা জননীর ক্রোড়দেশে মাথা রাখিয়া শৈশবের সোণার কাহিনীও দেশের কথা গল্প করিতে বড়ই ভালবাসিতেন। রজনীনাথের প্রণীত কয়েক খানা কবিতা গ্রন্থও আছে। তিনি নিজে যেমন সুশিক্ষিত ও সুপণ্ডিত ছিলেন, তাঁহার পুত্র কন্যাগণও তদ্রূপ শিক্ষিতা ও গুণবতী। তাঁহার চরিত্রের বিমলতা, হৃদয়ের উদারতা, বিশ্বাসের দৃঢ়তা, ভাবের কোমলতা, সৌজন্য ও সরলতা তাঁহাকে বন্ধুদিগের আদর্শ করিয়াছিল। তাঁহাদের

হৃদয়-পটে তাঁহার মধুর চিত্র চিরদিন উজ্জ্বল রহিবে। তাঁহাকে হারাইয়া পূর্ব্ব বাঙ্গালা একটী রত্ন হারাইয়াছে। রজনীনাথ গিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার কীর্ত্তি কি লুপ্ত হইয়াছে? তিনি কি মরিয়াছেন? কে মরে? অমরের মরণ কোথায়? তিনি আছেন, চিরদিন চিরকাল থাকিবেন—অক্ষয় যশোমণ্ডিত গৌরব নাম তাঁহার বিক্রমপুরের ঘরে ঘরে থাকিবে। হে কর্ম্মী! হে বীর! হে বিজ্ঞ! আবার দীনা মাতৃভূমির নাম উজ্জ্বল করিতে অত্যুত্তাল তরঙ্গমালা সঙ্কুলা পদ্মার তটে তোমার সাধের বিক্রমপুরে আসিও—আমরা তোমার নাম লইয়া কৃতার্থ হইব।

১৩০৯ সালের ২রা বৈশাখ (ইং ১৫ই এপ্রিল ১৯০২) ভবানীপুর রিট্রিটে বেলা ১০-৪৫ মিনিটের সময় তাঁহার দেহত্যাগ হয়।

ডাক্তার নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায়।

বিক্রমপুরের অন্তর্গত পশ্চিমপাড়া গ্রামে সন ১২৫৯ সালের ৭ই শ্রাবণ ডাক্তার নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় জন্ম গ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা কাশীকান্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সে সময়ে ঢাকা জজ আদালতের একজন লব্ধ প্রতিষ্ঠ উকীল এবং তৎকালীন ঢাকা হিন্দু সমাজের প্রধান নেতা ছিলেন। ইঁহার বিষয় স্বর্গীয় শীতলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের জীবনীতেই বিশেষরূপে লিপিবদ্ধ করিয়াছি।

নিশিকান্ত বাবু শৈশব হইতেই বিশেষ প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন। প্রবেশিকা পরীক্ষায় বৃত্তিলাভ করিয়া তিনি কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কালেজে ভর্ত্তি হন, সে সময়ে তাঁহার মন ব্রাহ্ম ধর্ম্মের দিকে আকৃষ্ট হয়, এবং দ্বিতীয় বার্ষিক পাঠ সমাপ্ত হইতে না হইতেই তিনি বিলাত যাইবার জন্য উৎসুক হইয়া পড়েন। এই সময়ে তিনি উত্তর পশ্চিমের স্থানে স্থানে বাস করিয়া প্রায় তিন বৎসর অতিবাহিত করেন। দেরাদুনে

থাকিবার সময় নিশিকান্ত হিন্দি এবং উর্দ্দু ভাষায় জ্ঞান লাভ করেন। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে বিশেষ উদ্যোগ করিয়া ঢাকা নগরে ইনি "বাল্য-বিবাহ-নিবারিণী" সভা স্থাপিত করেন, এই সভা হইতে "মহা-পাপ বাল্য বিবাহ" শীর্ষক একখানা মাসিকপত্র প্রকাশিত হইত, উক্ত কাগজ ও সভার স্থায়ী সম্পাদক নিশিবাবুর মধ্যমাগ্রজ স্বর্গীয় নবকান্ত বাবু ছিলেন। নিশিকান্তবাবু নানাস্থানে সভা করিয়া বক্তৃতা দিয়া এবং উক্ত পত্রিকায় প্রবন্ধাদি লিখিয়া সে সময়ে ঢাকা জেলায় বাল্য-বিবাহের বিরুদ্ধে ঘোরতর আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত স্বর্গীয় দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত "অবলা-বান্ধব" নামক পত্রিকাতেও ইনি প্রবন্ধাদি লিখিতেন।

২১ বৎসর বয়সে ১৮৭৩ খৃঃ অব্দে নিশিবাবু বিলাত গমন করেন। সেখানে এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়া এক বৎসর কাল লাটীন ভাষা ও চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা করিয়া ভাষাতত্ত্ব ও দর্শনাদি শিক্ষার নিমিত্ত জর্ম্মানীর সুপ্রাচীন ও সুপ্রসিদ্ধ লাইপজিক্ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন এবং তথায় প্রায় সার্দ্ধ তিন বৎসর কাল থাকিয়া জর্ম্মণ, সংস্কৃত, ভাষাতত্ত্ব, ইতিহাস, ন্যায় এবং দর্শনশাস্ত্র শিক্ষা করিয়া আট মাস ফ্রান্সদেশে রুষ ও ফরাসী ভাষা শিক্ষা করেন। নিশিবাবুর অপূর্ব্ব বিদ্যাবত্তা ও অনুসন্ধিৎসু প্রবৃত্তির আলোচনা করিলে বিস্মিত হইতে হয়। ফরাসী ভাষায় ও রুষ ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া অবশেষে দুই বৎসর কাল রুষিয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপকতা করেন, এই অধ্যাপকতা করিতে করিতেই তিনি ভাষাতত্ত্ব এবং রুষভাষা উত্তমরূপে শিক্ষা করিয়া লইয়াছিলেন। রুষিয়ার কর্ম্মত্যাগের পর নিশিবাবু পুনর্ব্বার সুইজরলণ্ডে জর্ম্মণভাষা, ভাষাতত্ত্ব, ইতিহাস, ন্যায় ও দর্শন শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। জর্ম্মণীতে সময় সময় যখন তাঁহাকে অর্থাভাবে পড়িতে হইত, তখনি তিনি কোন ভাল বিষয়ে বক্তৃতা করিয়া সে অভাব

মোচন করিতেন। ধর্ম্ম বিষয়ক বক্তৃতা করিয়া তিনি লাইপজিক নগরের ধর্ম্মান্ধ খৃষ্টানগণ কর্ত্তৃক বিরাগ ভাজন হইয়াছিলেন, সেই ধর্ম্মান্দোলনের সময়ই তাঁহার খ্যাতি বহুল পরিমাণে পণ্ডিত সমাজের মধ্যে ছড়াইয়া পড়ে। জর্ম্মনি এবং সুইজারলণ্ডের অনেক বিখ্যাত পত্রিকায় তাঁহার জর্ম্মণী ভাষায় অভিজ্ঞতা এবং বক্তৃতার সারবত্তার বিষয় প্রকাশিত হইয়াছিল। এ সময়ে রুষিয়ার শিক্ষা সচিব লাইপজিক্ নগরে আগমন করেন, তিনি নিশিকান্তের অপূর্ব্ব বিদ্যাবত্তা ও প্রতিবাদ দর্শনে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে রুষিয়ায় লইয়া যাইবার প্রস্তাব করেন, কিন্তু সে সময়ে নিশিবাবুর ফরাসী ভাষার শিক্ষা শেষ না হওয়ায় তিনি রুষ গভর্মেণ্টের ব্যয়ে ফরাসী দেশে থাকিয়া ফরাসী ভাষা শিক্ষা শেষ করেন। উক্ত ভাষা শিক্ষা শেষ হইলে নিশিবাবু সেণ্টপিটার্সবর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় ভাষা সমূহের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। কিন্তু অবশেষে নানা কারণে বাধ্য হইয়া দুই বৎসর পরে উক্ত পদ পরিত্যাগ করেন। পদত্যাগের পর জুরিক বিশ্ববিদ্যালয়ে P. H. D. উপাধি লাভের জন্য প্রবেশ করেন এবং সেই কঠিনতম পরীক্ষায় গৌরবের সহিত প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়া উপাধি ভূষণে ভূষিত হন। আমাদের দেশে পুর্ব্বে আর কেহই রুষদেশে অধ্যাপকতা কিংবা এই গৌরবজনক উপাধি লাভে সমর্থ হন নাই।

১৮৮৩ খৃঃ অব্দের ২২শে ফেব্রুয়ারী তারিখে ডাক্তার নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় দেশে প্রত্যাগমন করেন। তাঁহার প্রত্যাগমনে জাতি-ধর্ম্ম-বর্ণ-নির্ব্বিশেষে ভারতের প্রায় সমুদয় প্রজা, এমন কি রাজপুরুষগণও স্থানে স্থানে তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

নিশিকান্ত বাবু ভারতের নানাস্থানে উচ্চপদে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। তাঁহার প্রণীত নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলির খ্যাতি দেশে বিদেশে সর্ব্বত্র বিদ্যমান। বিলাতের Trubner কোম্পানী কর্ত্তৃক প্রকাশিত "The Jatras or the popular Dramas of Bengal", জুরিক

হইতে প্রকাশিত "The Indische Essays" এবং Buddhism and Christianity" ইউরোপে যথেষ্ট প্রশংসা লাভ করিয়াছে। প্রথম গ্রন্থখানি ইংরেজী হইতে জুরিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক Henne জর্ম্মণ ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিল। অপর গ্রন্থ দুইখানাও জর্ম্মণপত্রিকাসমূহ কর্ত্তৃক বিশেষরূপে প্রশংশিত হইয়াছিল।

নিশি বাবুর নিকট দেশবাসী বহু আশা করিয়াছিল, কিন্তু তাঁহাদের সে আশা এখনও পূর্ণ হয় নাই। বিক্রমপুরের দুর্ভাগ্য এই যে তাঁহার স্নেহের কোল ছাড়াইয়া তাহার বুকের দুধে পুষ্ট সন্তানগণ যখন গৌরব মণ্ডিত শিরে জগতের নিকট আপনাদের প্রকাশ করে, তখন তাঁহারা দীনা কাতরা জন্মভূমির করুণ চাহনির মর্ম্ম আর বুঝিতে চাহে না—মাকে তাহারা আর চিনে না! কিন্তু হায়! দুর্ভাগিনী জননী কি তাহাদের ভোলে? মা কি চায়? একবার শুধু উচ্চকণ্ঠে ভক্তির সহিত সন্তানের আদর ভরা ডাক শুনিতে চায় মা-মা-মা।

মুন্সী কাশীনাথ দাশ গুপ্ত।

কাশীনাথ দাশ বিক্রমপুরস্থ বিদগাঁয়ে ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবে ইনি সে কালের রীতি অনুযায়ী সংস্কৃত বাঙ্গালা ও পারস্যভাষায় শিক্ষালাভ করেন। বিক্রমপুরের হিতার্থে ইনি যেরূপ চেষ্টা, যত্ন ও অর্থব্যয় করিয়াছিলেন বর্ত্তমান সময়ে বহু শিক্ষিত ব্যক্তিও তদ্রূপ করেন না। ইনি নোয়াখালির কালেক্টরীতে মহাফেজের পদে নিযুক্ত ছিলেন, উক্ত পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া তিনি স্বকীয় সততা ও কার্য্যদক্ষতার গুণে ইংরেজ কালেক্টরগণের মনোরঞ্জন করিয়া ৫৫ বৎসর বয়সে পেন্সান লইয়া নিজ বাসগ্রামে বাস করিতে থাকেন। এই সময়ে তাঁহার সাহিত্য জীবনের সূত্রপাত হয়, তিনি বাসগ্রামে থাকিয়া 'শব্দদীপিকা,' 'পঞ্চবটীতত্ত্ব' ও

'অবলা-জ্ঞানদীপিকা' নামক গ্রন্থ প্রণয়ণ করেন। বৃদ্ধ বয়সেও তিনি যুবকের ন্যায় কর্ম্মঠ ছিলেন, একমুহূর্ত্ত সময়ও বৃথা নষ্ট করিতেন না। পরের মঙ্গলের নিমিত্ত সর্ব্বদাই তিনি প্রস্তুত থাকিতেন, তিনি বহু জ্ঞাতি কুটুম্ব ও দরিদ্রগণকে আপন আশ্রয়ে রাখিয়া প্রতিপালন করিয়াছেন এবং চাকুরীর সংস্থান ইত্যাদি করিয়াছেন।

কাশীনাথের সর্ব্বপ্রধান কীর্ত্তি গ্রাম্য পোষ্টাফিস স্থাপনের চেষ্টা ও সূচনা। বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় পূর্ব্বে পল্লীগ্রামে চিঠি ও সংবাদ পত্রাদি যাতায়াতের কোনও রূপ বন্দোবস্ত ছিল না। এই অভাব দূরীকরণার্থ মুন্সী মহাশয় থানার ডাকে চৌকিদার কিংবা ঠিকা লোক দ্বারা গ্রাম ও নগরবাসী লোকদিগের পত্রাদি প্রেরণের বন্দোবস্তের জন্য ১৮৪৪ খ্রীঃ অঃ ২রা জুন তারিখে 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রে আলোচনা করেন। ইহার ফলে ১৮৫২ খ্রীঃ অঃ গভর্মেণ্ট সাধারণের ডাকচালানের বন্দোবস্তের নিমিত্ত থানার ডাকে এবং চৌকিদার বা ঠিকা লোকের বন্দোবস্ত করেন। এই রূপে গ্রাম্য ডাকঘরের পত্তন হয়।

বিক্রমপুরের রাস্তাঘাটের অভাব দৃষ্টে তদ্দূরীকরণার্থ কাশীনাথ 'বিক্রমপুরের পথ বিষয়ক প্রস্তাব, নামক একখানা পুস্তক মুদ্রিত করিয়া তাহা বিলি করিয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ 'ঢাকা গেজেট' পত্রে ১২৭১ সনের ২৭শে কার্ত্তিক তারিখে এ গ্রন্থের বিশেষ প্রশংসা বাহির হইয়াছিল।

তদানীন্তন ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট বাবু দীনবন্ধু মৌলিক উক্ত পুস্তক পাঠ করিয়া গ্রন্থকারকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া এক চিঠি লিখেন এবং বিক্রমপুরের রাস্তাঘাটের দুর্দ্দশা ইত্যাদি বিষয়ের উল্লেখ করিয়া গভর্মেণ্টের নিকট এক রিপোর্ট প্রেরণ করেন, তাহারি ফলে তালতলা হইতে শ্রীনগর পর্য্যন্ত গভর্মেণ্টের সাহায্যে এক রাস্তা নির্ম্মিত হয়। এই আদর্শের অনুকরণে সুপ্রসিদ্ধ এসিঃ কমিশনার স্বর্গীয় অভয়াচরণ দাস মহাশয়ের বাসগ্রাম লোনসিংহ হইতে নড়িয়া পর্য্যন্ত (দক্ষিণ বিক্রমপুর) এক রাস্তা এবং

বজ্রযোগিনী নিবাসী বাবু কালীকিশোর গুহ মহাশয়ের যত্নে বজ্রযোগিনী হইতে মিরকাদিম পর্যান্ত এক রাস্তা প্রস্তুত হইয়াছিল। ইহা ছাড়া ঢাকা ছোট আদালতের ভূতপূর্ব্ব জজ বাবু অভয়কুমার দত্ত গুপ্ত মহাশয়ের চেষ্টায় জৈনসার গ্রামে এক রাস্তা তৈয়ারী হয়। দত্ত মহাশয় মুন্সী মহাশয়ের এইরূপ চেষ্টা ও উদ্যমের জন্য বিশেষ ধন্যবাদ প্রদান করিয়া চিঠি লেখেন। পথঘাট প্রভৃতির দিকে যেমন দাশ মহাশয়ের চেষ্টা ও যত্ন ছিল, তদ্রূপ সমাজের হিতের প্রতিও তাঁহার সূক্ষ্মদৃষ্টি নিপতিত হইয়াছিল। কন্যাপণের দারুণ অত্যাচারে ব্রাহ্মণকুলের সর্ব্বনাশ হইতেছে দেখিতে পাইয়া তিনি 'কন্যাপণ-বিনাশিকা' নামক একখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া বিতরণ করিয়াছিলেন। এই পুস্তক পাঠ করিলে মুন্সী মহাশয়ের শাস্ত্র জ্ঞানের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি সমাজের কল্যাণের নিমিত্ত নানা শাস্ত্র হইতে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া কন্যাপণের অবৈধতা সরল যুক্তিপূর্ণভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। ১২৬৬ সালের ২০শে আষাঢ়ের 'সংবাদভাস্কর' পত্রে উহার যথেষ্ট প্রশংসাবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল। গভর্মেণ্ট কর্ত্তৃক ইহা সাদরে গৃহীত হইয়া ইংলণ্ডস্থ পার্লিয়ামেণ্ট ও এসিয়াটিক সোসাইটির লাইব্রেরীতে রক্ষিত হইয়াছে। এ সকল গ্রন্থ ছাড়া 'হিন্দুধর্ম্ম সংমন্ত্রণা' নামক আর একখানা গ্রন্থও তিনি প্রণয়ন করিয়াছিলেন বলিয়া জানিতে পারা যায়। এখানে গ্রন্থ সকলের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করিলাম।

(১) শব্দার্থদীপিকা—ইহা একখানি আশ্চর্য্য অভিধান, ইহাতে আদি ও অন্ত বর্ণের পর্য্যায়ক্রমে শৃঙ্খলা করিয়া শব্দার্থ লিখিত হইয়াছে। যথা—

অক।	অঙ্কা।
অকর্ত্তৃক।	অঙ্গমর্দ্দক।
অখ্যাতিকারক।	অঙ্গারক।
অগণক।	অঙ্গুরীয়ক।

জষ্টিস শ্রীযুক্ত চন্দ্রমাধব ঘোষ।

সাত আট বৎসরের অক্লান্ত পরিশ্রমে এই গ্রন্থ সংগৃহীত হইয়াছিল। ৭০৪ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ শেষ হইয়াছে। 'শব্দদীপিকা' অভিধান আলোচনা করিয়া বিক্রমপুরের তৎকালীন খ্যাতনামা পণ্ডিত গঙ্গাচরণ বিদ্যারত্ন মহাশয় যে শ্লোক রচনা করিয়াছিলেন আমরা এখানে তাহা উদ্ধৃত করিলাম।

"শ্রীকাশীনাথ দাশো রচয়তি হি মুদা গুপ্ত শব্দেন যুক্তঃ,
বিদ্যোৎসাহার্থ মেকং সুমধুর রসযুতং কোষকং সম্মনোজ্ঞং।
পর্য্যায়ৈঃ শব্দ পূর্ব্বং হৃদয়গ ফলদং দীপিকাখ্যং সুধীরৈ—
রালোচ্যং পণ্ডিতাগ্রৈঃ শ্রম ইহ সকলোপ্যাদৃতশ্চেদয়ং স্যাৎ।
শ্রীগঙ্গাচরণেনাপি বিদ্যারত্নেন সম্মুদে।
বিবেচিতাতিযত্নেন আশ্চর্য্যা শব্দদীপিকা॥"

(২) পঞ্চবটীতত্ত্ব—এই পুস্তকে পরলোক, আত্মা, জন্মান্তরবাদ ইত্যাদি বিষয় আলোচিত হইয়াছে।

(৩) অবলা-জ্ঞান-দীপিকা—ইহা নারীগণের প্রতি নানাবিধ উপদেশ পরিপূর্ণ পদ্যপুস্তক। রচনা প্রাঞ্জল ও মধুর।

সাহিত্যে সমাজে ও বিবিধ দেশহিতকর কার্য্যে ব্রতী হইয়া বিবিধ সদানুষ্ঠান দ্বারা কাশীনাথ বিক্রমপুরে আপনাকে চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন। ১২৯৩ সালের বৈশাখ মাসে ৭৭ বৎস বয়সে তিনি পরলোক গমন করেন।

জাষ্টিস সার চন্দ্রমাধব ঘোষ।

জাষ্টিস চন্দ্র মাধব ঘোষ বিক্রমপুরের উজ্জ্বল রত্ন। ১৮৩৮ খৃঃ অব্দের ২৬শে ফেব্রুয়ারী মাসে ইনি নিজ বাসগ্রাম বোলঘরে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা রায়বাহাদুর দুর্গাপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়ের সুখ্যাতি সে সময়ে

পূর্ব্ববঙ্গের সর্ব্বত্র শ্রুত হইত, সুদীর্ঘকাল ডেপুটি কালেক্টরের পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া নিজ প্রতিভাবলে ইনি গভর্মেণ্টের ও স্বদেশীয় জন সমাজের প্রীতি ও শ্রদ্ধা লাভ করিয়াছিলেন। পল্লীবৃদ্ধগণ এখনও দুর্গাপ্রসাদের নাম গৌরবের সহিত উচ্চারণ করিয়া থাকে। মাননীয় চন্দ্রমাধব উপযুক্ত পিতার উপযুক্ত পুত্র। ১৮৮৫ খৃঃ অব্দে সর্ব্বপ্রথমে যখন হিন্দু কালেজ প্রেসিডেন্সি কালেজে পরিণত হয়, তাহার দুই বৎসর পরে বর্ত্তমান বিশ্ব-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইলে প্রথম বৎসর প্রেসিডেন্সি কালেজ হইতে যাঁহারা এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন, চন্দ্রমাধব তাঁহাদের অন্যতম। ক্ষুদ্র কাজের ভিতরে যেমন বৃহৎ বৃক্ষের অঙ্কুর লুকায়িত থাকে, তেমনি ইঁহার শৈশব প্রতিভা হইতেই ভবিষ্যৎ গৌরবের আভাষ পাওয়া গিয়াছিল। এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ইনি নূতন ইউনিভার্সিটি হইতে উপাধি লাভ করিবার জন্য প্রেসিডেন্সি কালেজ সংশ্লিষ্ট আইন ক্লাসে প্রবিষ্ট হইয়া ১৮৬০ খৃঃ অব্দে অতিশয় প্রশংসার সহিত আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। প্রেসিডেন্সি কালেজের তৎকালীন আইন অধ্যাপক ব্যারিষ্টার মণ্টিরো সাহেব ইঁহার সূক্ষ্ম বুদ্ধি দেখিয়া বিশেষ স্নেহ করিতেন। আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি প্রথমে বর্দ্ধমানে ওকালতী করিতে প্রবৃত্ত হন, সেখানে অল্প সময়ের মধ্যেই বিশেষ প্রতিষ্টা লাভ করিয়া ছয়মাস যাইতে না যাইতেই সরকারী উকীলের পদে নিযুক্ত হন এবং তাহার কিছুদিন পরে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ প্রাপ্ত হন, এইকার্য্য ও তাঁহার ন্যায় উৎসাহী যুবকের নিকট বিশেষ ভাল বোধ না হওয়ায় উহা পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় সদর দেওয়ানী আদালতে উকীল হইয়া অদম্য উৎসাহের সহিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন—অতঃপর সদর দেওয়ানী ও সদর নেজামত হাইকোর্টে পরিণত হইলে, চন্দ্রমাধব বাবু হাইকোর্টেও বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে থাকেন। স্বকীয় বিদ্যা, বুদ্ধিও প্রতিভা বলে হাইকোর্টে ওকালতি করিতে করিতেই প্রধান বিচারকের পদে

প্রতিষ্ঠিত হইয়া সমগ্র বাঙ্গালীর মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন। বিচারক পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ইনি যেরূপ সূক্ষ্মবুদ্ধি, পদোচিত গাম্ভীর্য্য ও পদোচিত সম্ভ্রম রক্ষায় সমর্থ হইয়াছেন, তাহা প্রত্যেক বাঙ্গালীরই গৌরবের বিষয়। হাইকোর্টের ব্রিটিস জজেরাও ইঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শনে কুণ্ঠিত হন নাই। বড় বড় ব্রিটিশ ব্যারিষ্টারেরা ইঁহার সহিত বাক্যালাপ করিবার সময় সাবধান ও সংযতবাক হইতেন। কিছুকাল প্রধানতম বিচারক পদে কার্য্য করিবার পরেই ইনি 'সার' উপাধি প্রাপ্ত হন। ইনি সুরসিক ও মিষ্ট ভাষী, পরিচিত অপরিচিত সকল ভদ্র লোকের সহিতই আলাপ করিতে কুণ্ঠিত নহেন। বাকপটুতার জন্য ইনি ভদ্রসমাজে মজলিসি লোক বলিয়া পরিচিত। সমাজ-সংস্কার বিষয়ে ও ইনি একজন অগ্রনী, কায়স্থ সভায় সভাপতিরূপে চন্দ্রমাধব সামাজিক অভিজ্ঞতা ও হিতৈষীতার যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। ইনি পেন্‌সান গ্রহণ করিয়া কলিকাতায় বাস করিলেও স্বদেশও স্বজাতিকে বিস্মৃত হ'ন নাই। নিজগ্রামে একটী দাতব্য-চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠাপিত করিয়া স্বকীয় বাসগ্রামের ও নিকটবর্ত্তী অধিবাসী বৃন্দের যথেষ্ট কল্যাণ সাধন করিয়াছেন।

ইঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ ও দেশের উন্নতি কল্পে বিশেষ মনোযোগী রহিয়াছেন, ইঁহার প্রতিষ্ঠাপিত শিল্পবিজ্ঞান সমিতির সাহায্যে দেশ দেশান্তরে শিক্ষিত যুবকগণ প্রেরিত হইয়া নানাবিধ শিল্প-কলা শিক্ষা করিয়া আসিয়া দেশের বহু কল্যাণ সাধন করিতেছে। আমরা আশা করি ইনিও পিতৃনাম উজ্জ্বল করিবেন। চন্দ্রমাধব বাবু নিজগুণে দেশ বিখ্যাত হইয়াছেন, আমরা তাঁহার আরও দীর্ঘ-জীবন এবং পারিবারিক শান্তি ও সুখ কামনা করি। তিনি যে নিজ মাতৃভূমির নামে নাসিকা কুঞ্চিত করেন না, ইহাই সুখের বিষয়।

বিজ্ঞানাচার্য্য জগদীশ চন্দ্র বসু।

আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বিক্রমপুরের স্নেহের সন্তান, বঙ্গের মুকুটমণি, ভারতের উজ্জ্বল রত্ন, জগতের দীপ্ত প্রতিভা। জগদীশচন্দ্রের জন্মভূমি বলিয়া বিক্রমপুর ধন্য, আর আমরাও ধন্য যে একই নদীর তীরে, একই সোণার দেশে আমরাও জন্ম গ্রহণ করিয়াছি, একই মাতৃভূমি তাঁহারও আমাদের।

জগদীশচন্দ্র বিক্রমপুরস্থ রাড়ীখাল গ্রামে সুপ্রাচীন বসু পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম ভগবানচন্দ্র বসু। কলিকাতা বিশ্ব বিদ্যালয় হইতে বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ইনি বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য ইংলণ্ডে গমন করেন এবং সেখান হইতে ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে কেম্ব্রিজের ও লণ্ডনের বি, এস, সি, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া দেশে প্রত্যাগমন করেন। সেখান হইতে আসিয়া বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত ইনি প্রেসিডেন্সি কালেজের বিজ্ঞান অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত আছেন। ডাক্তার বসু ভারতের কেন, সমগ্র জগতে বৈজ্ঞানিক নব সিদ্ধান্তের আবিষ্কারে ধন্য হইয়াছেন। শিক্ষক ও ছাত্রগণের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধির জন্য ইনি সতত সচেষ্ট আছেন। ইঁহার যত্ন ও চেষ্টায় প্রেসিডেন্সী কালেজের পদার্থ বিদ্যা বিষয়ক যন্ত্রাগারের দিন দিন উন্নতি সাধিত হইতেছে। ভারতবর্ষে ইঁহার ন্যায় শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক আর একজনও নাই। ১৮৯৫ খ্রীঃ অঃ ইনি এসিয়াটিক সোসাইটির গৃহে "on the Polarisation of the Electricity" শীর্ষক যে প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন, তাহা পাঠে বর্ত্তমান যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তাড়িতজ্ঞ বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত লর্ড কেলভিন্ আচার্য্য বসুর প্রবন্ধের মৌলিকতায় বিস্মিত হইয়া বিশেষ প্রশংসা করেন। বসু মহাশয়ের দ্বিতীয় সন্দর্ভ "The determination of the Indices of refretion for the Electrical Ray লর্ড রেলী কর্ত্তৃক

বিজ্ঞানাচার্য্য শ্রীযুক্ত জগদীশ চন্দ্র বসু।

বিলাতের Rayal Societyতে প্রেরিত হইয়াছিল, রয়াল সোসাইটী বসু মহাশয়কে তাঁহার আদর্শানুযায়ী কার্য্য সম্পাদনার্থ অর্থ সাহায্য করেন। অতঃপর জগদীশচন্দ্র বঙ্গীয় গভর্মেণ্টের সংস্থাপিত গবেষণা ফণ্ডের অধ্যক্ষ হন। ইহার কিছুকাল পরে ইউরোপে বিজ্ঞান চর্চ্চার নিমিত্ত ভারত গভর্মেণ্ট কর্ত্তৃক মনোনীত হইয়া সপরিবারে বিলাত যাত্রা করেন, সেখানে ব্রিটিস এসোসিয়েসনের একটী অধিবেশনে 'তাড়িত কম্পনের গুণাবলী নির্ণয়ার্থ একটী পূর্ণাঙ্গযন্ত্র', শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ ও স্বীয় নির্ম্মিত যন্ত্রের ব্যবহার করেন। তাঁহার দ্বিতীয় প্রবন্ধ The Electric Conductivity exhibited by certain polarising substances রয়াল সোসাইটীতে পঠিত হয়। গ্লাসগো নগরে প্রসিদ্ধ লর্ড কেলভিন্ কর্ত্তৃক অভ্যর্থিত হইয়া তিনি তত্রত্য Society of the Arts নামক সমিতির নিকট 'ভারতে বিজ্ঞান শিক্ষা' শীর্ষক একটী প্রবন্ধ পাঠ করিয়া ভারতে বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার স্থাপন ও বিজ্ঞানের অন্যান্য উচ্চতর বিষয়ালোচনা জন্য বৃত্তি স্থাপনও সরকারি নানা বিভাগে বৈজ্ঞানিক শিক্ষা প্রাপ্ত ব্যক্তিগণের নিয়োগ আলোচনা করিয়াছিলেন, তাঁহার এ সারগর্ভ মন্তব্য সমুদয় বিলাতের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ পত্র সমূহে প্রশংসার সহিত সমর্থিত হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত দেশে প্রত্যাগমনের সময় জর্ম্মাণী, ফ্রান্সের বহু বিশ্ব বিদ্যালয়ে ও বৈজ্ঞানিক সমিতিতে প্রবন্ধ পাঠ ও বক্তৃতা করেন। ফরাসি দেশ ও আমেরিকায় ডাক্তার বসুর যন্ত্র সমূহ ব্যবহৃত হইতেছে। কালক্রমে বৈজ্ঞানিক উন্নতির সহিত তাঁহার নির্ম্মিত তার বিহীন তার-যন্ত্র হয় ত জগতের সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধিলাভ করিবে। জগদীশচন্দ্র একান্ত সরল, শান্ত, তেজস্বী উদারচরিত্র নিরহঙ্কারী ও অমায়িক লোক। সম্প্রতি জগদীশচন্দ্র আমেরিকায় গিয়াছিলেন। সেখানকার খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক সমিতি কর্ত্তৃক তিনি বিশেষ সমাদরের সহিত গৃহীত হইয়াছেন। বাল্টিমোর, চিকাগো, উইসকোনসিস প্রভৃতি

সহরে তিনি বক্তৃতা করিয়া বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। জগদীশচন্দ্র চিকাগো সহরে গমন করিলে সেখানকার বৈজ্ঞানিক সমিতি আপনাদের সভা স্থাপিত করেন এবং তথাকার বৈজ্ঞানিক সভার সভাপতি সাধারণের নিকট বলিয়াছিলেন "এই যাঁকে আপনারা সম্মুখে দেখিতেছেন, ইনি একজন ভারতবর্ষীয়, জগতের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক। বিদ্যুৎ সম্বন্ধে ইঁহার আবিষ্কার জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। পুরাতন ভারতবর্ষ যেমন দর্শন, ধর্ম্ম ও নৈতিক বিষয়ে সমগ্র সভ্যজাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছিল, বর্ত্তমান ভারতও বিজ্ঞানে জগতের শীর্ষ স্থান অধিকার করিবে, তাহার সূচনা দেখা যাইতেছে।"

কবি রবীন্দ্রনাথের অমর ভাষায় তাঁহাকে অভিনন্দিত করিয়া আমরা আমাদের এই ক্ষুদ্র জীবনীর উপসংহার করিলাম।

তিনি সত্যই গাহিয়াছেন ;—

* * * "মোরা যবে
মত্তছিনু অতীতের অতিদূর নিষ্ফল গৌরবে,
পরবস্ত্রে, পরবাক্যে, পর ভঙ্গিমার ব্যঙ্গরূপে
কল্লোল করিতেছিনু স্ফীতকণ্ঠে ক্ষুদ্র অন্ধকূপে—
তুমি ছিলে কোন্ দূরে? আপনার স্তব্ধ ধ্যানাসন
কোথায় পাতিয়া ছিলে? সংযত গম্ভীর করি মন
ছিলে রত তপস্যার অরূপ রশ্মির অন্বেষণে
লোক লোকান্তর অন্তরালে,—যেথা পূর্ব্ব ঋষিগণে
বহুত্বের সিংহদ্বার উদ্ঘাটিয়া একের সাক্ষাতে
দাঁড়াতেন বাক্যহীন স্তম্ভিত বিস্মিত জোড় হাতে।
হে তপস্বী, ডাক তুমি সামমন্ত্রে জলদ গর্জ্জনে
"উত্তিষ্ঠত! নিবোধত!" ডাক শাস্ত্র অভিমানী জনে

স্বর্গীয় মনোমোহন ঘোষ।

পাণ্ডিত্যের পণ্ড তর্ক হ'তে! সুবৃহৎ বিশ্বতলে
ডাক মূঢ় দাম্ভিকেরে! ডেকে দাও তব শিষ্যদলে
একত্রে দাঁড়াক তারা তব হোম হুতাগ্নি ঘিরিয়া!
আরবার এ ভারতে আপনাতে আসুক ফিরিয়া।
নিষ্ঠায়, শ্রদ্ধায়, ধ্যান, বরুক সে অপ্রমত্তচিত্তে
লোভহীন দ্বন্দ্বহীন শুদ্ধ শান্ত তরুর বেদীতে।

জগদীশবাবু অবসরমত প্রায়ই স্বকীয় বাসগ্রামে আসিয়া নিজ আত্মীয় স্বজনের সহিত সাক্ষাত ও স্বীয় বাল্যক্রীড়াভূমি দর্শন করিয়া তৃপ্তিলাভ করেন। দুই তিন বৎসর হইল তিনি একবার দেশে আসিয়াছিলেন।

স্বর্গীয় মনোমোহন ঘোষ।

১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে বয়রাগাদী গ্রামে মনোমোহন জন্মগ্রহণ করেন, ইঁহার পিতার নাম ৺রামলোচন ঘোষ। রামলোচন বাবু বড় লাট লর্ড আক-লাণ্ডের সময়ে সদর-আলার পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। রামলোচন সে সময়ে একজন শিক্ষিত, উদার চরিত্র এবং সর্ব্ববিধ সংস্কারের পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের একজন বিশিষ্ট বন্ধু ছিলেন। ঢাকা কালেজ প্রতিষ্ঠাতৃবর্গের মধ্যে তিনিও অন্যতর, উক্ত কালেজের জন্য তিনি বহু অর্থও ব্যয় করিয়াছিলেন। মনোমোহনের শৈশব শিক্ষা নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরেই পরিসমাপ্ত হয়। তিনি সেখান হইতে ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কালেজে অধ্যয়নোদ্দেশে আগমন করেন, কিন্তু এদেশে অধিক দিন না থাকিয়া তদীয় পিতৃদেবের ইচ্ছানুযায়ী সিবিল সার্ব্বিস পরীক্ষা দিবার নিমিত্ত ইংলণ্ডে গমন করেন। ইঁহারাই ভারতীয় যুবকবৃন্দের নিকট সিবিল সার্ব্বিস পরীক্ষারপ্রথম পথ-প্রদর্শক। মনোমোহন বাবু উক্ত

পরীক্ষায় বিফল মনোরথ হইয়া ব্যারিষ্টার হইয়া দেশে প্রত্যাগমন করিলেন। দেশে আসিয়া প্রথম প্রথম তাঁহাকে বিশেষ কষ্ট পাইতে হইয়াছিল, কারণ কোনও ইউরোপীয় ব্যারিষ্টারই তাঁহাকে কোন বিষয়ে সাহায্য করিতে চাহিতেন না। কিন্তু প্রতিভা-আগুনকে চাপিয়া কে রাখিতে পারে? শীঘ্রই একটী বড় মোকদ্দমায় তাঁহার বক্তৃতাশক্তি, আইনে অভিজ্ঞতা, যুক্তির নিপুণতা সর্ব্বত্র রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। মনোমোহন বাবু বাদী আমীরুদ্দীনের পক্ষাবলম্বন করিয়া এরূপ সুন্দর ও সুযুক্তি পূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন যে তাহা শুনিয়া তৎকালীন জাষ্টিস নর্ম্মাণ সাহেব তাঁহার ভবিষ্যত উন্নতি সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন। বহুদর্শী ও অভিজ্ঞ বিচারপতির ভবিষ্যদ্বাণী কালে অক্ষরে অক্ষরে সত্য হইয়াছিল। কেবল কি অর্থ সঞ্চয় করিয়া ধনকুবের হইবার বাসনাই তাঁহার ছিল? তাহা নহে, তিনি দরিদ্রের বান্ধব, আর্ত্তের সহায় এবং উৎপীড়িতের একমাত্র আশার অবলম্বন ছিলেন। যেখানে ফৌজদারী মোকদ্দমার কোন আসামীকে অন্যায়রূপে নির্যাতিত হইতে দেখিতেন, সেখানেই মনোমোহন অকাট্য যুক্তি ও তর্ক সহ তাঁহার উদ্ধারার্থ প্রাণ পণ করিতেন, অর্থের জন্য ভ্রূক্ষেপ ও করিতেন না। এরূপ স্বার্থপর স্বদেশ প্রাণ মহাবীর বিক্রমপুর কেন সমগ্র বঙ্গদেশেই অতি অল্প জন্মগ্রহণ করিয়াছে। কত দরিদ্র, কত নিঃসহায় হতভাগ্যকে যে তিনি পুলিসের অত্যাচার, বিচার বিভ্রাট ও প্রাণদণ্ডের কঠিন পীড়ন হইতে রক্ষা করিয়াছেন তাহা এখনও বঙ্গের পল্লীতে পল্লীতে কুটীরে কুটীরে প্রতিনিয়ত ধ্বনিত হইয়া আসিতেছে। আমরা এখানে একটী ঘটনার উল্লেখ করিলাম, তাহা হইতেই পাঠকবর্গ তাঁহার মহানুভবতার পরিচয় পাইবেন। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে নদীয়া জেলায় মুলুকচাঁদ নামক এক ব্যক্তি হত্যাপরাধে ধৃত হইয়া পুলিস কর্ত্তৃক বিচারালয়ে নীত হয়, পুলিস অভিযোগে প্রকাশ করে যে, মুলুকচাঁদ নিজের নবম বর্ষীয়া কন্যা নেকজানকে নিজ হস্তে হত্যা করিয়াছে, পুলিসের

শিক্ষায় ও ভয়ে নেকজানের মাতা এবং সহোদরও স্বীয় পিতাকে দোষী বলিয়া সাব্যস্থ করে এবং চক্ষে তাহারা এই হত্যাকাণ্ড দর্শন করিয়াছে তাহাও বলে।

স্ত্রী ও কন্যার এইরূপ বিরুদ্ধ সাক্ষীতে বিচারক জজ সাহেব আসামীর প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রদান করেন। মনোমোহন বাবু এই মোকদ্দমার নথি পত্র পড়িয়া কিন্তু বুঝিলেন যে মুলুকচাঁদ সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ, তখন স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া তাহার পক্ষাবলম্বন করিলেন। মনোমোহনের সূক্ষ্ম বুদ্ধি প্রভাবে গুপ্ত সত্য প্রকাশ হইয়া পড়িল এবং সে হাইকোর্টের বিচারে বেকসুর খালাস পাইল। গরীব মুলুকচাঁদ যতদিন জীবিত ছিল ততদিন তাঁহার জীবনদাতাকে বৎসরে দুই একবার করিয়া কৃতজ্ঞতা স্বরূপ কিছু কিছু ফল ফুলাদি উপহার প্রদান করিত। মনোমোহন বাবু ছাত্রদিগের পরম বন্ধু ছিলেন। মণিপুরের হতভাগ্য যুবরাজ টীকেন্দ্রজিৎকে প্রাণদণ্ড হইতে রক্ষা করিবার জন্য তিনি যেরূপ আইনাভিজ্ঞতা, সুযুক্তির ও নজীর জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছিলেন তাহাতে লর্ড ল্যান্সডাউন ও তাঁহার প্রধান প্রধান অমাত্যবর্গও তাঁহার যুক্তির সারবত্তা ও আইনাভিজ্ঞতার প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। তিনি দেশের সর্ব্ববিধ হিতানুষ্ঠানেই যোগ দিতেন। জাতীয় মহাসমিতিরও তিনি একজন পরম বান্ধব ছিলেন। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার কংগ্রেসোপলক্ষে তিনি অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি পদে বরিত ছিলেন।

পুলিসের অত্যাচার, বিচারকদিগের অন্যায় বিচার প্রভৃতি তিনি একেবারেই দেখিতে পারিতেন না। তিনি শাসন ও বিচারের স্বতন্ত্র বিধান সম্বন্ধে চিন্তা করিতে করিতেই তদীয় কৃষ্ণনগরের বাস ভবনে ১৮৯৬ খৃঃ অঃ র ১০ই অক্টোবর শনিবার দিবস অকালে মানব-লীলা সংবরণ করেন।

স্বর্গীয় লালমোহন ঘোষ।

স্বর্গীয় লালমোহন ঘোষ মৃত মহাত্মা মনোমোহন ঘোষের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। ইনিও অগ্রজের ন্যায় কৃতী পুরুষ। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে ব্যারিষ্টারি পরীক্ষা দিবার জন্য বিলাতে গমন করেন এবং অল্পকাল পরেই ব্যারিষ্টার হইয়া দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। দেশে আসিবার কয়েক বৎসর পরে যাহাতে ভারতে সিবিল সার্ব্বিস পরীক্ষা গৃহীত হয় সে বিষয়ে আন্দোলন করিবার জন্য ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসান কর্ত্তৃক ইনি পুনরায় ইংলণ্ডে গমন করেন। সেখানে পালেমেণ্টের সভ্যগণ ইঁহার বক্তৃতায় মুগ্ধ হইয়াছিলেন এবং তাহার অতি অল্প কাল পরেই ভারতে ষ্টাটুটারি সিবিল সার্ব্বিস পরীক্ষা প্রচলিত হয়। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে লালমোহন ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে বোম্বাই ও কলিকাতার অধিবাসিবর্গ তাঁহাকে বিশেষ সমাদরের সহিত অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। অতঃপর যখন লর্ড রিপণের আদেশে ভারতে 'ইলবার্ট বিল' নামক রিপণের ব্যবস্থা সচিব মহাত্মা ইলবার্ট কর্ত্তৃক নূতন বিধান অর্থাৎ যে বিধানের বলে এদেশবাসী বিচারকগণ ইংরেজদিগের উপর ব্রিটিশ বিচারকদের ন্যায় বিচারাধিকার দিবার প্রস্তাব হয় তখন এদেশীয় ইংরেজগণ এই নূতন বিধানের বিরোধী হইয়া দাঁড়াইলে, লালমোহন বাবু বিলাত গমন করিয়া পার্লেমেণ্ট মহাসভার সভ্য হইবার চেষ্টা করেন, ইঁহার পক্ষে মোট ৩৫৬০ ভোট প্রদত্ত হইয়াছিল, কিন্তু পরিশেষে আইরিসদের চেষ্টায় লিবারেল সম্প্রদায়ের পরাজয় হওয়ায় ইঁহাকে বিফল মনোরথ হইতে হয়। ইংরেজী সাহিত্য ও ইতিহাসে ইঁহার অসাধারণ দখল ছিল, বঙ্গভাষার প্রতিও লালমোহন বাবুর যথেষ্ট অনুরাগ ও শ্রদ্ধা ছিল। ইনি মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রণীত 'মেঘনাদবধ' কাব্যের ইংরাজীতে যে অনুবাদ করিয়াছেন, তাহা অতিশয় মনোরম হইয়াছে। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে ইনি

স্বর্গীয় লালমোহন ঘোষ।

জাতীয় মহা সমিতির সভাপতি হইয়াছিলেন। ইংরেজী বক্তৃতায় ইনি প্রখ্যাত নামা বাগ্মী। রাজনৈতিক ইতিহাসে ইঁহার মত অসাধারণ বিজ্ঞ ব্যক্তি ভারতে অতি অল্পই আছে। লালমোহন বাবুই সর্ব্বপ্রথমে দ্বিধা ভিন্ন বঙ্গের নিরাশ অধিবাসীদিগকে স্বদেশী ও বয়কটের তূর্য্য-নিনাদে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন। লালমোহন বাঙ্গালা দেশে চিরস্মরণীয়। দীর্ঘকাল রোগ যন্ত্রণা সহ্য করিয়া বিগত ২রা আশ্বিন শনিবার (১৮ই সেপ্টেম্বর) অপরাহ্নে লালমোহন বাবু পরলোক গমন করিয়াছেন।

দাতা কালীকুমার।

দাতা কালীকুমারের গৌরবময় পুণ্যনাম পূর্ব্ববঙ্গবাসীর বিশেষ পরিচিত। এই মহাত্মা আনুমানিক ১৮২০ খ্রীঃ অঃ মুন্সীগঞ্জ মহকুমার অধীন শ্রীনগর থানার অন্তর্গত কুকুটিয়া নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। কালীকুমারের নাম হইতেই কুকুটিয়া গ্রামের খ্যাতি। ইনি মধ্যবিত্তা-বস্থাপন্ন গৃহস্থের সন্তান। শৈশবে দুঃখ ও দরিদ্রতার সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া যৌবনে স্বকীয় পৌরুষ ও অধ্যবসায়ের বলে কমলার কৃপা লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। কালীকুমার কুকুটিয়া গ্রামের দত্তোপাধিধারী কায়স্থ বংশ উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পিতামহ রামজয় দত্তের তিন পুত্র, রামলোচন, রাজকিশোরও নন্দকিশোর। কালীকুমার সর্ব্বজ্যেষ্ঠ রামলোচনের বংশধর। শৈশবে নিজের চেষ্টা ও যত্নে তিনি বাঙ্গলা ও পারস্য ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেন, বিশেষ পারস্য ভাষায় তাঁহার অসাধারণ অধিকার ছিল। প্রথম জীবনে তিনি সামান্য বেতনে ঢাকা নগরে এক বক্সীর পদে প্রতিষ্ঠিত হন। কয়েক বৎসর এই কার্য্য করিয়া আদালতের কার্য্যে অভিজ্ঞতা লাভ করতঃ সেকালের ওকালতী পরীক্ষা দিয়া তাহাতে উত্তীর্ণ হন। প্রথমে মুন্সেফের উকীল

হইয়া পরে সদর আমিনী আদালতের উকীল হইয়া ময়মনসিংহ সহরে আগমন করেন। ময়মনসিংহেই তাঁহার জীবনের উজ্জ্বলতম অংশ যাপিত হইয়াছিল। কালীকুমারের ন্যায় পরোপকারী ও দানশীল ব্যক্তি বর্ত্তমান যুগে অতি বিরল। চঞ্চলা কমলার স্নেহ-দৃষ্টিপাতে তিনি ময়মনসিংহে আসিয়া যেরূপ প্রচুর অর্থোপার্জ্জন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, তদ্রূপ নানাবিধ সৎকার্য্যে মুক্তহস্তে দান করিয়া আপনাকে অমর করিয়া গিয়াছেন। কালীকুমার মাসে সহস্রাধিক মুদ্রা অর্জ্জন করিতেন, কিন্তু এক কপর্দ্দকও সঞ্চয় করিতেন না, সমুদয়ই পরার্থে ব্যয়িত হইত। তাঁহার ব্যবসায়ের প্রতিপত্তি ও চরিত্র সম্বন্ধে ময়মনসিংহের বিজ্ঞ ও প্রাচীন উকীল স্বর্গীয় গোবিন্দ প্রসাদ বসু মহাশয় বলিয়াছিলেন যে, "কালীকুমার আদর্শ চরিত্র উকীল ছিলেন। আত্মমর্য্যাদা জ্ঞান, ধর্ম্ম ভীরুতা তাঁহার বড়ই অধিক ছিল। তিনি নিজে অসদুপায়ে অর্থ উপার্জ্জন করিতেন না তাহাই নহে, কখন জ্ঞানতঃ আচরিত অসদুপায়ের প্রশ্রয় দিতেন না। অথচ তাঁহার উপার্জ্জন বড়ই অধিক ছিল। জীবনে তিনি দুই বার মাত্র কালেক্টরী ও ফৌজদারী কাছারিতে গিয়াছিলেন, একবার এক নামজারি, অন্যবার এক হত্যাপরাধ ঘটিত ফৌজদারি মোকদ্দমা উপলক্ষে। প্রথম মোকদ্দমায় তিন সহস্র ও দ্বিতীয় মোকদ্দমায় একদিনে এক সহস্র মুদ্রা পাইয়াছিলেন। কালীকুমারের প্রতিদ্বন্দ্বী উকীল সে সময়ে ময়মনসিংহে কেহ ছিলনা। তিনি মিষ্টালাপী সদ্বক্তা ও বিচক্ষণ বুদ্ধিবৃত্তি বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা মহত্ত্ব দানশীলতায় ও অতিথি-সৎকারে। কালীকুমারের বাসায় প্রতিদিন শতাধিক লোক আহার পাইত, দরিদ্র বিদ্যার্থী এবং কর্ম্ম প্রার্থিগণ যতদিন ইচ্ছা থাকিতে পারিতেন।* কোন কোন দিন তাঁহার বাটীতে তিনশত চারিশত অতিথিও হইত কিন্তু কেহই বিফল

---

* প্রবাপ ভাদ্র ১৩০৫।

মনোরথ হইয়া ফিরিয়া যাইত না, মোটের উপর আহার বা অর্থ যিনি যে বাসনা করিয়া তাঁহার নিকট উপনীত হইতেন, তিনি তাঁহাকেই যথাশক্তি সাহায্য করিতে পশ্চাদ্‌পদ হইতেন না।

একবার এক ব্রাহ্মণ সন্তান তাঁহার নিকট কন্যা বিবাহের জন্য অর্থ সাহায্য প্রার্থী হইয়া উপস্থিত হয়। কয়েক দিবস অতীত হইল ব্রাহ্মণ কোনওরূপ সাহায্য পাইলেন না; এক দিবস ব্রাহ্মণ কহিলেন বহু দিবস অতীত হইয়াছে এখন আমার প্রার্থনা পূর্ণ করিলে দেশে যাইতে পারি। কালীকুমার বুঝিলেন যে ব্রাহ্মণকে অনেক দিন রাখা হইয়াছে, কাছারি যাইবার সময় বলিয়া গেলেন অদ্য যাহা পাইব তাহা আপনার। সে দিবস কালীকুমার অর্দ্ধ সহস্র মুদ্রা প্রাপ্ত হইলেন এবং তাহাই আনিয়া ব্রাহ্মণকে প্রদান করিলেন। তাঁহার এক পিশতুতো ভাই তাঁহার বাসায় থাকিতেন, তিনি এই দানের প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছিলেন যে 'ব্রাহ্মণের কন্যার বিবাহে যে পরিমাণে অর্থ দিলে সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারে, তাঁহাকে সে পরিমাণ অর্থ দিলেইত হইত।" মহাত্মা কালীকুমার বলিলেন, "এ টাকা আমার নহে ব্রাহ্মণের। প্রত্যহ কি আমি পাঁচ শত টাকা পাই? আজ ব্রাহ্মণের অদৃষ্টগুণে প্রাপ্ত হইয়াছি।" তিনি সকলকে বলিতেন "আমি যে দু'পয়সা পাই, সে কেবল দশজনকে দু'টি অন্ন দেই এবং এক বিন্দু সাহায্য করি বলিয়া। কালীকুমারের সহধর্ম্মিণীও তদীয় পতির ন্যায় সরল ও উদার প্রকৃতির লোক ছিলেন। সূতার কাপড় ভিন্ন তিনি অন্য কোনরূপ মূল্যবান বস্ত্রাদি পরিধান করিতেন না। একবার একজন আত্মীয় কালীকুমারের সহধর্ম্মিণীকে একখানি সুবর্ণের অলঙ্কার উপঢৌকন দেন। এ অলঙ্কার খানি তিনি প্রত্যর্পণ করিয়া বলিয়াছিলেন, গৃহে আর কাহারও এরূপ অলঙ্কার নাই, আমি কিরূপে ইহা পরিধান করিব?" এরূপ উদার পত্নী গৃহে না থাকিলে কি কালীকুমার এইরূপ দানশীল হইতে পারিতেন?

কালীকুমার ১৮৬৭খ্রীষ্টাব্দে আটচল্লিশ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন। মৃত্যুর পরে তাঁহার গৃহে এক কপর্দ্দকও সঞ্চিত ছিল না। অতিথি সৎকারে ও দানশীলতায় দাতা কালীকুমার পূর্ব্ববঙ্গে যে অক্ষয়কীর্ত্তি সঞ্চয় করিয়া গিয়াছেন তাহা অক্ষয় ও অমর। কত দরিদ্র বিদ্যার্থী, কত হতভাগ্য কর্ম্মপ্রার্থী যে তাঁহার করুণা-কণা লাভে কৃতার্থ হইয়াছে আজ কে তাহার সংখ্যা করে? তিনি সমভাবে সকলকে অন্ন বস্ত্র দিতেন, কোনও ভেদবুদ্ধি তাঁহার ছিল না। প্রতিবৎসর দুর্গোৎসবের সময় চারিপাঁচ শত লোক তাঁহার নিকট বস্ত্র পাইত। এখনও বিক্রমপুরের সর্ব্বত্র এই মহাত্মার নাম প্রতিদিন গৌরবের সহিত উচ্চারিত হইয়া থাকে।

স্বর্গীয় কালীমোহন দাশ গুপ্ত।

স্বর্গীয় কালীমোহন দাশমহাশয় প্রখ্যাত নামা কাশীশ্বর দাশগুপ্ত মহাশয়ের প্রথম সন্তান। কালীমোহন বাবু বিক্রমপুরান্তঃর্গত তেলিরবাগ গ্রামে ১৭৬০ শকাব্দার ১৭ই শ্রাবণ মঙ্গলবার জন্মগ্রহণ করেন।

তাঁহার হাতে খড়ি এবং প্রাথমিক শিক্ষা গ্রামের গুরু মহাশয়ের হস্তেই সম্পাদিত হয়, তৎপরে কলিকাতার হিন্দু কালেজ ও প্রেসিডেন্সী কালেজে শিক্ষালাভ করিয়া আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন,—আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াই বরিশাল সদর কোর্টে ওকালতী করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার পিতার মৃত্যুর পরে কালীমোহন স্বকীয় সূক্ষ্ম বুদ্ধি ও আইনাভিজ্ঞতার জন্য অল্পকাল মধ্যেই খ্যাতি লাভ করিতে সমর্থ হন। কাশীশ্বর বাবু বরিশালে গভর্মেন্টের উকীল ছিলেন, পুত্র ও পিতার ব্যবসায় অনুসরণ করিয়া তরুণ বয়সেই জনসাধারণের শ্রদ্ধালাভ করিতে সমর্থ হন। ১৮৬২ খ্রীঃ অঃ কলিকাতা-হাইকোর্টের সৃষ্টি হইলে কালী-

স্বর্গীয় কালীমোহন দাসগুপ্ত।

মোহন বাবু বরিশাল পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আগমন করেন এবং হাইকোর্টে ওকালতী করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। হাইকোর্টের বিখ্যাত জজ পরলোক গত স্যার রমেশচন্দ্র মিত্র কে, টি এবং অবসর প্রাপ্ত জজ শ্রীযুক্ত চন্দ্রমাধব ঘোষ মহাশয় তাঁহার সম সাময়িক। কালীমোহন বাবুর বক্তৃতা শক্তি এবং আইনাভিজ্ঞতা এতদূর প্রখর ছিল যে লোকে তৎকালীন প্রসিদ্ধ বিচারক ও সুবিদ্বান দ্বারকানাথ মিত্র ও অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সহিত তাঁহার তুলনা করিতে কুণ্ঠিত হইত না।

জগতে প্রতিভা কখনও অনাদৃত থাকে না। যাহার শক্তি থাকে, শত বাধা বিঘ্নের মধ্য দিয়াও একদিন না একদিন তাহার বিকাশ হয়ই হয়। কালীমোহন বাবুর প্রতিভা ও অল্পকাল মধ্যেই সমগ্র বঙ্গদেশে ব্যাপৃত হইয়া পড়িল, তাঁহার অদ্ভুত আইনাভিজ্ঞতা বঙ্গের সুদূর পল্লী প্রান্তে ও গিয়া পঁহুছিল। তাঁহার আইনাভিজ্ঞতা এত দূর রাষ্ট্র হইয়া পড়িল যে সুদুর মফস্বল হইতেও সর্ব্বদা তাঁহার আহ্বান আসিত। কালীমোহন বাবু যখন যে মোকদ্দমা গ্রহণ করিয়াছেন, প্রায় সকল গুলিতেই জয়লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। তিনি সত্যবাদী, সাহসী এবং স্বাধীন মত পোষণ করিতে ভাল বাসিতেন। দুর্ব্বলতা ও অধীনতা তাঁহার পুরুষ হৃদয়কে নিগড় বদ্ধ করিতে পারিতনা। তিনি কিরূপ যথার্থবাদী এবং স্পষ্টবক্তাছিলেন পাঠকগণ আমাদের নিম্নলিখিত ঘটনাদ্বি হইতেই তাহা উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

একবার, যখন সার ষ্টুয়ার্ট জ্যাকসন কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারাসন অলঙ্কৃত করিতেছিলেন, সে সময়ে তাঁহার নিকট একটী মোকদ্দমায় কালীমোহন বাবুর আইনের কূট তর্ক চলিতেছিল,—জজ সাহেব এক বিষয়ে বড়ই ভ্রম করিতেছিলেন—এবং তাঁহার সেই ভ্রমাত্মক উক্তিই ঠিক্ বলিয়া মানিয়া লইতে কালীমোহন বাবুকে পুনঃ পুনঃ জেদ করিতেছিলেন। তদুত্তরে কালীমোহন বাবু পুরুষোচিত দৃঢ়তার

সহিত বলিয়াছিলেন যে, "এইরূপ একটী সামান্য বিষয় যাহা প্রেসি-ডেন্সী কালেজের যে কোন আইন ক্লাসের ছাত্র বুঝিতে সক্ষম, তাহা আপনার ন্যায় হাইকোর্টের একজন বিজ্ঞ বিচারপতি বুঝিতে পারিতেছেন না!" কালীমোহন বাবুর এই উক্তিতে জজ সাহেব ক্রোধে অগ্নি শর্ম্মা হইয়া উঠিয়াছিলেন, এমনকি তাঁহাকে ওকালতনামা কাড়িয়া লইবেন এইরূপ ভীতি প্রদর্শন করিতেও কুণ্ঠিত হ'ন নাই, কিন্তু তাহাতে কালী-মোহন বাবু বিন্দুমাত্রও ভীত হ'ন নাই—পরে অন্য একজন বিচক্ষণ বিচারকের নিকট সেই প্রশ্ন লইয়া আলোচনা হইলে—কালীমোহন বাবুই জয়ী হইয়াছিলেন।

আর একটী ঘটনা হইতেও পাঠকবর্গ কালীমোহন বাবুর অসামান্য তেজস্বিতার পরিচয় পাইবেন। একবার একটী মানহানির মোকদ্দমায় তিনি একজন ভদ্রলোকের পক্ষাবলম্বন করেন, সেই ভদ্রলোককে অপর একব্যক্তি 'শূয়রকা বাচ্চা' বলিয়া গালি দিয়াছিল, ভদ্রলোক ইহাতে নিতান্ত অপমানিত বোধ করিয়া আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই মোকদ্দমার বিবরণ অবগত হইয়া বিচারক বলেন যে 'এ কিছু নয়, বাঙ্গালীদের মধ্যে 'শূয়রকা বাচ্চা' এই গালটা তেমন দোষণীয় নহে—এটা একটা সাধারণ গালি—ইহাতে আবার মানহানি কি?" কালীমোহন বাবু তদুত্তরে বলিয়াছিলেন, যদি মাননীয় জজ মহোদয়কে কেহ 'শূয়রকা বাচ্চা' বলিয়া সম্বোধন করে, তাহা হইলে কি তিনি ভাল বোধ করিবেন?"

কালীমোহন বাবু পারিবারিক জীবনে সুখী হইতে পারেন নাই। উপর্য্যুপরি শোকের আঘাতে তাঁহার হৃদয় ক্ষত বিক্ষত হইয়াছিল। তাঁহার দুই পুত্র ও এক কন্যা জন্মগ্রহণ করে, কিন্তু আজ তাঁহাদের কেহই বিদ্যমান নাই। সর্ব্বপ্রথমে তাঁহার কন্যা সুশীলাবালার অতি শৈশবেই মৃত্যু হয়, তৎপরে তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র নিহির রঞ্জন একাদশ

বর্ষ বয়সে প্রাণত্যাগ করে, সর্ব্বশেষে জ্যেষ্ঠ পুত্র মনোরঞ্জন একমাত্র কন্যা কুসুমকুমারীকে রাখিয়া ২৪ বৎসর বয়সে পিতার বক্ষে শেল নিক্ষেপ করিয়া মৃত্যু মুখে পতিত হ'ন। মনোরঞ্জন বাবুর মৃত্যুতেই তাঁহার হৃদয় ও স্বাস্থ্য উভয়ই ভগ্ন হইয়া গেল—ইঁহাদের মৃত্যুর পরে তিনি যে কয়েক বৎসর জীবিত ছিলেন, সে কয় বৎসর আপনার স্বাস্থ্যের দিকে একেবারেই দৃক্‌পাত করিতেন না।

মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দের জুবিলি দিনে তিনি পত্নী চন্দ্রমণিদেবী এবং পৌত্রী কুসুমকুমারী কে রাখিয়া পরলোক গমন করেন।

বিক্রমপুরের বহু কৃতী সন্তান যেমন উত্তর কালে খ্যাতিমান হইয়া নিজ মাতৃভূমির নাম স্মরণ করিতেও কুণ্ঠা বোধ করেন, কালীমোহন বাবু তদ্রূপ ছিলেন না। দেশবাসীর কল্যাণের জন্য তাঁহার আন্তরিক চেষ্টা ও যত্ন ছিল। গ্রামে দাতব্য ঔষধালয়, বিদ্যালয় প্রভৃতিই তাঁহার সাক্ষ্য। দাতব্য ঔষধালয়ের ব্যয়-নির্ব্বাহার্থ তিনি বিশেষরূপে তদীয় উইলের মধ্যে লিখিয়া দিয়া গিয়াছেন। যাহাতে গ্রামবাসী ছোট বড় সকলে বিনা ব্যয়ে চিকিৎসিত হইতে পারে ইহাই তাঁহার লক্ষ্য ছিল। নিজ মাতৃভূমি তেলিরবাগ তাঁহার অতি প্রিয়তম ছিল। কোনও গ্রামবাসী আসিলে তাঁহার নিকট—গ্রামের ছোট বড় সকলের কুশলা-কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া তৃপ্তি লাভ করিতেন। নিজ গ্রামের উন্নতির দিকে তাঁহার চেষ্টা ও যত্ন অত্যন্ত বেশী ছিল। তাঁহার মত বিক্রমপুরের প্রত্যেক কৃতী সন্তানগণ যদি নিজ নিজ গ্রামের উন্নতি কল্পে মনোযোগী হইতেন, তাহা হইলে বিক্রমপুরের যৌবন-শ্রী বুঝিবা আবার ফিরিয়া আসিত!

স্বর্গীয় দুর্গামোহন দাশগুপ্ত।

১২৪৮ সালে তেলিরবাগ গ্রামে ইনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বিক্রমপুরের মধ্যে এই গ্রাম একটী প্রসিদ্ধ স্থান, এখানে বহু সম্ভ্রান্ত বংশীয় ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থ জাতীয় ভদ্রলোক বাস করিয়া থাকেন। দুর্গামোহন বাবুর পিতা ৺কাশীশ্বর দাশ তৎকালে বরিশালে ওকালতী করিয়া বিশেষ খ্যাতিমান হইয়া পড়িয়াছিলেন। বর্ত্তমান সময়ে যেমন গ্রামে গ্রামে বিদ্যালয় সে সময়ে তাহা ছিল না, তখন লেখা পড়া শিখিতে হইলে বালকগণকে যথেষ্ট কষ্ট সহ্য করিতে হইত। শৈশবে মাতৃহীন হইয়া প্রথমে তিনি তাঁহার খুড়ার নিকট কালীঘাটের বাসায় থাকিয়া লেখাপড়া করিতেন, পরে বরিশালে ইংরেজী স্কুল খুলিলে তথায় আসিয়া লেখাপড়া করিতে থাকেন। শৈশব হইতেই ইনি পরদুঃখকাতর, নিরহঙ্কার ও পাঠে মনোযোগী ছিলেন। বালক দুর্গামোহন পাঠ্যাবস্থাতেও কখনও কোনও দুষ্ট বালকের সহিত মিশিতেন না। নিজের অবস্থা ভাল ছিল সেজন্য গর্ব্বিত হওয়া দূরে থাকুক বরং তিনি সে সময়ে ক্লাসের গরিব ছেলেদের সহিত মিশিতেই বেশী ভালবাসিতেন। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী দুর্গামোহন বাবুর হৃদয়ের স্বাভাবিক পরদুঃখকাতরতা সম্পর্কে যে একটী উদাহরণ দিয়াছেন, তাহা আমরা এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম ইহা হইতেই পাঠকবর্গ তদীয় চরিত্রের মহত্ব ও অকৃত্রিম বন্ধুত্বের পরিচয় পাইবেন।

তিনি লিখিয়াছেন যে "দুর্গামোহন বাবুর কালীঘাটে বাস করিবার সময় তাঁহার সমবয়স্ক বালকদিগের মধ্যে একটী গোয়ালার ছেলে ছিল, তাহার পিতা দোকান করিয়া দই ও দুগ্ধ বিক্রয় করিতেন। প্রতিদিন স্কুলের ছুটির পর দেখা যাইত, শিশু দুর্গামোহন গোয়ালার দোকানে বসিয়া আছে। এজন্য বাটীর লোকে তাঁহাকে তিরস্কার করিতেন,

স্বর্গীয় দুর্গামোহন দাসগুপ্ত।

কিন্তু তিনি সেই গোয়ালার ছেলেটিকে ভালবাসিতে ও সাহায্য করিতে ছাড়িতেন না। এ বন্ধুতা চিরদিন ছিল। শেষে তিনি হইলেন হাইকোর্টের একজন বড় উকীল, আর সেই বন্ধুটি হইলেন একটী সামান্য কুড়ি টাকা বেতনের স্কুল মাষ্টার। দুর্গামোহন বাবু বাস করিতে লাগিলেন রাজপ্রাসাদে, আর সেই গরীব স্কুল মাষ্টারটি বাস করিতে লাগিলেন একখানি গোলপাতার ঘরে। দুর্গামোহন বাবু মধ্যে মধ্যে সেই গোলপাতার ঘরে গিয়া সেই বন্ধুকে ও পরিবার পরিজনকে দেখিয়া আসিতেন। বাড়ীতে কোনও কাজকর্ম্ম হইলে সেই বন্ধুকে ও তাঁহার স্ত্রীপুত্রকে না আনিলে চলিত না।" এইরূপ প্রীতির ভাব শৈশব বন্ধুর প্রতি কয়জনে পোষণ করেন? এমন কি তাঁহার এই বাল্যবন্ধু অকালে কালগ্রাসে পতিত হইলে, যতদিন পর্য্যন্ত না তাহার নাবালক পুত্রগণ বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াছিল ততদিন পর্য্যন্ত তিনি মাসহারার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন।

বরিশাল হইতে অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তিসহ কলিকাতা আগমন করিয়া প্রেসিডেন্সী কালেজে প্রবিষ্ট হইয়া যথা সময়ে ওকালতী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বরিশালে ওকালতী করিতে আরম্ভ করেন। সেখানে অল্পকালের মধ্যেই তিনি বহু অর্থ উপার্জ্জন করিতে আরম্ভ করিলেন, যেমন অর্থোপার্জ্জন করিতেন তদ্রূপ নানা সৎকার্য্যেও তাহা ব্যয় করিতেন। পাঠ্যাবস্থাতেই তিনি ব্রাহ্ম-ধর্ম্মানুরাগী হইয়া পড়েন এবং পরিশেষে তাহাতে দীক্ষিতও হন।

দুর্গামোহন বাবু নিজে যেরূপ উদার ও মহৎ ছিলেন। তাঁহার পত্নী ব্রহ্মময়ী দেবীও তেমনি গুণবতী ও পতির সমুদয় সাধুকার্য্যের সহায়তা করিতেন। ব্রহ্মময়ীর ন্যায় উদার হৃদয়া পরদুঃখকাতরা ও দয়াবতী রমণী অতি বিরল। নানা প্রকার বিপদ ঝঞ্ঝার মধ্যেও তিনি সর্ব্বদা মধুর বাক্যে পতিকে উৎসাহিত করিতেন। যখন পণ্ডিতবর ঈশ্বর

চন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় হিন্দু বালবিধবাগণের দুঃখে ব্যথিত হইয়া বিধবা বিবাহের চেষ্টা করিতেছিলেন, তখন দুর্গামোহন বাবুও প্রাণপণে তাঁহার সহায়তা করিয়াছিলেন। এমনকি নিজে উদ্যোগী ও যত্নপরায়ণ হইয়া বহু অর্থ ব্যয়ে অনেক বিধবার বিবাহ দিয়াছিলেন এজন্য হিন্দু সমাজের নিকট তাঁহাকে যথেষ্ট গ্লানিও সহ্য করিতে হইয়াছিল।

বরিশাল হইতে পরে তিনি কলিকাতায় হাইকোর্টে ওকালতী করেন, এখানেও তাঁহার বহু পসার ও প্রতিপত্তি হইয়াছিল। স্বদেশের উন্নতি কল্পে চিরদিনই তিনি যত্নবান্ ছিলেন। স্ত্রী শিক্ষার জন্য তিনি অকাতরে অর্থব্যয় করিতেন। স্বীয় কন্যাদিগকে উচ্চশিক্ষা দিয়াছেন এবং কতকগুলি নিরাশ্রয়া বালিকাকে নিজ বাড়ীতে আনয়ন করিয়া শিক্ষা দিয়াছিলেন। মৃত্যুর সময়ে বালিকাদিগের উচ্চ শিক্ষার জন্য মাসিক বৃত্তির যে বন্দোবস্ত করিয়া গিয়াছেন, তাহা তাঁহার জীবনের এক অক্ষয় কীর্ত্তি।

একবার তিনি স্বীয় বাসগ্রাম তেলিরবাগে আসিয়া দেখিতে পাইলেন যে, বর্ষার সময় সর্ব্বসাধারণের শবদাহের বিশেষ অসুবিধা হয়, চারিদিকে জল, কাজেই মৃতব্যক্তির আত্মীয়গণের দারুণ শোক দুঃখের মধ্যে ইহা আরও গুরুতর হইয়া পড়ে; দুর্গামোহন বাবু এই অসুবিধা দূর করিবার নিমিত্ত পাকা শ্মশান নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে নিকটবর্ত্তী গ্রামবসীগণের যে কতদূর সুবিধা হইয়াছে তাহা বলাই বাহুল্য। ১৩০৪ সনে কলিকাতা মহানগরীতে ইনি মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন।

বিক্রমপুরবাসীগণ চিরদিন গৌরবের সহিত এই মহাত্মার নাম স্মরণ করিবে।

স্বর্গীয় অভয়কুমার দত্ত গুপ্ত।

জগতে অনেক প্রকার দেশহিতৈষী দেখিতে পাওয়া যায়, এক প্রকারের দেশহিতৈষী আছেন, যাঁহারা বক্তৃতার ছটায় ভারতমাতার গৌরবকাহিনী গাহিয়াই আপনাদিগকে দেশের প্রকৃত মঙ্গলকারী বলিয়া বিবেচনা করেন, প্রকৃত কর্ত্তব্য ইঁহারা চাহেন না, ইঁহাদের স্বপ্নে বক্তৃতা, চিন্তায় বক্তৃতা, কথায় বক্তৃতা, কার্য্যে কিছুই করিতে স্বীকৃত নন। আর এক প্রকারের দেশহিতৈষী আছেন তাঁহারা প্রকৃত কর্ম্মবীর, যাহাতে দেশের কল্যাণ হয়, একমাত্র তাহাই তাঁহাদের লক্ষ্য, এই শ্রেণীর লোকেরা নাম ও যশের কাঙাল নন, ইঁহাদের মূলমন্ত্র কর্ম্ম—বক্তৃতার শূন্যগর্ভ বাক্যচ্ছটাতেই কেবল ইঁহাদের শক্তি ও তেজ নিহিত থাকে না। স্বর্গীয় অভয়কুমার দত্ত গুপ্ত মহাশয়ও এই শেষোক্ত শ্রেণীর একজন ছিলেন। অভয়কুমার বাবু জৈনসার গ্রামস্থ দত্তবংশীয় রাজচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের কনিষ্ঠ সন্তান। ইনি ১৭৩৮ শকের ২৩শে ফাল্গুন বুধবার জন্ম-গ্রহণ করেন। অতি শৈশব হইতেই তাঁহার বুদ্ধি ও মেধাশক্তি একান্ত তীক্ষ্ণ ছিল। ৭ বৎসর বয়সে গুরুমহাশয়ের নিকট তৎকাল প্রচলিত বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা করিয়া পার্শী লেখাপড়া শিক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হন, কারণ তৎকালে সর্ব্বত্র পার্সী লেখাপড়া প্রচলিত ছিল এমন কি আদালতে ও পার্সী ভাষাতেই কাজকর্ম্মাদি নির্ব্বাহিত হইত। অভয় বাবু তদীয় জ্যেষ্ঠের সহায়তায় নোয়াখালী থাকিয়া তিন বৎসর অতিশয় কঠোর পরিশ্রমে পার্শীভাষা অধ্যয়ন করিয়া উক্ত ভাষাতে বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। অতঃপর এক বন্ধুর বাসায় একখানা ইংরাজী অনুবাদ পুস্তক দেখিতে পাইয়া ইংরেজী ভাষা শিক্ষা করিতে কৃতসঙ্কল্প হন এবং স্বকীয় চেষ্টা ও যত্নপ্রভাবে ইংরেজী ভাষা শিক্ষা লাভ করিতে কৃতকার্য্য হন।

ইংরেজী ভাষায় ব্যুৎপন্ন হইয়া তিনি আইন শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন এবং তৎকাল প্রচলিত মুন্‌সেফী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, প্রথমে একটিন মুন্‌সেফী পদে নিযুক্ত হন। ১৮৪২ খৃঃ অব্দের ২৯শে আগষ্ট তিনি বিচারাসনে প্রথম উপবেশন করিয়াছিলেন। তৎকালে তাঁহার বয়স ২৪ বৎসরও পূর্ণ হয় নাই। কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহার কার্য্য দৃষ্টে সন্তুষ্ট হইয়া তিন মাস যাইতে না যাইতেই তাঁহাকে স্থায়ী মুন্সেফ নিযুক্ত করেন।

অভয় বাবু সরকারী কার্য্যোপলক্ষে যখন যেখানে গমন করিয়াছেন সেখানেই স্বকীয় মহত্ত্ব ও কার্য্যনিপুণতার জন্য জনসাধারণের শ্রদ্ধা ও ভক্তিলাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। প্রত্যেক উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীই একবাক্যে তাঁহার প্রশংসা করিতেন। তৎকালে মুন্সেফদের কার্য্যপ্রণালী পরিষ্কার ছিল না, তাহাতে অনেক সময়ে অনেক অসুবিধা ভোগ করিতে হইত। এ নিমিত্ত তিনি তাহা সংশোধন করিবার প্রস্তাব করেন এবং যেরূপ প্রণালী অবলম্বন করিলে ভাল হয়, তাহার এক পাণ্ডুলিপি করিয়া পাঠান। সেই পাণ্ডুলিপিই ১৮৫২ খৃষ্টাব্দের ২৬ আইনরূপে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে।

রাজকার্য্যে তিনি যশস্বী হইয়াছিলেন এবং গভর্মেণ্টের নিকট বার বার প্রশংসিত হইয়াছিলেন বলিয়া আজ আমরা তাঁহার জীবনী লিপিবদ্ধ করিতেছি না, অভয় বাবু দেশের কল্যাণ কামনায় জীবনব্যাপী যে সাধনা করিয়াছিলেন তাহাই আমাদের একমাত্র বক্তব্য বিষয়। লোকে উচ্চপদ পাইলে দেশকে ভুলিয়া যায়, কিন্তু অভয় বাবু সে প্রকৃতির লোক ছিলেন না। কিসে বিক্রমপুরের ও বিক্রমপুরস্থ অধিবাসিগণের অবস্থার অভাব ও অভিযোগ দুর হইতে পারে, কিসে সর্ব্বত্র শিক্ষা, ধর্ম্ম, স্বাস্থ্য ও নীতির বিকাশ হয় তাহাই তাঁহার এক মাত্র লক্ষ্য ছিল। এই দেশ-হিতৈষণার নিমিত্তই বিক্রমপুরের গ্রামে গ্রামে জজ বাবুর নাম সুপরিচিত।

অভয় বাবু দেশের ও নিজ গ্রামের জন্য যাহা করিয়াছেন আমরা এখানে তাহার উল্লেখ করিয়াই তাঁহার জীবনীর উপসংহার করিব। তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা গৌরব ও জনসাধারণের কল্যাণকর কাজ, জৈনসারের দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন। ১৮৬৬ খৃঃ অঃ জৈনসারের দাতব্য চিকিৎসালয়টি (Charitable Dispensary) স্থাপিত হয়, ইহা দ্বারা নিকটবর্ত্তী গ্রামবাসিগণের যে কতদুর কল্যাণ সাধিত হইয়াছে তাহার অধিক উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। ডিস্পেন্সেরীর সাহায্যকল্পে তিনি এক হাজার টাকা মুল্যের একখানি ভূসম্পত্তি ক্রয় করিয়া দিয়া গিয়াছেন। জৈনসার হইতে যে রাস্তাটি ইছাপুর গ্রাম পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে তাহার ব্যয় নির্ব্বাহার্থেও তিনি এক হাজার টাকা দান করেন।

১৮৫৬ খৃঃ অব্দে তিনি আপনার বাটীতে একটী সাহায্যকৃত বঙ্গ বিদ্যালয় স্থাপন করেন, পরিশেষে উহা মধ্য ইংরেজীতে পরিণত হয়। ১৮৬৭ খৃঃ অব্দে অভয় বাবু নিজ বাসগ্রামে একটী পোষ্টাফিস স্থাপিত করেন। সে সময়ে বিক্রমপুরে পোষ্টাফিসের সংখ্যা অধিক ছিল না, অনেক সময়েই পত্রাদি পাইতে গোলযোগ হইত, সুতরাং উহা দ্বারা নিকটবর্ত্তী গ্রামবাসিগণের যথেষ্ট কল্যাণ সাধিত হইয়াছিল।

তাঁহার অপর মহান্ কর্ত্তব্য "পল্লী-বিজ্ঞান" নামক মাসিক পত্রের প্রচলন। অভয় বাবু যখন ঢাকার ছোট আদালতের জজরূপে (Small Cause Court Judge) উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত, তখন তাঁহারই যত্নে ও ব্যয়ে এবং জৈনসারের তৎকালিক শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু রাজমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সম্পাদকাধীনে ১২৭৩ সনের মাঘ মাস (ইং ১৮৬৭ খৃঃ অঃ জানুয়ারী মাসে) উহা প্রথমে প্রকাশিত হয়। ইহা দ্বারা দেশের যথেষ্ট কল্যাণ হইয়াছিল।

অভয় বাবু অত্যন্ত অতিথিবৎসল ছিলেন। তাঁহার বাটীতে একটী অতিথিশালা ছিল, তাহাতেও তিনি যথেষ্ট অর্থ ব্যয় করিতেন। একবার

চালের দর অত্যন্ত অধিক হওয়ায়, দরিদ্র প্রজাদিগের মধ্যে অন্নকষ্ট উপস্থিত হয়। বহুসংখ্যক লোক দলে দলে তাঁহার বাড়ীতে উপস্থিত হয়, সৌভাগ্যের বিষয় একটী লোকও বিমুখ হইয়া ফিরিয়া যায় নাই। তিনি যখন বাটীতে আসিতেন তখন বহুসংখ্যক দীন দরিদ্র অন্ধ, আতুর আগমন করিত, তিনি কাহাকেও বঞ্চিত করিতেন না। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের প্রতি ও তাঁহার যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও ভক্তি ছিল।

১২৭৭ সনের ২৬শে ভাদ্র শনিবার সন্ধ্যার অব্যবহিত পূর্ব্বে মহাত্মা অভয়কুমার দত্ত পরলোক গমন করেন।

দ্বাদশ অধ্যায়।

বিবিধ।

আমরা এ অধ্যায়ে শিক্ষা, রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্ম্ম ও সাহিত্য ইত্যাদি বিবিধ বিষয়ের অবতারণা করিলাম। ইহা হইতেই পাঠকবর্গ অতীত ও বর্ত্তমান উভয়ের তুলনা করিয়া দেখিতে পারিবেন যে কাল-চক্রের আবর্ত্তনে এ উভয়ে কত প্রভেদ। সেই ছিল এক স্বপ্নময় কুহেলিকামাখা যুগ, আর এই হইল এক কঠোর কর্ত্তব্যময় জীবন-সংগ্রামের দিন। কাল-সাগরের ঢেউয়ে অতীতের যে দিনগুলি সুখে হউক দুঃখে হউক একেবারে চিরদিনের মত গড়াইয়া পড়িয়াছে, আর কি তাহা ফিরিয়া আসিবে? বিক্রমপুরের প্রাচীন কাহিনী সত্য সত্যই স্বপ্নময়। প্রাচীন দলিল ইত্যাদি হইতে সেকালের সমাজ-চিত্র কতকটা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যায়। দেড়শত দুইশত বৎসর পূর্ব্বে কিংবা তাহা অপেক্ষাও প্রাচীন কালে বিক্রমপুরের প্রাদেশিক ভাষা, বর্ণ-জ্ঞান ও লিখিবার পদ্ধতি কিরূপ ছিল, প্রাচীন দলিল পাঠে সে সমুদয় পরিষ্কার রূপে বুঝিতে পারা যায়। আমরা এখানে কয়েকখানা দলিলের অনুলিপি প্রদান করিলাম। দলিলগুলির ভাষা ও বর্ণাশুদ্ধির কোনও রূপ সংশোধন করা গেলনা। এই দলিলগুলির মধ্যে ১নং দলিলখানি পাঠ করিলে ইহা দুইজন সাক্ষীর জবানবন্দী বলিয়াই সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। সাক্ষীদ্বয়ের বয়স যথাক্রমে ৮৮ ও ৭০ বৎসর ছিল। জবানবন্দীর

দেড়শত বৎসর পূর্ব্বের প্রাচীন দলিল ও দাসত্ব প্রথার কথা।

পার্শ্বে সাক্ষীগণের স্ব স্ব নাম স্বাক্ষরিত আছে। এই জবানবন্দী কাহার নিকট প্রদত্ত হইয়াছিল দলিল দৃষ্টে তাহা বুঝিতে পারা যায় না; কারণ দলিলে সে বিষয়ের কোনও উল্লেখ নাই। সম্ভবতঃ সাক্ষীদ্বয় আদালতে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে বয়সের আধিক্য বশতঃ মৃত্যুমুখে পতিত হন এই আশঙ্কা করিয়া বাদী তাহাদিগের জবানবন্দী গ্রহণ করিয়াছিলেন, নতুবা এই দলিলের অপর পৃষ্ঠে কতিপয় ইসাদির দস্তখত থাকার কোনও কারণ দেখা যায় না। খুব সম্ভব এই ইসাদিগণের সম্মুখেই সাক্ষীদ্বয়ের জবানবন্দী ও দস্তখত গৃহীত হইয়াছিল। এতদ্বারা বুঝা যায়, সাক্ষী মৃত্যুমুখে পতিত হইলেও তাহাদের এইরূপ জবানবন্দী তৎকালে আদালতে প্রমাণ স্বরূপ গৃহীত হইত এবং তৎকালে আদালত বর্ত্তমান যুগের আইনের 'hearing is no evidence' এই মর্ম্ম অবগত ছিলেন না, নচেৎ ২নং সাক্ষীর শুনা কথা এত যত্ন করিয়া লিপিবদ্ধ করিবার অন্য কোনও কারণ দেখা যায় না। ১নং ও ২নং দলিল দৃষ্টে দেখা যায় প্রায় ২০০ দুই শত বৎসর পূর্ব্বে বিক্রমপুরের কোন কোন স্থানে কাজীর হাঙ্গামা নামক কোনওরূপ হাঙ্গামা সংঘটিত হইয়াছিল। এই হাঙ্গামা কি? কেন হইয়াছিল? এতদিন পরে তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন, কারণ ইতিহাস ও কিম্বদন্তী উভয়ই এস্থলে নীরব। আমরা এ বিষয়ে বহু প্রাচীন ব্যক্তির নিকট অনুসন্ধান করিয়াও কোন সন্তোষজনক উত্তর পাই নাই। তবে অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া ইহা বলা যায় যে, ইহা হিন্দু মুসলমানের ঝগড়া ব্যতীত আর কিছুই নহে। হিন্দু মুসলমানের ঝগড়ার মধ্যে সাধারণতঃ ইহা দেখা যায় যে, মুসলমানগণ হিন্দুর দেবালয় ও দেবমূর্ত্তি ধ্বংস করাকেই পৌরুষ মনে করিয়া থাকে। সেকালের সোমনাথের বা বারাণসীধামের দেবমন্দির সমূহের লুণ্ঠনের কথা ছাড়িয়া দিলেও সেদিনকার জামালপুরের বাসন্তীমূর্ত্তির ধ্বংসের কথা আমাদের উক্তির

প্রমাণ দিয়া থাকে। এস্থলেও মুসলমানগণের ভয়ে দুর্ব্বল ধর্ম্মপ্রাণ বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের স্বীয় বিগ্রহমূর্ত্তি লইয়া নিজ পৈত্রিক বাসগ্রাম পরিত্যাগ করিবার এবং বিগ্রহমূর্ত্তি পুষ্করিণীর জলের মধ্যে নিমজ্জিত রাখিবার প্রমাণ পাওয়া যায়।

সেকালের মানুষের সরলতা, উদারতা ও সত্যনিষ্ঠার কথা চিন্তা করিলে হৃদয়ে অপরিসীম বিস্ময়ের উদয় হয়। তাহারা বাক্যে যাহা প্রকাশ করিতেন, প্রাণান্তপণে তদনুরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেন। 'মরদ্‌কা বাত হাতিকা দাঁত' এই প্রবাদ বচনটীর সারতত্ত্ব এই—হাতীর দাঁত একবার মুখ হইতে বহির্গত হইলে, তাহা যেমন আর ভিতরে প্রবিষ্ট হইয়া অদৃশ্য হইতে পারেনা, সেইরূপ যে প্রকৃতপক্ষে পুরুষত্বশালী পুরুষ তাহার মুখ হইতে যে বাক্য বহির্গত হয় তাহা মুখেই লয়প্রাপ্ত হইতে পারে না অর্থাৎ বক্তা কর্ত্তৃক বাক্যানুসারে কার্য্যানুষ্ঠান হইবেই হইবে। কোন্ সময়ে এই প্রবচনটী প্রথম সৃষ্ট হয় জানিনা, কিন্তু প্রাচীন কালের মানব চরিত্রই উক্তরূপ প্রবচনের উৎপত্তিভূমি তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

২নং দলিলখানি বাদি বিবাদী কর্ত্তৃক সম্পাদিত আপোষনামা। ১নং ও ২নং দলিলের তারিখ দৃষ্টে বোধ হয় যে, তখনও বর্ত্তমান কালের ন্যায় আদালতের মোকদ্দমা নিষ্পন্ন হইতে দীর্ঘ সময়ের আবশ্যক হইত। কালের যবনিকার গাঢ়স্তর ভেদ করিয়া প্রাচীন সময়ের রীতিনীতি ও আচার পদ্ধতি আলোচনা করিতে গেলে সেকালও একালের পার্থক্য অনুভব করিয়া হৃদয় অপরিসীম আনন্দরসে আপ্লুত হইয়া থাকে। সেকালে যে কার্য্যটী সামান্য একটী কথার উপর নির্ভর করিয়া নিঃসন্দেহে সুচারুরূপে সম্পাদিত হইত, বর্ত্তমান সময়ে তাহা অপেক্ষা ক্ষুদ্র বিষয়ের মীমাংসা করিতে হইলে রেজেষ্টরী আফিসে যাতায়াতের আবশ্যক হয়। সময়ের কত প্রভেদ।

সাক্ষীদ্বয়ের জবানবন্দীর অনুলিপি।

১নং দলিল।

শ্রী গঙ্গানারায়ণ
মৌপঞ্চ

চন্দ্রমাধব ঠাকুর হকিকত
ভবানী শ্রীগঙ্গা নারায়ণ
মৌপঞ্চ সাকীম গুয়াখলা
পরগণে রষুলপুর আগে
এহিমত দেখীছি রুক্মিকান্ত ঠাকুর
ও জয়দেব ঠাকুর ও মণিঠাকুর
এহি তিনজন তিন হিসা করিয়া
ঈশ্বর সেবা করিছেন বাসাইল
গ্রামে সেবাতে অর্ণত্র থাকিয়া
আশীত তাহা সমান তিন অংশ
করিয়া লইছেন দষ দিন করিয়া
এক এক জনে পূজা করিছেন
পরে কৃষ্ণপ্রসাদ ঠাকুর বাসাইল
এতে ঠাকুর লইয়া ইছাপুর গ্রামে
গেলেন তৎপর কাজীর হাঙ্গা-
মাতে ঠাকুর পুষ্করিণিত জলে থুই-
লেন পুর্ণায় ভুলিয়া ঠাকুর সেবা
করিলেন ইহা সেওয়ায় আর
কিছু না জানি ইতি সন ১১৫৫
তেরিখ ৩০ জ্যৈষ্ঠ।

বয়েস ৭৭
শ্রী [illegible]
বৎসর
ইতি

শ্রীরাম প্রসাদ দত্তস্য
সাং বাসাইল।

চন্দ্রমাধব ঠাকুর হকিকত
জবানি শ্রীরাম প্রসাদ
দর্ত্তস্য আগে শ্রীযুক্ত ৺
মথুরানাথ ঠাকুরের সেবিত
এমত ষুনিচি বাসাইল
গ্রামে এক পণ্ডিত থাকিতে রুক্মি-
কান্ত ঠাকুর ওলদে রঘুনাথ ঠাকুর
ও জয়দেব ঠাকুর ওলদে গোবিন্দ
ঠাকুর মণিরাম ঠাকুর পুরুসত্তম
ইহারা তিনজনে ঠাকুর সেবা
করিছেন আমার অল্প বত্রসে
ঠাকুর প্রণাম করিছি প্রণাম
করিতে যাইতাম তাহাতে এরূপ
সেবা করিতে দেখিছি কে কত-
দিন সেবা করিছেন ইহার
সাবিকী বেত্তয়া আমি না জানী
আর কাজীর ধুম ক্রেমে বাসাইল
গ্রামের পুস্করিণিত জলেতে লামা-
ইয়া ঠাকুর রাখীছিলেন সেহি
ঠাকুর কৃষ্ণপ্রসাদ ঠাকুর উঠাইয়া
নিলেন ষুনিলাম ইছাপুরা নিয়া
সেবা প্রকাশ করিছেন ইতি
সন ১১৫৮ তেরিখ ১০ আষাড়।

বয়েস
৭০ বৎসর

---

* প্রাচীন বিক্রমপুর মুসলমান শাসন সময়ে পরগণে মহ.দপুর, পরগণে বৈকুণ্ঠপুর, পরগণে বহর, তৌজে রামকৃষ্ণপুর, পরগণে কার্ত্তিকপুর পরগণে রছুলপুর ইত্যাদি বহু স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র পরগণায় বিভক্ত ছিল।

দলিলের অনুলিপি।

২নং দলিল।

/৭ শ্রীরাধাকৃষ্ণ মহন্ত সুচরিতেষু

শ্রীজীবনকৃষ্ণ সর্ম্মণঃ

লিখিতং শ্রীজীবনকৃষ্ণ শর্ম্মা সাকিম ইচ্ছাপুরা আমলে পরগণে মকিমাবাদ আগে তোমার প্রপীতামহ আমার বৃদ্ধ প্রপীতামহ মথুরানাথ মহান্ত এহান স্থাপিত শ্রীযুত বাসাইলের বাড়ীতে তোমার পিতা মণিরাম মহন্ত ও আমার পিতামহ রুক্মিকান্ত মহান্ত এহানাএ ঠাকুর সেবা করিতেছিলেন পরে গ্রাম মজকুরের উপদ্রব কারণ ইছাপুরা গ্রামে নিয়া ঠাকুর রাখিলেন আমার পিতা কৃষ্ণপ্রসাদ মহন্ত সেই স্থানে বাড়ি করিয়া এঠাকুর সেবা করিতেছিলেন তোমারা বাসাইল রহিলা ঠাকুরের সারিকি সেবা করিতে তোমাদের না দিছিলাম এ কারণ তুমি শ্রীমৎ হুযুরনালিষ করিয়া পেয়াদা দিয়া আমারে পাকড়িছ সরে আদালতে মুছদ্দি আর তজবিজ ক্রমে এ ঠাকুরের সরিকি সেবা অর্দ্ধেক তোমার পৌছিল অর্দ্ধেক সরিক সেবা তুমি করিয়া অর্দ্ধেক সরিকি সেবা আমি করিব এতদর্থে তোমারে না দাবি দিলাম ইতি সন১১৬০ এগারস ষাটে তেরিখ ৩১ অগ্রাহায়ণ।

৩নং দলিলখানি, বিক্রমপুরে যে এক সময়ে দাসত্ব প্রথা প্রচলিত ছিল তাহারই প্রমাণ দিতেছে। দাসত্ব প্রথার নাম শুনিয়া পাঠকবর্গ শিহরিয়া উঠিবেন না। এ দাসত্ব প্রথা ইংলণ্ডের দাসত্ব প্রথার অনুরূপ নহে। যে দাসত্ব প্রথার সুতীব্র লাঞ্ছনা দৃষ্টে একদিন কবিবর কাউ পারের লেখনী পর্য্যন্ত বিচলিত হইয়াছিল, বিক্রমপুরের দাসত্ব প্রথা তদ্রূপ ছিলনা, যদি সেইরূপ কঠোর দাসত্ব প্রথাই বিক্রমপুরে প্রচলিত থাকিত তাহা হইলে কখনই প্রাচীন কালে যখন খাদ্যদ্রব্যাদি সমুদয়ই

সুলভ ছিল সাধ করিয়া কেহ আসিয়া বিক্রীত হইত না। ইংলণ্ডের দাসত্ব প্রথার ভীষণত্ব "Uncle Tom's Cabin" নামক পুস্তক পাঠ করিলেই বিশেষরূপ অবগত হওয়া যায়।

ইংলণ্ডের ন্যায় এখানে কেহ কাহাকেও ইচ্ছার বিরুদ্ধে ক্রয় বিক্রয় করিত না। বিক্রমপুরে দাসগণ সাধারণতঃ নিজ ভরণপোষণের সুবিধা হইবে মনে করিয়া স্বেচ্ছায় অপরের নিকট সপরিবারে বিক্রীত হইত। ইংলণ্ডের ন্যায় এখানে দাসগণের উপর কোনরূপ অত্যাচার ছিল না। দাসক্রয়কারীগণ ক্রীতদাসের পরিবারস্থ ব্যক্তিগণকে স্বীয় পরিবারের অন্তর্ভুক্ত আত্মীয় বলিয়া বিবেচনা করিতেন এবং তাহাদের ভরণপোষণ বিবাহ শ্রাদ্ধাদি সকল কার্য্যেরই ব্যয়ভার বহন করা স্বীয় কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিতেন। দাসগণও আপন ক্রয়কারীর পরিবারের সর্ব্বতোভাবে মঙ্গল কামনা করিত এবং ঐ সকল পরিবারে তাহাদের যথেষ্ট সম্মান ও প্রতিপত্তি ছিল। পরিবারস্থ বালক বালিকাগণ উহাদিগকে নাম ধরিয়া সম্বোধন করিত না, মামা, কাকা, দাদা, জেঠা ইত্যাদি সম্পর্ক ধরিয়া ডাকিত। বালকবালিকাগণ কোনরূপ অন্যায় আচরণ করিলে দাসগণ তাহাদিগকে আপন পরিবারস্থ শিশুগণের ন্যায় শাসন করিত। ঐ শিশুগণ বয়োপ্রাপ্ত হইলেও ঐ সকল দাস দাসীদিগকে সম্মান করিত ও আপদ বিপদে তাহাদের পরামর্শ গ্রহণ করিত। পরিবারস্থ বধূগণও আপন শ্বশুরশ্বাশুড়ীর ন্যায় ইহাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনে কুণ্ঠিত হইত না। কাজেই যে দেশের দাস দাসী দিগকে হত্যা করাও অপরাধ বলিয়া পরিগণিত হইত না, সে দেশের দাসগণের সহিত আমাদের দেশের এই দাসগণের তুলনা করিতে যাওয়া বাতুলতা মাত্র। এ দেশের দাস গণের অধিকাংশ স্থলেই সুখশান্তি ছিল বলিয়াই অনেক পুরুষ, রমণী আপনাদিগকে দাসত্বে নিবদ্ধ করিতে আগ্রহ প্রকাশ করিত। শুধু বিক্রমপুরে কেন? সমস্ত পূর্ব্ববাঙ্গালায়ই একদিন এইরূপ দাসত্ব প্রথা

বিস্তারিত ভাবে প্রচলিত ছিল, এই দাসগণকে নফর বা সিকদার বলিত। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, এই দাসত্ব প্রথা মুসলমান দিগের অনুকরণে এই দেশে প্রচলিত হইয়াছিল। বর্ত্তমান সময়ে বহু সম্ভ্রান্ত পরিবারের নফরবংশ পুরুষানুক্রমে পূর্ব্ব মনিবগণের দাসত্ব করিয়া আসিতেছে, তবে এখন আর উভয় পক্ষের মধ্যে পূর্ব্বের ন্যায় কোনও দাবি চলেনা।

৩নং ও ৪নং দলিলখানি দৃষ্টে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, সে সময়ে এক পরিবারস্থ সকলেই এমন কি স্ত্রীলোক পর্য্যন্ত দাস্য বৃত্তিতে নিযুক্ত হইবার চুক্তিতে আবদ্ধ হইতে পারিত। আমাদের এই দলিল দু'খানির একখানার মধ্যে আত্মবিক্রয়কারিগণ কিরূপে খালাস পাইবে তাহারও উল্লেখ আছে, কিন্তু তাহা এইরূপ অসম্ভব কাল্পনিক সর্ত্তে নিবদ্ধ যে কস্মিন্ কালেও তাহা কার্য্যে পরিণত হইতে পারে না। ৩নং দলিলের মধ্যে নরসিংহ শর্ম্মার সাকিম মৌজে আকালমেঘ উল্লিখিত আছে, বর্ত্তমান সময়ে বিক্রমপুরে আকালমেঘ নামক কোনও ভদ্রপল্লী বিদ্যমান নাই, বর্ত্তমানে মেঘনা নদীর আকালমেঘ নামক একটী চর বিদ্যমান আছে, সে স্থান এখন নিম্ন শ্রেণীর মুসলমান ও নমঃশূদ্র অধিবাসিবৃন্দে পরিপূর্ণ। প্রাচীন আকালমেঘ যে সুখ সমৃদ্ধি ও ভদ্র অধিবাসী পূর্ণ সুন্দর গণ্ডগ্রাম ছিল, প্রাচীন দলিল ইত্যাদি দৃষ্টে তাহা সুস্পষ্ট প্রমাণিত হয়; কারণ বিক্রমপুরস্থ মুন্সীগঞ্জ থানার এলাকাধীন মুলচর গ্রামের চক্রবর্ত্তী বংশোদ্ভব শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত মহোদয়গণ এখনও তাঁহাদের পূর্ব্ব পুরুষের আবাসস্থল আকালমেঘ ছিল বলিয়া স্বীকার করেন। আমরা প্রথম অধ্যায়ে বিক্রমপুরের যে ভৌগোলিক পরিবর্ত্তনের কথা উল্লেখ করিয়াছি ইহা দ্বারা তাহাও সুস্পষ্ট প্রমাণিত হয়।

দলিলের অনুলিপি।

৩নং

/৭ ইষাদি বন্দাজির পত্রমিদং শ্রীরামকৃষ্ণ শর্ম্মা ওলধে রাম গোপাল শর্ম্মা ইবনে নবসিংহ শর্ম্মা সাকিম মৌযে আকালমেঘ আমলে পরগণে বিক্রমপুর ষুচরিতেষু শ্রীযুকদেব দেয় ওলদে রামকৃষ্ণ দেয় ইবনে বমাই দেয় মৌজ সাকিম চাচকুণ্ড আমলে পরগণে রশুলপুর কস্য আগে আমি আর আমার স্ত্রী হরিপ্রিয়া ও আমার পুত্র শ্রীবুগীরাম দের এই তিন জনে অন্ত ও রিন উপহতি আজিজে ও পেরেসনি হইয়া জীন্দগরির কোন ফিকীর না দেখি অতএব আপেনা আপেনা রাজীবকবতে স্বেচ্ছাত্র তোমার স্থানে নগদ মূর্ল্য পুব ও জন বা এজন উক্ত মবলক ২১ একুশ রূপাইয়া পাইয়া বন্দাজির হইলাম লবজিমা খোবাকী পোষাক পাইয়া তোমার পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে দান বিক্রি অধিকারী হইবা নফারি কর্ম্ম করাইতে রহো এই কড়ারে বন্দাজর পত্র দিলাম ইতি সন ১১৩৩ এগারস তেত্রিশ বাঙ্গালা সন পরগণাতি সন ৫৫ পাচশ ও পঁচিষ তেরিখ ২৭ অগ্রহায়ণ।

নিসান সহি ৮
মুচাল্কাত
শ্রীনাত হরিশ্রীমা সর্ম্মাত
বত্তবলব নিস্কাষ
শ্রী মুনসের দেব

৪নং দলিল।*

/৭ ইয়াদিকীর্দ্দ শ্রীইন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্ত্তি ওলদে জোগেশ্বর চক্রবর্ত্তি ইবনে দুর্গাপ্রসাদ চক্রবর্ত্তি স্বচরিতেষু লিখিতং শ্রীমতী অপূর্ব্বা ওলদে নারান দেও জওজে চান্দ দেও ও শ্রীমতি স্বধবনি ওলদে চান্দদেও জাওজে

* এই দলিল খানার বিষয় ও তৎ সম্পর্কিত মোকদ্দমার বিবরণ শ্রীযুত পরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ মহাশয় ১৩০৯ সালের ২য় ভাগ ১০ম ১১ দশ সংখ্যার 'প্রবাসী'তে লিখিয়া ছিলেন।

উদয়রাম দেও ও আমার পুত্র সানন্দরায় দেও বঅস ৪ চারের বৎস্বর ও তস্য ভগ্নীর বঅস ৪ চাইর মাস মনিস্য আপ্ত বিক্রয় কবজ পত্রমিদং কার্য্যঞ্চআগে আমরা আপনার স্থানে দস্তবদস্ত নগদমূল্য পুর ওজন দহ-মাসী ২৫ পচিষ রূপাইয়া পাইয়া কবজ দিলাম ইতি সন ১১৯১ এগারস একানব্বই তেরিখ ১৮ ফাল্গুন।

দলিলোক্ত পুর ওজন শব্দে কেহ কেহ ইংরেজী Standard value বা sterling বুঝিয়াছেন। এ সমুদয় প্রাচীন দলিলের মধ্যে ব্যঞ্জন বর্ণে উকার বা ঊকার সংযোগের পরিবর্ত্তে 'ব' ফলা ব্যবহৃত দেখিতে পাওয়া যায়, এই 'ব' ফলা কোন্ কোন্ স্থানে 'ব' বাচক ও কোন্ কোন্ স্থলে উকার বাচক, ইহা পাঠকালে সহজেই হৃদয়ঙ্গম হয়। /৭ এই চিহ্নে ঈশ্বরের নাম বুঝায়। একজন প্রাচীন ব্যক্তিকে /৭ লিখিতে দেখায় তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি এইরূপ ব্যাখ্যা দিয়াছেন, তবে ইহা যে কোনও রূপ মঙ্গল সূচক তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

৩নং দলিলের তারিখ ১৭২৬ খ্রীষ্টাব্দ। পলাশীর যুদ্ধেরও বহুপূর্ব্বে যখন মুসলমান শাসন পূর্ণ মাত্রায় দেশ মধ্যে প্রচলিত ছিল দাসত্ব প্রথাও তখন পূর্ণতেজে দেদীপ্যমান ছিল। এই দাসত্ব প্রথার দলিল হইতে আমরা এই সত্যে পঁহুছিতে পারি যে, অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ও সপ্তদশ শতাব্দীতে এদেশে দাসত্ব প্রথা প্রচলিত ছিল এবং তাহা জন সাধারণ তাদৃশ ঘৃণার চক্ষে অবলোকন করিত না। স্বাধীনতার মূল্য যে তৎকালে অকিঞ্চিৎকর ছিল ইহা দ্বারা তাহাও সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয়।

ইংরেজ রাজত্বের সঙ্গে সঙ্গে সাম্যভেরীর প্রবল নিনাদে নানা পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে নিম্নশ্রেণীর অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়াছে এবং লোকে এখন স্বাধীনতার প্রীতি আস্বাদন করিতে পারায় সে কালের ন্যায় কেহই সাধ করিয়া অধীনতা নিগড়ে আবদ্ধ হইতে চাহে না।

প্রাচীন ও আধুনিক শিক্ষায় বহু প্রভেদ বিদ্যমান। সে সময়ে বর্ত্তমান যুগের ন্যায় গ্রামে গ্রামে স্কুল, পাঠশালা এবং প্রতি নগরেই উচ্চ শ্রেণীর কালেজ বিদ্যমান ছিল না। তখন ছাত্রগণ বাল্যকালে ভূর্জ্জপত্র কিংবা তালপত্রে কঞ্চির লেখনী দ্বারা লিখিত এবং বাড়ীর বিজ্ঞ ও বিদ্বান ব্যক্তিই তাহাদিগকে শিক্ষা দিতেন। মুসলমান শাসনের পূর্ব্বে এবং পরে বিক্রমপুরের প্রায় প্রতি গ্রামেই প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণের চতুষ্পাঠী ছিল। কৃতবিদ্য ও খ্যাতনামা অধ্যাপকগণ তথায় ছাত্রগণকে শিক্ষা প্রদান করিতেন। পাণ্ডিত্য গৌরবে বিক্রমপুর চির দিনই গৌরবান্বিত। সেকালে বিক্রমপুর ও নবদ্বীপ এই উভয় স্থান হইতেই ছাত্রগণকে উপাধি দেওয়া হইত। হরিতকী, বহেড়া, লৌহ প্রদীপের শিষের সংমিশ্রণে একপ্রকার কালি নির্ম্মিত হইত তাহাই ছাত্র, অধ্যাপক সকলে ব্যবহার করিতেন। পাঁচশত বৎসরের প্রাচীন দলিলসমূহে এখনও সেই কালির লিখিত অক্ষরসমূহ সুস্পষ্ট বিদ্যমান আছে। চতুষ্পাঠীতে নানা বিভিন্ন দেশাগত ছাত্রগণ থাকিয়া অধ্যয়ন করিত। অধ্যাপক শিষ্যগণের আহার প্রদান করিতেন। প্রভাতে সন্ধ্যায় টোলের ছাত্রগণের ব্যাকরণের ও সাহিত্যের আবৃত্তি ধ্বনিতে সারাখানি গ্রাম মুখরিত হইত। সে সময়ে খাদ্য দ্রব্যাদিও যেরূপ সুলভ ছিল, লোকে সৎকার্য্যও করিত তদ্রূপ। শিক্ষার আদর সর্ব্বত্রই দেদীপ্যমান ছিল। বিবাহ সভায়, শ্রাদ্ধ সভায় ও অন্য কোনও রূপ উৎসবাদি উপলক্ষে পণ্ডিতবর্গ ও ছাত্রগণ সমবেত হইলেই ন্যায় শাস্ত্র ও দর্শন শাস্ত্রের কূটতর্কে একদিকে যেমন পণ্ডিতবর্গ নিজ নিজ শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনে যত্নবান হইতেন, তদ্রূপ ছাত্রবর্গও সন্ধি সমাসের এবং উদ্ভট শ্লোকের আলোচনা দ্বারা নিজ নিজ টোলের প্রাধান্য রক্ষায় যত্নবান্ হইত; সে যুগে ব্রাহ্মণগণ শিক্ষা দান ব্যতীত অন্য কিছুই

শিক্ষা প্রাচীন ও আধুনিক।

চতুষ্পাঠী বা টোল।

জানিতেন না, বৈষয়িক কূটতর্কে তাঁহারা লিপ্ত হইতে চাহিতেন না। অধ্যয়ন, অধ্যাপন, যজন, যাজন ইহাই ছিল তাঁহাদের একমাত্র ব্রত। সান্ধ্যাহ্নিক বিরত ব্রাহ্মণ তখন কেহই ছিলেন না। সর্ব্বশ্রেণীর নর-নারীই ব্রাহ্মণগণের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রদর্শন করিত। গ্রামের তর্কালঙ্কার ঠাকুরদাদার আদেশ,—ধনী, নির্ধন সকলেই নত মস্তকে গ্রহণ করিতেন, তাঁহার 'মন্ত্রি'র ভয়টা সকলেরই ছিল। ব্রাহ্মণেরাও তেমনি মিথ্যা কি তাহা জানিতেন না, অধর্ম্মের ছায়া স্পর্শেও তাঁহারা ভীত হইতেন। সেই তপোনিষ্ঠ, ত্রিপুণ্ড্রকধারী, ন্যায়বান, দয়াবান, জ্ঞানী ব্রাহ্মণ এখন কোথায়? আর কি সমাজে সেই মহাপুরুষগণের শুভ অভ্যুদয় হইবে না? পাঠশালায় সাধারণ শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া শিক্ষার্থিগণ টোলে ব্যাকরণ শিক্ষা আরম্ভ করিত। তখন কোনও মুদ্রিত গ্রন্থ ছিল না, সকলেই হস্ত লিখিত গ্রন্থ পাঠ করিত। টোলের ছাত্রগণ গুরুকে দেবতার ন্যায় জ্ঞান করিতেন, গুরুদেবের গো-রক্ষা হইতে অন্যান্য আবশ্যকীয় সমুদয় কার্য্য সম্পাদন করিতে তাহারা বিন্দু মাত্রও কুণ্ঠা বোধ করিত না। এখনও বিক্রমপুরের টোলসমূহে প্রাচীন যুগের সে পুণ্য-চিত্রের ক্ষীণ প্রতিবিম্ব দেখিতে পাওয়া যায়। সরস্বতী পূজোপলক্ষে ছাত্রগণের কতই না আনন্দ ছিল! আমাদের শৈশবেই আমরা দেখিয়াছি যে, রাত্রি শেষে স্নান করিয়া টোলের ছাত্রগণ গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া দেবী বীণাপানির চরণে অঞ্জলি প্রদানার্থ পুষ্প সংগ্রহ করিতেছে। তাহাদের আননে উৎসাহ প্রতিফলিত, হৃদয়ের ভক্তি ও শ্রদ্ধা নয়ন যুগলে বিকশিত। কি অটল প্রীতি! কি সুন্দর বিশ্বাস! এখন সে দৃশ্য আর বড় দেখিতে পাই না। এখনও বিক্রমপুরে শতাধিক টোল আছে। ঢাকার সারস্বতসভা ও গভর্মেণ্টের কল্যাণে সংস্কৃত শিক্ষার ক্ষীণ আশা-দীপ এখনও নির্ব্বাপিত হয় নাই। সংস্কৃত শিক্ষার গৌরবে এখনও বিক্রমপুর উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত।

মুসলমান শাসনের সঙ্গে সঙ্গে এদেশে মক্তব প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন মুসলমান রাজা, কাজেই রাজকার্য্য লাভ করিতে হইলে পার্সী শিক্ষার প্রয়োজন।

মক্তব ও পাঠশালা।

সেজন্য দেখিতে দেখিতে গ্রামে গ্রামে মক্তব প্রতিষ্ঠিত হইল। মুন্সী সাহেব ছেলেদের প্রাতে ও সন্ধ্যায় পার্সী পড়াইতেন, আর দ্বিপ্রহরে 'বেত্রহস্তে গুরুমশাই' পড়ুয়াদিগকে নাম, শ্লোক ও তালপাতে হস্তাক্ষর মক্স করাইতেন। বর্ত্তমান যুগে যেমন প্রত্যেক অভিভাবকই নিজ নিজ সন্তানকে ইংরেজী বিদ্যায় শিক্ষিত করিতেই অধিকতর যত্নবান, তদ্রূপ মুসলমানদের আমলেও অভিভাবকগণ বাঙ্‌লা লেখাপড়া অপেক্ষা পার্সী শিক্ষা দিতেই অধিকতর যত্নবান্ ছিলেন। কোনও ধনী ব্যক্তির গৃহের চণ্ডীমণ্ডপে, আটচালা ঘরে, অথবা বৃক্ষ তলেই পাঠশালা বসিত। চারিদিকে ছাত্রগণ নিজ নিজ বাড়ী হইতে আনীতছোট ছোট চাটাইয়ের উপর বসিয়া কলাপাতের উপর ক্ক, স্ব, দগ, দব লিখিত, আর মধ্যস্থলে একখানা জলচৌকি কিংবা পিঁড়ির উপরে বসিয়া তন্দ্রালস নয়নে মাঝে মাঝে গুরুমশাই বেত্র নাড়িয়া এবং হুঙ্কার দিয়া ছাত্রগণকে সুশাসনে রাখিতেন! যিনি যত বেশী গুরুতর শাস্তি প্রদান করিতে পারিতেন, তিনিই তত অধিক সুপণ্ডিত বলিয়া বিবেচিত হইতেন। এ সকল পাঠশালায় নামতা, কড়াকিয়া, গণ্ডাকিয়া, কাঠাকালি, বিঘাকালি, নাম শ্লোক ও দলিল তমঃশুক ইত্যাদি লিখিবার ও শিখিবার ব্যবস্থা ছিল!

তখনকার দিনে বেতন স্বরূপ গুরুমহাশয় ছাত্রগণের নিকট হইতে কোনও রূপ নগদ কাঞ্চন মূল্য প্রাপ্ত হইতেন না। চা'ল, ডাল, তরি তরকারী,

ছাত্রবেতন ও ছাত্রশাসন।

তামাক ছিলিম, পাণ, কলা, মূলা ও উৎসব পর্ব্বাদি উপলক্ষে কিঞ্চিৎ রজত খণ্ড; ইহাই ছিল সেকালের গুরুর প্রাপ্য। ছাত্রগণ গুরুমহাশয় ও গুরুপত্নীর বিবিধ আদেশ প্রতিপালন করিতেন। তাঁহাদের হাট,

বাজার ইত্যাদি অধিকাংশ স্থলে ছাত্রগণই করিয়া দিত। গুরুমহাশয় দুর্দ্দান্ত ও অমনোযোগী ছাত্রগণকে নানা প্রকার কঠোর শাস্তি প্রদান করিতেন। ১৮৩৪ সালে মিঃ এডাম সাহেব এতদ্দেশীয় শিক্ষার অবস্থা পরিদর্শনার্থে জেলায় জেলায় গমন করিয়া গ্রাম্য পাঠশালা ইত্যাদি দৃষ্টে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন তন্মধ্যে চতুর্দ্দশ প্রকার শাস্তির উল্লেখ আছে—সে সকলের মধ্যে ত্রিভঙ্গী, নাড়ুগোপাল, সূর্য্যমুখো, ধান দিয়ে কপাল চিরিয়া দেওয়া ইত্যাদি উল্লেখ যোগ্য।

দেশী কাগজ ও মুদ্রিত গ্রন্থ।

কলাপাতা ও তালপাতায় লেখা শেষ হইলে ছাত্রগণ কাগজে লেখা-পড়া করিত। বিক্রমপুরস্থ আরিয়ল গ্রাম নিবাসী কাগজীগণ বর্ত্তমান বালি মিলের কাগজের ন্যায় এক প্রকার পুরু হরিদ্রবর্ণের কাগজ প্রস্তুত করিত তাহাই তৎকালে বিশেষ আদরণীয় ছিল। এই কাগজগুলি প্রস্থে অর্দ্ধ হস্ত এবং দৈর্ঘ্যে প্রায় দেড়হস্ত পরিমাণ নির্ম্মিত হইত। এখন আর সে কাগজের আদর নাই। আরিয়ল গ্রামে পূর্ব্বে প্রায় পাঁচশত ঘর কাগজী বাস করিত, এখনও করে, কিন্তু পূর্ব্বে ইহারা যেরূপ গ্রামে গ্রামে কাগজ বিক্রী করিয়া জীবিকা-নির্ব্বাহ করিতে পারিত বর্ত্তমান সময়ে আর তাহা পারে না,—এখন সে কাগজ আর কেহ ক্রয় করে না। যদি এই সকল কাগজী দিগকে নবীন পদ্ধতি অনুযায়ী সরল উপায়ে কাগজ তৈয়ারী শিক্ষা দেওয়া যাইত, তবে বোধ হয় দেশের একটা স্থায়ী শিল্প এইরূপ ভাবে লুপ্ত হইত না। 'শিশুবোধকই' বাঙলার সর্ব্বপ্রথম মুদ্রিত শিশুপাঠ্য গ্রন্থ।

শিক্ষা বিস্তৃতি ও ইংরেজী শিক্ষার অবির্ভাব।

ইংরেজ রাজত্বের শুভ বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ দেশের শিক্ষা পদ্ধতির পরিবর্ত্তন এবং উন্নতি হইতে আরম্ভ করে। গভর্ম্মেণ্টের সাহায্যে ক্রমশঃ গ্রামে গ্রামে বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে

বিক্রমপুরে সর্ব্বপ্রথম বঙ্গ বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ক্রমশঃ বিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে বিক্রমপুরে মধ্যইংরেজী ২০টি, এবং মধ্য ছাত্রবৃত্তি ২৫টী মোট ৪৫টী বিদ্যালয় ছিল। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে এখন বিক্রমপুরে উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ই ২৪টী। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে কালীপাড়া, শ্রীনগর, বহর, মুন্সীগঞ্জ, মাইজপাড়া, কুকুটিয়া, হাসারা, মালখানগর, জৈনসার, জপসা, কাচাদিয়া, কুমার ভোগ, কনকসার, তারপাশা, কোলা, বেতকা, ব্রাহ্মণগাঁ ও বজ্রযোগিনী এই কয়টী উচ্চ ইংরেজী ও মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয় প্রসিদ্ধ ছিল। বর্ত্তমান সময়ে মুন্সীগঞ্জ, বজ্রযোগিনী, আবদুল্লাপুর, মালখানগর, আউট-সাহী, সোণারঙ্গ, ইছাপুরা, পাইকপাড়া ষোলঘর, বেলতলি, শেখরনগর, চিত্রকূট, ভাগ্যকুল, ব্রাহ্মণগাঁও, স্বর্ণগ্রাম, লৌহজঙ্গ, পালং, লোনসিং, তুলাসার, ডোমেসা, বাহেরক (সিদ্ধেশ্বরী) সিমুলিয়া, রাউৎভোগ, আরিয়ল, পণ্ডিতসার, কার্ত্তিকপুর, বানারি ও তেলিরবাগ একয়টি উচ্চ বিদ্যালয় আছে। এতদ্ব্যতীত প্রায় দুই বৎসর হইল সোণারঙ্গ ও মাইজপাড়া গ্রামে দু'টী জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে।

বিক্রমপুরের প্রায় প্রতি গ্রামেই বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধি-ধারী বহু ব্যক্তির বাস। কালীপাড়ার বাবুদের বাড়ীর উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়টীই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ছিল, উহা ১৮৫৪ সালে স্থাপিত হয়। ইংরেজী শিক্ষার

ইংরেজী শিক্ষিতের আদর।

প্রথম প্রচলন সময়ে সকলেই ইংরেজী বিদ্যাকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন। পল্লীবৃদ্ধ ও স্ত্রীলোকদের বিশ্বাস ছিল যে ইংরেজী পড়িলেই লোকে খৃষ্টান হয়; ক্রমশঃ এ অন্ধ বিশ্বাস দূরীভূত হইতে থাকে এবং অভি-ভাবকগণও সানন্দচিত্তে স্বীয় স্বীয় সন্তানগণকে ইংরেজী বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিতে আরম্ভ করেন। কালীপাড়ার বাবুদের যত্নে তাঁহাদের বাসগ্রামে ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপিত হইলে বাবু ত্রিপুরাচরণ দাশ গুপ্ত নামক এক

জন শিক্ষিত বৈদ্য সন্তান তথাকার প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন। ইহার সুশিক্ষার গুণে বিক্রমপুরে এক যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছিল। গুরুপ্রসাদ বাবু বিক্রমপুরের সর্ব্ব প্রথম বি, এ, তাঁহার পূর্ব্বে বিক্রমপুরে কেহ বি এ, পাশ করেন নাই। তাঁহার মেধাশক্তির কথা সর্ব্বত্র এরূপ ভাবে প্রচারিত হইয়া গিয়াছিল যে তিনি বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া দেশে আসিলে পর বিক্রমপুরের ভিন্ন ভিন্ন স্থানের অধিবাসীবর্গ তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছিল।

স্ত্রী-শিক্ষা।

স্বর্গীয় দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় বিক্রমপুরে স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তৃতির জন্য সর্ব্ব প্রথমে যত্নবান হইয়াছিলেন। স্বর্গীয় কাশীকান্ত মুখোপাধ্যায় যখন স্কুল বিভাগের ডেপুটি ইন্স্পেক্টর ছিলেন সে সময়ে বিক্রমপুরে প্রকৃত ভাবে স্ত্রী-শিক্ষার প্রচার হইতে থাকে এবং তখন মাইজপাড়া, করটীয়া, ষোলঘর, পরাণিমণ্ডল, কামার গাঁ, কুমার-ভোগ, ব্রাহ্মণগাঁ ও হাঁসারা গ্রামে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়, দু'তিন বৎসর পরে আবার সে সকল বিদ্যালয় উঠিয়া গিয়াছিল। প্রথমে পল্লী বৃদ্ধাগণ ও রমণীগণ কেহই নিজ নিজ বালিকাকে বিদ্যালয়ে পাঠাইতে স্বীকৃত হন নাই, তাঁহাদের বিশ্বাস ছিল যে লেখাপড়া শিখিলেই বালিকারা বিধবা হইয়া যাইবে এবং গৃহকার্য্যে উদাসীন হইয়া বিবি সাজিয়া বসিবে, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সে সমুদয় অমূলক ভীতি কিয়ৎ পরিমাণে দূরীভূত হইলেও স্ত্রী-শিক্ষা বিক্রমপুরে আশানুরূপ পুষ্টিলাভে সমর্থ হইতেছে না। ব্রাহ্মণ এবং কায়স্থ অপেক্ষা বৈদ্য জাতির মধ্যেই স্ত্রী-শিক্ষা অধিকতর প্রচলিত। (উপস্থিত বিক্রমপুরের প্রায় অধিকাংশ সমৃদ্ধ গ্রামেই বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত আছে, তন্মধ্যে বহর, ভরাকৈর, সোণারঙ্গ, জৈনসার, ইছাপুরা, মালখানগর, সেখরনগর, শ্রীনগর, মূলচর, স্বর্ণগ্রাম, হাঁসাড়া, ষোলঘর প্রভৃতি গ্রামের বিদ্যালয়গুলি

বিখ্যাত।) 'বিক্রমপুর সম্মিলনী' নামক সভা দ্বারা বিক্রমপুরে স্ত্রী-শিক্ষার বিশেষ প্রচার হইয়াছে। বিক্রমপুরের নৈতিক উন্নতি, স্ত্রী-শিক্ষা ও অন্যান্য হিতকর কার্য্য সাধনোদ্দেশ্যে ১২৮৬ সালের ৭ই আশ্বিন রবিবার "বিক্রমপুর সম্মিলনী সভা" প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। দশ এগার বৎসর পর্য্যন্ত ইহার কার্য্য সুন্দররূপে চলিয়াছিল, কিন্তু তৎপরে নানা কারণে আট নয় বৎসর ইহার কার্য্য একরূপ বন্ধ ছিল। পুনরায় ১৩০৮ সনে স্বর্গীয় বাবু রজনীনাথ রায় এবং মনস্বী ডাক্তার শ্রীযুক্ত পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহোদয় বিক্রমপুর-বাসী কতিপয় যুবকের আগ্রহে বিশেষ উৎসাহিত হইয়া উক্ত সভার পুনর্গঠন মানসে ৩ রা ভাদ্র শনিবার সিটিকলেজ ভবনে কলিকাতাস্থ বিক্রমপুরের অধিবাসিগণের একটী সভা আহ্বান করিয়া বিক্রমপুরস্থ বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের সহায়তায় উহা পুনর্ব্বার স্থাপন করিয়াছিলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এই সভা পুনর্ব্বার গঠিত হইয়াও ৩।৪ বৎসরের অধিক জীবিত রহিল না। এই সভা হইতে পরীক্ষোত্তীর্ণা বালিকা ও অন্তঃপুরচারিণী যে কোন বয়স বা জাতির রমণীকেই গুণানুসারে পুরস্কার বিতরণ করা হইত। বিক্রমপুরে এইরূপ একটী সভার বিশেষ প্রয়োজন আছে, আশা করি দেশের কল্যাণ কামনায় বিক্রমপুরের কৃতী সন্তানগণ পুনরায় এই সভার স্থাপন কল্পে যত্নপরায়ণ হইবেন। সৌভাগ্যের বিষয় বিক্রমপুরের ঘরে ঘরেই এখন স্ত্রী-শিক্ষা প্রচলিত। প্রত্যেকেই এখন নিজ নিজ কন্যা, ভগিনীকে শিক্ষিতা করিবার জন্য যত্নবান। স্ত্রীজাতি সমাজের কেন্দ্রস্বরূপ। তাঁহারাই প্রকৃত পরিচালক। স্ত্রী-শিক্ষা ব্যতীত দেশের মঙ্গল কখনও হইতে পারে না, তাহাদিগকে অন্ধকারে রাখিয়া দিলে উন্নতির শুভ্র জ্যোৎস্নালোক আমরা কিরূপে প্রাপ্ত হইবার আশা করি? সন্তান-জননী, মাতৃ স্বরূপিনী রমণীকুল যতদিন পর্য্যন্ত না জ্ঞানা-লোকে আলোকিত হইয়া পুরুষের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইবার শক্তি লাভ

বিক্রমপুর সম্মিলনী সভা।

সরোজিনী নাইডু।

না করিবেন, যতদিন পর্য্যন্ত না আমরা তাঁহাদিগকে তাঁহাদের প্রকৃত অধিকার প্রদান করিব, ততদিন পর্য্যন্ত আমরা কবিতাই লিখি, বক্তৃতাই দিই, আর দেশব্যাপী তুমুল আন্দোলনই কেন না করি, কোন প্রকারেই আমাদের প্রকৃত উন্নতি সংসাধিত হইবে না। সৌভাগ্যের বিষয় যে দেশের সকলেই এখন স্ত্রী-শিক্ষার উপযোগীতা বোধ করিতেছেন। বিক্রমপুরবাসিনী কোন কোন রমণী সাহিত্যক্ষেত্রেও প্রবেশ করিয়া খ্যাতিপন্না হইতেছেন। তাঁহাদের মধ্যে শ্রীযুক্তা অবলা বসু, 'ভারতীর' লেখিকা শ্রীযুক্তা শতদলবাসিনী বিশ্বাস, 'অশ্রুমালিকা' নামক গ্রন্থ-প্রণেত্রী সুশীলাসুন্দরী সেনগুপ্তা, 'উচ্ছ্বাস' প্রণেত্রী আশালতা রায়, স্বর্গীয়া পঙ্কজিনী বসু ও শ্রীমতী জগৎলক্ষ্মী দেবী প্রভৃতির নাম উল্লেখ-যোগ্য। শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু ও শ্রীমতী অমিয়া বানার্জ্জী বিক্রমপুরের রমণীকুলের উজ্জ্বলতম রত্ন। শ্রীমতী সরোজিনী বিক্রমপুরের অন্যতম গৌরব ব্রাহ্মণগাঁ নিবাসী সুবিখ্যাত ডাক্তার অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্যা। অঘোর বাবু এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে শিক্ষা লাভ করতঃ উচ্চ উপাধিতে ভূষিত হইয়া নিজামরাজ্যে আগমন করেন। তিনি নিজাম কালেজের স্থাপয়িতা। বর্ত্তমান সময়ে ইনি নিজাম রাজ্যের শিক্ষা বিভাগে উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত আছেন। সরোজিনী এই চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রথম সন্তান। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দের ১৩ই ফেব্রুয়ারী দাক্ষিণাত্যের নিজাম রাজ্যের রাজধানী হাইদরাবাদে সরোজিনী জন্মগ্রহণ করেন। শৈশব হইতেই তিনি ইংরেজীতে সুশিক্ষা লাভ করেন। তাঁহার বাল্য শিক্ষা সম্বন্ধে সরোজিনী নিজেই লিখিয়াছেন যে "শৈশবেই অত্যন্ত কল্পনা-প্রিয় হইলেও সে সময়ে কবিতা লিখিবার জন্য আমার বিশেষ আগ্রহ ছিল না। আমার পিতার দৃঢ় সঙ্কল্প ছিল, গণিত ও বিজ্ঞান শাস্ত্রে আমাকে সুপণ্ডিত করিবেন। এই ভাবেই তিনি আমাকে শিক্ষা দিতে ছিলেন, কিন্তু পিতা ও মাতার (তরুণ বয়সে

শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু।

আমার মা কয়েকটি সুন্দর কবিতা রচনা করিয়াছিলেন) নিকট হইতে যে কবিতানুরাগের উত্তরাধিকারিণী হইয়াছিলাম, তাহাই বিজ্ঞান শিক্ষার চেষ্টার উপর প্রাধান্ত লাভ করিল। আমার এগার বৎসর বয়সের সময় একদিন বীজগণিতের (Algebra) একটা আঁক কসিতে না পারিয়া বিমর্ষভাবে ভাবিতেছিলাম, কিন্তু কিছুতেই আঁকটা শুদ্ধ করিয়া কসিতে পারিতেছিলাম না। কিন্তু সে সময় হঠাৎ একটা কবিতা মনে আসিল, আমি তাহা লিখিলাম। সেই দিন হইতেই কবি-জীবনের সূত্রপাত। তের বৎসর বয়সে ছয়দিনে তেরশত পংক্তির এক খানা কবিতা-পুস্তক লিখিলাম। সেই বৎসরেই অসুখের সময় ডাক্তার বলিলেন, আমার অত্যন্ত অসুখ হইয়াছে বই ছুঁইতে পাইব না। তাঁহার কথার প্রতি অনাস্থা প্রকাশের জন্য একখানা নাটক লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম এবং দুই সহস্র পংক্তিতে তাহা সম্পূর্ণ করিলাম। এই সময়ই চিরকালের তরে আমার স্বাস্থ্য ভগ্ন হইল, বিদ্যালয়ে পাঠ বন্ধ হইল, কিন্তু বাড়ীতে আমি খুব পড়িতে লাগিলাম। চৌদ্দ হইতে ষোল বৎসরের মধ্যেই আমি সর্ব্বাপেক্ষা বেশী পড়িয়াছি। এই সময়ে আমি একখানা উপন্যাস লিখিয়াছিলাম, অন্যান্য লেখাও অনেক লিখিয়াছিলাম। এই সময়ে আমি জীবনের গুরুত্ব বিশেষ ভাবে অনুভব করিয়াছিলাম"। সরোজিনী দ্বাদশ বৎসর বয়সে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং দেশময় তাঁহার খ্যাতি ছড়াইয়া পড়ে। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে ষোল বৎসর বয়সে নিজাম প্রদত্ত বৃত্তি গ্রহণ করিয়া ইংলণ্ডে গমন করেন এবং তিন বৎসর কাল সেখানে থাকিয়া বিদ্যা শিক্ষা করেন। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে কিছুদিনের জন্য ইটালীতেও ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন। এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার কিছুকাল পরে সরোজিনী মান্দ্রাজী শূদ্র জাতীয় শ্রীযুক্ত গোবিন্দ রাজলু নাইডুকে বিবাহ করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন, কিন্তু পিতা মাতার অনভিলাষে তাহা সে সময় পারেন নাই, কিন্তু ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে

শ্রীমতী অমিয়া বানার্জ্জী ।

ডিসেম্বর মাসে ইটালী হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তিনি তাঁহার প্রণয়াস্পদ গোবিন্দ রাজলু নাইডুকে বিবাহ করেন। সরোজিনী এখন চারি সন্তানের জননী। পতির প্রেম, পুত্র কন্যাগণের প্রীতি ও দেশ বিদেশে প্রতিভার যশে ইনি বর্ত্তমান যুগে পরম সৌভাগ্যবতী রমণী।* সম্প্রতি শ্রীমতী সরোজিনী হায়দ্রাবাদের বন্যা-প্রপীড়িত নরনারীগণের সেবা করিয়া গভর্মেণ্টের নিকট হইতে 'কৈশোর-ই হিন্দ' নামক মেডেল প্রাপ্ত হইয়াছেন।

শ্রীমতী অমিয়া বানার্জ্জী।

অমিয়া বানার্জ্জী গাওদিয়া নিবাসী পরলোকগত সুপ্রসিদ্ধ রজনীনাথ রায় মহাশয়ের দুহিতা। ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় দ্বিতীয় ও এফ্ এ পরীক্ষায় তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়া বিক্রমপুরের মহিলাকুলের নামোজ্জ্বল করিয়াছেন। আমরা শ্রীমতী সরোজিনীর ন্যায় শ্রীযুক্তা অমিয়া বানার্জ্জীর নিকটও বহু আশা করি, আশা করি সাহিত্য-চর্চ্চায় তিনিও নাইডুর ন্যায় উচ্চস্থান অধিকার করিয়া দেশের নাম গৌরবান্বিত করিবেন।

সমাজ।

প্রাচীন সময়ে বিক্রমপুরের সমাজ বিশেষ শক্তিশালী ছিল, তখন জন সাধারণকে সমাজের শাসন নত মস্তকে বহন করিতে হইত। ব্যভিচার প্রভৃতি গুরুতর দোষে ধোপা, নাপিত ও হুকা বন্ধ সেকালের কঠোর দণ্ড ছিল। সমাজের নেতার বাক্য হেলা করিবার ক্ষমতা কাহারও থাকিত না। সেকালের পঞ্চায়েতী প্রথার অদম্য ক্ষমতা এখন হ্রাস হইয়া গিয়াছে। এখন সকলেই সাম্যনীতির পক্ষপাতী। কেহই ছোট হইয়া থাকিতে চাহে না। নগরের কল-কোলাহল হইতে দূরে, সুদূর পল্লীগ্রামে এখনও এই সমাজ-শক্তি সম্পূর্ণরূপে অন্তর্হিত হয় নাই।

* ভারত মহিলা দ্বিতীয় খণ্ড ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

বর্ত্তমান যুগের শিক্ষিত সমাজের এবং জন সাধারণের রুচির সহিত সেকালের রুচির তুলনা করিলে বিস্ময়ান্বিত হইতে হয়। তখন অশ্লীলতা সমাজে দোষাবহ বলিয়া পরিগণিত হইত না। অশ্লীল গান, অশ্লীল আমোদ, অশ্লীল রসিকতাকে লোকে বিশেষ ভাবে প্রশ্রয় দিত। কবির গান, পাঁচালী, হোলী সঙ্গীত ইত্যাদি বিশেষ আদরণীয় ছিল। যিনি যত অশ্লীল গানে অশ্লীল ভাষায় গল্প-স্রোত প্রবাহিত করিতে পারিতেন, তিনিই তত সুরসিক বলিয়া বিবেচিত হইতেন। এমন কি রমণী সমাজেও অশ্লীলতা ঘৃণ্য বলিয়া বিবেচিত হইত না। দ্বিতীয় বিবাহের সঙ্গীত ও তাহার অশ্লীল ও উশৃঙ্খল ব্যবহার অদ্যাপি তৎকালীন রমণী-সমাজের জঘন্য রীতির ক্ষীণ-স্মৃতি বহন করিতেছে। তখনকার দিনে গান, বাজনার মধ্যে কবি, পাঁচালী ও যাত্রা বিশেষ আদৃত হইত, ধনবানের মজলিসে বাই খেমটার নাচও বাঙ্গালা মদের লীলা তরঙ্গও খুব চলিত। পুরুষদিগের মধ্যে 'বাবড়ী' বা লম্বা চুল রাখা একটা বিশেষ ফ্যাসান ছিল, গায়ে সার্ট, কোটের পরিবর্ত্তে 'আঙরাখাই' তখন সৌন্দার্য্য বৃদ্ধি করিত। আর শ্রীচরণ যুগলের শোভা সাধনার্থ ধনীরা দিল্লীর 'নাগড়াইজুতা' ব্যবহার করিতেন, মধ্যবিত্তাবস্থাপন্নের ভদ্র লোকেরা সাধারণ চামারের তৈয়ারী চামের সেলাই করা চটিজুতা ব্যবহার করিয়াই ভদ্র সমাজে গমনাগমন করিতেন,—বাটীতে ছোট বড় সকলেরই কাষ্ঠ পাদুকা বা খড়ম অবলম্বনীয় ছিল।

সেকালের রুচি

চরকার সূতা।

গ্রাম্য তন্তুবায় শ্রেণীই তখন বস্ত্র যোগাইত ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ভদ্রবংশীয়দের প্রত্যেকের বাড়ীতেই তখন কার্পাস বৃক্ষ রোপিত হইত, সে সকল কার্পাস তুলার সাহায্যে চরকার দ্বারা ভদ্র-কুল-লক্ষ্মীগণ সূত্র নিৰ্ম্মাণ করিয়া তন্তুবায় শ্রেণীদিগকে

দিতেন, তাহারা তৎবিনিময়ে যথা সম্ভব অল্প মূল্যে বস্ত্র যোগাইত। যে চর্‌কা এখন গৃহ কোণে লাঞ্ছিত ও ধূলি সমাচ্ছন্ন একদিন তাহারি সহায়-তায় কত নিরন্ন পরিবারের অন্নের সংস্থান হইত, কত সহায় সম্বল বিহীনা নিজ নিজ জীবিকা-নির্ব্বাহ করিতেন। কত অভিভাবক বিহীন দরিদ্র বালক, দীনা জননীর চরকার সূত্র বিক্রীত অর্থ-সাহায্যে বিদ্যাভ্যাস করিয়া কালে কৃতী হইয়া গিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। সে যুগে ধনবানেরা ঢাকাই কাপড়, আবদুল্লাপুরের রেস্‌মী বস্ত্র, ধামারাইয়ের সু-চিকণ ধুতি ব্যবহার দ্বারা দেহ-যষ্টির শোভা সম্পাদান করিতেন। ঢাকার সূক্ষ্ম বস্ত্র ও উত্তরীয় বসনেরই সমধিক আদর ছিল।

যাতায়াত ও যান বাহন অলঙ্কার ইত্যাদি।

পূর্ব্বে যাতায়াতের জন্য ধনবানেরা স্থলপথে পাল্কী, ঘোড়া, হস্তী ও জলপথে পান্সী, বজ্‌রা, কোষা, ও ডিঙ্গী নৌকা ইত্যাদি ব্যবহার করিতেন। স্ত্রীলো-কেরা ডুলি, মহাপায়া, চতুর্দ্দোলা ইত্যাদিতে আরোহণ করিয়া কুটুম্ব বাড়ীতে গমনাগমন করিতেন। স্ত্রীলোকেরা স্বর্ণ ও রৌপ্য উভয়বিধ অলঙ্কারই ব্যবহার করিতেন। তবে স্বর্ণালঙ্কার অপেক্ষা রৌপ্যালঙ্কারেরই সমধিক প্রচলন ছিল। তখন রমণীগণ সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির নিমিত্ত হাতে কাল্‌সী, একদানা, কঙ্কন, তার, বয়লা (বালা) জসম, বাজু, ছিপবাহু, পৈছী, নাকে নত, বোলক, নোলক, নাকফুল, কাণে পাশা, গলে মটর দানা, বা কণ্ঠ মালা, হাসুলি বা হাঁসুলি, কোমরে শিকল, চন্দ্রহার, পায়ে বেকী, পায়জার, গোলখাড়ু, বেকখাড়ু, তোড়ল, নেপুর বা নূপুর, ঘুঘ্‌রাতোড়া ইত্যাদি। বর্ত্তমান সময়ে এসকল অলঙ্কার কচিৎ নিম্নশ্রেণীর রমণীদের মধ্যে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। নবীনা ভদ্র মহিলাগণ এখন প্রাচীনাদের এসকল প্রাচীন ফ্যাসানের অলঙ্কারের নাম শুনিয়াও নাসিকা কুঞ্চিত করেন। তাঁহারা এখন অনন্ত, বালা, চিক, ইয়ারিং, হার, কাণ, ইত্যাদি ব্যবহার করিয়া প্রসাধন কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। রৌপ

অলঙ্কারের এখন 'নাইক জারি জুরি।' পূর্ব্বে স্ত্রীলোকেরা পোষাকি কাপড় স্বরূপ লটকন সাড়ি, চুনারির সাঁড়ি, গুল বাদাম, রাস মণ্ডল, নীল কন্ধা, বারাণসী, মস্‌লিন, জামদানি, সবনাম ইত্যাদি নিজ নিজ অবস্থানুযায়ী ব্যবহার করিতেন। ছোট ছোট বালকেরা ৪।৫ বৎসর কিংবা সময়ে সময়ে ৭।৮ বৎসর পর্য্যন্ত ও উলঙ্গ থাকিত ঐ সকল ছেলেদের হাতে বালা, বাজু, কোমরে ঘুঘড়া তোড়া ও পায়ে খাড়্‌ থাকিত। পূর্ব্বে স্ত্রীলোকেরা স্বামীর নাম, ভাসুরের নাম ও শ্বশুর ভাসুরের নাম, এমন কি ঐ নামের আদ্যাক্ষরও উচ্চারণ করিতেন না। পুরুষদের পূর্ব্বে আহার করিতেন না,—দিবাভাগে পতিসম্ভাষণ নীতিবিরুদ্ধ ছিল।

বিবাহে পণ-প্রথা, কন্যাপণ।

বর্ত্তমান যুগে যেমন কাহারো গৃহে কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করিলে হাহাকার ধ্বনি উত্থিত হয়, অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে আবার তেমনি কন্যা জন্মগ্রহণ করিলে আনন্দ-ধ্বনি উত্থিত হইত, কারণ সে সময়ে সমাজে কন্যা-পণ প্রচলিত ছিল। ব্রাহ্মণ, বৈদ্যও কায়স্থগণের মধ্যে কন্যাপণ অত্যন্ত অধিক পরিমাণে থাকায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বেও বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় বিবাহ এত সহজ ছিল না। বৈদ্যও কায়স্থগণ অপেক্ষা রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণ-গণের মধ্যে ইহা অত্যন্ত অধিক পরিমাণে থাকায় ঐ সমাজে অনেককেই অবিবাহিত ভাবে কুমার-জীবন যাপন করিতে হইত। সহস্র মুদ্রার কমে প্রায়শঃই কন্যা বিক্রীত হইত না। এখনও এমন দুই একটী বৃদ্ধ দেখিতে পাওয়া যায়, যাঁহারা পণের অর্থ যোগাইতে না পারায় গৃহ-লক্ষ্মীকে গৃহে আনিতে পারেন নাই।

পূর্ব্ববঙ্গে ভরার মেয়ে।

ভরার মেয়ে পূর্ব্ববঙ্গের বিশেষতঃ বিক্রমপুর ব্রাহ্মণ সমাজের ভীষণ কলঙ্ক। কন্যাপণ দিয়া বিবাহে অক্ষম পুরুষগণের বিবাহের সুবিধার্থ দুষ্টবুদ্ধি ঘটক-

গণ নানাস্থানের দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত কিংবা অন্য নানাবিধ উপায়ে সংগৃহীত অভিভাবকবিহীনা নানা জাতীয় লোকের কন্যা সংগ্রহ করিয়া অল্প মূল্যে বিক্রয় করিতেন। কন্যাপণের নানা দুর্ঘটনা দর্শন করিয়া প্রসিদ্ধ সমাজ-সংস্কারক রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় মহাশয় যে সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন এখানে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম, উহা হইতেই পাঠকবর্গ কন্যাপণের অপকারিতা ও সমাজের কলঙ্ক-কাহিনী অবগত হইতে পারিবেন।

দাশরথীর সুর—তাল ঠেস্‌ কাওয়ালী।

তোরা দেখ এসেলো বৌ, দীপেরে চেরাক কয়।
(পোড়া) লোকে কয়, বিয়ে হলেই হয়, (মোদের)
অর্থ গেল বিত্ত গেল
এ পথ গেল, ও পথ গেল (এখন) প্রকাশ পেল,
এটা হিন্দুর মেয়ে নয়।
এ মেয়ে নাকি কয়দিন ছিল ঢাকা লো, ছিল
দিনেক দুদিন ঢাকা লো, তার
পরে অঢাকালো, ঢাক ঢোল বাজিল, কত ঢাকালো,
(হায় হায়)
এ মেয়েতে গেল কত টাকা লো! কত দিগ্‌
দিগন্তর ভ্রমে ভ্রমে, আন্‌লে
কত পরিশ্রমে, (এখন) ক্রমে ক্রমে গুপ্ত কথা
ব্যক্ত হয়।
কিসের বিয়ে এ বিয়েত বিয়ে নয়, লাভের মধ্যে
এই হয়, মোদের
কেবল টাকা ক্ষয়, না জানি সমাজে কিবা দশা
হয় (হায় হায়)

এ কন্যাপণে কিনা হয়! দেখে দুঃখে নয়ন ঝরে,
জাত মান কুল
সব গেল রে (এ মেয়ে) কত ছেলে মেয়ের মা
হয়েছে মনে হয়।

সৌভাগ্য ক্রমে 'ভরার মেয়ের' নীচ ব্যবসা অনেক কাল হইল বিক্রমপুর হইতে সম্যকরূপে অন্তর্হিত হইয়াছে, আর ঐরূপ কন্যার পাণি-গ্রহণ নিতান্ত হীনাবস্থাপন্ন দরিদ্র ব্রাহ্মণ ছাড়া প্রকৃত ভদ্র বংশোদ্ভব উচ্চ শ্রেণীর কোন ব্রাহ্মণেই করিতেন না, কাজেই বিক্রমপুর ব্রাহ্মণ-সমাজের শুভ্র যশ এই হীন কলঙ্ক দ্বারা কলঙ্কিত হয় নাই। কন্যাপণের পরিবর্ত্তে সমাজে এখন বরপণ প্রবেশ লাভ করিয়াছে। বিক্রমপুরস্থ বৈদ্য ও কায়স্থ সমাজের মধ্যেই ইহা ভীষণাকারে প্রচলিত। কায়স্থ সমাজ অপেক্ষা আবার বৈদ্য সমাজে ইহা অধিকতর সংক্রামিত, উহা দূরীকরণার্থ কয়েক বৎসর যাবত 'বিক্রমপুর অম্বষ্ঠসম্মিলনী' সভা চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হন নাই।

মহিলা বারব্রত।

শিক্ষা ও সভ্যতার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে একদিন যে প্রাচীন প্রথাগুলি সমাজ-তরুকে লতার মত দৃঢ়রূপে বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছিল, তাহা দুর হইয়া যাইতেছে। যে সুন্দর সুরুচি-সঙ্গত বারব্রতের ছড়ার মধুর আবৃত্তিতে নিবিড়-তরু-ছায়া-সমাচ্ছন্ন পল্লীগুলির নিভৃত কুটীর প্রাঙ্গণ প্রতিধ্বনিত হইত, যাহার উৎসাহে বালিকাগণ ও বয়স্কা গৃহিনীগণ একদিন প্রচুর আমোদ ও শান্তি অনুভব করিতেন, এখন ক্রমশঃই তাহা অস্তগমনোন্মুখ। আমরা এখানে বিক্রমপুর অঞ্চলে প্রচলিত অবিবাহিতা বালিকাদিগের আচরণীয় কতকগুলি বারব্রতের কাহিনী সংকলিত করিয়া প্রকাশ করিলাম এবং বিবাহিতা বয়স্কা স্ত্রীলোকদিগের ব্রতাদির বিষয় কেবল উল্লেখ করিয়া গেলাম, কারণ সে সকল অধিকাংশই পৌরাণিক

ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, কাজেই সে গুলির সহিত বঙ্গের অন্যান্য অঞ্চলের প্রচলিত ব্রতাদির সঙ্গে এক হইবার সম্ভাবনাই বেশী। শীতের কুহেলিকাসমাচ্ছন্ন প্রভাতে সূর্য্যদেব পূর্ব্বগগনে দেখা দিবার অনেক পূর্ব্বে ছোট ছোট অবিবাহিতা বালিকাগণ পুকুরপাড়ে বসিয়া যখন সমস্বরে ছড়া আওড়াইতে আওড়াইতে মাঘমণ্ডল ব্রতের সূর্য্য দেবকে উঠাইতে থাকে, তখন সে ছড়া শুনিতে বড়ই মনোহর বোধ হয়।

মাঘমণ্ডলের ব্রত।

সারা মাঘমাস এই ব্রত (বর্ত্ত) করিবার নিয়ম। পাঁচ বৎসর কাল এই ব্রত করিতে হয়। ইট, চাউল, অঙ্গার, বিল্বপত্র, হলুদ ইত্যাদি গুঁড়া করিয়া যথাক্রমে পাঁচ বৎসর পাঁচটী মণ্ডল অঙ্কিত করিয়া মেয়েরা এই ব্রত করিয়া থাকে। মণ্ডলের উপরাংশে সূর্য্য, সর্ব্বনিম্নে অর্দ্ধচন্দ্র এবং মধ্যে মণ্ডল অঙ্কিত করিতে হয়। শেষ বৎসর অর্থাৎ পাঁচ বৎসরের পর ব্রত সাঙ্গ হয়। তখন বালিকাগণ ঘাট হইতে ছড়া পড়িয়া পরে বাড়ীতে আসিয়া মণ্ডল মধ্যে লাড়ু, মধু, ঘৃত প্রভৃতি অর্পণপূর্ব্বক নিম্নলিখিত মন্ত্রপাঠে ব্রত শেষ করে ;—

মাঘমণ্ডল সোণার কুণ্ডল
সোণার কুণ্ডলে ঢাইলা (ঢালিয়া) ঘি,
বড় মাইন্ষের (মানুষের) পুতের ঝি।
সোণার কুণ্ডলে ঢাইলা মৌ (১)
বড় মাইন্ষের পুতের বৌ।
সোণার কুণ্ডলে ঢাইলা লাড়ু,
শাখার আগে সোণার খাড়ু।

(১) মধু।

চন্দন কাষ্ঠে রাধি,
জিরা তুষ ফিকি, (২)
দোলায় আসি ঘোড়ায় যাই
আঁকে (৩) বইসা (বসিয়া) দইভাত খাই।
চন্দ্র সূর্য্যে দিয়া ফুল,
ভইরা (ভরে) উঠুক তিন কুল।

ব্রতিনীর কামনা এই মন্ত্রের মধ্যে সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত রহিয়াছে; সে কি চায়? একান্নবর্ত্তী পরিবারের পুত্রবধূ হইতে ও বর্ত্তমান যুগের সীমন্তিনীগণের মত পাচকঠাকুরের হস্তে রন্ধনকার্য্যের ভার অর্পণ করিয়া দূরে থাকা অপেক্ষা রন্ধনের ভার লইবার জন্যই সে ইচ্ছুক, আর তার শেষ কামনা—যেন পিতৃমাতৃ ও ভ্রাতৃ এই তিন কুলের মঙ্গলের সঙ্গে সঙ্গে বংশ বৃদ্ধি পায়।

আমরা এখানে সূর্য্য উঠাইবার ছড়াও উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

সূর্য্য উঠাইবার ছড়া।

ওঠ ওঠ সূর্য্যদেব ঝিকিমিকি দিয়া,
না উঠিতে পারি আমি ইয়লের (১) লাইগা,
ইয়লের পঞ্চকোটি শিয়রে থুইয়া (২),
সূর্য্য উঠ্‌বেন কোন্‌খান দিয়া?
বামুন বাড়ীর ঘাটা দিয়া।

(২) রাঁধিবার সময় চুল্লির ভিতর জিরা তুষ নিক্ষেপ করা;—বোধ হয় সম্পাদ-বোধার্থ ব্যবহৃত হইয়াছে। (৩) আঁকে অর্থাৎ মণ্ডলের মধ্যে। ব্রত-সমাপ্তির বৎসরে মণ্ডলে বসিয়া দুধভাত খাইতে হয়। আর "দোলায় আসি ঘোড়ায় যাই" এই ঘোড়ার অংশ পাঠে বুঝিতে পারা যায় যে, সেকালের বিক্রমপুরবাসিনী নারীদিগের মধ্যে বোধ হয় অশ্বারোহণ প্রচলিত ছিল।

(১) কুয়াসা (২) রাখিয়া।

বামুনদের মাইয়ারা (মেয়ে) বড় শেয়ান, (৩)
পৈতা যোগায় বেহান বেহান (৪)।
ওঠ ওঠ সূর্য্যারে ঝিকিমিকি দিয়া।

*　*　*　*　*

সূর্য্য ওঠ্‌বেন কোন্‌খান দিয়া ?
বটগাছটির আগা দিয়া,
নবীন পৈতা গলায় দিয়া,
কামরাঙা সিন্দূর কপালে দিয়া,
লাল গামছা কাঁধে কইরা (করিয়া)
ওঠ ওঠ সূর্য্যরে ঝিকিমিকি দিয়া ?

*　*　*　*　*

সূর্য্য ওঠ্‌বেন কোন্‌খান দিয়া ?
বৈদ্য বাড়ীর ঘাটা দিয়া!
বৈদ্যের মাইয়ারা বড় শেয়ান,
সন্ধ্যা পূজা করে বেহান বেহান।
তার গোতলাইনা (৫) জল পুষ্করিণীতে ভাসে,
তাহা দেইখা (দেখিয়া) মাইলানী ঝি খট্‌খটাইয়া হাসে।
হাসচ্‌ কেন্‌লো মাইলানী (মালিনী) ঝি তুইত আমার সই,
মাঘমণ্ডলের বর্ত্ত করতে ঘাট পাইমু কই ?
আছে আছেলো ঘাট শূদ্রবাড়ীর ঘাট

*　*　*　*　*

আমের বউল (৬) আসেরে লোচা লোচা (৭)
বাপ ভাইরে দিমু আমরা তসরের কোচা (৮)

---

(৩) সেয়ানা (৪) ভোর (৫) ঘোলা (৬) মুকুল (৭) থোপাথোপা (৮) কাপড়।

দে দে আম গাছটা ঝল্লই (৯) দে,
ছকুড়ি ছয়টা আম লেইখ্‌খা দে,
লেখ্‌তে পড়তে গোটা হইল উনা (১০)
কাইটা কুইটা ফালালো সিপাইর কাণের সোণা,
সিপাইর কাণের সোণা না লো লড়িয়ার (১১) পিত্তল,
এই বর্ত্ত করি আমরা মাঘের শীতল।
মাঘের জল ফুটি টল মল করে,
উইড়া (উড়িয়া) যাইতে পইখটা পুইড়া পুইড়া মরে।
হাতে লইলে ফটিক জলে।

*   *   *   *   *

বট গাছটি মেল্‌লো পাত,
সূর্য্য ঠাকুর জগন্নাথ।

এই ব্রতের ছড়াগুলি অত্যন্ত দীর্ঘ, সে সকলের পূর্ণরূপে উল্লেখ করিতে গেলে উহা দ্বারাই একটী স্বতন্ত্র প্রবন্ধ রচিত হইতে পারে। এ সকল ছড়ার মধ্যে অনাবশ্যক বাক্যচ্ছটা এবং অর্থহীন বহু শব্দের সংযোজনা থাকিলেও এবং কোন প্রকার ছন্দের মাধুর্য্য না থাকিলেও মাঘের দারুণ শীতের প্রভাতে পল্লীবাসিনী বালিকাগণের মুখে সুরের ঝঙ্কারের সহিত ইহা যখন উচ্চারিত হইতে থাকে, তখন আবৃত্তির মাধুর্য্যে আপনা হইতেই শ্রোতার মন মুগ্ধ করিয়া ফেলে, সে সময়ে ইহার রচনা বা অর্থের জন্য কাহারো একটা মনোযোগ থাকে না। এসকলের মধ্যে একেবারেই কোন সত্য নিহিত নাই, তাহাই বা কিরূপে বলিতে পারি? যেমন বাঙ্গালা দেশের সর্ব্বত্র রমণীকণ্ঠোচ্চারিত দুরন্ত শিশুকে ঘুম পাড়াইবার ছড়া,—

"খোকা ঘুমাল পাড়া জুড়াল বর্গী এল দেশে,
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দিব কিসে?" ইত্যাদি—

(৯) ঝুলে পড়া (১০) কম (১১) খারাপ, কৃত্রিম।

হইতে বর্গীর হাঙ্গামার চিত্রটা আমাদের হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়া যায়, তেমনি বিক্রমপুরের প্রচলিত "থুয়া ব্রত" হইতেও একটা প্রাচীন ঐতিহাসিক চিত্র অলক্ষ্যে আমাদের হৃদয়ে ছায়াপাত করে। সূক্ষ্ম মনোবৃত্তির পরিচালন দ্বারা দেখিতে গেলে, ইহাদের প্রত্যেকটির মধ্যেই অতি গুপ্তভাবে লুক্কায়িত যে সত্য আছে, তাহার অর্থ সুস্পষ্ট প্রকাশ হইয়া পড়ে।

থুয়া ব্রত।

সমগ্র অগ্রহায়ণ মাসে এই ব্রত করিবার নিয়ম এবং চারি বৎসরে ইহার সমাপ্তি হয়! প্রতিদিন ভোরে কিছু না খাইয়া মাটীর মধ্যে একটী গোলাকার গর্ত্ত খনন করিয়া তাহার চারি পারে চারিটী এবং মধ্যে একটী "থুয়া" (মাটির স্তূপ) বসাইয়া ছড়া বা মন্ত্র পড়িতে হয়। ছড়া এই,—

থুয়া পূজে থুয়ানী (১)
আগুণ মাসের বৌয়ানী (২)
হাতে ঝাড়ি (৩) কাখে কলসী।

থুয়া পুইজা ঘরে গেলেন, মাকে নমস্কার কর্‌তে,—মা কি আশীর্ব্বাদ কল্লেন?

আকালে (৪) ভাতস্তি (৫) হইও,
সকালে পুতস্তি (৬) হইও,
রণে আইয়ো (৭) হইও
জলে সায়তি (৮) হইও

(১) ব্রতিনী (২) বধূগণ (৩) গাড়ু (৪) দুর্ভিক্ষ (৫) ভাতস্তি অর্থাৎ বহু অন্নবিশিষ্ট,—অন্নদানপরায়ণা অন্নপূর্ণা হইও অর্থাৎ দুর্ভিক্ষের সময়েও যেন তোমার ভাণ্ডার পূর্ণ থাকে। (৬) পুত্রবতী (৭) এয়ো, অর্থাৎ যদি তোমার স্বামী যুদ্ধেও যায় তথাপি তুমি এয়ো থেকো, ইহার অর্থে বুঝায় যেন স্বামী রণজয়ী হইয়া আইসে।।বোধ হয়, যখন এই ব্রত প্রচলিত হয়, তৎকালে বিক্রমপুরবাসীগণ যুদ্ধ করিতে যাইতেন; চাঁদকেদার রায়ের মাতৃ-ভূমিতে ইহা অসম্ভব বলিয়া বিবেচিত হয় না। (৮) সায়তি অর্থাৎ তুমি জলে পূর্ণ হইও।

ভাদ্রমাসের গঙ্গাজল যেমন ভরপুর থাকে,
তুমি তেমন ভরপুর থাইকো (থাকিও)।

তুষতুষালি।

সমগ্র পৌষমাস এই ব্রত করিবার নিয়ম, থুয়া ব্রতের মত এই ব্রতেও ব্রতিনী প্রাতে কিছু না খাইয়া তুষ ও গোবর দ্বারা একএকটী পিণ্ড নির্ম্মাণ করিয়া মন্ত্র পাঠ করতঃ তাহার পূজা করে। মন্ত্র এইরূপ ;—

তুষ তুষালি কাঁধে ছাতি,
বাপের ধন লাতিপাতি (৯)
ভাইর ধন লাস পাশ,
সোয়ামির ধন টগর বগর (১০)
পুতের ধন অতি ঝগর (১১)
অষ্টবর্ণের (১২) গোবর,
নবান্নের তুষ,
বিয়া কর স্বর্গের উপর,
গাই বিয়ন্ত,
আখা (১৩)জ্বলন্ত,
ঢেঁকি পড়ন্ত,
সন্ধি বিলাস (১৪),
পাট কাপড়খানা রাত্রিবাস। (১৫)

(৯) বৎসামান্ত (১০) প্রচুর (১১) কলহপূর্ণ (১২) বলদ (১৩) চুলা। (১৪) অর্থাৎ এমন পরিবারে তোমার বিবাহ হউক যেখানে গাই বিয়ন্ত, আখা জ্বলন্ত, ঢেঁকি পড়ন্ত, আর বিলাসিতার মধ্যে সন্ধি—সংসারে যাহাদের সহিত ঘর করিতে হইবে, তা কে জানে ভাই-ভাজ, কে জানে স্বামীপুত্র, কে জানে যা-ননদ, দেবর-ভাশুর, শ্বশুর-শাশুড়ী আর কে জানে পাড়াপড়্শী তাহাদের সঙ্গে সন্ধি অর্থাৎ প্রীতি এবং (১৫) রাত্রিবাসের কাপড়খানা পাট কাপড় হইলেই হইল—সে যুগ এখন কোথায়?

স্ত্রীলোকের পক্ষে চিরদিনই যে পিতৃধন, ভ্রাতৃধন ও পুত্রধন অপেক্ষা স্বামীর ধন আদরণীয় ও তাহাতেই স্ত্রীলোকের অধিকার বেশী, এই ব্রতের ছড়া হইতে কি তাহা সুস্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় না? এ সকল ছড়া যে নারীসুলভ অন্তর্দৃষ্টির সহিত রচিত তাহাতে সন্দেহ করিবার কি কোন কারণ আছে?

ফাগুন কুণা।

সারা ফাল্গুন মাস ব্যাপিয়া এই ব্রত করিবার রীতি প্রচলিত আছে। চারি বৎসরে ইহা সাঙ্গ হয়। প্রত্যূষে কল্ক দ্বারা মণ্ডলাঙ্কিত করিয়া এই ব্রতের মন্ত্রোচ্চারণ করিতে হয়। মন্ত্রের শেষ চরণেই ব্রতিনীর কামনা পরিব্যক্ত রহিয়াছে।

ফাগুণ কুণা গুণ ফাগুণা,
গুণনিধি ছৈল (১) গুয়া (২) লইল পান,
ঘাটে দোলা পথে ঘোড়া,
উঠানে ফাগুন কুণা,
খাটালে (৩) খাট,
মাইজালে (৪) ভোজন পাট (৫)
তিল-তুলসী রাত্রে,
ঘি-তুলসী পাত্রে,
ইন্দ্র রাজা জিজ্ঞাসা করেন ধর্ম্মরাজার ঠাঁই (৬)
ঐ পাড়ার বালিরা (৭) কিসের বর্ত্ত করে?
চাইর (চারি) বছর ধইরা তারা ফাগুণ কুণা করে।
ভাই আমার লক্ষীশ্বর,
বাপ আমার রাজা।

---

(১) ছেলা (২) সুপারী (৩) পশ্চাৎ দুয়ারে (৪) গৃহের পশ্চাৎদিকের অংশ (৫) স্থান (৬) কাছে (৭) বালিকারা।

ফাগুণ কুণায় দিয়া ফুল,
ভইরা উঠুক তিন কুল।

তারাব্রত।

মাঘ মাসের প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে এই ব্রত করিতে হয়। প্রতিদিন একএকটী মণ্ডলের মধ্যে চন্দ্র, সূর্য্য ইত্যাদি অঙ্কিত করিবার নিয়ম। প্রথম বৎসর চারিটী, দ্বিতীয় বৎসরে আরও চারিটী, তৃতীয় বৎসরে আরও চারিটী, সরা, খই, গুড়, মোয়া, (মোদক) ক্ষীরের লাড়ু, ইত্যাদি দ্বারা পূর্ণ করিয়া মণ্ডলের চারিধারে রাখিতে হয়—এই ব্রতও চারি-বর্ষে সাঙ্গ হইয়া থাকে। সংক্রান্তি-দিবসে অন্নের পরিবর্ত্তে দধি ও খই ভোজন করিতে হয়। মন্ত্র বা ছড়া এইরূপে কথিত হইয়া থাকে ;—

এক তারা দুই তারা * * * ষোলতারা পূজি।
ষোল ষোল তারা তোমরা হইয়ো সাক্ষী।
ঘৃত দিয়া করি আমি পঞ্চগ্রাসী (১)।
সাগর আন কাগর আন (২)
ষোল ঘরের ভূজ্যি (৩) আন,
ষোল ঘরের ষোল বর্ত্তি,
আমি তাদের অধিপতি।

শঙ্কর জিজ্ঞাসেন—গৌরী তারা পূজি কি কি ফল পায়? গৌরী বলেন,

শঙ্কর হেন স্বামী পায়,
কার্ত্তিক গণেশ পুত্র পায়,
লক্ষ্মী সরস্বতী কন্যা পায়,

(১) পঞ্চগ্রাস ভোজন করা। (২) "সাগর আন কাগর আন" অর্থে ব্রতের আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি আনয়নের অর্থ বুঝাইতেছে। (৩) ভোজ্য।

নন্দী ভৃঙ্গী নফর পায়,
জয়া বিজয়া দাসী পায়।
ষোল ব্রতীর হাতে ষোল সরা দিয়া,
আমি যাই ইন্দ্রপুরে নাটুয়া (৪) হইয়া।

ব্রতের ফল শ্লোকেই ব্যাখ্যাত রহিয়াছে।

যমপুকুরের ব্রত।

বিক্রমপুরে যমপুকুরের ব্রতের প্রচলন খুব বেশী। কার্ত্তিক মাস এই ব্রতের সময়। ঘরের বহির্ভাগে একটী ছোট পুকুর কাটিয়া তাহার চারি পার্শ্বে ধান, মানকচু, হলুদ ও কলাগাছ রোপণ করিয়া প্রাতে কিছু না খাইয়া একমাস কাল এই ব্রত করিবার নিয়ম। মাটির দ্বারা কাক, চিল, কুম্ভীর, যমরাজার মা ইত্যাদি নির্ম্মাণ করিয়া খনিত পুকুরের জলে স্নান করাইতে হয়। ব্রতকথা এইরূপ;—এক শ্বাশুরী তাহার পুত্রবধূকে এই ব্রত করিতে না দেওয়ার পাপে, মৃত্যুর পরে তাহার প্রেতাত্মার উদ্ধার হয় না। পরে তিনি পুত্রকে স্বপ্নে দেখা দিয়া বলিলেন যে বধূকে এ ব্রত করিতে না দেওয়ায় তাঁহার প্রেতাত্মার উদ্ধার হইতেছে না। পুত্র স্বপ্ন দেখিয়া স্ত্রীকে ঐ ব্রত করিতে অনুরোধ করিল, কিন্তু বধূ এখন সুযোগ বুঝিয়া বলিল যে সোণার পুতুল ও দুধের পুকুর না হইলে সে ব্রত করিবেনা। মাতৃমুক্তি-প্রয়াসী সন্তান অবশেষে স্ত্রীর প্রার্থনা মঞ্জুর করিতে বাধ্য হন, তৎপরে বধূ মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক ব্রত করে। মন্ত্র এই;—

ওলো ওলো কুদিরা খাই, ধানতলা না দিলি ঠাঁই,
" " " " মানতলা " "
" " " " কলাতলা " "
" " " " হলুদতলা " " ইত্যাদি।

(৪) নর্ত্তকী।

জীবিতকালে শাশুড়ী বধূকে ব্রত করিতে দেয় নাই, কাজেই শাশুরী বধূ কর্ত্তৃক তুচ্ছার্থে "ক্ষুদিরা ধাই" প্রভৃতি অবজ্ঞাসূচক সম্বোধনে সম্বোধিত হইয়াছেন। এই ব্রতদ্বারা বালিকাদিগের কোমল হৃদয়ে শৈশব হইতেই শাশুরীর প্রতি যে ঘৃণা ও বিদ্বেষের ভাব সঞ্চার করিয়া দেয় তাহা কোনরূপেই অভিপ্রেত নহে। প্রাচীন কালে শাশুরীগণ পুত্রবধূর প্রতি যে সকল নির্ম্মম অত্যাচার করিতেন, বোধ হয় তাহারি ফলে কোন সুচতুর পুত্রবধূ কর্ত্তৃক এই ব্রত প্রবর্ত্তিত হইয়া সেকালের বধূগণের সান্ত্বনার কতকটা কারণ হইয়াছিল। ব্রতের ফল—শাশুরীর সদগতি লাভ।

নাটাই মঙ্গলচণ্ডী।

অগ্রহায়ণ মাসে প্রতি রবিবারে এই ব্রত করিতে হয় এবং ব্রতশেষে পিষ্টক ভক্ষণ করিবার পদ্ধতি প্রচলিত আছে। এই ব্রতকথা কবিকঙ্কন মুকুন্দের চণ্ডীনামক বিখ্যাত গ্রন্থ হইতে গৃহীত হইয়াছে—ব্রতের ফল চণ্ডীর অনুগ্রহ লাভ।

মনসা ব্রত।

শ্রাবণ মাসে এই ব্রত করিবার নিয়ম, চারি বৎসরে ইহার সমাপ্তি হয়। ব্রতকথা অত্যন্ত দীর্ঘ এবং কেতকী ক্ষেমানন্দ প্রণীত লখীন্দর বেহুলার কাহিনী হইতে গৃহীত। শ্রাবণ মাসের শুক্ল ও কৃষ্ণা পঞ্চমী এবং আষাঢ় ও শ্রাবণ মাসের সংক্রান্তিতে এই ব্রত করিতে হয়। সর্পভয় নিবারণের নিমিত্তই এই ব্রত করিয়া থাকে।

ত্রিভুবন চতুর্থী।

মাঘ মাসের শ্রীপঞ্চমীর পূর্ব্বদিন এই ব্রত করিতে হয়, ইহাও চারি বৎসর করিবার নিয়ম। কাঁটালের পাতার উপর নিম্নলিখিত রূপ লিখিতে হয়—

আগুনের চাউল, পৌষের সরাটোপ। মাঘের পাণি,
অমুকে যে বর্ত্ত করে ত্রিভুবনে জানি।

কোন কোন স্থানে ইহাকে বরদা চতুর্থীও বলে। এতদ্ব্যতীত বয়স্কা স্ত্রীলোকগণ জামাই ষষ্ঠি, শীতলা-নিস্তারিনী, জরাজরি, (জরারির অপভ্রংশ নয় ত? এই ব্রত সাধারণতঃ জ্বর নিবারণোদ্দেশে করা হয়) প্রভৃতি করিয়া থাকেন। ইহা ছাড়া আশ্বিন কিম্বা কার্ত্তিকে ভ্রাতৃদ্বিতীয়া, অগ্রহায়ণ মাসে ইয়াতলি, চৈত্রমাসে ঝলকা ব্রত করা হইয়া থাকে। শীতলা বসন্তরোগের, ঝলকা ওলাউঠার ইয়াতলি ফোটপাঁচড়া ইত্যাদির প্রতিষেধস্বরূপ করা হয়। পৌরাণিক ব্রত সকলের মধ্যে জলদান, ফলদান, অনন্তব্রত, ললিতাসপ্তমী, দুর্ব্বাষ্টমী, তালনবমী—এ গুলি সধবা ও বিধবা উভয়েরই করণীয়, আর সাবিত্রীব্রত, অক্ষয়সিন্দূর পঞ্চমীব্রত, দধিসংক্রান্তি, এয়োসংক্রান্তি ব্রত সধবাগণ করিয়া থাকেন।

নিরাকুল পরমেশ্বরী, মুস্কিলআসান প্রভৃতি আরও কয়েকটি ব্রত বিক্রমপুরের স্থানবিশেষে প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়, এই ব্রত দুইটীর কথা অত্যন্ত দীর্ঘ ও সুন্দর।

দিন দিন এই বারব্রতগুলি উপেক্ষিত হইয়া আসিতেছে, শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অনেকেই অর্থহীন এ সকল ছড়াপাঁচালীকে নিতান্ত তুচ্ছজ্ঞানে ঘৃণা করিয়া আসিতেছেন এবং নিজ নিজ কন্যাভগিনীকে যত্নপূর্ব্বক উহাদের নিকট হইতে দূরে রাখিতেছেন; ইহা যে কোন্ হিসাবে ন্যায় সঙ্গত তাহা বুঝিতে পারি না। যাহা এতদিন বংশপরম্পরায় শত বাধাবিঘ্ন ও পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়াও আপনার অস্তিত্ব কোনওরূপে রক্ষা করিয়া আসিতেছে তাহা কোন প্রকারেই উপেক্ষণীয় নহে। আপনার দেশকে ও আপনার মাতৃভূমিকে ভাল করিয়া জানিতে হইলে, তাহার প্রত্যেক বিষয়কেই তুচ্ছ না করিয়া সাদরে গ্রহণ করতঃ উহার ভালমন্দ বিচার পূর্ব্বক যত্নের সহিত গ্রথিত করিয়া রাখা কর্ত্তব্য। নবীন সভ্যতার

সংঘর্ষে এ সকল ব্রত যাহাতে লুপ্ত হইয়া যাইতে না পারে, সেজন্য আমাদের সর্ব্বতোভাবে মননিবেশ করা উচিত।

খেলার বিবরণ।

বিক্রমপুরের সর্ব্বত্র নানাবিধ ক্রীড়া-কৌতুক প্রচলিত আছে। দেশ প্রচলিত এই সকল চিরন্তন প্রথা হইতে প্রাচীন কালের সামাজিক ইতিহাসের বহু বিবরণ জানিতে পারা যায়। আমরা এখানে চল্‌তি বস্‌তি ইত্যাদি খেলাগুলির উল্লেখ করিলাম। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি দেশী এবং কতকগুলি বিদেশী। চল্‌তি খেলা অর্থে (out door game) শরীর সঞ্চালক এবং বস্‌তি খেলা অর্থে (indoor Game) বা মানসিক অনুশীলন শীর্ষক ক্রীড়া বুঝিতে হইবে। চল্‌তি খেলার মধ্যে বিক্রমপুরে ডুগুডুগু (হা ডুডু) দাড়িয়াবান্ধা, গোল্লাছুট, চোক বুজানি বা লুকোচুরি, বুড়ী ছোয়ানি, এতদ্ব্যতীত বসুমতী, কুমীরকুমীর, মাছমাছ,লোস্তালোস্তা, ডাণ্ডাগুলি বা দাণ্ডাগুলি, বাইগন টিপ টিপ, নলডুবানী, তাত্ত্ব রুস্তা ভুকম্বা ইত্যাদি খেলাগুলি প্রধান। এ সকল খেলার মধ্যে আবার গোল্লাছুট এবং ডুগুডুগু সর্ব্বাপেক্ষা আদরণীয়। বৈদেশিক ক্রীড়ার মধ্যে ফুটবল ও ক্রীকেট প্রায় প্রতিগ্রামে প্রচলিত, তা ছাড়া টেনিস, বেডমিনটন ইত্যাদিও কোন কোন গ্রামে প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়। ক্রীকেট খেলার জন্য মালখানগর, সেখরনগর এবং বহর এই তিনটী গ্রাম এক সময়ে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। বস্‌তি খেলা বা মানসিক খেলার মধ্যে তাস, পাশা' সতরঞ্চ, দাবা, ষোলগুটি মঙ্গলপাটা ২৪গুটী বাঘচাল, তিন গুটি বাঘচাল, দশ পঁচিশ, বারগুটি পাইটপাইট, জোড়বেজোড়, বুদ্ধিমন্ত, ফাক্কা ফাক্কা বা টাইলো টুয়ানি, ঘুজি ইত্যাদি প্রচলিত। যে সকল খেলার ছড়া ইত্যাদি উচ্চারিত হয় আমরা সযত্নে সে সকল খেলার ছড়া সংগ্রহ করিয়া দিলাম ইহাতে সর্ব্বশ্রেণীর পাঠকগণই বিশেষ আমোদ উপভোগ

করিবেন। এ সকল ছড়ার মধ্যে অনেকগুলি আবার অর্থহীন শব্দ সমষ্টি মাত্র, কিন্তু অঙ্গভঙ্গি ও স্বর বৈচিত্র্যতার সহিত যখন এগুলি ছেলেদের মুখে সমস্বরে উচ্চারিত হইতে থাকে তখন উহা অত্যন্ত শ্রুতিমধুর হয়।

ডুগু ডুগু।

ডুগু ডুগু খেলায় যে সকল ছড়া উচ্চারিত হয়, সেগুলি প্রত্যেকটীই উত্তেজক এবং বীরত্ব জ্ঞাপক। 'ডাক' দেওয়ার সময় এ সকল ছড়া উচ্চারিত হয়, যেমন :—

(১) "ডুগু ডুগু লাপ্পে (লাফে লাফে)
ধনা গোদার বাপ্পে (বাপ)
খারা (খাড়া) লইয়া কাপ্পে।
খাড়ার কপালে ফোটা
মইষ (মহিষ) মারি গোটা গোটা।

(২) এক হাত্তা বলরাম দোহাত্তা শিং
নাচেরে বলরাম তাক্ ধিনা ধিন্ ধিন্

(৩) মরা (মড়া) রইছে (রহিয়াছে) মইরা (মরিয়া)
সাতদিন ধইরা (ধরিয়া)
শিয়ালে শকুনে খায়
মরা হাড্ডি দেখা যায়।

(৪) আমার খেড়ু মাইরা (মারিয়া কিবা পাইলি সুখ)।
লাইথাইয়া ভাঙ্গুম তর পাটাতনের বুক॥

ডগারে ডগা।

এই খেলায় একটী খেড়ু (খেলোয়াড়) গাছে উঠে আর অন্যান্য খেলোয়াড়গণ গাছের নীচে দাঁড়ায়। নীচের খেলোয়াড়গণ চীৎকার করিয়া ডাকে—"ডগারে ডগা?

গাছ হইতে ডগা উত্তর দেয়	কিরে ডগা ?
পুনর্ব্বার প্রশ্ন হয়	গাছে কেন্ ?
উঃ	বাঘের ডরে ?
প্রঃ	বাঘ কই ?
উঃ	মাটীর তলে।
প্রঃ	মাটী কই ?
উঃ	ঐ তো।
প্রঃ	তরা কয়ভাই ?
উঃ	সাতভাই।
প্রঃ	আমারে একটা দিবি ?
উঃ	ছুইতে পারলে নিবি।

মাছ মাছ।

এতটুকুন জল এতটুকুনপানি
জাকৈর জানি।

খেলা শেষ হইলে জেতৃদল বিপক্ষকে নিম্নলিখিত ছড়াটী বলিয়া শ্লেষ করে।

হাইরা গেল কুত্তি
নাক ভইরা মুত্তি।
নাকে অইল ঘাও
লেইয়া পুইছা খাও।”

কাকা ফাকা বা টাইলো টুয়ানি।

টাইলো টুয়ানি খইল্‌সা মাছের বুয়ানি
মামায় দিল খইলসাটা সেরে নিল চিলে,
চিলের লাগুড় পাইলাম না ফাকা ভাইলে।

ঘুঙ্গিলো ঘুঙ্গি।

ঘুঙ্গিলো ঘুঙ্গি দাও খান্ দে।

দাওখান কেন্? পাতখান্ কাট্‌তে।

পাতখান কেন্? বৌ ভাত খাইব।

বৌ কই? জলেরে গেছে।

জল কই? ডাউগে খাইছে।

ডাউগ কই? আরা বনে গেছে।

আরাবন কই? পুইরা গেছে।

ছালি মাটী কই? ধোপায় নিছে।

ধোপা কই? হাটে গেছে।

হাটে কেন্? সূইচ সূতা কিন্‌তে।

সূইচ সূতা কেন্? ঝুলি কাথা সিলাইতে।

ঝুলি কাথা কেন্? টাকা কড়ি থুইতে।

টাকা কড়ি কেন্? দাসীনফর কিন্‌তে।

দাসী নফর কেন্? আমার নসুরে হাগাইতে মুতাইতে।

তুইল্লা তুইল্লা নাচাইতে।
তুইল্লা তুইল্লা নাচাইতে॥

ইহার পর শিশুকে সম্বোধন করিয়া বলা হয়—

সোণার ডাইলে পরবা
না শুয়ের ডাইলে পরবা?
পর পর পর সোণার ডাইলে পর।
পর পর পর শুয়ের ডাইলে পর।

পূর্ব্বে লাঠি খেলা সমধিক প্রচলিত ছিল। 'স্বদেশী' আন্দোলনের

সঙ্গে সঙ্গে তাহা পুনরায় প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, কিন্তু গভর্মেণ্ট বাহাদুরের নব বিধনানুযায়ী স্থগিত হইয়াছে।*

পূজা, উৎসব বিবাহ।

দুর্গোৎসব, চড়ক পূজা, দোল ইত্যাদিতেই বিক্রমপুরবাসীগণ বিশেষ আনন্দানুভব করেন। চড়ক পূজার সন্ন্যাসীগণের তাণ্ডব নৃত্য ও গীত, শূদ্র, জেলে, চণ্ডাল ইত্যাদি নিম্নশ্রেণীর মধ্যেই সমধিক প্রচলিত। ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ সম্প্রদায়ের মধ্যে ঘটকে বিবাহ সম্বন্ধ ইত্যাদি ঠিক্ করে। বৈদ্যজাতির মধ্যেও পূর্ব্বে ঘটকেই সম্বন্ধ আনয়ন করিত, কিন্তু এখন তাহা প্রায় উঠিয়া গিয়াছে, উক্ত শ্রেণীর মধ্যে এখন নিজেরাই, সাধারণতঃ কন্যার পিতাই পাত্ররূপ 'ভবজলধি' রতনের উদ্দেশে গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া বেড়ান। পূর্ব্বে লগ্ন পত্র ইত্যাদি লিখিত হইত, এখন তাহা অনেক স্থানে উঠিয়া গিয়াছে, তবে কোন কোন স্থলে এখনও হয়। বিবাহকালে বর পক্ষ বাজী বন্দুক আওয়াজ করিয়া, বরকে পাল্কীতে চড়াইয়া সদল বলে কন্যার বাড়ীতে গমন করে। আঙ্গিনায় চন্দ্রাতপ টানাইয়া, অধিবাস, বিবাহ, স্ত্রী-আচার, বাসী বিবাহ প্রভৃতি হইয়া থাকে। বর কন্যা বাড়ীতে আসিয়া 'শুভ রাত্রি' করে। দধি, ক্ষীরের ছড়াছড়ি, কর্ত্তৃপক্ষের ব্যাগ্র চীৎকার, সানাইয়ের ও অধুনা প্রচলিত ইংরেজী বাদ্যের তুমুল নাদ, কুলীনগণের সাহঙ্কার তীব্রবাণী, কুটুম্বগণের হৈ-চৈ, স্ত্রীলোকগণের উলুধ্বনি, আবশ্যক অনাবশ্যক বাক্যালাপ, নিমন্ত্রিতগণের ভোজ্য দ্রব্যের জন্য প্রার্থনা প্রভৃতি নানাবিধ কল-কোলাহলে বিবাহ-উৎসব নির্ব্বাহিত হয়। এতদ্ব্যতীত, জাত কর্ম্ম, চূড়াকরণ, অন্নপ্রাসন, সাধ-

---

* শ্রীযুক্ত বিনোদেশ্বর দাশ গুপ্ত বি. এ. 'সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায়' বিক্রমপুরের অঞ্চলে খেলার বিবরণ শীর্ষক একটী প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছেন। বিক্রমপুরের সমগ্র খেলার বিস্তৃত বিবরণ তাহাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে...আমরা সেই প্রবন্ধ হইতে বহু সাহায্য পাইয়াছি।

ভক্ষণ, শিবপূজা, স্বস্ত্যয়ন ইত্যাদি নৈত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। সকল কার্য্যেই গুরু পুরোহিত গণের আগমন হয়।

জন্ম, বিবাহ ও মৃত্যু মানব জীবনে এই তিনটীই প্রধান। দু'টীর কথা বলা হইয়াছে। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা যেটী নিশ্চিত বিষয়টি, তাহার সম্বন্ধে কোন কথা বলা হয় নাই। যখন পরলোক যাত্রীর নাভীশ্বাস

শবদাহ, শোকপ্রকাশের রীতি অশৌচ প্রতিপালন।

হইতে আরম্ভ করে, তখনি সমবেত ব্যক্তিগণ তাহাকে ঘরের বাহিরে আনয়ন করে। শবদাহ বঙ্গের অন্যান্য অঞ্চলের ন্যায়ই শাস্ত্রের বিধানানুযায়ী সম্পাদিত হয়। বাড়ীর ধারে, নদীর তীরে কিংবা কোনও মাঠের মধ্যস্থিত পরিত্যক্ত পুষ্করিণীর তীরে দাহাদি কার্য্য হইয়া থাকে। পশ্চিমে যেরূপ 'রাম নাম সত্য হায়', পশ্চিম বঙ্গে 'বল হরি, হরি বোল,' তদ্রূপ বিক্রমপুর ও পূর্ব্ববঙ্গের সর্ব্বত্র 'হরি বল হরি বোল' ধ্বনি করিয়া শবদাহ হয়। শোক প্রকাশের রীতি জগতের বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন প্রকারের প্রচলিত। বিক্রমপুরে ও ইহার যথেষ্ট স্বাতন্ত্র্য আছে। স্ত্রীলোকেরা প্রত্যূষে ও সন্ধ্যায় এক প্রকার সুর করিয়া মৃতের গুণাবলী প্রকাশ করতঃ ক্রন্দন করে। এইরূপ ক্রন্দনের করুণ সুরে বিক্রমপুরের প্রত্যেক গ্রাম প্রত্যূষে ও সন্ধ্যায় ধ্বনিত হইতে শোনা যায়। ঈদৃশ শোক-প্রকাশ সর্ব্বথা নিন্দনীয়। ইহা দ্বারা প্রত্যেক বাড়ীর ছোট ছোট শিশুদের মনে অতি শৈশব হইতেই মৃত্যুর করাল বিভীষিকার ছায়া অঙ্কিত হইয়া যায়। তাহারাও সর্ব্বদা মৃত্যুর আশঙ্কায় ভীত হইয়া পড়ে। যাহাতে প্রতিদিন এইরূপ শোক-প্রকাশের প্রথা দূরীভূত হয় তদ্বিষয়ে প্রত্যেক বাড়ীর শিক্ষিত পুরুষগণের যত্নবান হওয়া কর্ত্তব্য। শোক-প্রকাশ হৃদয়ের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। দু'চারিদিন কিংবা একমাস কাল ক্রন্দনও সহ্য হয়, কিন্তু প্রতি নিয়ত একঘেয়ে ক্রন্দন ধ্বনি অসহ্য হইয়া পড়ে। দুর্ব্বল রমণীগণ শোকের আবেগ সহ্য করিতে পারেন না স্বীকার করি, কিন্তু আমাদের

বিশ্বাস যে উপদেশ ও শিক্ষা দ্বারা তাহাদিগকেও এ বিষয়ে নিরস্ত করিতে পারা যায়। হৃদয়ে স্মরণ করাই মৃতের প্রতি প্রকৃত শোক প্রকাশের চিহ্ন—তাহার প্রসঙ্গ, তাহার আলোচনা করাই প্রকৃত প্রীতির গভীরত্ব, মৌখিক ভাষায় হৃদয়ের কথা প্রকাশ হইতে পারে না। বিক্রমপুরে বর্ষার সময় শবদাহ বিশেষ কষ্টের কারণ হয়, কারণ তখন চতুর্দ্দিক জলে ডুবিয়া যায়। এক তেলিরবাগ গ্রামস্থিত, মৃত মহাত্মা দুর্গামোহন দাশের নির্ম্মিত বাঁধান শ্মশান ঘাট ব্যতীত বিক্রমপুরের আর কোনও গ্রামে শ্মশান ঘাট নাই। জীবিত ও মৃতাশৌচ বঙ্গের সর্ব্বত্র হিন্দুধর্ম্ম ও শাস্ত্রানুযায়ী যেরূপ অনুষ্ঠিত হয় বিক্রমপুরেও তাহার ব্যতিক্রম হয় না। হিন্দুর মধ্যে একমাত্র বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বীদিগের মৃতদেহ জলে নিক্ষেপ করে ও মুসলমান বেদেদের সমাধি দেওয়া হয়। বিক্রমপুরে একটী অতি সুন্দর প্রথা প্রচলিত দেখা যায়, সেটি মৃতের শ্মশানোপরি শিব মন্দির, ইত্যাদি নির্ম্মাণ। প্রায় প্রতি গ্রামেই এইরূপ মঠ ও মন্দিরাদি বিদ্যমান আছে। আধুনিক মঠ সমূহের মধ্যে সোণারঙ্গের মঠ দু'টি অতীব সুন্দর। তা ছাড়া, যাহারা দরিদ্র তাহারা হয় পঞ্চবটী, কিংবা ছোট ঘর নির্ম্মাণ করিয়া চারিদিকে দেশীয় ফুলের গাছ ইত্যাদি রোপণ করিয়া মৃতের প্রতি নিজ নিজ হৃদয়-জাত শ্রদ্ধা ও ভক্তি জ্ঞাপন করে।

চিকিৎসক ও দাতব্য চিকিৎসালয়।

প্রাচীনকালে আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসারই একাধিপত্য ছিল। সে সময়ে প্রায় সকল লোকেই দীর্ঘজীবি হইতেন, সাধারণতঃ ঔষধ ব্যবহারের বড় একটা প্রয়োজন হইত না। জ্বর হইলে বর্ত্তমান সময়ে যেমন চিকিৎসকগণ সঙ্গে সঙ্গেই ঔষধ প্রয়োগ করেন তখন সেরূপ ছিল না, সে সময়ে সাত দিন পর্য্যন্ত কোনও রূপ ঔষধ দেওয়া হইত না, যদি সাত দিন মধ্যে রোগ সারিয়া যাইত ভালই, নচেৎ তাহার পর হইতে ঔষধ দেওয়া হইত। কবিরাজেরা ছোট ছোট বেতের পেটারায় এবং মাটির হাঁড়ি ইত্যাদিতে

বড়ি ও তৈল ইত্যাদি রক্ষা করিতেন। আলমারার প্রচলন তখন ছিল না। বেতের পেটারায় ও সিন্দুকেই আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি রাখা হইত। বর্ষীয়সী রমণীগণ শিশুদের চিকিৎসা বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন,—সেজন্য সাধারণতঃ কোন চিকিৎসকের প্রয়োজন হইত না, বনজাত লতা, পাতা ও শিকড় দ্বারাই রোগ নিবারিত হইত। প্রসবের জন্য কোনও পরীক্ষোত্তীর্ণা ধাত্রীর আবশ্যক হইত না—গ্রাম্য শ্রীমতী ভুঁইমালিনী, কিম্বা রাধামণি ধাঁইই তাহা সম্পন্ন করিত—অথচ তখন প্রসবকালীন রমণী-গণের মৃত্যু ও একরূপ শুনাই যাইত না। সে সময়ে বহু নাড়ী-জ্ঞানী চিকিৎসক ছিলেন—তাঁহারা সকলেই রীতিমত সংস্কৃত শাস্ত্রে জ্ঞান লাভ করিয়া তবে আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিতেন। 'তালিখা' দৃষ্টে 'নাপিত' কবিরাজ তখন ছিলনা, কবিরাজী ব্যবসা কেবল মাত্র বৈদ্যজাতির মধ্যেই আবদ্ধ ছিল।

মুসলমান শাসনের সঙ্গে সঙ্গে দেশে 'হেকিমি' চিকিৎসার প্রচলন হইতে থাকে এবং গ্রামে গ্রামে 'হাতুড়ে' চিকিৎসকের আবির্ভাব হয়। বর্ত্তমান সময়ে 'হাতুড়ে' ডাক্তার ও কবিরাজের সংখ্যা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। 'হোমিয়োপ্যাথিক' তিন টাকা মূল্যের এক একটী বাক্স ক্রয় করিয়া আজকাল গ্রামে গ্রামে বহু হোমিয়োপ্যাথিক চিকিৎসকের আবির্ভাবে, মহাত্মা হানিমানের বিজয়-বৈজয়ন্তী উড়িতেছে!

বিক্রমপুরের দাতব্য চিকিৎসালয় মোট সাতটী। জৈনসার, ভাগ্যকুল, কালীপাড়া (এখন নাই) ষোল ঘর, তেলিরবাগ, মূলচর, হাসারা ও কোমরপুর। ইহার মধ্যে জৈনসার গ্রামস্থ দাতব্য চিকিৎসালয়ই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। আমরা এখানে সমুদয় দাতব্য চিকিৎসালয়গুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করিলাম।

জৈনসার—১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে জৈনসার গ্রাম নিবাসী স্বর্গীয় প্রসিদ্ধ অভয় কুমার দত্ত গুপ্ত মহাশয়ের চেষ্টায় ও যত্নে ইহা সংস্থাপিত হয়।

নিকটবর্ত্তী জনসাধারণের ও গ্রামবাসীর এবং ঢাকা ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের অর্থ সাহায্যে ইহার ব্যয়াদি নির্ব্বাহিত হয়। একজন হস্পিটাল এসিষ্টাণ্ট ইহার চিকিৎসকরূপে নিয়োজিত আছেন। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে ২২২১ জন লোক এই চিকিৎসালয় হইতে চিকিৎসিত হইয়াছিল। দৈনিক উপস্থিতি গড় ১৬.৫৬ জন ছিল। ১৮৭২ সনে ২ জন (In door) এবং ২৪১৬ (Out door) রোগী চিকিৎসিত হয়, দৈনিক উপস্থিতির গড় ২০.১৫। পীড়ার মধ্যে জ্বর, বাত, কফ, কাশি ও অজীর্ণরোগই বেশী ছিল। ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে এ অঞ্চলে কলেরার প্রকোপে বহু প্রাণনাশ হয়। বর্ত্তমান সময়ে এই চিকিৎসালয়ের অবস্থা সন্তোষজনক নহে। সরকারী রিপোর্টে প্রকাশ গ্রামবাসীর অমনোযোগীতায় এবং চাঁদার অভাবেই ইহা অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থায় উপনীত হইয়াছে।

ভাগ্যকূল—১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে ইহা স্থাপিত হইয়াছে। চারিদিকে বিলের সংখ্যা বেশী হওয়ায় এই ডাক্তারখানার চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সমূহের স্বাস্থ্য ভাল নহে। পীড়ার মধ্যে জ্বর, আমাশয়, অজীর্ণই খুব বেশী। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে ১৮৭৬ জন লোক এখান হইতে চিকিৎসিত হয়, আর দৈনিক উপস্থিতির গড় ১১.০১ ছিল। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে ২৪৫৬ জন এবং দৈনিক উপস্থিতির গড় ১২.১৬। এই চিকিৎসালয়ের আর্থিক অবস্থা সন্তোষ জনক।

কালীপাড়া—১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে ইহা সংস্থাপিত হইয়া ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে বন্ধ হয় এবং পরে ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে খোলা হয়। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে এই চিকিৎসালয়ে ১৪৫৫ জন রোগী চিকিৎসিত হয়—এবং সে বৎসর দৈনিক উপস্থিতির গড় ছিল ১৫.৯০, ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে ২০.৬০ জন এবং উপস্থিতির গড়

১৪.১৯। পদ্মার প্রবল তরঙ্গাভিঘাতে কালীপাড়ার ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গেই এই ডাক্তার খানার ও শেষ হইয়াছে।

তেলির বাগ ও ষোল ঘরের ডাক্তার খানা দুইটী স্বর্গীয় মহাত্মা কালীমোহন দাশ, দুর্গামোহন দাশের অর্থব্যয়ে এবং শ্রীযুক্ত চন্দ্রমাধব ঘোষ মহাশয়ের অর্থব্যয়ে পরিচালিত হইতেছে। এই উভয় ডাক্তার খানার অবস্থাই সন্তোষ জনক। চিকিৎসার্থ দুই জন নেটিব ডাক্তার নিয়োজিত আছেন।

মূলচর—স্বর্গীয় রায় অক্ষয়কুমার সেন বাহাদুরের চেষ্টা ও যত্নে ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে জুন এই চিকিৎসালয়টি স্থাপিত হইয়াছে। রায় বাহাদুরের প্রদত্ত বার্ষিক ১৫০ দেড়শত টাকায় এবং ঢাকা ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের অর্থ সাহায্যে ইহার কার্য্যাদি নির্ব্বাহিত হয়। একজন সুদক্ষ ও সুবিজ্ঞ হস্‌পিটাল এসিষ্টাণ্ট এখানকার চিকিৎসকরূপে নিয়োজিত আছেন। অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যেই এই ডাক্তারখানার সুযশ এতদুর বিস্তৃত হইয়াছে যে ডাক্তার খানার আয়তন বৃদ্ধি করিবার জন্য গভর্মেণ্ট কর্ত্তৃক বহু জমি দখল (acquire) করিয়া লওয়া হইয়াছে। বিক্রমপুরে এখন সর্ব্বশুদ্ধ সাতটী দাতব্য চিকিৎসালয় আছে। দক্ষিণ বিক্রমপুরের কোমরপুরের লক্ষ্মীকান্ত দাতব্য চিকিৎসালয়টি উল্লেখযোগ্য।

প্রাকৃতিক বিপ্লব, দুর্ভিক্ষ ভূমিকম্প, ঝড়তুফানও হাঁসাইলের ঝড়।

বিক্রমপুরে যে সকল প্রাকৃতিক বিপ্লব হইয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে ১৭৬৯-৭০ খৃঃ অঃ ১৭৮৭-৮৮ খৃঃ অব্দের দুর্ভিক্ষের ন্যায় দারুণ দুর্ভিক্ষ আর কখনও হয় নাই। পাশ্চাত্য ভ্রমণকারীগণ প্রত্যেকেই পূর্ব্ববঙ্গকে সমগ্র বঙ্গের অন্নভাণ্ডার বলিতে কুণ্ঠিত হন নাই। সপ্তদশ শতাব্দীতে হ্যামিল্টন সাহেব ঢাকায় প্রত্যেক খাদ্য দ্রব্যাদির প্রাচুর্য্য ও অল্প মূল্য দেখিয়া বলিয়াছিলেন "The

plenty and cheapness of provisions are here incredible." তাঁহার পূর্ব্বে এবং পরে যখনি যে কোন পর্য্যটক পূর্ব্বাঞ্চলে ভ্রমণ করিতে আসিয়াছেন তিনিই এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।* শায়েস্তা খাঁর সময়ে ও খালেব আলি খাঁ এবং যশোবন্ত রায়ের শাসনকালে এই জেলায় টাকায় আট মণ চাউল বিক্রী হইত। আর বর্ত্তমান সময়ে প্রতিবৎসর টাকায় আট সের চাউলও বিক্রী হয় না! এমন কি পঞ্চাশ ষাট বৎসর পূর্ব্বেও চাউলের মণ ১৲ এক টাকা ছিল। পূর্ব্বে লোকে পাঁচ টাকা বেতন পাইয়া দোল, দুর্গোৎসবাদি পুণ্যকার্য্য উপযুক্তরূপে নির্ব্বাহ করিয়াও পরিবারাদি প্রতিপালন করিতে পারিতেন। আর এখন একশত টাকা বেতন পাইলেও চারিদিক অন্ধকার দেখিতে হয়। ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে দুর্ভিক্ষে দেশের অবস্থা এতদূর ভয়ানক হইয়াছিল যে সহস্র সহস্র লোক প্রত্যহ অন্নাভাবে প্রাণত্যাগ করিত, দেশের চারিদিকে দুর্ভিক্ষ রাক্ষসীর তাণ্ডব নর্ত্তনে শ্মশানের বিভীষিকা বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। বনের ঘাসে ও কচুর পাতায় লোকের উদর পূর্ণ করিতে হইত। এক মুষ্টি চাউলের জন্য পিতা মাতা প্রাণাধিক সন্তানকে বিক্রয় করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। পিতা পুত্রকে, স্বামী, স্ত্রীকে এক মুষ্টি অন্নের জন্য ফেলিয়া পালাইত। এই দুর্ভিক্ষে ঢাকা জেলায় সর্ব্বশুদ্ধ ৬০, ০০০ হাজার লোক প্রাণত্যাগ করে। হতভাগ্য দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িতগণ সহরে সাহায্য পাইবার প্রত্যাশায় দলে দলে সহরে আসিতে লাগিল, আশা, নগরে নিশ্চয়ই সাহায্য জুটিবে, কিন্তু হায়! অনেককে পথেই প্রাণত্যাগ করিতে হইয়াছিল। বিক্রমপুরে ও সমগ্র ঢাকা জেলায় এইরূপ দারুণ দুর্ভিক্ষ আর কখনও হয় নাই। ১৭৮৭-৮৮ খৃষ্টাব্দের এই দারুণ দুর্ভিক্ষের মূল কারণ জল প্লাবন। বন্যার দ্বারা লোকের ঘর বাড়ী এবং শস্যাদি ধ্বংস হওয়ায়ই দুর্ভিক্ষ এতদূর প্রবল হইয়াছিল। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দের বর্ষার সময় বিক্রম-

* See Purchas's collection of Travels.

পুরে অত্যধিক পরিমাণে জল বৃদ্ধি হওয়ায় সে বৎসরও চাউলের দর ১০৲।১২৲ টাকা পর্য্যন্ত হইয়াছিল, কিন্তু সৌভাগ্য ক্রমে উহা বেশীদিন স্থায়ী না হওয়ায় দুর্ভিক্ষ হইতে পারে নাই। এতদ্ব্যতীত ১৮৩৩-৩৭, ও ১৮৭০ খৃষ্টাব্দেও বন্যার সঙ্গে সঙ্গে দুর্ভিক্ষের সূত্রপাত হইতে থাকে কিন্তু উহা সর্ব্বত্র প্রসারিত না হওয়ায় ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দের ন্যায় চারিদিকে হাহাকার ধ্বনি উত্থিত হয় নাই।*

ভূমিকম্প, জলকম্প ইত্যাদি ঢাকা জেলায় অতি অল্পই হইয়া থাকে। ১৭৩২, ১৭৭৫, ১৮১২, ১৮৭২, ১৮৯১, ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে বিক্রমপুর অঞ্চলে ভূমিকম্প হইয়াছিল, কিন্তু কোথাও কোনরূপ অনিষ্ট হয় নাই। ১৮৯৭ খৃঃ অব্দের ভীষণ ভূমিকম্পে বঙ্গের প্রায় সর্ব্বত্রই বহু অনিষ্ট ঘটে, কিন্তু বিক্রমপুরের কোন এক ক্ষুদ্র পল্লীরও সামান্য কোনরূপ ক্ষতি হয় নাই। প্রাচীন ভূমিকম্প সমূহের মধ্যে ১৭৭৫ এবং ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দের ভূমিকম্প একটু গুরুতর রকমের হইয়াছিল। ঝড় তুফান বিক্রম-পুরে প্রায় প্রতিবৎসরই হইয়া থাকে, কিন্তু ঢাকার টর্ণেডো যে সন ও যে তারিখে হয়, অর্থাৎ ১৮৮৮ (১২৯৪) খ্রীষ্টাব্দের মার্চ্চমাসের ২৬শে তারিখে যেরূপ ঝড় হয় এরূপ ভয়ানক ঝড় বিক্রমপুরের অতি বৃদ্ধ ব্যক্তিরা ও কেহ কথনও দেখেন নাই। সমগ্র বঙ্গে ঢাকার টর্ণাডো

* The famine raged with such violence that some thousands miserably perished, while whole families forsook their habitations to avoid the most cruel of deaths, but so reduced and emaciated were many through sickness and hunger, that they ended their days in search of sustenance ; others repaired to the town of Dacca in the hopes of finding some alleviation of their distresses, and to such misery and wretchedness were mothsrs reduced by the griping hand of hunger, that forgetting all parental affection, they offered their children for a handful of rice."

From the Report of Mr. Dey Collector of Dacca.

নামে ইহা যেমন পরিচিত, তদ্রূপ বিক্রমপুরে ইহা হাঁসাইলের ঝড় নামে খ্যাত হইয়া আসিতেছে। প্রথমে ঈষাণকোণে একটুকু লোহিত-বর্ণের মেঘ দেখিতে পাওয়া যায় ক্রমশঃ উহা সারা আকাশে বিস্তৃত হইয়া ভয়ানক ঝড় ও বৃষ্টির আকারে প্রলয়ের ধ্বংসের ন্যায় দালান, ঘর, গাছপালা, গরুবাছুর, লোকজন ইত্যাদি উড়াইয়া ধ্বংস করিতে থাকে। ঝড়ের ভুক্তভোগী লোকসমূহের মুখে হাঁসাইলের ঝড়ের কাহিনী শুনিলে বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইতে হয়। ঝড় সম্পর্কিত ভাটের কবিতা এখনও বিক্রমপুরাঞ্চলে গীত হইয়া থাকে। এই ঝড়ে ঢাকা সহরের ও বিক্রমপুরের যেরূপ অনিষ্ট হইয়াছিল—এরূপ আর কখনও হয় নাই। কত লোক যে দালান চাপা ঘর চাপা ও গাছ চাপা পড়িয়া মারা গিয়াছিল তাহার সীমা নাই। বর্ষার সময় কোন কোন বৎসর জল-প্লাবনাধিক্য বশতঃ লোকের বাড়ী ঘরে জল উঠিয়া বড়ই অশান্তির কারণ হয়।

বিক্রমপুরে-বর্ষা।

বিক্রমপুরের বর্ষা বড়ই বিপজ্জনক। নৌকার সাহায্য ব্যতীত হাটে বাজারে এমন কি কোন কোন গ্রামে একবাড়ী হইতে অন্য বাড়ী যাওয়াও অসম্ভব হইয়া উঠে, আজকাল প্রত্যেক গ্রামের শিক্ষিত যুবকগণের চেষ্টা, যত্ন ও উদ্যোগে রাস্তা ঘাট, পুল ইত্যাদি নির্ম্মিত হইয়া যাতায়াতের ক্রমশঃই সুবিধা হইতেছে। সারা বৎসরের সঞ্চিত আবর্জ্জনা রাশি বর্ষার জলে ধৌত হইয়া যায় বলিয়াই বিক্রমপুরে ম্যালেরিয়ার দারুণ প্রকোপ নাই। স্বাস্থ্যের জন্য বিক্রমপুর পশ্চিম বঙ্গের গ্রাম সমূহ হইতে বহু শ্রেষ্ঠ। চব্বিশপরগণা, হুগলী, নদীয়া প্রভৃতি অঞ্চলের গ্রাম সমূহ যেমন ম্যালেরিয়ার নির্য্যাতনে বন-জঙ্গলাকীর্ণ ও পরিত্যক্ত, বিক্রমপুর সেরূপ নহে। অতএব এক হিসাবে বর্ষার কষ্ট নিতান্ত বিপজ্জনক হইলেও—ইহা রোগ নিবারক।

আমোদ প্রমোদ

মানবের কর্ম্ম-কঠোর জীবনে অবসর ও আনন্দ নিতান্ত আবশ্যকীয় ব্যাপার। একঘেয়ে জীবন কেহই বহন করিতে পারে না। সারাদিনের শ্রান্তির পর কর্ম্ম-ক্লান্ত-জীব একটুকু শান্তি, একটুকু অবসরের জন্য আপনা হইতেই লালায়িত হইয়া পড়ে। দেশ ভেদে রুচি ভেদে প্রকৃতি ভেদে আমোদ প্রমোদের ভাবান্তর দৃষ্ট হয়। বিক্রমপুরাঞ্চলে আমোদ প্রমোদের মধ্যে যাত্রা, কবি, দোল থিয়েটারই অধিক প্রচলিত। পূর্ব্বে লোকে যেমন কবির গানের জন্য উতলা হইত এখন আর সেরূপ হয় না। এখন প্রায়ই কোন ভদ্র লোকের বাড়ীতে কবিগান হয় না। কবির স্থান এখন যাত্রাও থিয়েটার অধিকার করিয়াছে। শারদীয় পূজোপলক্ষে কিংবা অন্য কোনও কার্য্যাদি উপলক্ষে যাত্রা গান এবং থিয়েটার হয়। থিয়েটার সাধারণতঃ গ্রাম্য শিক্ষিত যুবক বৃন্দের উৎসাহ ও উদ্যোগেই হয়, তাঁহারা গ্রীষ্মাবকাশে কিংবা পূজার ছুটিতে নিজ নিজ বাসগ্রামে থিয়েটারের হুজুগ তুলিয়া অভিনয় করিয়া থাকেন। এই সকল শিক্ষিত অভিনেতাবর্গের অভিনয় দেখিতে দেখিতে এখন আর গ্রাম্য জনসাধারণে যাত্রা শুনিতে ভিড়ে না। এক সময়ে হোলির গানেরও বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল, তখন ভিন্ন ভিন্ন গ্রামের দুইদলে গানের প্রতিযোগীতা চলিত, মৃদঙ্গের ও করতালের মধুর নিনাদে, গায়কগণের উচ্চ চীৎকারে ও অঙ্গভঙ্গীসহকারে নৃত্যের তুমুল আনন্দ উচ্ছ্বাসে গ্রামবাসিগণ প্রচুর আনন্দ অনুভব করিতেন। এখন হোলির সে আনন্দ উচ্ছ্বাস আর নাই। পূর্ব্বে যেরূপ রাস্তা, ঘাটে ও উৎসবকারীগণ আবিরের লোহিত রঙে রঞ্জিত হইয়া 'হোরী খেলত নন্দদুলালা' ইত্যাদি বৈষ্ণব কবিগণের সুমধুর গীতধ্বনিতে গ্রাম্যপথ ঘাট প্রতিধ্বনিত করিতেন, এখন থিয়েটার-প্রিয় নব্যযুবকদের কৃপায় 'শাল তমাল তল লাল যমুনা জল', ইত্যাদি শীর্ষক দু'একটী সঙ্গীত মাত্র

শোনা যায়। দশহরার সময় গ্রামে গ্রামে বিশেষ আনন্দ উৎসব হয়, ছেলে বুড়ো সকলে মিলিয়া দশহরায় গমন করিয়া প্রফুল্ল চিত্তে বিজয়ার দেবী প্রতিমার বিসর্জ্জন দর্শন করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করেন। গৃহে ফিরিয়া ছোট বড় সকলে কোলাকুলি করিয়া মিলনের আনন্দ ও প্রীতি অনুভব করে। সে দিন শত্রু, মিত্র ছোট বড় কাহারও কোন পার্থক্য থাকে না। পুরাঙ্গনারাও হুলুধ্বনির সহিত বিজয়া-প্রত্যাগত বালক, যুবক ও বৃদ্ধ সকলকে বরণ করিয়া লয়েন এবং ধান্য-দূর্ব্বাদি দ্বারা 'শান্তি-আশীর্ব্বাদ' প্রদান করেন। বৃদ্ধেরা এখনও সেকালের মত বাড়ুয্যে মহাশয়ের বাড়ীর চণ্ডীমণ্ডপে, কিংবা দাসের বাড়ীর বৈঠকখানায় বসিয়া পাশা কিংবা দাবার চালে মত্ত থাকিয়া তামাকের ধূম উদ্গীরণ করিতে করিতে তৃপ্তি বোধ করেন। সে সভায় পরনিন্দা, পরকুৎসা, সাহিত্য, সমাজ, স্বাস্থ্য, বাজার দর প্রত্যেক বিষয়েই আলোচিত হয়।

এই খেলার হুজুগে অকর্ম্মণ্য বৃদ্ধগণ কর্ত্তব্য-জ্ঞান-বিহীন একদল যুবককেও দলে টানিয়া লইতে প্রবৃত্ত হন। ইহাদের এই অনুকরণে কোন কোন গ্রামে দেখিয়াছি যে দশ বার বছরের ছেলেরাও 'ছয় তিন নয়' বলিয়া খেলা জুড়িয়া দিয়াছে। হায়রে দেশ! হায়রে অলসতা! যে অমূল্য সময়ের একমুহূর্ত্তের অপব্যয়ে সুসভ্য দেশের বালক, যুবক ও বৃদ্ধগণ সারাদিন রাত কঠোর পরিশ্রম করিয়াও হাহাকার করেন, আর আমাদের দেশের যুবক ও বৃদ্ধগণ সেই অমূল্য সময়কে প্রতিদিন পাশার চালে সদ্ব্যবহার করিতেছেন! শিক্ষা ও সভ্যতার কত প্রভেদ!

ধর্ম্ম।

ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, ব্রাহ্ম, বৈষ্ণব, বাউল ও কিশোরী ভজনী সম্প্রদায় প্রচলিত আছে। ইহার মধ্যে হিন্দু সম্প্রদায়ের সংখ্যাই বেশী। বৈষ্ণব, বাউল ও কিশোরী ভজনী সম্প্রদায় হিন্দুধর্ম্মেরই বিভিন্ন শাখা। শ্রীশ্রীচৈতন্য দেবের সুমধুর প্রেমের ও মিলনের

বৈষ্ণব ধর্ম্ম আজকাল যত পাষণ্ড ব্যভিচারী ও ব্যাভিচারিনীর লীলার স্থল হইয়াছে। বিক্রমপুরের বাউল শ্রেণী—সুধারাম নামক একজন বাউলের মতানুযায়ী চলিতেছে। সুধারাম বাউল একজন সাধু মহাত্মা ছিলেন, ইঁহার রচিত বাউল-সঙ্গীত গুলি ভাবে ও সৌন্দর্য্যে অতুলনীয়। কালাচাঁদ বিদ্যালঙ্কার নামক এক ব্যক্তি কিশোরী ভজন সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। এই সম্প্রদায়ের পুরুষ আপনাকে কৃষ্ণ এবং স্ত্রী আপনাকে রাধা মনে করে। কিশোরী আদ্যাশক্তি, সেইজন্য ইহারাও একজন নারীকে আদ্যাশক্তি জ্ঞানে তাহার পূজা করে। যুগল ভিন্ন ইহারা ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে পারে না। নায়কের নায়িকা না হইলে চলে না। ইহাদের মধ্যে কোনরূপ জাতিবিচার নাই। দীক্ষার সময় আমি কৃষ্ণ, তুমি রাধা এইরূপ বিশ্বাস থাকা আবশ্যক। এই সম্প্রদায়ে ব্যবসায়ী শ্রেণীর লোকের সংখ্যাই বেশী। কোন ভদ্র-লোকই এই সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত নহেন। রাত্রিকালে এই সম্প্রদায়ের পুরুষ ও রমণীগণ একস্থানে সমবেত হইয়া কিশোরীর পূজা এবং প্রসাদাদি ভক্ষণ করে। ইহারা মৎস্যাদি আহার করে না—প্রত্যেকেই নিরামিষাশী। গুরুসত্য সম্প্রদায়ের একটী সঙ্গীতও আমরা এখানে প্রকাশ করিলাম ;—

জীবনের নাইরে আশা, কর শ্রীগুরুর চরণ ভরসা,
ও তোর মাটীর দেহের নাই ভরসা !
ও মন এই দেহের গুমর মিছে, ওরে নিশ্বাসে কি বিশ্বাস আছে,
কাল শমনে ফাঁদ পেতেছে ভাঙ্গবেরে তোর সুখের বাসা।
ও মন ভাই বল বন্ধু বল, সময়ে সকলি ভাল—
গুরু বিনে এ সংসারে কে করবে আর জিজ্ঞাসা !
ও মন অষ্টম জনে কাষ্ঠ নেবে, মেটে ঘড়া সঙ্গে দিবে।
দু'জনেতে কাঁধে লবে নদীর কূলে দিবে বাসা।

বিক্রমপুরস্থ নধ্যাপাড়া, বাহেরকুচি প্রভৃতি গ্রামের নিকটবর্ত্তী কোন কোন গ্রামের নমঃশূদ্র, যুগী প্রভৃতি নিম্ন শ্রেণীস্থ হিন্দুগণকে ত্রিনাথের পূজা করিতে দেখা যায়। এই পূজায় গাঁজার ধূম খুব চলে। ত্রিনাথ-ভক্তগণ গাঁজা পানে বিভোর হইয়া সন্ধ্যার অব্যবহিত পর হইতে নিম্নলিখিত রূপে ত্রিনাথের সঙ্গীত গাহিয়া থাকে; যথা;—

ত্রিনাথের সেবক।

সাধুরে ভাই দিন গেলে ত্রিনাথের নাম লইও।
ত্রিনাথ আমার বড় দয়াল যায় নারে তার বোঝা॥
ওরে পাঁচটী পয়সা হলেরে হয় ত্রিনাথের পূজা॥
ত্রিনাথের পূজা দেখে যে করিবে হেলা।
তার গলায় হবে গলগণ্ড চউথ (চোখে) দিয়ে বের হবে ডেলা॥
গোলকের এক পাশে ক্ষীরোদের কূলে।
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব ছিল নাম গানে ভুলে॥
হেনকালে আদ্যাশক্তি উমা কাত্যায়নী।
আসিয়া দিলেন দেখা হরি নাম শুনি॥
বিষ্ণু বলে কালী তারা কি হ'বে উপায়।
কিসে যাবে জীবের দুঃখ বল তা আমায়॥
আমরা তিনে এক একে তিন জানে জ্ঞানী জনে।
মুখ্যলোকে না জানে পূজা করিবে কেমনে॥
শুনে দুর্গা বলেন তখন শুন এর উপায়।
"ত্রিনাথ" নামে পূজা হইবে ধরায়॥
তোমরা তিনে এক একে তিন হইও সেইখানে।
পূজিলে কলির লোক তরিবে তুফানে॥
এই সব কথা যারা না শুনিবে কাণে।
তারা ধনে পুত্র হবে নষ্ট রমাই ফকির ভনে॥" (ইত্যাদি)

বিক্রমপুর ব্যতীত পূর্ব্ববঙ্গের অন্যান্য স্থলেও এই মত প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত 'মনসা পাওয়া,' হরি পাওয়া, কালী পাওয়া, শীতলা পাওয়া ইত্যাদি কতরূপ ভণ্ডামি যে প্রতি বৎসরই দেখিতে পাওয়া যায় তাহার অন্ত নাই। বিক্রমপুরের ন্যায় শিক্ষিত সমাজের পক্ষে এ সমুদয় বড়ই লজ্জাজনক! দয়হাটার 'কল্কি-অবতারের' কলঙ্ককাহিনী বিক্রমপুরের ন্যায় সুসভ্য স্থানের সুনাম ডুবাইয়াছে। বিক্রমপুরের ভদ্র-সম্প্রদায়ের প্রায় সকলেই চাকুরে, কাজেই প্রতি গ্রামে ছোট লোক ব্যতীত বড় কেহ বাড়ীতে থাকেনা, কোনরূপ শাসন না পাইয়া দুর্ব্বৃত্তগণও এইরূপভাবে এক এক অন্ধ ধর্ম্ম মত প্রচার করিয়া বসে। আর মূর্খ নরনারীগণও তাহাতে যোগ দিয়া দেশে একটা হৈ চৈ করিয়া তোলে।

এ সকল দুর্বৃত্তগণ যাহাতে কোনওরূপে প্রশ্রয় না পায় সে বিষয়ে প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তিরই বিশেষরূপে লক্ষ্য রাখা উচিত। ফিরিঙ্গি-বাজার ও রিকিববাজার ব্যতীত অন্যত্র খ্রীষ্টান দেখিতে পাওয়া যায় না। মুসলমান প্রায় প্রতি গ্রামেই আছে। ইহারা বেদিয়া, বেহারা, কোদার, দাই, দাড়িয়া, হাজাম, জোলা, কুলু, নাগটি, নিকারী, পাঠান, সৈয়দ, সেখ, মোগল এই কয় শ্রেণীতে বিভক্ত। মুসলমান গণের অধিকাংশই সুন্নিমতাবলম্বী। বিক্রমপুরের হিন্দু ও মুসলমানের সম্প্রিতী খুব বেশী। হিন্দু-সম্প্রদায়ের সঙ্গে মিশিয়া থাকিতে থাকিতে ইহাদের প্রায় সকলের মধ্যেই বহু হিন্দু রীতি নীতি প্রবেশ করিয়াছে। কালীর বাড়ী পাঁঠা মানত, লক্ষ্মী পূজা, শীতলা পূজা, দুর্গোৎসব ইত্যাদিতে নববস্ত্র পরিধান ইত্যাদিই ইহার উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। বিশেষ আনন্দের বিষয় এই যে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে কোনওরূপ কলহ নাই।

হিন্দু-মুসলমান পরস্পরের মধ্যে দাদা, দিদি, নানি, মামু প্রভৃতি নানাবিধ সম্পর্ক প্রচলিত থাকায় উভয়ের মিলনের পথ সুপ্রশস্ত করিয়া

দিতেছে। Taylor সাহেব যথার্থই লিখিয়াছেন যে "Religious quarrels between Hindus and Mahomedans are of rare occurence. These two classes live in perfect peace and contend." এক ডাবা হুকোতে (জলবিহীন হুকো) হিন্দু মুসলমানকেও বহুস্থলে তামাক খাইতে দেখা যায়। অন্যান্য ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে গুরুসত্য ও ত্রিনাথের সেবকগণকেও বিক্রমপুরে দেখিতে পাওয়া যায়। সাধারণতঃ হিন্দু সমাজের নিম্নশ্রেণীস্থ জনসাধারণই গুরুসত্য মতাবলম্বী। এই ধর্ম্ম মতের লোকেরা অধিকাংশই সংসারে নির্লিপ্ত। হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ, শূদ্র, গোয়ালা, তেলী, ধোপা, নাপিত, কুমার, নমঃশূদ্র, বানিয়া, বারুই, ভুঁইমালী, ঝাল, মাল, কর্ম্মকার, শাঁখারী, মালাকর, গন্ধবণিক, সুবর্ণবণিক, সাহা, সদ্‌গোপ, আগুড়ি, চাষাধোপা, প্রভৃতি সর্ব্বশ্রেণীর লোকেরই বাস। বিক্রমপুরের ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থ এই তিন জাতি বিশেষ উন্নত ও ক্ষমতাশালী। শিক্ষিত জনসংখ্যা এই তিন শ্রেণীর মধ্যেই বেশী, ব্রাহ্মণ মধ্যে, রাঢ়ী, বারেন্দ্র, বৈদিক, অগ্রদানী (মহাশ্রাদ্ধি বা মহা পুরোহিত) গণক বা আচার্য্য ব্রাহ্মণ প্রধান। ব্রাহ্মণগণের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণ বিক্রমপুরে সর্ব্বাপেক্ষা শিক্ষিত ও উন্নত। বঙ্গের অন্যান্য জেলার ন্যায় বিক্রমপুরে বৈদ্যজাতির সংখ্যা অল্প। কিন্তু তাহা হইলে কি হয় শিক্ষায় ও সভ্যতায় ইঁহারা সমাজের উচ্চ স্থানে অবস্থিত। স্ত্রী-শিক্ষায় ইঁহারা বিক্রমপুরের সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছেন। ১৯০১ সালের সেন্সাস রিপোর্ট হইতেই তাহার প্রকাশ। কায়স্থ সম্প্রদায়ের মধ্যে মালখানগরের বসু, শ্রীনগরের গুহ ঠাকুরতা, সেখরনগরের বসু ও গুহ, বয়রাগাদীর বসু, ষোলঘরের ঘোষ, ভাসুলদির মজুমদার প্রভৃতি প্রধান। ইঁহাদের ও স্ত্রী, পুরুষ প্রায় সকলেই শিক্ষিত। বিক্রমপুরের কায়স্থ সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন অনেক মহাত্মা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন

যাঁহাদের গৌরবে সমগ্র বঙ্গদেশ কেন, সমগ্র ভারতবর্ষ গৌরবান্বিত। বিজ্ঞানাচার্য্য জগদীশচন্দ্র, মনোমোহন ও লালমোহন এই ভ্রাতৃদ্বয়ের নাম সমগ্র ভারতের কোন্ প্রান্তের নর নারীর অপরিজ্ঞাত? নবশাখ সম্প্রদায়ের মধ্যে শূদ্র, কামার, কুমার, নাপিত, তেলী, তাঁতী, কাঁসারী, শাঁখারি, সদ্‌গোপ, এই কয়শ্রেণী জলাচরনীয়।

বাঙ্গালার অন্যান্য স্থানের ন্যায় এখানেও তণ্ডুলই প্রধান খাদ্য।

কৃষি ও উদ্ভিদ।

বিক্রমপুরে মুসলমান, শূদ্র, সদ্‌গোপ, চণ্ডাল এই কয় জাতিই কৃষিকার্য্য করিয়া জীবন ধারণ করে। এ অঞ্চলে চারি প্রকারের ধান্য উৎপন্ন হয়; আমন বা হৈমন্তিক, আউশ বা আশু, বোরা এবং উড়ি। উড়ি সাধারণতঃ জলা অঞ্চলেই হয়। অন্যান্য খন্দের মধ্যে জোয়ার, বাজবা, দ্বিদল, কুসুম্ভ, যব, তিল, কলাই, কার্পাস, কালিজিরা, মেথি, শণ, চিনাই, কায়ন, আদা, হরিদ্রা, সর্ষপ, ইক্ষু, পান সুপারি, নারিকেল ও পাট প্রধান। পাটের চাষ আজকাল খুব বেশী হয়, গ্রামে গ্রামে পাট বিক্রীর জন্য গুদাম ও আফিস আছে। ফলের মধ্যে আম, কাঁটাল, কালজাম, আমজাম, তেঁতুল, আম্‌লকি, কদলী, আনারস, লেবু, জামির, পেয়ারা, অম্বুরা (বাতাবি লেবু) লট্‌কা, কুম্‌রা, ঝিঙ্গা, শসা, লেচু, জামরুল, চাল্‌তে, জলপাই, সিম বা ছিম্‌রা, উচ্ছে, ফুটি ইত্যাদি। ফুলের মধ্যে গেন্ধা (গাঁদা), যুঁই, বেলি, মালতী, অপরাজিতা, চাঁপা, সুবর্ণকলিকা, গন্ধরাজ, দোপাটি, কামিনী, শেফালি, টগর, জবা শ্বেত ও লাল, বকুল, চুঁাপা, কনক চাঁপা, কাঁটালে চাঁপা, আকন্দ, কবরী রক্ত ও শ্বেত, ঝুম্‌কো জবা (পঞ্চমুখী) শাপ্‌লা, ইত্যাদি। শিমুল, বট, অশ্বত্থ, জারল, উড়িয়াম, হিজল, বউনা, ছায়তান (সপ্ততাল) গাছ ও বাঁশ প্রচুর পরিমাণে জন্মে।

বিক্রমপুরে প্রায় প্রতি গ্রামেই একটী না একটী বাজার আছে। প্রতিদিন ভোরে বাজার মিলে। এ সকল বাজারে সাধারণতঃ তরকারি,

চাল, ডাল, তেল, লবণ, মাছ, কাপড় ইত্যাদি নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি বিক্রয় হয়। এ সকল বাজারে দু' একখানা স্থায়ী চাউলের দোকান, কাপড়ের দোকানও থাকে। অধিকাংশ স্থলেই দোকান কেবল হাটের সময় বসে। এখানে বিক্রমপুরস্থ প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ হাট ও বন্দরের নামোল্লেখ করিলাম। যথা,—মিরকাদিম (ঢাকা জেলার মধ্যে ইহা সর্ব্বপ্রধান হাট) তালতলা, সেরাজদিঘা, মুন্সীর হাট, শ্রীনগর, ধানকুনিয়া, কল্মা, রাজাবাড়ী, দিঘীরপাড়, খালিপাশা, হল্দিয়া, লৌহজঙ্গ (বিক্রমপুরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বন্দর, এখানে চাউল, কাপড়, টিন, কাঠ, কাঁসের ও পিত্তলের দ্রব্য, পাথুরে কয়লা প্রচুর পরিমাণে আমদানি ও রপ্তানি হয়) হাঁসাইল, সেরাজাবাজ, শুবচনী, মধ্যপাড়া, ইচ্ছাপুরা, মুন্সীগঞ্জ, ফিরিঙ্গীবাজার, রিকাবীবাজার, কমলা ঘাট ইত্যাদি প্রধান।

হাট বাজার।

মুন্সীগঞ্জে প্রতিবৎসর একমাস স্থায়ী একটা মেলা বসে। ইহা সাধারণতঃ কার্ত্তিক বারুণীর মেলা বা 'বান্নীর মেলা' নামে পরিচিত। কার্ত্তিক মাসে এই মেলার আরম্ভ হয় বলিয়া ইহার নাম কার্ত্তিক বারুণীর মেলা হইয়াছে। এরূপ বৃহৎ মেলা বঙ্গদেশে অতি বিরল। ইহাতে ভারতের নানা স্থান, এমন কি সুদূর দিল্লী, অমৃতসর, আরাকান প্রভৃতি স্থান হইতেও সওদাগরগণ পণ্যদ্রব্যাদি লইয়া আগমন করেন। সে সময়ে এ স্থানের এক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য হয়। নদীতীরবর্ত্তী সারি সারি বিপনি শ্রেণী, বৃহৎ তেজপত্রের স্তূপ, কাষ্ঠের স্তূপ, টিনের গুদাম, তূলা, ঔষধ পত্র, পিত্তল ও কাঁসের বাসন ইত্যাদি দেখিলে মন মুগ্ধ না হইয়া যায় না। নদীতটবর্ত্তী বালুকাময় ভূমি আরব্যরজনীর স্বপ্ন কুহকের ন্যায় এক মাসের জন্য নাগরিক শোভা-সৌন্দর্য্যে শোভিত হয়। পূর্ব্বে কার্ত্তিকমাসে এই মেলার আরম্ভ হইত। এখন প্রতি

কার্ত্তিক বারুণীর মেলা, গলুইয়া, অষ্টমী স্নান ও বারুণী স্নান।

বৎসর অগ্রহায়ণ মাসের শেষ অথবা পৌষ মাসের প্রথমে গভর্মেণ্ট কর্ত্তৃক দিন স্থিরীকৃত হইয়া মেলার কার্য্যারম্ভ হয়। বিক্রমপুরের অতি দূরবর্ত্তী গ্রাম নিবাসীগণও ক্রয় বিক্রয়াদি কার্য্যে এই মেলায় সমাগত হন। মেলার সময়ে এখানে একটী অস্থায়ী পোষ্টাফিস, ডাক্তারখানা এবং মুন্সীগঞ্জের পুলিশ ষ্টেসনটি উঠিয়া আসে। মাঘের শেষে কিংবা ফাল্গুনের প্রথমে গভর্মেণ্টের আদেশে মেলা বন্ধ হয়।* বারুণী বা বার্নীর মেলা ব্যতীত প্রতিবৎসর বর্ষের প্রথম দিনে অর্থাৎ ১লা বৈশাখ একটী মেলা হয় তাহার নাম 'গলইয়া'। এই মেলাও প্রায় প্রধান প্রধান হাট বাজারেই মিলে। চাচরতলা সিদ্ধেশ্বরী কালীবাড়ীর মাঠে, মালধা কালীবাড়ীর ময়দানে, সুবচনীর হাটে গলইয়া মেলা হয়। গলইয়ার মেলা হইতে বিক্রমপুরবাসীগণ এক বৎসরের ব্যবহারোপযোগী, ধনিয়া, সরিষা, কালিজিরা প্রভৃতি মসল্লা সংগ্রহ করে। এ মেলায় ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের কত আনন্দ, এক পয়সার একটী বাঁশী কিনিয়া, তেলে ভাজা জিলিপি খাইয়া কতই না তৃপ্তি লাভ করে। বাঁশীর পোঁ, পোঁ ধ্বনি—স্ত্রীলোকের কল-কোলাহল এ সকল মেলার জীবন। এ সব মেলায় স্ত্রীলোকের সংখ্যাই খুব বেশী হয়।

রাস্তা ঘাটের মধ্যে একটী মুন্সীগঞ্জ হইতে রাজাবাড়ী, এবং মুন্সীগঞ্জ হইতে শ্রীনগর, এই রাস্তা দুইটীই প্রধান। ইহার মধ্যে প্রথমটী বাঁধান হয় নাই। এই মূল রাস্তা দু'টি ছাড়া কাচকীর দরজা, মটুকপুরের

---

* Idrackpore is celebrated for a Barnee or fair, which is held in month of October. * * * attended by people from all the eastern districts, as well as by a few merchants from the upper Provinces and Calcutta.

Talyor's Topography of
Dacca P. 104.

দরজা প্রভৃতি এখনও উল্লেখ যোগ্য। খালের মধ্যে মাকুয়াটির খাল ও তালতলার খাল ব্যতীত তেমন উল্লেখ যোগ্য বৃহৎ কোন খাল নাই। বর্ষার সময় ব্যতীত অন্য কোন সময়ে এই খাল দু'টির ও সর্ব্ব বায়গায় নৌকা চলাচলের উপযুক্ত পরিমাণ জলও থাকে না। এ সকল রাস্তা ঘাট ছাড়া এখন প্রত্যেক গ্রামেই শিক্ষিত যুবকগণের চেষ্টা ও যত্নে রাস্তা, ঘাট, খাল ইত্যাদির সংস্কার সাধিত হইয়া প্রত্যেক গ্রামেরই বিশেষ উন্নতি হইতেছে।

সহমরণ।

পুর্ব্বে বিক্রমপুরে সহমরণ প্রথা প্রচলিত ছিল। প্রাচীনাগণের নিকট সতীদাহের বিবরণ শুনিতে পাওয়া যায়। গভর্মেণ্টের নিষেধাজ্ঞা প্রচারিত হইলে পর এ অঞ্চলে কোনও সতীদাহ হয় নাই। ১৮১৫—১৮২৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ১৮৫ জন বিধবা সমগ্র ঢাকা জেলায় সহমৃতা হন। এখানে উহার একটী তালিকা দিলাম।

২০ বৎসরে ন্যূন ১০ জন।
২০ হইতে ৩০ বৎসর বয়সের মধ্যে ৪৩ জন।
৩১ ,, ৪০ ,, ,, ৪৯
৪১ ,, ৫০ ,, ,, ৪৬
৫১ ,, ৭০ ,, ,, ১২ ,,
৭০ বৎসরের উপর ১ ,,

১৮৫৭ খৃঃ অব্দে বিক্রমপুরস্থ শ্যামসিদ্ধি গ্রামে একটী রমণী সহমৃতা হইয়াছিলেন।

শিল্পবাণিজ্য।

অতিপ্রাচীন সময়ে বিক্রমপুরের শিল্পজাতদ্রব্যাদি বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। আবদুল্লাপুরের সূক্ষ্ম বস্ত্র-শিল্পের কাহিনী আজ স্বপ্নময় বলিয়া প্রতীয়মান হয়। এখানকার কর্ম্মকার, স্বর্ণকার, এবং তন্তুবায়গণ বিশেষ

মা ঐসার দিগম্বরী তলা।

বিখ্যাত। এক সময়ে ঝায়টিয়ার বাউ, শ্যামসিদ্ধি ও ষোলঘরের কর্ণা ভরণ, কাণ এবং উড়ানির বিশেষ আদর ছিল। এতদ্ব্যতীত বিক্রম পুরের কাষ্ঠ নির্ম্মিত দ্রব্য সামগ্রীও উল্লেখ যোগ্য। বিক্রমপুর হইতে ঘৃত এবং সামান্যরূপে তাঁতী ও জোলাদের তৈয়ারী বস্ত্রাদি অন্যান্য স্থানে প্রেরিত হইয়া থাকে।

নীলকুঠি।

এক সময়ে বিক্রমপুরের নানাস্থানে নীলের কুঠি ছিল। তখন বর্ত্তমান সময়ে যেমন পাট, তদ্রূপ নীলের চাষও খুব বেশী হইত। নীলকর সাহেব ওয়াটসের অত্যাচার সম্বন্ধে নানারূপ জনপ্রবাদ এখনও বিক্রমপুরের ঘরে ঘরে আলোচিত হইতে শোনা যায়। সে সময়ে রাজনগর, সেরাজা বাদ, ইছাপুরা, হাঁসাইল প্রভৃতি স্থানে নীলের কুঠি বিদ্যমান ছিল। একমাত্র সেরাজাবাদের কুঠিটি এখনও নিজ অস্তিত্ব লইয়া বিদ্যমান, নচেৎ অন্যান্য কুঠিগুলি ভূমিসাৎ হইয়াছে।

মঠ, মন্দির, মসজিদ্ তীর্থস্থান দেউলবাড়ী, দীঘী, সরোবর।

বিক্রমপুরের প্রায় সর্ব্বত্রই মঠ ও মন্দিরাদির আধিক্য দৃষ্ট হয়। প্রতি গ্রামেই হয় একটী মঠ, মন্দির কিংবা একটী ঝিকটী ঘর ভগ্ন বা অভগ্ন অবস্থায় বিদ্যমান দেখিতে পাওয়া যায়। মঠ সমূহের মধ্যে রাজাবাড়ীর মঠ, ধাইধার মঠ, মালদার মঠ, আউটসাহীর মঠ, শ্যামসিদ্ধির মঠ, চৌদ্দহাজারীর মঠ, কামারখাড়ার মঠ ও আকিয়া ধলের শিববাড়ীর মঠ, টঙ্গীবাড়ীর মঠ, প্রভৃতি উল্লেখ যোগ্য। ইহার প্রায় প্রত্যেকটীই শ্মশানোপরি নির্ম্মিত। শ্মশানোপরি বিনির্ম্মিত এ সকল প্রত্যেক মঠের নির্ম্মাণ সম্বন্ধেই নানা প্রকার কিম্বদন্তীও প্রচলিত আছে। বাবা আদমের মসৃজিদ্, রিকিব বাজার, পাথর ঘাটা, কাজির মসজিদ ইত্যাদির কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি, এই বিখ্যাত মসজিদ কয়টি ছাড়া, 'আউটসাহীর মসজিদ ও কার্ত্তিকপুরের মসজিদ

উল্লেখ যোগ্য বিবেচনা করি, ইহাও পাঠান শাসন সময়ে নির্ম্মিত হইয়াছিল।

তীর্থস্থান বা দেবমন্দির সম্পর্কে উত্তর বিক্রমপুরের চাচুরতলা, কালীবাড়ী, মালদার কালীবাড়ী, বাঘরার বাসুদেব ও শ্রীনাথের বাড়ী, বানারীর মনসাবাড়ী, মুন্সীগঞ্জের যোগিনী ঘাট, দিঘীর পারের অষ্টমী স্নান ঘাট ইত্যাদি প্রধান। দক্ষিণ বিক্রমপুরের মাঐসারের কালীবাড়ী সিদ্ধপীঠ। চাচুরতলা কালীবাড়ী সাধারণতঃ ঠারইন (ঠাকুরুণ বাড়ী বা সিদ্ধেশ্বরী কালী মন্দিরনামে পরিচিত। রাজাবাড়ীর মঠের অর্দ্ধ মাইল দূরে চাচুরতলা নামক গ্রামে এই কালীমন্দির স্থাপিত। পদ্মাতট হইতেই ইহা দেখিতে পাওয়া যায়। এমন সুন্দর শান্তিপ্রদ স্থান উত্তর বিক্রমপুরের আর কোথাও বিদ্যমান নাই। প্রাচীন এমন কোনও কাগজ পত্র এখন বিদ্যমান নাই যদ্বারা ইহার প্রকৃত অতীত ইতিহাস জানা যাইতে পারে। জন-কোলাহল হইতে দূরে একটী খালের পাড়ে (চাচুর তলার খাল) সুরম্য তপোবনের ন্যায় বট, তেঁতুল, আম্র প্রভৃতি প্রাচীন মহীরুহরাজির শীতল ছায়ায় শস্পাচ্ছাদিত প্রান্তরভূমে জগন্মাতা বিক্রমপুরবাসীর স্নেহময়ী রক্ষয়িত্রীরূপে বিরাজিতা। নানাদেশ দেশান্তর হইতে প্রতিদিন দেবীকে দর্শনের নিমিত্ত এখানে লোক সমাগম হইয়া থাকে। এই কালী প্রত্যক্ষ জাগ্রতা দেবী। ইহার মাহাত্ম্য সম্বন্ধে নানাপ্রকার সুন্দর সুন্দর কিম্বদন্তী শুনিতে পাওয়া যায়। সে সকল লিপিবদ্ধ করিলে ছোট খাট একখানা পুথি বিরচিত হইতে পারে। মাল্‌দার কালীবাড়ী প্রভৃতি স্থলেও 'মানত' ইত্যাদির জন্ত পর্ব্বাদি উপলক্ষে বহু স্ত্রী ও পুরুষ যাত্রীর সমাগম হয়। চাচর অর্থে কেশ, লোকে চাচুর তলা 'চুল দেয় বলিয়াই ইহার নাম চাচরের তলার অপভ্রংশ চাচুরতলায় পরিণত হইয়াছে।

লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দির
আটপাড়া কালীবাড়ী।

লস্কর দীঘীর শিবমন্দির।

উত্তর বিক্রমপুরের চাচুর তলার সিদ্ধেশ্বরী বাড়ীর ন্যায় দক্ষিণ বিক্রম-পুরের মাঐসার নামক গ্রামের দিগম্বরী বাড়ী। ইঁহারা উভয়ই জাগ্রতাদেবী। কথিত আছে যে, সুপ্রসিদ্ধ ব্রহ্মাণ্ড গিরি চাচুর তলাতে এবং মাঐসারে চাঁদ কেদার রায়ের গুরু গোসাঞি ভটাচার্য্য সিদ্ধিলাভ করেন। এই উভয় স্থানই সিদ্ধপীঠ।

মাঐসারের দিগম্বী তলা।

বাঘিয়া (বাইগা) গ্রামের পশ্চিম প্রান্তে একটী প্রকাণ্ড দীঘীর খাত বিদ্যমান আছে, উহার নাম লস্কর দীঘী, এই দীঘীর তীরে একটী শিবমন্দির আছে, ইহা সাধারণতঃ লস্কর দীঘীর শিবমন্দির নামে পরিচিত। উহা ১১১২ সনে রূপরাম লস্কর (গুপ্ত) কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়। রূপরাম নবাবের কর্ম্মচারী ছিলেন এবং তাঁহার লস্কর উপাধি থাকায় এই দীঘীর নামও লস্কর দীঘী হইয়াছে। দীঘীটি দৈর্ঘ্যে প্রায় ছয়শত হাত এবং প্রস্থে প্রায় তিনশত হাত হইবে। বর্ষার সময় যখন ইহা জলে পূর্ণ হয়, তখন ইহার সৌন্দর্য্য বিশেষরূপে উপলব্ধি করিতে পারা যায়। সরোবরের পূর্ব্বতটে শিবমন্দিরটি বিরাজিত, এই মন্দিরও রূপরাম গুপ্তই নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এরূপ সুন্দর কারুকার্য্য সম্পন্ন ইষ্টক-গ্রথিত শিবমন্দির বিক্রমপুরের আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। দুইশত বৎসর পূর্ব্বে ইষ্টকালয় কিরূপ সুন্দর ও সুগঠিত হইত, এই শিবমন্দিরের প্রত্যেক খানা খোদিত ইষ্টকের মূর্ত্তি সমূহ হইতে তাহা বিশদরূপে অধ্যয়ন করিতে পারা যায়। মন্দিরের চতুর্দ্দিকস্থ ইষ্টকগাত্রে নানাবিধ পৌরাণিক চিত্র বিদ্যমান। কোথাও দিগ্‌বসনা লোলরসনা কালিকা মূর্ত্তি, কোথাও বা মহিষাসুরমর্দ্দিনী দশহস্তে দশ প্রহরণধারিণী শক্তি রূপিনী দেবী ভগবতীর মূর্ত্তি, কোথাও বা কৃষ্ণ বকাসুরকে বধ করিয়া তাহার বদন-বিবর হইতে বহির্গত হইতেছেন; আবার একধারে আভীর

লস্কর দীঘীর শিবমন্দির।

পল্লীর চিত্র, গোপবধূগণ গো-দোহন রত, গোপগণ ভাড় কাঁধে করিয়া যাইতেছে, তাহারি পার্শ্বে আবার কোন রমণী প্রসাধনে রত, এক সখী তাহার কেশপাশ বন্ধন করিয়া দিতেছে, আবার একদিকে কে একজন পুরুষ জনৈকা যুবতীর খোপা ধরিয়া টানিতেছে। এরূপ যে কত চিত্র তাহা বর্ণনা করিয়া উঠা সুকঠিন। মন্দিরটীর কোন কোন অংশে লোনা ধরায় সে সে দিকের মূর্ত্তি ধ্বংস হইয়াছে। দীঘীর তীরে এখন কয়েক ঘর মাত্র মুসলমান বাস করে। চারিদিকে একটা নীরবতা ইহাকে বেড়িয়া রহিয়াছে। এখন মন্দির মধ্যে শিবলিঙ্গ নাই, একদিন যে ছিল তাহার চিহ্ন বিদ্যমান আছে। পল্লীস্থ একটী অভিজ্ঞ প্রাচীন বৃদ্ধ যখন আমাদের নিকট ইহার প্রাচীন ইতিহাস বর্ণনা করিতেছিলেন, তখন সেকালের বিক্রমপুরের সামাজিক মিলনের সুমধুর চিত্র, শিব-মন্দির প্রতিষ্ঠা, পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি ধর্ম্ম ও পুণ্য কর্ম্মাদির অনুষ্ঠান, হিন্দুর হিন্দুত্ব ও প্রকৃত লোক-হিতকর কাহিনীর সহিত বর্ত্তমান ধনীদের বিলাস কাহিনীর কথা মনে হইয়া যুগপৎ ঘৃণা ও ক্ষোভের সঞ্চার হইয়াছিল। এই রূপরাম গুপ্ত একজন ধনবান ব্যক্তি ছিলেন, কিন্তু নিজ পারিবারিক সুখ-স্বচ্ছন্দতার দিকে বিন্দুমাত্রও দৃষ্টিপাত না করিয়া নানাবিধ লোক-হিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠানে যে ধর্ম্মের ও পুণ্যের কীর্ত্তিস্তম্ভ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, তাহা কি অক্ষয় ও অমর নহে?

কথিত আছে যে, কয়েক সহস্র মুদ্রা মৃত্তিকা মধ্যে প্রোথিত করিয়া তদুপরি এই শিব-মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে, ইহা অবিশ্বাস্য নহে। কারণ সেকালে দেব মন্দিরাদি নির্ম্মাণ সম্পর্কে এইরূপ রীতি প্রচলিত ছিল। শ্রীপুরের কোটিশ্বর শিব-মন্দির সম্পর্কে এইরূপ জনপ্রবাদ চির প্রচলিত। এই দীঘী ও শিব মন্দির সম্বন্ধে নানা প্রকার জন প্রবাদ শুনিতে পাওয়া যায়, তাহার মধ্যে অধিকাংশই যে নানা প্রকার অদ্ভুত কল্পনা প্রসূত, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই।

বিক্রমপুরের দেউলবাড়ী বিশেষ রূপে আলোচনার যোগ্য। বিক্রমপুরে জোড়াদেউল, রাউতভোগ, সুয়াসপুর (সুখবাসপুর), দেওসার, সোণারঙ্গ, চুড়াইন একয়টী গ্রামে দেউলবাড়ী বিদ্যমান ছিল। প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্যে 'দেউল' অর্থে দেবালয় বুঝায়, অতএব ইহা অনুমান করা অসঙ্গত নহে যে এক সময় এ সকল স্থানে দেবমন্দিরাদি প্রতিষ্ঠাপিত ছিল, কালবশে দেবালয়ই দেউলে পরিণত হইয়াছে। দেউলবাড়ী সম্বন্ধে নানা প্রকার মতামত শুনিতে পাওয়া যায়। ইহার মধ্যে কোনটি উপন্যাসের মত অসত্য এবং কোনটী বা কতকটা যথার্থ বলিয়া অনুমান হয়। কেহ কেহ বলেন রাজাবল্লাল সেন তদীয় উচ্চ পদস্থ কর্ম্মচারী দিগকে যে সকল দেয়াল ঘেরা আবাস বাটী নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন তাহাই দেউল বাড়ী, দেয়াল হইতে দেউল হইয়াছে।

দেউল বাড়ী

আর এক প্রকার মন্তব্য এই যে রামপালের নিকটবর্ত্তী কোনও গ্রাম নিবাসী জগন্নাথ বণিক নামক একজন ধনশালী ব্যক্তি গ্রামে গ্রামে যে সকল দেবালয় প্রতিষ্ঠাপিত করিয়াছিলেন তাহাই দেউলবাড়ী। আবার কেহ কেহ এ গুলিকে বৌদ্ধ সঙ্ঘারাম বলিয়া অনুমান করেন। এ সিদ্ধান্ত ও একেবারে উপেক্ষণীয় নয়, কারণ সোণারঙ্গ গ্রাম নিবাসী স্বর্গীয় বৈকুণ্ঠনাথ সেন মহাশয় এই সকল দেউলবাড়ী হইতে যে সকল প্রস্তর মূর্ত্তি ইত্যাদি সংগ্রহ করিয়া ছিলেন তাহার অধিকাংশই বুদ্ধমূর্ত্তি, অতএব এ সকল দেউল বাড়ীই যে য়ুয়নচয়ঙের বর্ণিত বৌদ্ধ সঙ্ঘারাম সমূহ তাহা অনুমান করা অসঙ্গত নহে। এতদ্ব্যতীত রায়পুরা, বজ্রযোগিনী, বেজিনীসার, শ্রীনগর, কুমরপুর, কুমরভোগ, তেলির বাগ প্রভৃতি গ্রামেও এককালে দেউল বাড়ী ছিল বলিয়া শুনিতে পাওয়া যায়। দেউলবাড়ী সমূহ যে সঙ্ঘারাম ছিল তাহা নিঃসন্দেহ, কারণ নবাবিষ্কৃত অবলোকিতেশ্বর মূর্ত্তিই তাহার বিশেষ সাক্ষ্য।

এই দেউল বাড়ীগুলি সম্পর্কিত বিবরণ, যথার্থ রূপে জ্ঞাত হইতে হইলে খনন ব্যতীত আর কোনও রূপ উপায়ই নাই। কালের ভীষণ আক্রমণে, বংশপরম্পরা-সঞ্জাত অলসতায় এমন অবস্থাই এখন দাঁড়াইয়াছে যে অতিবড় বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ প্রত্নতত্ত্ব বিদের পক্ষে ও দেউলবাড়ীর প্রকৃত ইতিহাস উদ্ঘাটন করিতে হইলে কল্পনার সাহায্য ব্যতীত অন্য কোনও উপায় নাই।

দীঘী সরোবর

বিক্রমপুরে দীঘী ও সরোবরের সংখ্যা অত্যন্ত বেশী। এমন পল্লীগ্রাম অতি বিরল যে গ্রামে একটী দীঘী বা সরোবর নাই। এ সকল দীঘী ও সরোবরের মধ্যে রামপালের দীঘী, কেশারমার দীঘী, রঘুরামপুরের দীঘী, নাদিমসার দীঘী (দশলঙ্গ), নয়নন্দের দীঘী, কান্দার বাড়ীর দীঘী, সুয়াসপুরের দীঘী, ভাঙ্গইনার দীঘী প্রভৃতি প্রধান। রামপালের দীঘী ও কেশারমার দীঘী সম্বন্ধে পূর্ব্বেও উল্লেখ করিয়াছি, এখানে রামপাল দীঘী সম্বন্ধে আর একটী জন প্রবাদ উল্লেখ করিলাম। (১) "রাজা বল্লাল স্বীয় জননীর সহিত এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, তাঁহার মাতা কোন স্থানে দণ্ডায়মান বা উপবিষ্ট না হইয়া একদিকে যতদূর গমন করিতে পারিবেন, তিনি সেই দিনের রাত্রিতে ততদূর পর্য্যন্ত একটা দীঘী খনন করাইবেন। তদনুসারে তাঁহার মাতা এক দিবস বৈকালে বাহির বাটীর দক্ষিণ হইতে ক্রমাগত দক্ষিণাভিমুখে চলিয়া যাইতে লাগিলেন। তিনি অধিক দূর গমন করিলে পর বল্লালসেনের মনে এই ভাবনা উপস্থিত হইল যে, তাঁহার মাতা অনেক দূর অতিক্রম করিয়াছেন, আরো গমন করিলে তিনি এক রাত্রিতে এক দীঘী খনন করিতে পারিবেন না। কেবল তাঁহাকে মাতৃ প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া নিরয়গামী হইতে হইবে, মনে মনে এইরূপ আন্দোলনের পর রাজা স্থির করিলেন যে, এখন যদি কেহ তাঁহার জননীর চরণে

আলতা দিয়া বলে যে, আপনার পায়ে জোঁক ধরিয়াছে, তাহা হইলে তিনি উহা দেখিতে স্থগিত থাকিবেন। সুতরাং সে পর্য্যন্তই এক দীঘী খনন করা হইবে, তদনুসারে তিনি আপনার কয়েক জন ভৃত্যকে তদ্বাক্য সুধাইয়া তদনুযায়ী কার্য্য করিতে আদেশ করতঃ গম্যমান জননীর সন্নিকটে প্রেরণ করিলেন এবং তাহাতেই তাহার উদ্দেশ্য সফল হইল, রাজমাতা প্রেরিত লোকদের বাক্য শ্রবণে যে স্থানে দণ্ডায়মানা হন সেখানেই কর্ম্মচারীরা চিহ্ন স্থাপন করিয়া (খোটা গাড়িয়া) রাজমাতা সমভিব্যহারে রাজবাটীতে প্রত্যাগমন করিলেন। অনন্তর অসংখ্য লোক সংগ্রহ করা হইল, এক রাত্রিতে এ পর্য্যন্ত দীঘী খনন করা হইল।*

অনেক দিন পর্য্যন্ত দীঘীতে জল উঠিয়াছিল না, রাজা বল্লালের পরম স্নেহাস্পদ ভৃত্য রামপাল স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া, অশ্বারোহণ পূর্ব্বক সে দীঘীতে প্রবেশ করে। এবং প্রবেশ কালীন উহার চতুষ্পারে লোক রাখিয়া বলে ইহা জল পরিপুরিত হইলে তোমরা সকলে উহাকে রাম পালের দীঘী বলিয়া আখ্যাত করিও। এতবচন প্রয়োগান্তে রামপাল প্রোক্ত দীঘীতে প্রবেশ করিবা মাত্র উহা কল কল স্বরে জল পরিপূর্ণ হইতে লাগিল এবং রামপাল তখন সকলের নয়ন পথাতীত হইয়া কোথায় গেল, কেহই নিশ্চয় করিতে পারিলেন না। আর সেই সময়ে সকলের মুখ হইতে রামপাল, রামপাল এই শব্দ বিনির্গত হইতে লাগিল। তদবধি উহা রামপালের দীঘী বলিয়া খ্যাতাপন্ন হইয়াছে।" †

* পল্লী বিজ্ঞান ১মবর্ষ ১২৭৬ 'রামপাল, শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

† এই দীঘীর উৎপত্তি সম্বন্ধে স্বর্গীয় আশুতোষ গুপ্ত মহাশয়ের লিখিত যুক্তিকেই আমরা যথার্থ বলিয়া মনে করি, তিনি যথার্থই লিখিয়াছেন :—'Rampal is also the

বজ্রযোগিনী গ্রামের উত্তর পূর্ব্বকোণে রঘুরামপুরে একটী বৃহদায়তন দীর্ঘিকা রাজা হরিশ্চন্দ্রের দীঘী বলিয়া সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। রঘুরামপুরে অদ্যাপি হরিশ্চন্দ্রের বাটীর ভিটা দৃষ্ট হয়। ঐ ভিটার দক্ষিণ পার্শ্বে প্রায় দুইশত হস্ত দীর্ঘ এবং ৮০।৯০ হস্ত প্রশস্থ দীঘীটি অদ্যাপি বিরাজিত আছে। এই দীঘী বার মাস বড় বড় জঙ্গল ও ভীট সকল দ্বারা পূর্ণ থাকে, কিন্তু প্রতি মাঘী পূর্ণিমার দিবস ১০।১২ হাত পরিমিত স্থানের ভীট সকল জল মগ্ন হইয়া পরে পুনরায় ভাসিতে থাকে। অনেকেই এই আশ্চর্য্য ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়াছেন কিন্তু কোন সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত

---

name of Ballal sen's city. Is it not very strange that Bullal's city and the largest lake he excavated should be named after an obsqure person unknown to history ? Rampal is by the name of a person and is analogous to the names of Bhim Pal and other Pal kings of Bengal, I conjecture that he was a king of the Pal dynasty which reigned at Rampal after the death of Ballal Sen, and that it was he and not Ballai who excavated the lake, and the city and the lake have been named after him. To the, north of the Burhi Ganga there are still many remains to show that the Pal kings reigned in that part of Bengal, and it is a historical fact that they flourished both before and after the sen dynasty. But as they were Buddhist, ruling a population, which were Hindus, there names have not been handed down to posterity with that halo of glory which surrounds the sen kings, who were orthodox Hindus and great patrons of Brahmans aud Brahmanical learning. Again, it is a well known fact that one of the characteristics of the Pal kings was to excavate large lakes and tanks wherever they lived. The Mahipal dighi, still existing in Dinajpur, is perhaps the largest lake they cut in Bengal, for all these reasons I am of opinion that the prince who gave his name to the city and lake of Rampal was a king of the pal dynasty.

হইতে পারেন নাই। এই রাজা হরিশ্চন্দ্র কে? তদ্বিষয় নানারূপ প্রশ্ন মনে উদয় হয়। আমাদের মনে হয় এই হরিশ্চন্দ্রই—বৌদ্ধ নৃপতি হরিশ পাল। * 'সুবর্ণগ্রামের ইতিহাস' প্রণেতা স্বরূপ বাবু এবং এসিয়াটিক সোসাইটির জার্ণেলের † রামপাল শীর্ষক প্রবন্ধ লেখক ৺আশুতোষ গুপ্তও এই মতাবলম্বী।

অন্যান্য প্রায় প্রত্যেকটি দীঘী, সরোবরের সম্বন্ধেই নানাবিধ জন প্রবাদ প্রচলিত। কোনটি বা এক রাত্রিতে ভূতে খনন করিয়াছিল, কোনটি বা 'সোনার নাও পবনের বৈঠা' ওয়ালা কোনটি বা যক্ষের 'আমল' করা ইত্যাদি। পল্লী বৃদ্ধদের মুখে এসব উপকথা শুনিতে বেশ লাগে। এ সমুদয় দীঘী ও পুষ্করিণী দৃষ্টে আমার মনে হয় সে সকল মহাত্মাদের কথা, যাঁহারা জন সাধারণের জল কষ্ট দূরীকরণার্থ এ সমুদয় জলাশয় খনন করিয়া দেশে দেশে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা ও দেবালয় স্থাপনই ছিল সেকালের ধর্ম্ম। একদিন যে সমুদয়

---

* বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অধিবেশনে পঠিত শ্রীযুক্ত সুখবিন্দুসেন গুপ্ত বি, এ মহাশয় একটী প্রবন্ধে এই রাজা হরিশ্চন্দ্র সম্বন্ধে যে সকল জনপ্রবাদ সংগ্রহ করিয়াছেন তাহাও আলোচনার যোগ্য।

† There is a comparatively small tank in the south west part of Rampal, which deserves a passing notice. It is called Raja Haris chandra's dighi. It is overgrown with trees and shrubs which are flooded over with water for a week once a year of the time of the full moon in the month of Magh. Before and after this period the tank is dry * * * * This tank is said to have been excavated by Raja Haris Chandra, probably one of the Kings of the Pal dynasty.

P. 22. J. R. H. S. 1889.

সুবর্ণ গ্রামের ইতিহাস ৪২ পৃষ্ঠা।

মহাত্মারা লোকের নির্ম্মল পানীয়ের সংস্থান নিমিত্ত আগণন জলাশয় খনন করিয়াছিলেন—আজ তাঁহাদের বংশধরেরা এ সকল কার্য্য অপেক্ষা বিলাসব্যসনে অর্থ ব্যয় করাকেই ধর্ম্ম বলিয়া বরণ করিয়া লইয়াছে। গ্রীষ্মকালে বিক্রমপুরের আভ্যন্তরিক গ্রাম সমূহের জলাভাবের শোচনীয় অভাব দৃষ্টে আপনা হইতেই নয়নযুগল অশ্রুতে ভরিয়া যায়, হায়! আজ তাঁহারা কোথায়! তাঁহাদের খনিত দীঘী, সরোবর গুলির পঙ্কোদ্ধার করিলেও দারুণ জলাভাবের হস্ত হইতে আমরা উদ্ধার পাইতে পারি।

সাহিত্য, রাজনীতি, সভা, সমিতি, বঙ্গবিভাগও স্বদেশী আন্দোলন, পত্র ও পত্রিকা।

সাহিত্যের সম্বন্ধে পূর্ব্ববর্ত্তী অধ্যায়ে বিশেষরূপে আলোচনা করা গিয়াছে, এখানে কেবলমাত্র দু'একটী কথা বলিয়াই ক্ষান্ত রহিব। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে লৌহজঙ্গের পাল বাবুদের চেষ্টাও যত্নে "বিক্রমপুর" নামক একখানা সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত হইয়াছিল, দুঃখের বিষয় উহা কয়েক বৎসর পরিচালিত হইয়াই কাল-সাগরে বিলীন হইয়া গিয়াছে। "পল্লীবিজ্ঞান' নামক মাসিক পত্র খানাই বিক্রমপুরের সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন পত্রিকা। ইহা জৈনসার গ্রাম নিবাসী স্বর্গীয় খ্যাতনামা 'জজ বাবু' অভয় কুমার দত্তগুপ্তের অর্থানুকূল্যে

পল্লী বিজ্ঞান।

জৈনসার স্কুলের তদানীন্তন শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু রাজমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সম্পাদনে ১২৭৩ সনের মাঘ মাসে (ইং ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে জানুয়ারী মাসে) প্রথম প্রকাশিত হয়। বিক্রমপুরের ও বিক্রমপুরস্থ অধিবাসিগণের অবস্থা, অভাব ও অভিযোগ বর্ণনা করাই ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। পত্রিকা খানি বহু সার গর্ভ সুন্দর সুন্দর প্রবন্ধাদিভূষিত হইয়া প্রকাশিত হইত। প্রথমতঃ ইহার একশত খানা মাত্র মুদ্রিত হইয়া বিনামূল্যে বিতরিত হইত, পরে গ্রাহক সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং অনেকে বিনামূল্যে পত্রিকা গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হওয়ায় ইহার বার্ষিক দুই

টাকা মূল্য ধার্য্য হয়। রাজমোহন বাবু ১২৬৪ সনের অগ্রহায়ণ মাস হইতে সম্পাদকের কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিলে, জৈনসার স্কুলের শিক্ষক বাবু আনন্দ কিশোর সেন মহাশয় পত্রিকার সম্পাদকের কার্য্য ভার গ্রহণ করেন। ১২৭৫ সনে পত্রিকা খানি উঠিয়া যায়! বর্ত্তমান সময়ে "পল্লী বিজ্ঞানের" নাম বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। জৈনসার গ্রামস্থ পুস্তকাগারে মাত্র ইহার এক খণ্ড রক্ষিত আছে। এই পত্রিকা খানিতে গ্রাম্য দলাদলী, রাস্তা ঘাটের সংস্কার, স্ত্রী-শিক্ষা, সাময়িক সংবাদ, বিক্রমপুর ও রাম পালের প্রাচীন ইতিহাস প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ের আলোচনা হইত। দেশের মঙ্গলের জন্য স্বদেশবাসীকে আহ্বানই ইহার মূলমন্ত্র ছিল। পত্রিকার শিরোভূষণ স্বরূপ যে চারি পংক্তি কবিতা প্রকাশিত হইত আমরা এখানে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম, ইহা হইতেই পাঠকবর্গ বুঝিতে পারিবেন যে পরিচালক বর্গের কিরূপ উৎসাহ ও উদ্যম ছিল—এবং তাঁহারা মাতৃ ভূমির কল্যাণ কামনায় কিরূপ দৃঢ় চিত্ত ছিলেন।

"গেল পক্ষ গেল মাস কি করিলে কাজ।
তোষিতে ত্রাসেতে দগ্ধ বঙ্গের সমাজ ॥
দেশহিত কর সদা মুখেতে সাধিত।
হৃদয়ে সে ভাব কিছু আছে কি নিহিত ॥"

বর্ত্তমান সময়ে আবার এইরূপ একখানা মাসিক পত্রের আবির্ভাবের প্রয়োজন হইয়াছে। লৌহজঙ্গ, মুন্সীগঞ্জ ও সোনারঙ্গে তিনটী মুদ্রা যন্ত্র ছিল। বর্ত্তমান সময়ে এক মুন্সীগঞ্জের মুদ্রা যন্ত্রটী ব্যতীত আর দুটী মুদ্রাযন্ত্র নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

বিক্রমপুরের প্রাচীন সভাসমিতির মধ্যে শ্রীনগরের কৌমারবিনোদিনী সভা, কোরহাটীর জ্ঞানদায়িনী সভা, কাঁচাদিয়ার শুভকরী সভার ও ব্রাহ্মণগাঁর গ্রামহিতৈষিণী ও লৌহজঙ্গের জ্ঞানপ্রকাশিনী নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। কোরহাটীজ্ঞানদায়িনী সভার

নাম বিলুপ্ত হইয়াছে, কিন্তু কাঁচাদিয়ার শুভকরী সভাই নব পর্য্যায়ে কামাড়খাড়া গ্রামবাসীগণ কর্ত্তৃক পরিচালিত হইতেছে। বর্ত্তমান সময়ে 'ব্রাহ্মণসভা' ও 'অম্বষ্ঠ সম্মিলনী সভা" নামক দুইটী সভা আছে। প্রতি বৎসর একবার করিয়া ইহাদের অধিবেশন হয় এবং তাহাতে সর্ব্বভৌমিক ভাবে কোন বিষয় আলোচিত না হইয়া কেবল নিজ নিজ জাতীয় উন্নতির বিষয়ই আলোচিত হয়। দুঃখের বিষয় যে এ দু'টি সভার দ্বারা দেশের আশানুরূপ কোনও উন্নতি হইতেছে না। বিক্রমপুরের প্রায় প্রতিগ্রামেই পাঠাগার আছে। ১৯০৩ সালে বঙ্গভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গেই চারিদিকে রাজনীতির আলোচনা সভা সমিতি ও স্বদেশী আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। তখন প্রতিগ্রামেই সভা, বক্তৃতা ও বিলাতী বর্জ্জনের ধূম পড়িয়া গিয়াছিল। বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে বিক্রমপুরের জন সাধারণ তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিল। বিখ্যাতবাগ্মী শ্রীযুক্ত বিপিন চন্দ্র পাল মহাশয় বিক্রমপুরের পূর্ব্বাঞ্চলবাসীগণের নিমন্ত্রণে বিক্রমপুরে আগমন করিয়া বিদগাঁ, স্বর্ণগ্রাম ও মুন্সীগঞ্জে বক্তৃতা করিয়া স্বদেশী আন্দোলন আরও দৃঢ়ীভূত করিয়া গিয়াছিলেন। গ্রামে গ্রামে 'অনুশীলন সমিতি', 'সুহৃদ সমিতি' ও 'শক্তি সমিতি' প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কিন্তু গভর্মেণ্টের আদেশে ঐ সকল সমিতি এখন উঠিয়া গিয়াছে। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই অক্টোবর তারিখে বঙ্গ ভঙ্গ স্থিরীকৃত হইলে স্বদেশী দ্রব্যের প্রচলন আরও দৃঢ়ীভূত করিবার জন্য প্রত্যেক গ্রামে গ্রামে সভা সমিতির অধিবেশন হইয়াছিল। পরে গভর্মেণ্টের আদেশে উহা নিবারিত হওয়ার পর হইতে আর কোনও রাজনৈতিক সভা সমিতির অধিবেশন হয় নাই। বিক্রমপুরে স্বদেশী সংশ্লিষ্ট বলিয়া যে কয়টি মামলা মোকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছে, তন্মধ্যে দিঘীর পাড়ের হাটে ঢাকার ম্যাজিষ্ট্রেট এলেন সাহেবের প্রতি ঢিল ছোড়ার মোকদ্দমা, নড়িয়ার ডাকাতি সম্পর্কিত ধর-পাকড়া এবং

সভাসমিতি।

কলমার অস্ত্র আইন ঘটিত মোকদ্দমা ব্যতীত তেমন উল্লেখ যোগ্য কিছুই ঘটে নাই। কলিকাতা হ্যারিসন রোডের বোমা ঘটিত মোকদ্দমার দণ্ডিত আসামীগণের মধ্যে শ্রীযুক্ত ধরণী ধর গুপ্ত ও শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ গুপ্ত কবিরাজ ভ্রাতৃদ্বয় বিক্রমপুরস্থ বিদ্গাঁয়ের অধিবাসী।

প্রাচীন জমিদার বংশ।

যশোবন্ত রায়ের সুশাসন প্রভাবে বিক্রমপুরে তেমন ক্ষমতাশালী কোনও জমিদার বংশ নাই। যাঁহারা আছেন, তাঁহাদের ও ক্ষমতা প্রতিপত্তি বিক্রমপুরের বাহিরে, বিক্রমপুরের সীমার অন্তর্ভুক্ত নহে। এ সকল প্রাচীন জমিদার বংশের মধ্যে বঙ্গবীর প্রতাপাদিত্যের খুল্লতাত রাজা বসন্ত রায়ের বংশধরগণ, নওপাড়ার চৌধুরী, শ্রীনগরের কালীপাড়ার বন্দ্যোপাধ্যায় বংশ, আউটসাহীর গুপ্ত, বহরের চৌধুরী, তারপাশার মহাশয়, মালখানগরের বসু, মাইজপাড়ার রায়, ভাগ্যকূলের কুণ্ডু, লৌহজঙ্গের পাল প্রভৃতি প্রধান। ইহাদের বিষয় পরবর্ত্তী অধ্যায়ে আলোচনা করিলাম।

ভূমির আকৃতি ও জলবায়ু।

বিক্রমপুর সম্পুর্ণরূপে সমতল ভূমি নহে। অনেক স্থানে অত্যন্ত উচ্চ, এমন কি বর্ষার প্রবল প্রকোপের সময় ও তথায় জলাধিক্য হয় না, রামপাল, বজ্রযোগিনী পঞ্চসার প্রভৃতি পল্লীনিচয় এইস্থানে অবস্থিত। বিখ্যাত পাল ও সেন রাজাদিগের রাজধানী এক সময়ে এখানেই প্রতিষ্ঠাপিত ছিল। এ দিকের ভূভাগ ব্যতীত অন্যান্য স্থান সমূহ নিম্নভূমি বলিয়া বর্ষার সময় একেবারে জলে প্লাবিত হইয়া যায়। সে সময়টা বড়ই অস্বাস্থ্যকর ও বিপজ্জনক হয়। উপরেও জলধরের জলধারা, নিম্নেও বরুণদেবের জলধারা; কাজেই বিক্রমপুরের অধিবাসীদিগকে দারুণ ক্লেশে দিনাতিপাত করিতে হয়। এমন কি, অনেকের গৃহের মধ্যে পর্য্যন্ত জল উঠায় বাধ্য হইয়া তাহাদিগকে বংশ ও কাষ্ঠাদি নির্ম্মিত মঞ্চের উপর বাস করিতে হয়। অতি বর্ষা নিবন্ধন সময় সময় শস্যাদি বিনষ্ট হইয়া দুর্ভিক্ষের সৃষ্টি করে।

বিক্রমপুরের জলবায়ু ঋতুভেদে পরিবর্ত্তনশীল। তবে সাধারণ ভাবে বলিতে গেলে বিক্রমপুরের প্রায় সকল স্থানেরই জলবায়ু স্বাস্থ্যপ্রদ। ম্যালেরিয়ার নাম-বংশও বিক্রমপুরে নাই, বোধ হয় বর্ষার প্রবল পরাক্রমে আবর্জ্জনা রাশি ধৌত হইয়া যায় বলিয়াই এস্থানে ম্যালেরিয়া নাই। বিক্রমপুরে অগ্রহায়ণ মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত স্বাস্থ্য উত্তম, তখন একদিকে যেমন মাতা বসুন্ধরা হরিৎ শস্যের সাটি পরিধান করিয়া নবীন সৌন্দর্য্য ধারণ করেন, তদ্রূপ অধিবাসী-বর্গও স্বাস্থ্যসুখ উপভোগ করে। এসময়ে খাদ্য দ্রব্যাদিও সুলভ হয়। ফাল্গুন মাস হইতে জ্যৈষ্ঠ মাস পর্য্যন্ত গ্রীষ্মের দারুণ প্রকোপের সঙ্গে সঙ্গে নানাবিধ ব্যাধিরও আধিক্য পরিলক্ষিত হয়, তন্মধ্যে ওলাউঠা, জ্বর, আমাশয়, হাম, জলবসন্ত প্রভৃতি প্রধান। এসময়ে ঝড়, ঝঞ্ঝা প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিপ্লবও বিক্রমপুরবাসীর আতঙ্কের সঞ্চার করে।

জলবায়ু।

বঙ্গের সর্ব্বত্র যেমন বঙ্গভাষা প্রচলিত, বিক্রমপুরেও তদ্রূপ সেই ভাষাই প্রচলিত আছে। যোজনান্তরেই যখন ভাষা ভেদ পরিলক্ষিত হয়, তখন এ অঞ্চলেও তাহা হইবে না কেন? বিক্রমপুরের প্রাদেশিক কথিত ভাষার সহিত বঙ্গের অন্যান্য জেলার কথোপকথনের বহু প্রভেদ বিদ্যমান। শব্দের অর্থ এবং উচ্চারণেও তাহা পরিস্ফুট। বিক্রমপুরের প্রাদেশিক কথিত ভাষার মধ্যেও আবার দুইটী স্তর দেখিতে পাওয়া যায়, একটী উচ্চ শ্রেণীর অপরটী নিম্নশ্রেণীর। উচ্চঃশ্রেণীর লোকের কথার মধ্যে লিখিত ভাষার শব্দাড়ম্বরের সংখ্যা খুব বেশী, আর নিম্নশ্রেণীর লোকের কথোপকথনের মধ্যে গ্রাম্য সরল ভাষার আধিক্য পরিলক্ষিত হয়। প্রাদেশিক কথিত ভাষার ইতিহাস বেশ কৌতুহলোদ্দীপক। এতদ্ব্যতীত প্রবাদ, ছড়া, প্রবচন, ডাকবচন প্রভৃতিও বহু প্রচলিত আছে।

ভাষা।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

প্রাচীন জমিদার বংশ।

বিক্রমপুরে ভূম্যধিকারীর সংখ্যা অতি অল্প, কেন অল্প তাহাও পূর্ব্বেই বিবৃত করা হইয়াছে। আমরা এখানে যে কয়টি প্রাচীন জমিদার বংশ শৌর্য্যে বীর্য্যে ও মহত্ত্বে এক সময়ে বিশেষ যশস্বী হইয়াছিলেন, তাঁহাদের প্রাচীন অথচ সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিলাম। প্রাচীনত্বের হিসাবে নপাড়ার চৌধুরী বংশের পরেই শ্রীনগরের জমিদার বংশ। এই বংশের প্রাচীন ইতিহাস কৌতুহলোদ্দীপক ও আলোচনার যোগ্য।

শ্রীনগরের জমিদার বংশ ও রাজা বসন্ত রায়ের বংশধরগণ।

এই বংশের স্থাপয়িতা বিখ্যাত জমিদার ৺লালা কীর্ত্তিনারায়ণ বসুর পিতা ৺কংসনারায়ণ বসু পৈত্রিক বাসস্থান ইদিলপুর ত্যাগ করিয়া বেজগ্রামে আগমন করেন। তখন কংসনারায়ণ দারিদ্র্য-প্রপীড়িত। এই দারিদ্র্যই তাঁহার পূর্ব্ব-নিবাস পরিত্যাগের কারণ; কিন্তু ঘটকদের প্ররোচনায় এখানেও তিষ্টিতে পারিলেন না। তাঁহারা বলিয়া বসিলেন "বেজগ্রামে কুলং নাস্তি"; কাজেই কৌলীন্ত-রক্ষার্থ কংসনারায়ণকে বেজগাঁ পরিত্যাগ করিয়া রায়েসবরে আসিতে হইল। কিন্তু বেজগ্রামে থাকার প্রায়শ্চিত্ত-স্বরূপ কুলীন হইতে কুলজে নামিতে হইল।

কংসনারায়ণ রায়েসবরের কুলীন গুহ মুস্তফীদের কন্যা বিবাহ করিয়া সেই খানেই বাস করিতে লাগিলেন। ইঁহার তিন পুত্র;—৺লালা কীর্ত্তিনারায়ণ, রামভদ্র ও শিবনারায়ণ।

কীর্ত্তিনারায়ণ কায়স্থ হইয়াও আলস্যে কাল কাটাইতে লাগিলেন। বিজ্ঞ কংসনারায়ণ কর্ত্তব্য-বিমুখ পুত্রকে কার্য্যক্ষম করিবার নিমিত্ত অনেক প্রয়াস পাইলেন, কিন্তু কিছুতেই কোন ফল হইল না। অবশেষে একান্ত বিরক্ত হইয়া এক দিবস স্ত্রীকে আদেশ করিলেন, 'ইহাকে ভাতের পবিবর্ত্তে ছাই বাড়িয়া দাও। স্ত্রী স্বামীর এই কঠোর আদেশ শুনিয়া বিস্মিত হইলেন। মা হইয়া কোন্ প্রাণে পুত্রকে ভাতের বদলে ছাই বাড়িয়া দিবেন? কিন্তু ওদিকে পতি প্রত্যক্ষ দেবতা, পতির আদেশ কেমন করিয়া অমান্য করেন! তখন ত আর বর্ত্তমানের নভেল পড়া মেয়েদের মত স্বামীর সঙ্গে তর্ক করার অভ্যাস ছিল না! কাজেই তিনি কৌশলের সহিত স্বামীর আজ্ঞা প্রতিপালন করিলেন। কীর্ত্তিনারায়ণের ভাতের থালার এক পার্শ্বে যৎকিঞ্চিৎ ছাই রাখিয়া দিলেন। যথা সময়ে কীর্ত্তিনারায়ণ ভোজন করিতে আসিয়া উহা দেখিলেন। কি মা বাপের পুত্রের প্রতি এত অবহেলা! অপমানিত কীর্ত্তিনারায়ণ সে দিবসই বাটী পরিত্যাগ করিয়া রাজনগরে উপনীত হইলেন।

লালা কীর্ত্তিনারায়ণ।

তখন রাজনগরের খ্যাতি ও রাজা রাজবল্লভের প্রতিপত্তি বঙ্গের সর্ব্বত্র বিদ্যমান। কীর্ত্তিনারায়ণ এ হেন মহৎ ব্যক্তির স্মরণ লইলেন। রাজবল্লভের অনুগ্রহে সামান্য নকলনবিশ হইতে নিজ বুদ্ধিমত্তা ও কর্ম্ম-কুশলতায় শীঘ্রই উচ্চপদে উন্নীত হইলেন। একদা মুর্শিদাবাদে নবাব সরকারের হিসাব সম্বন্ধে রাজা রাজবল্লভ অত্যন্ত গোলযোগে পতিত হ'ন, কিন্তু কীর্ত্তিনারায়ণের প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও ক্ষিপ্রতায় অচিরে সমস্ত গোল-যোগ হইতে রক্ষা পান।

এই সূত্রে কীর্ত্তিনারায়ণ নবাবের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং তাঁহার অনুগ্রহে ও রাজা রাজবল্লভের সহায়তায় বৈকুণ্ঠপুরের সমগ্র জমিদারীর অধিকারী হ'ন। তৎপরে নবাব দরবার হইতে 'লালা' উপাধি প্রাপ্ত

হ'ন। তদবধি বংশ পরম্পরায় এই উপাধি চলিয়া আসিতেছে। লালা কীর্ত্তিনারায়ণ মাতুলালয় রায়েসবর হইতে তৎপার্শ্বস্থ শ্রীনগর পত্তন করিয়া চতুর্দ্দিকে পরিখা খনন করতঃ সুদৃঢ় বাস-ভবন প্রস্তুত করেন। গ্রাম রক্ষার্থ পাইক নিযুক্ত হইল। তাহারা তীর, বর্ষা প্রভৃতির সাহায্যে গ্রাম রক্ষা করিত। বিপৎকালে তাহাদের আত্মরক্ষার্থ আটটী গোলাকার উচ্চাকৃতি বুরুজ তৈয়ার করান হয়। এখন অতীতের গর্ভে সে সকল বীরত্বচিহ্ন লুপ্ত। আজও একটী বিদীর্ণ বুরুজ অতীতের সাক্ষীস্বরূপ মাথা তুলিয়া আছে। সংস্কারাভাবে তাহাও শীঘ্র কালের গর্ভে বিলীন হইবে।

কীর্ত্তিনারায়ণের কীর্ত্তি।

ইহা ছাড়া শিবমন্দির প্রতিষ্ঠাও তাঁহার অন্যতম কীর্ত্তি। শিব মন্দির এখন ভগ্ন ইষ্টক-স্তূপে পরিণত।

কুল দেবতা অনন্তদেব ও কাত্যায়নী—কীর্ত্তিনারায়ণ স্থাপন করেন। সমস্ত জমিদারী এই বিগ্রহের নামে ক্রয় করা হয়।

আজও এই বিগ্রহ-মন্দিরে মঙ্গল-আরতির শব্দ নিত্য শুনা যায়। এখনও প্রতি সন্ধ্যায় এই মন্দির ধূপ চন্দনাদির পূত গন্ধে পরিপূর্ণ হয়। উৎসব আনন্দে এখনও এই মন্দিরপ্রাঙ্গণ জন-কোলাহলে মুখরিত হয়।

কীর্ত্তিনারায়ণের অক্ষয় কীর্ত্তি তাঁহার প্রতিষ্ঠিত অতিথিশালা। অদ্যাবধি এখানে অতিথিসেবা পূর্ণমাত্রায় চলিয়া আসিতেছে।

কীর্ত্তিনারায়ণের মৃত্যুর পর তাঁহার সহধর্ম্মিণী এবং অপর দুই ভ্রাতা জমিদারী বিভাগসূত্রে মোকদ্দমা আরম্ভ করেন। কীর্ত্তিনারায়ণের স্ত্রী অতি দয়াবতী নারী ছিলেন। তিনি তাঁহার বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীদিগের সম্পূর্ণ অমতে জমিদারীর কিয়দংশ দেবরদিগকে ছাড়িয়া দিয়া আসন্ন গৃহ-বিবাদ দূর করিয়াছিলেন।

কীর্ত্তিনারায়ণের জ্যেষ্ঠ পুত্র লালা কৃষ্ণচন্দ্র অত্যন্ত সৌখীন লোক ছিলেন, তিনি জমিদারী কার্য্যাদিতে তাদৃশ পটু ছিলেন না। তৎপুত্র

পুণ্যশ্লোক লালা জগদ্বন্ধু বসু মহাশয় অতি ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার দয়া-দাক্ষিণ্যে এ অঞ্চলের লোক তাঁহাকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করিত। অতিথি অভ্যাগতের জন্য তাঁহার দ্বার সর্ব্বদা মুক্ত থাকিত।

লালা জগদ্বন্ধু।

শ্রীনগরে প্রতি বৎসর ব্রহ্মপুত্র স্নানের সময় ৪০।৫০ হাজার অতিথি সমবেত হয়। ইঁহার সময়ে একবার অতিথি সংখ্যা এত অধিক হয় যে মজুত জ্বালানি কাষ্ঠে অকুলন হয়; জগদ্বন্ধু তাঁহার বড় বড় আটচালা ঘর ভাঙ্গিয়া অতিথির জ্বালানী কাষ্ঠ যোগাইয়া ছিলেন।

শ্রীনগর হইতে কখনো কোন অতিথি অভুক্ত ফিরিয়াছে বলিয়া শুনা যায় না। লালা জগদ্বন্ধুর এই অতিথিপরায়ণতা এবং অমায়িক ব্যবহার সর্ব্বত্র প্রচারিত ছিল। ঢাকার স্বনামধন্য নবাব স্যার আবদুল গণি সাহেব জগদ্বন্ধুকে বড় সম্মান করিতেন।

জগদ্বন্ধু ঢাকায় আসিলে এই মহানুভব নবাব তাঁহাকে আহার্য্য দ্রব্য-সম্ভার পাঠাইয়া স্বীয়,গুণগ্রাহিতার পরিচয় দিতেন। স্বর্গীয় নবাব বাহাদুর লালা মহাশয়কে বলিতেন "আপনি শত শত অতিথিকে সেবা করিয়া পুণ্য সঞ্চয় করিতেছেন, এমন পুণ্যবান লোককে বাটীতে আনিয়া খাওয়াই সে সাধ্য আমার নাই,—সুতরাং আমি ভেটস্বরূপ যাহা কিছু পাঠাই, তাহা গ্রহণ করিয়া আমাকে কৃতার্থ করিবেন।"

হায়! আজ সে পুরাতন সৌজন্য ও সৌহার্দ্দ্য কোথায়?

জগদ্বন্ধু শ্রীনগরে সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। যশোহরের বিখ্যাত মহারাজা বসন্তরায়ের বংশধর দ্বারকানাথ রায় মহাশয়লালা জগদ্বন্ধুর জ্যেষ্ঠা ভগ্নী আনন্দদাসীকে বিবাহ করেন।

প্রথম স্ত্রী বন্ধ্যা হওয়ায় জগদ্বন্ধু ভাগিনেয়গণকে তাঁহাদের বাসস্থান চব্বিশ পরগণা পুঁড়া গ্রাম হইতে উঠাইয়া শ্রীনগরে আনিলেন। সেই সময় হইতে মহারাজা বসন্ত রায়ের একশাখা শ্রীনগরে প্রতিষ্ঠিত হয়।

লালা জগবন্ধুর ভগ্নী আনন্দময়ী পিতৃবংশ লোপের ভয়ে, নিজ সন্তানদের ভাবী সমৃদ্ধি উপেক্ষা করিয়া দ্বিতীয় ভ্রাতা জগবন্ধুকে তাঁহার অনিচ্ছায়—দ্বিতীয় দার-পরিগ্রহ করান।

এই দ্বিতীয়া স্ত্রীর গর্ভজাত দুই পুত্র শ্রীযুত রাজেন্দ্রকুমার বসু এবং ব্রজেন্দ্রকুমার বসু বংশগত সৌজন্য ও অতিথি-পরায়ণতার অধিকারী হইয়াছেন।

লালা রাজেন্দ্রকুমার প্রখর বুদ্ধিশালী তেজস্বী জমিদার বলিয়া বিক্রমপুরে খ্যাত। তৎ কনিষ্ঠ লালা ব্রজেন্দ্রকুমার ধীর ও নির্ম্মল চরিত্রের জন্য সর্ব্বজন প্রশংসিত।

কীর্ত্তিনারায়ণের ভ্রাতা রামভদ্রের বংশে শ্রীনাথ বসু মহাশয় অতি প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন। ইনি অত্যন্ত ধর্ম্ম-পরায়ণ লোক বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। তিনি পঞ্চাশ বৎসর উত্তীর্ণ হইলে কাশীবাসী হন এবং সেখানেই জীবন শেষ করেন। ইঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত কালীনাথ বসু অতি সাধু ব্যক্তি। ইঁহার সৌজন্য ও বিনম্রব্যবহারে সকলে ইঁহাকে সাধু বলিয়া সম্মান করেন। এরূপ নিরভিমান চরিত্রবান লোক সর্ব্বাংশেই অতি বিরল।

শিবনারায়ণের বংশের মধ্যে অধুনা শ্রীযুক্ত হরলাল বসু মহাশয় সর্ব্বজন-প্রিয় লোক।

মহারাজা বসন্তরায়ের শ্রীনগরস্থ শাখার বংশাবলী পর পৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইল।
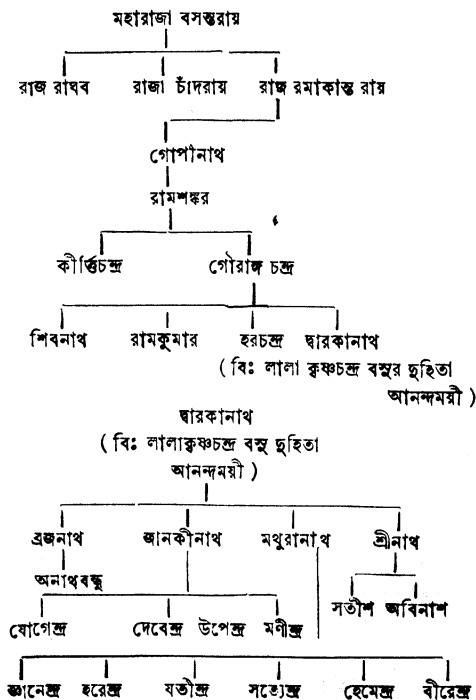
এই বংশের ব্রজনাথ রায় মহাশয় অতি সাধু লোক ছিলেন। ইনি পরিব্রাজকবেশে পদব্রজে সমস্ত দাক্ষিণাত্য হৃষীকেশ, বদরিকাশ্রম, কেদারনাথ এবং ভগবান শঙ্করাচার্য্যের চারি মঠ পরিভ্রমণ করেন। ইনি অতি সুশ্রী পুরুষ ছিলেন। ইঁহার তপ্তকাঞ্চনবৎ বর্ণ; আবক্ষবিলম্বিত শ্মশ্রু

এবং দীর্ঘকেশ দেখিয়া ইহাকে প্রাচীন ঋষি বলিয়া মনে হইত। আহারের সময় যে কোন ব্যক্তি উপস্থিত হউক না কেন, তাঁহাকে কিছু না দিয়া তিনি কখনও আহার করিতেন না। সর্ব্বদা হরিণাম গানে তন্ময় থাকিতেন। ৭৬ বৎসর বয়সে গত ১৩১১ সালের ১৮ই ভাদ্র ইনি সজ্ঞানে স্বগ্রাম শ্রীনগরে পরলোক গমন করেন। ইনি অতি পুরাতন "ধর্ম্মগীতা নামক পুস্তিকা সংগ্রহ করিয়া সাধারণের জন্ম মুদ্রিত ও প্রচারিত করিয়াছিলেন।

বহরের চৌধুরী।

বহর গ্রামের বসুবংশ সম্ভূত জমিদারগণ চৌধুরী বলিয়াই সমধিক পরিচিত। বহরের চৌধুরী বিক্রমপুরে সুপরিচিত। বহর গ্রামের অভ্যন্তর দিয়া প্রবাহিত যে খালটি উত্তরাভিমুখে গিয়াছে, তাহার উভয় তীরে এক সময়ে এই চৌধুরিবংশ বাস করিতেন। এখন সে বহর আর নাই, পদ্মার তরঙ্গভঙ্গে তাহার বহু পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। জমিদারী বহু অংশে বিভক্ত হইয়াছে। রাক্ষসী পদ্মার ভীষণ আক্রমণে পুনঃ পুনঃ আবাস স্থল পরিবর্ত্তন করায় আর্থিক অবস্থা হীন হইয়া পড়িয়াছে, কাজেই এই চৌধুরি বংশের অতীতের সহিত বর্ত্তমানের তুলনা অসম্ভব। এক সময়ে মুন্সেফী বিচারালয় ও ছোট আদালত নদীর তটে বহর গ্রামেই অবস্থিত ছিল।

দশমহাবিদ্যা পূজা।

বহরের চৌধুরিগণের প্রবল প্রতাপে এক সময়ে বিক্রমপুরের অধিকাংশ অধিবাসিবৃন্দই আতঙ্কিত হইতেন, দাঙ্গা হাঙ্গামায়, লাঠি খেলায় অত্যাচার অবিচারে কোন দিকেই ইহারা কাহাকেও ভয় করিতেন না। দশ-মহাবিদ্যা পূজা তাহার একটী উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এ পূজার কাহিনী এখনও পল্লী-বৃদ্ধগণ গল্প করিয়া থাকেন। কথিত আছে যে, এই বংশের কাহারও প্রতি দেবী কালিকার এইরূপ আদেশ হয় যে, মন্দির মধ্যে

আমার দশমহাবিদ্যা মূর্ত্তি নির্ম্মাণ ও প্রতিষ্ঠা করিয়া একটী নরবলি প্রদান করিতে হইবে, নচেৎ যারপর নাই অকল্যাণ সাধিত হইবে। স্বপ্ন-কাহিনী প্রচার হইবামাত্র চৌধুরিগণ বলির অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। গ্রামে গ্রামে গুপ্তভাবে চর প্রেরিত হইতে লাগিল, একটা আতঙ্কের ভাব সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িল। কেহ ঘর হইতে ছেলেদের বাহির হইতে দিতেন না। 'ঐ ছেলে নিতে এলরে,' এইরূপ জনরব প্রায় প্রতি গ্রামেই শোনা যাইত। জনরবে প্রকাশ যে, অবশেষে চৌধুরিগণ নিজেদের একজন শ্রীহট্টবাসী ভৃত্যকে অতিরিক্ত মদ্যপানে বিভোর করাইয়া দশমহাবিদ্যার সমীপে বলিদান করেন। আবার কেহ কেহ বলেন যে, ধীবর জাতীয় একটী শিশুকে নানা ছলে ভুলাইয়া তাহাকে বধ করা হয়। ধর্ম্মের নামে যে জগতে কত প্রকার নিষ্ঠুর ও পৈশাচিক ব্যবহার প্রচলিত আছে, তাহা চিন্তা করিলে বিস্মিত হইতে হয়। যিনি দয়াময়, যিনি ন্যায়বান, অখিল ব্রহ্মাণ্ড যাঁহার রাজ্য, আমরা কিনা তাঁহারি করুণা কণা-লাভের বৃথা আশায় জীবহত্যা করিয়া পুণ্য সঞ্চয় করি! তন্ত্রমতের জন্মস্থান বিক্রমপুরে এইরূপ নরহত্যা কিছুই বিচিত্র নহে। এখন সেই সেকালের সেরূপ—প্রতাপশালী চৌধুরি-বংশ নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপের ন্যায় অতি ক্ষীণ রশ্মি বিকীর্ণ করিতেছে!

তারপাশার মহাশয়।

তারপাশার মহাশয়গণ চৌধুরিগণের সমসাময়িক। যখন চৌধুরি বংশের প্রতিপত্তি সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, তখন তারপাশা গ্রামবাসী 'মহাশয়' গণও নানাবিধ সাধু অনুষ্ঠানদ্বারা প্রতিষ্ঠাভাজন হইয়া জনসাধারণের নিকট হইতে 'মহাশয়' এই সম্মানজনক উপাধি প্রাপ্ত হন, মহাশয়গণের সেই ধনৈশ্বর্য্য আজ এখন কোথায়! এক সময়ে সুন্দর সুন্দর সৌধ-মালা পরিশোভিত ইঁহাদের আবাসবাটী দর্শকগণের চক্ষুর তৃপ্তি উৎপাদন করিত, আজ কোথায় সেই সিংহদ্বার, কোথায় সেই বিরাট অট্টালিকা?

দীঘী সরোবর সকলি এখন পদ্মার গর্ভে। মহাশয় গণের বাস ভবন বহু খণ্ডে বিভক্ত ছিল। অন্তঃপুর, বহির্বাটী, দেবালয়, অতিথিশালা, কাছারী গৃহ, লাঠীয়ালদের বাড়ীঘর কত কি ছিল! ইঁহাদের বাটির চতুর্দ্দিকে এক সুপ্রশস্ত প্রাকার বিদ্যমান ছিল, সেই প্রাকার মধ্যে বাটীস্থ পুরুষগণ ব্যতীত অপরের প্রবেশাধিকার ছিলনা। এমন কি কোন ও অন্তঃপুর চারিণী বধূগণের অল্প বয়স্ক ভ্রাতা আসিলেও তাহাকে বহির্বাটীতে অবস্থান করিতে হইত, ইঁহারা তাহাকে ও বাটীর ভিতরে যাইয়া ভগিনীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে দিতেন না। মহাশয়গণের এই রীতি আমাদের নিকট কিম্ভূত কিমাকার বলিয়া বিবেচিত হইলেও তাঁহারা কিন্তু ইহা একান্ত সভ্যতা ও সম্মানের চিহ্ন বলিয়াই মনে করিতেন। যদি ও এখন আমরা ইহাকে দীনবন্ধু বাবুর 'জামাইবারিকের' অন্যতম সংস্করণ ব্যতীত আর কিছুই মনে করিব না। পূর্ব্বে ইঁহাদের বিস্তৃত জমিদারী ছিল। মহাশয়গণ শ্যামপুর ও ভুলুয়া পরগণার অধিকারী ছিলেন। দানে, ধনে, প্রতাপে, অতিথিসেবায় এই ব্রাহ্মণ জমিদার বংশ সে সময়ে বিক্রমপুরে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, আজ কিন্তু তাঁহাদের বংশধরগণ অতি হীনাবস্থায় দিন যাপন করিতেছেন।

পূর্ব্বে তারপাশা গ্রামে কোনও কুলীন ব্রাহ্মণের আবাস ছিলনা, মহাশয়গণ বহু অর্থব্যয় করিয়া কুলীন প্রধান বেইখে বা বেখে গ্রাম হইতে কুলীন আনিয়া স্থাপিত করেন। তদবধি তারপাশা গ্রাম কুলীন-প্রধান। পদ্মার প্রবল আক্রমণে এই বংশের সমুদয় কীর্ত্তি বিলুপ্ত হইয়াছে।

বিক্রমপুরের কালীপাড়ার জমিদার বংশ ও বিশেষ বিখ্যাত। কালী-পাড়া পদ্মার গর্ভে নিহিত হওয়ার পর হইতে এই জমিদার বংশ 'চন্দন ধূল,নামক গ্রামে বাস করিতেছেন। কালীপাড়ার পূর্ব্বে নাম ছিল কাওলীপাড়া, তখন এ গ্রাম কাপালিক জাতীয় অধিবাসিবৃন্দে পরিপূর্ণ ছিল, তাহারাই ঐ গ্রামের

কালীপড়ার জমিদার

আদিম অধিবাসী। এই বংশের পূর্ব্ব পুরুষ রামনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় চাচরপাশা গ্রাম হইতে আগমন করিয়া কালীপাড়া গ্রামে বাসস্থান স্থাপন করেন। ইনি নিতান্ত হীনাবস্থাপন্ন ছিলেন। রাম নারাণের পুত্র সূর্য্য নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় হইতেই এই বংশের প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায়। বাবু সূর্য্যনারায়ণ অত্যন্ত বিষয়-বুদ্ধি-সম্পন্ন ক্ষমতাশালী ব্যক্তি ছিলেন। ইনি কলিকাতা নিবাসী গোকুলচন্দ্র ঘোষাল নামক জনৈক খ্যাতনামা জমিদারের নীলামে ক্রীত চিরণীমধুর নামক অদখলি জমিদারী নানাবিধ কৌশল পূর্ব্বক তাঁহার অধিকার ভুক্ত করিয়া দেওয়ায় উক্ত ঘোষাল মহাশয়ের নিকট হইতে বহু অর্থোপার্জ্জন করিয়া স্বীয় অবস্থার উন্নতি সাধন করেন। গ্রাম্য জনপ্রবাদে প্রকাশ, যে সূর্য্যবাবু স্বীয় বাস গ্রাম কালীপাড়ায় একটী প্রকাণ্ড দীর্ঘিকা খনন করিতে যাইয়া খনন কালে মোহর পূর্ণ কতিপয় কলস প্রাপ্ত হ'ন এবং তাহার সাহায্যেই জমিদারী ক্রয় করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। সূর্য্য বন্দ্যো-পাধ্যায়ের দুই বিবাহ ছিল। প্রথমা পত্নীর গর্ভে বঙ্গ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় জন্ম গ্রহণ করেন, দ্বিতীয়া স্ত্রীর সন্তান না হওয়ায় তাঁহাকে দত্তক রাখিয়া দিয়াছিলেন। পিতার মৃত্যুর পরে উভয় ভ্রাতার মধ্যে ধন-সম্পত্তি লইয়া বহু গোলযোগ উপস্থিত হয়, পরে পিতৃ নিয়োগ পত্রানুসারেই মীমাংসিত হয়, বঙ্গচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় হইতেই ইঁহাদের 'চৌধুরী খ্যাতি। বঙ্গ চন্দ্রের তিন পুত্র হয়, কিন্তু তাঁহারা কেহই জীবিত নাই। কান্ত বাবুর পুত্র শ্যামাকান্ত বাবু এখনও জীবিত আছেন।

সূর্য্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

কালীপাড়ার খ্যাতি এখানকার উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের জন্ম। বিক্রমপুরস্থ কুমারভোগ গ্রামে যেমন সর্ব্ব প্রথমে বঙ্গ বিদ্যালয়ের সৃষ্টি, তদ্রূপ কালীপাড়া গ্রামেই সর্ব্বাগ্রে উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ইঁহারা স্বীয় বাসগ্রামে একটী সংস্কৃত বিদ্যালয় ও স্থাপিত

করিয়াছিলেন। এখানে জয়কালী নাম্নী এক মৃন্ময় কালীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিতা ছিলেন, এই দেবীর সম্মুখে সে সময়ে প্রতি অমাবস্যা তিথিতে একটী করিয়া ছাগ বলি হইত। কালীপাড়া বহুদিন হইল পদ্মাগর্ভে বিলীন হইয়াছে।

আউট সাহীর গুপ্ত গোষ্ঠী এখন যেস্থানে বাস করিতেছেন সেস্থানের নাম পূর্ব্ব আউটসাহী। পুরাতন নেত্রাবতী ও দাসপাড়া গ্রামের অনেক স্থান উহার অন্তর্গত হইয়াছে। আড়াইশত বৎসর পুর্ব্বে সে স্থানের অধিকাংশ জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। শ্রীযুক্ত হরমোহন গুপ্ত মহাশয় এখন যে বাড়ীতে বাস করিতেছেন, আউট সাহী গোষ্ঠীর আদি পুরুষ কৃষ্ণরাম গুপ্ত সেই বাড়ীতেই আসিয়া বাস করেন। কথিত আছে, কৃষ্ণরাম গুপ্তের পিতা কুরমিরা গ্রামে বাস করিতেন, ১০৬৩ সনের ১২ই আশ্বিন ছুইজন মুসলমান জমিদার হইতে মিরাস পাট্টা লইয়া কৃষ্ণরাম গুপ্ত আউটসাহী আসিয়া বাস করেন। পূর্ব্বকালের কাগজ পত্রে আউট সাহীর নাম "আহুট সাহী" দেখা যায়। কৃষ্ণরাম গুপ্তের তিন পুত্র নন্দরাম, অনন্তরাম ও রামনারায়ণ। ১০৮৮ সনের ৭ই মহরম মুসলমান জমীদার হইতে বাঁসরাগ্রাম বন্দোবস্ত করিয়া লন। বাসিরাগ্রাম এই সময়ে জনশূন্য পতিত ভূমি মাত্র ছিল। ইহারা বন্দোবস্ত পাওয়ার পরেই জঙ্গল আবাদ ও তথায় লোকের বসবাস হইতে আরম্ভ হয়। সেই হইতেই বাসীরা গ্রাম "গুপ্তের বাসীরা" নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। গুপ্তদের দৈন্যদশা বশতঃ বাসীরা গ্রামের কিছু কিছু অন্যদের হাতে গিয়াছে; কিন্তু অধিকাংশ এখনও গুপ্তদেরই রহিয়াছে।

আউটসাহির গুপ্ত

১১৭২ সনে কৃষ্ণরাম গুপ্তের সন্তানগণ আপনাদের মধ্যে সম্পত্তি বিভাগ করিয়া লন। নন্দরামের সন্তানগণের বড় হিস্যা অনন্তরামের সন্তানগণের মাঝার হিস্যা, এবং রাম নারায়নের সন্তানগণের ছোট হিস্যা

নাম হইল। বাসীরা গ্রামে অদ্যাপি বড়, মাঝার ও ছোট হিস্যা বলিয়া তিনভাগ বর্ত্তমান আছে।

১০৬৩ সন হইতে ১১৭১ সনপর্য্যন্ত ইঁহাদের কাগজ পত্রে নামের পূর্ব্বে "শ্রী" ব্যবহার দেখা যায় না। এই সময়ের কাগজ পত্রগুলির প্রথম অর্দ্ধেক পার্সীতে এবং শেষার্দ্ধ বাঙ্গালায় লিখিত দেখা যায়। বোধহয় নবাবী আমলে দলিল দস্তাবেজ এইরূপই লিখিবার নিয়ম ছিল। পার্সীতে মূল লিখিয়া উহার তরজমা বাঙ্গালাতে লিখিত থাকিত। কাজেই নামের পূর্ব্বে "শ্রী" ব্যবহৃত হইত না।

নন্দরামের পৌত্র রমানাথ ও জীবনকৃষ্ণ এবং অনন্তরামের পৌত্র হরিরাম ঢাকায় বাঙ্গালার নবাব সরকারে চাকরি করিয়া বহু সম্পত্তি অর্জ্জন করিয়া ছিলেন এবং তদানীন্তন প্রথা অনুসারে তাঁহারা সরকার নামে অভিহিত হইতেন। ইহাদের মধ্যে রমানাথ সরকারেরই প্রবল প্রতাপ ছিল। সম্ভবতঃ ১১৫০ সন হইতে ১২০০ সন পর্য্যন্ত অর্দ্ধশতাব্দীকাল রমানাথ, জীবনকৃষ্ণ ও হরিরামের বিশেষ ক্ষমতায় ও ধনৈশ্বর্য্যে বিক্রমপুরের সর্ব্বত্র এবং অন্যত্রও আউটসাহীর গুপ্তগণ বিশেষ পরিচিত হইয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত হরমোহন গুপ্ত মহাশয় কৃষ্ণরামের অতিবৃদ্ধ প্রপৌত্র; সুতরাং কৃষ্ণরাম হইতে ৬ষ্ঠ পুরুষ এবং শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন গুপ্ত মহাশয় ৭ম পুরুষ। আউটসাহী গুপ্তগোষ্ঠীর মধ্যে নাম করিতে এখন ইঁহাদেরই নাম করা যাইতে পারে। কৃষ্ণরাম হইতে দশম পুরুষ পর্য্যন্ত জন্মিয়াছে। মোটের উপর কৃষ্ণরামের ৬ষ্ঠ পুরুষ হইতেই এই গোষ্ঠীর পতন হইতে আরম্ভ হইয়াছে। বহু পরিবার হইলেও প্রত্যেক পরিবারের তালুকদারীর আয়ের দ্বারাই "বার মাসের বার ক্রিয়া" ও জীবিকা নির্ব্বাহ হইত। গুপ্তগণ শাক্ত; সুতরাং পূর্ব্ববর্ত্তিপুরুষগণ অপরিমিত মদ্যপান এবং উৎকৃষ্ট কুলসম্বন্ধ করিতে বহুব্যয় করিয়া দৈন্যদশায় উপস্থিত হইয়াছিলেন, ঘরে খাবার ছিল বলিয়া চাকুরি করাটা অপমানের কাজ বলিয়া ইঁহারা

মনে করিতেন। শেষে আর উপায়ান্তর না দেখিয়া চাকুরি গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। শ্রীযুক্ত রাজেশ্বর গুপ্ত মহাশয়ই এই বংশের মধ্যে প্রথম সরকারি চাকুরি প্রাপ্ত হন।

গুপ্তদের বাড়ীর প্রায় প্রতি পরিবারেই হস্তলিখিত নানা সংস্কৃত গ্রন্থ অতিযত্নে রক্ষিত হইত। তন্মধ্যে অনেকগুলিই পটল ছিল। সে সকলের অনেকগুলি এখনও কোন কোন পরিবারে রক্ষিত আছে। আয়ুর্ব্বেদের চর্চ্চা ইহাদের মধ্যে ছিল বলিয়া কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। প্রাচীন পার্সী গ্রন্থগুলি অযত্নে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। স্বর্গীয় আনন্দ চন্দ্র সেন মহাশয় ঢাকা নর্ম্মাল স্কুলে পড়িয়া বাঙ্গালাশিক্ষার চর্চ্চা গুপ্ত গোষ্ঠীর বালকদের মধ্যে আনয়ন করেন। আনন্দ বাবু গুপ্ত গোষ্ঠীরই স্থাপিত কুলীন, প্রায় ৩০ বৎসর হইল তিনি পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহারই যত্নে আউটসাহী সার্কেল স্কুল স্থাপিত হয় এবং অনেকগুলি বালক লেখাপড়া আরম্ভ করে। আনন্দ বাবুই যত্ন করিয়া পূর্ব্ব আউট সাহীতে স্ত্রী-শিক্ষা প্রবর্ত্তিত করেন। অনেকগুলি বালিকা এবং কোন কোন কুলবধূ ও তাঁহার যত্নে লেখাপড়া করিতে আরম্ভ করে। তিনিই গুপ্ত পাড়ার যুবকদের সঙ্গে মিলিয়া প্রথম ব্রহ্মোপাসনা প্রবর্ত্তিত করেন।

এখন ৺রাজকুমার গুপ্ত মহাশয়ের দুই পুত্র শ্রীযুক্ত ইন্দ্রভূষণ গুপ্ত ও শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রভূষণ গুপ্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের B. A. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া শিক্ষিত সমাজে গুপ্ত গোষ্ঠীর নাম রক্ষা করিতেছেন। জ্ঞানে ও সম্পত্তিতে এখন ইঁহাদের নাম করা যাইতে পারে। শ্রীযুক্ত কালীচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় চট্টগ্রামে অবস্থান করিয়া 'সংশোধিনী' নাম্নী পত্রের সম্পাদন করিয়া আসিতেছেন। চট্টগ্রামে 'সংশোধিনী' এখন প্রাচীনতম পত্র।

নপাড়ার চৌধুরী।

বঙ্গের শেষবীর কেদার রায়ের অধঃপতনের পর, যে খ্যাতিমান বংশ বিক্রমপুরে বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন আমরা এখানে সেই প্রসিদ্ধ নপাড়ার চৌধুরী

বংশের বিষয় আলোচনা করিলাম। মহারাজা মানসিংহ ভীষণ যুদ্ধের পরে বহু সৈন্য নাশ করিয়া বিক্রমপুর অধিকার করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। কেদারের বীর্য্যবত্তা তাঁহাকে বিস্ময়-সাগরে নিমগ্ন করিয়াছিল। স্বদেশের জন্য এইরূপ নির্ভীক আত্মত্যাগ, বিক্রমপুরের এই মহাপুরুষের অপূর্ব্ব চরিত্র গৌরব, দেব-দ্বিজ ভক্তি, দানশীলতা প্রভৃতি গুণের কাহিনী বাঙ্গালীর অতীত ইতিহাসকে গৌরবান্বিত করিয়াছে।

বিশ্বাস ঘাতকতাই আমাদের দেশের অধঃপতনের মূল কারণ। সেই অতি প্রাচীন ইতিহাস জয়চাঁদের বিশ্বাসঘাতকতা হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত আমরা অক্ষরে অক্ষরে ইহার যথার্থতা উপলব্ধি করিয়া থাকি।

বিশ্বাস ঘাতকের কপটতায় কেদার রায় পরাজিত ও নিহত হইলে পর মানসিংহ দিল্লী অভিমুখে অগ্রসর হওয়ার পূর্ব্বে বিক্রমপুরের জমিদারী কেদার রায়ের প্রধান অমাত্য প্রভু বৎসল, যুদ্ধ-কলাভিজ্ঞ এবং রাজ-নীতিজ্ঞ রাজা রঘুরামকে অর্পণ করিয়া যান। রাজা রঘুরামের নানাবিধ সদ্‌গুণ রাজি ও অপূর্ব্ব কৃতিত্ব দর্শনেই যে, তাঁহার এই দান-প্রবৃত্তি হইয়াছিল, তাহা অনুমান করা অসঙ্গত নহে। মানসিংহ হিন্দু কুলাঙ্গারই হউন, আর যাহাই হউন, তিনি যে একজন বীর, রাজনীতিজ্ঞ ও বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন, তাহা ইতিহাস অস্বীকার করে না। রাজা রঘুরামের উপরে বিক্রমপুরের রাজ্যভার অর্পণ করায় তাঁহার সূক্ষ্ম দৃষ্টিরও ভূয়সী প্রমাণ পাওয়া যায়। 'ঢাকের' হইতে আমরা রাজা রঘুরাম সম্বন্ধে জানিতে পারি যে—

'ভরদ্বাজ গোত্রে দাশ আদি সাধ্য হয়।
ক্রিয়াগুণে দোষে ভাবাভাব পরিচয় ॥
ভরদ্বাজ রবি রাজা রঘুরাম রায়।
সমস্ত বিক্রমে যার রাজস্ব যোগায় ॥
হিন্দু মুসলমান যুবা বালক স্থবির।
যার পদাতির ভয়ে কম্পিত শরীর ॥

যার দ্বারে থানাদার বিস্তর লস্কর।
শত শত ছিল যার চাকর নফর॥
যাহাদের মধ্যে বহু যেয়ে ভিন্ন স্থান।
লভিল ক্রমশঃ কালে বিপুল সম্মান॥
বিক্রমে সমাজ পতি রঘুরাম ছিলা।
বহু ক্রিয়া গুণে বহু সম্মান লভিলা॥

রাজা রঘুরাম কর্তৃক বিক্রমপুরের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয়, তিনি ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ প্রভৃতি আনয়ন করিয়া বিক্রমপুরকে বহু ভদ্র-পল্লীতে সুশোভিত করিয়া গিয়াছেন। নামে মাত্র অধীন হইলেও, প্রকৃত পক্ষে তিনি একজন স্বাধীন নরপতিই ছিলেন। এক রাজস্ব ব্যতীত তাহাকে মোগলের নিকট অন্য কোনও রূপ বশ্যতা স্বীকার করিতে হইত না। তাঁহার সুযশ ও সুনাম দিল্লী দরবারে স্বয়ং সম্রাট পর্য্যন্ত অবগত ছিলেন। রাজা রাজবল্লভ কৃতী পুরুষ হইলেও সারা জীবন 'গোলামী' করিয়া জীবনাতিবাহিত করিয়াছেন, কিন্তু রঘুরাম স্বীয় শক্তি প্রভাবে নামে মাত্র অধীন হইলেও কার্য্যতঃ স্বাধীন নরপতির মত প্রভুত্বে ও বীরত্বে স্বীয় বংশকে সমুজ্জল করিয়া গিয়াছেন। রঘুরামের অধস্তন পুরুষগণের কুশিক্ষা ও বিলাসিতা দোষেই এই খ্যাতি মান চৌধুরি বংশের দারুণ দুর্গতি হইয়াছে।

উত্তর কালে রাজস্ব সংগ্রহ বিষয়ে এই চৌধুরীরা অত্যন্ত অত্যাচারী হইয়াছিলেন। বিক্রমপুরের সর্ব্বত্রই ইঁহাদের সম্বন্ধে নানা প্রকার পৈশাচিক উৎপীড়ন কাহিনীর কথা শুনিতে পাওয়া যায়। লম্পটতা, নরহত্যা দাঙ্গা, হাঙ্গামা, এমন কি গর্ভিনীর গর্ভ-বিদারণ প্রভৃতি কতক অসম্ভব দোষারোপও ইঁহাদের স্কন্ধে নিপতিত হইয়াছে।

এই বংশের অধঃপতন সম্বন্ধে জানিতে পারা যায় যে, যখন আরাকান দেশে ব্রহ্মবাসীদের সহিত ইংরেজ রাজের যুদ্ধ চলিতেছিল, সে সময়ে

কয়েক দল পশ্চিমাঞ্চলবাসী সিপাহী রণপোতারোহণে আরাকান যাইবার পথে নপাড়ার নিকট নোঙর করিয়া আহারাদির আয়োজন করতঃ কদলীপত্রে বাসনের কার্য্য নির্ব্বাহ করিবার নিমিত্ত তাহারা চৌধুরিগণের বাগানে প্রবেশ করে। প্রবেশ কালে চৌধুরিগণের লোকেরা তাহাদিগকে অনেক প্রকার নিষেধ বাক্য বলে। কিন্তু রণকুশল উদ্ধত প্রকৃতির সিপাহীগণ তাহাদের কথায় কর্ণপাত করা আবশ্যকীয় মনে না করিয়া নিঃশঙ্ক চিত্তে পাত কাটিতে থাকে। দ্বার পালগণ চৌধুরিদিগকে এ বিষয় জ্ঞাপন করিলে তাঁহারা তাহাদিগকে (সিপাইদিগকে) প্রহার ও তাহাদের যান সমূহ নদী গর্ভে নিমগ্ন করিবার আদেশ প্রদান করেন। তদনুসারে চৌধুরিবৃন্দের সেনাগণ বীরত্ব প্রদর্শন পূর্ব্বক সিপাই দিগের অনেককে হত ও অনেককে আহত করে। তাহাদিগের পোতাবলী জলমগ্ন করিয়া তাহাদিগকে যার পর নাই দুরবস্থ করিয়া দেয়।

এই সংবাদ কর্ত্তৃপক্ষের গোচরীভূত হইলে তাঁহারা চারিজন প্রধান দারোগার উপর এ বিষয় তদন্ত করিবার ভার দেন। দারোগাগণ নপাড়ায় উপনীত হইবা মাত্র তাঁহাদের তিন জনকে চৌধুরি বৃন্দ নানাবিধ বিভীষিকা প্রদর্শন করিয়া পরিশেষে বন্দী করিয়া রাখেন। অবশিষ্ট ব্যক্তি অতি কষ্টে পলায়ন করিয়া এই সমস্ত শোচনীয় ঘটনা গভর্মেণ্টের গোচর করেন।

গভর্মেণ্ট তাঁহাদিগকে এরূপ অত্যাচারী মনে করিয়াছিলেন যে, তাঁহারা, যাহাতে সমূলে চৌধুরিগণ বিনষ্ট হয়, তদ্রূপ আদেশ করিলেন। চৌধুরিদিগের গৃহ তোপ দ্বারা জ্বালিয়া দেওয়ার অনুমতি হয়। অনন্তর গভর্মেণ্ট প্রেরিত সৈন্যবৃন্দ তোপাগ্নিতে চৌধুরিদিগের বাটী ভস্মীভূত করিয়া ফেলে।

রাজবল্লভ, কাশীনাথ ও জগন্নাথ প্রভৃতির সময়েই এই পরিবারের সমগ্র ভূসম্পত্তি হ্রাস হইয়া যায়। এই দুই পরিবার বিক্রমপুরস্থ রাজাবাড়ী থানার অন্তর্গত বাহেরক গ্রামে শেষ বসতি করিয়াছিলেন, সে গ্রামে এখনও চৌধুরী বাড়ীর ভিটা বর্ত্তমান আছে।

ভিক্ষাকর দাস
১ অজানিত
২ জগন্নাথ দাশ
দেশত্যাগী
৩ গৌরীনাথ দাশ
১ শ্রীনাথ
২ যাদবেন্দ্র
১ জানকীনাথ
২ রূপরাম পত্রনবিশ
৩ রঘু বাসুদেব দাস
বাসুদেব দাশ
৪ রঘুনন্দন
রামচন্দ্র
রাজা রঘুরাম বা রঘুনন্দন
১ কৃষ্ণজীবন রায় বা কেদার রায়
চামটা গ্রাম
২ প্রসাদ রায়
১রাম রায়
২ শ্যাম রায়
১ রাজা রায়
২ ধনরায়
৩নরসিংহ
হরিদেব রায়
রতনরায়
১ চাঁদরায়
১ মনোহর রায়
৩ অমর রায়
১ শম্ভু নাথ
১ ভাগ্যবন্ত রায়
১ লক্ষ্মী নারায়ণ
২ রামচন্দ্র
১ রামজীবন
রামকান্ত
বা রমাবল্লভ
১ রামলোচন
১ কাশীনাথ
২ জগন্নাথ
রাজনারায়ণ
১ রামকানাই
কন্যা গঙ্গামণি
১ রাধামাধব
২ কৃষ্ণচন্দ্র
৩ চন্দ্রনাথ
১ নবকুমার বা অন্নদা প্রসাদ রায়
গজরা, থানা মতলবগঞ্জ ত্রিপুরা
১ যোগেন্দ্র
রাজেন্দ্র

বিদ্যমান আছে। এ বংশের ন্যায় দাতা, ভোক্তা তৎকালে অতি বিরল ছিল। ইহাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ গুরু, পুরোহিত ও আত্মীয় কুটুম্ব গণকে যে কত ভূমি সম্পত্তি দান করিয়া গিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। কুলপুরোহিত, ইষ্ট দেবতা এবং বলুর ও বিদগ্রাম প্রভৃতির ঘটকবংশ এখনও ইহাদের প্রদত্ত ভূসম্পত্তির সাহায্যে জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছেন। অধুনা ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত মতলবগঞ্জ থানার অধীন গজরা গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত অন্নদা প্রসাদ দাশ চৌধুরী এবং তাঁহার দুই পুত্র শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র চন্দ্র দাশ চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র চন্দ্র দাশ চৌধুরী ও বানারী গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত যোগেশ চন্দ্র দাশ গুপ্ত ঠাকুরতা এই চরিটী প্রাণী এই বংশের শেষ চিহ্ন স্বরূপ বিদ্যমান। আমরা এখানে এই বংশের একটী সংক্ষিপ্ত বংশাবলী দিলাম। এতদ্ব্যতীত খ্যাতিমান জমিদার বংশের মধ্যে কার্ত্তিকপুরের মুন্সী এবং কলমার ভুঁইয়া ও সাতকের মুসলমান ভুঁইয়া প্রসিদ্ধ। কল্মার ভুঁইয়াগণ ও বহুদিনের প্রাচীন জমিদার। নবাব সরফরাজ খাঁর রাজত্বে ইহারা জমিদারী প্রাপ্ত হন। কল্মার ভুঁইয়াগণ জাতিতে বৈদ্য। এই বংশের লক্ষ্মী ভুঁইয়ার নাম বিক্রমপুরের সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। বর্ত্তমান জমিদার শ্রীযুক্ত তারা কান্ত দাশ গুপ্ত লক্ষ্মী বাবুর সহোদর ভ্রাতা। এই বংশের যুবকগণের মধ্যে শ্রীযুক্ত ভূপতি কান্ত দাশ গুপ্ত বিশ্ব বিদ্যালয়ের বি, এ উপাধিধারী। ইহাদের স্থাপিত উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়টী ভুঁইয়াবংশের বিদ্যানুরাগীতার পরিচায়ক। সাথকের মুসলমান জমিদার বংশের অবস্থা এখন অতিশয় শোচনীয়। ইহারা এককালে বিশেষ ক্ষমতাশালী ও অত্যাচারী ছিলেন।

উপসংহার।

বিক্রমপুরের ইতিহাস এখানে শেষ হইল। আমরা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে অতি প্রাচীন বৈদিক যুগ হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত বিক্রমপুর প্রত্যেক বিষয়েই উন্নত ছিল, ধনে, ঐশ্বর্য্যে, পাণ্ডিত্যে, মাহাত্ম্যে, ধর্ম্মে

বিক্রমপুর, বিক্রমে বিক্রমপুরই ছিল। একদিকে যেমন প্রকৃতি-সুন্দরীর কোমল স্নেহ-কর-স্পর্শে মা আমার সৌন্দর্য্য গৌরবে গৌরবান্বিতা ছিলেন, তেমনি তাঁহার সন্তানগণও বীরত্বে, প্রভুত্বে ও স্বাধীনতার গৌরবে বাঙ্গালার ইতিহাসে তাঁহাকে গৌরবান্বিতা করিতে সমর্থ হইয়াছিল। মা আমাদের একদিন সুজলা সুফলা এবং শস্যশ্যামলা ছিলেন, একদিন তাঁহার গৌরবময় বক্ষে সন্তানগণ যে আনন্দ, যে স্বাধীনতা উপভোগ করিয়াছিলেন কল্পনা বলে আজ সে কথা মনে পড়ে। মনে পড়ে, কতশত শোণিত-ক্রীড়া, কতশত অস্ত্রের ঝন ঝনায়ই না একদিন স্বাধীনতার গৌরব-ধ্বজা জননীর বক্ষে উড্ডীন হইয়াছিল। যে যেখানে আছ, হিন্দু, মুসলমান, ব্রাহ্ম, খ্রীষ্টান, ছোট বড় তোমাদের সাধের বিক্রমপুরকে, সোণার বিক্রমপুরকে মনে রাখিও, মনে রাখিও মাতৃভূমি স্বর্গ হইতেও শ্রেষ্ঠ। তাহার কল্যাণ কল্পে যে যতটুকু পার ভাই স্বার্থত্যাগ করিও! কোন্‌দেশে এমন পদ্মার কল-প্রবাহে জ্যোৎস্না নাচিয়া ছুটিয়া বেড়ায়? কোন্‌দেশের মেঘনা নদীতে কালোরূপে কালো ঢেউ ছোটে? কোথায় সোণার মাঠে সোণাধান শোভা পায়? কোন্‌দেশে এত সুখ, এত সৌন্দর্য্য, এত বীরত্ব, এত মহত্ত্ব?

ওগো! কল্যাণী জননী জন্মভূমি, তোমার শ্যামল তরু পল্লব ছায়ার নিভৃত কুটীরে প্রতিপালিত হইয়া আজ যাঁহারা দেশে দেশে সম্মান ও সুযশ লাভ করিয়াছে, সে সকল প্রিয় সন্তানদের যেন তোমার প্রতি অনুরাগ, প্রীতি ও ভক্তি হয়, তাহারা যেন তোমার কল্যাণে আপনাদের শক্তি নিয়োজিত করে। দীনাহীনা জননীকে আবার যেন নবোৎসাহে শিক্ষা, দীক্ষা, শিল্প-বানিজ্য-কৃষি প্রভৃতি প্রত্যেক বিষয়ে উন্নত করে।

নির্জ্জন নদীতীরে, আম্রবন-ঘেরা বেণুবনের ছায়ায়—বেতস-বনাচ্ছাদিত পল্লীর পথে সর্ব্বত্র এস মায়ের প্রিয়সন্তানগণ ভক্তি-নম্র-চিত্তে মিলিত কণ্ঠে বলিঃ—

ওঁ

জননী জন্মভূমি।

তোমারি মাটিতে দেহ, তব বায়ু—এইপ্রাণ,
তোমারি কল্যাণে মোর হয় যেন অবসান।

পরিশিষ্ট।

পরিশিষ্ট।

—o—

প্রথম অধ্যায়।

বিক্রমপুরের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে সেন রাজাগণের তাম্রশাসনাদি হইতেও যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। কেশব সেন, লক্ষ্মণ সেন, মাধব সেন, বিশ্বরূপ সেন প্রভৃতির তাম্রফলকে বিক্রমপুরের বহুল উল্লেখ আছে।

১। স খলু বিক্রমপুরসমাবাসিত শ্রীমজ্জয়স্কন্ধাবারী মহারাজাধিরাজ শ্রীবল্লালসেন-পাদানুধ্যানাৎ পরমেশ্বর পরম বীরসিংহ পরমভট্টারক্ ইত্যাদি।

(এই তাম্রফলকখানি ২৪ পরগণার অন্তর্গত মজিলপুরের জমিদার হরিদাস দত্ত মহাশয়ের জমিদারিতে পাওয়া গিয়াছিল, ত্রিবেণীর হলধর চূড়ামণি মহাশয় ইহার পাঠোদ্ধার করেন।

২। * * * বঙ্গে বিক্রমপুরভাগপ্রদেশে প্রশস্ত লতাঘেড়াঘাটকে পূর্ব্বে স একাধি গ্রামসীমা দক্ষিণে শাঙ্কর বসা গোবিন্দ বনান্ত ভূসীমা পশ্চিমে পশ্চিমে পঞ্চকাপা গাদাগা: গ্রাম সীমা উত্তরে বাগুলীহিচয় গাতা ভূদ্যমান ভূঃ সীমা ইথং ইত্যাদি।

(এই তাম্রফলকখানা বাখরগঞ্জের অন্তর্গত ৺কানাইলাল ঠাকুরের জমিদারীতে পাওয়া গিয়াছিল। এসিয়াটিক সোসাইটির জার্ণেলের ১ম অংশের ৮০ পৃষ্ঠায় ইহা প্রকাশিত হইয়াছিল।

৩। * * পৌণ্ড্র বর্দ্ধনভুক্ত্যন্তঃপাতি বঙ্গে বিক্রমপুর ভাগে পূর্ব্বে অঠপাগগ্রামে জলল ভূঃসীমা দক্ষিণে বারয়ীপাড়া গ্রাম ভূঃসীমা পশ্চিমে উকোটকাঠীগ্রাম ভূঃসীমা ইত্যাদি।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান ... ... মূল গ্রন্থ ১৬ পৃঃ।

Dipankara was born A. D. 980 in the Royal family of Gaur at Vikramanipur in Bangala, * * * * * Dipankar wrote several works and delivered upwards of one hundred discourses on the Mahayans Buddhism. Indian pandits in the Land of now. P. 50, 76.

দ্বাদশহস্তবিশিষ্ট অবলোকিতেশ্বর মূর্ত্তি—বিক্রমপুরের ইতিহাস সংকলন কার্য্যে, ব্রতী হওয়ার পর আমাকে বিক্রমপুরের বহুগ্রামপর্য্যটন করিতে হইয়াছিল। সেই পর্য্যটনের ফলে যে সকল প্রাচীন দর্শনযোগ্য ও আলোচনার উপযুক্ত দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি তন্মধ্যে দ্বাদশহস্তবিশিষ্ট অবলোকিতেশ্বর মূর্ত্তি একটী।

বিক্রমপুরে যে এক সময়ে বৌদ্ধধর্ম্মাধিপত্য বিস্তৃত ছিল একথা সর্ব্ববাদিসম্মত এবং প্রত্যেক প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতও তাহা একবাক্যে স্বীকার করেন। প্রসিদ্ধ চৈনিক পরিব্রাজক য়ুয়নচঙের ভ্রমণবৃত্তান্ত মধ্যে যে সমতটের বর্ণনা আছে, তাহা হইতে জানিতে পারা যায় যে সমগ্র পূর্ব্ববঙ্গ এবং সুন্দরবনের কতকাংশ পর্য্যন্ত সমতট বিস্তৃত ছিল।* বিক্রমপুর এই সমতটাখ্যাপ্রাপ্ত জনপদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। দীপঙ্কর অতিষ শ্রীজ্ঞান, বঙ্গের আদি গৌরব শীলভদ্র প্রমুখ প্রখ্যাতনামা বৌদ্ধযতিগণ বিক্রমপুরের অধিবাসী ছিলেন। অতএব বৌদ্ধ প্রাধান্যপ্লাবিত বিক্রমপুরে অবলোকিতেশ্বর মূর্ত্তিটি পাওয়ায় তেমন বিস্ময়ের কোন কারণ নাই। প্রায় প্রতি বৎসরই প্রাচীন পুকুর ও দীর্ঘিকা ইত্যাদি খনন করিতে করিতে নানাবিধ প্রস্তরগঠিত বুদ্ধমূর্ত্তি পাওয়া যাইতেছে। বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের প্রাবল্য হেতু সে সমুদয় মূর্ত্তি এখন হিন্দু দেবতারূপে হিন্দুর দেব মন্দিরে পূজিত হইতেছে।

হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে যেরূপ ভগবানকে আরাধনা করিবার নিমিত্ত সাকার ও নিরাকার উপাসনার দুইটি স্তর আছে, বৌদ্ধধর্ম্মের ক্রমাবনতির সঙ্গেও তদ্রূপ নানাবিধ মূর্ত্তিপূজা তাহাদের মধ্যে প্রবেশ লাভ করিয়াছিল। পুরাতত্ত্বানুসন্ধানের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দিন দিন আমরা যে সকল বৌদ্ধমূর্ত্তি প্রাপ্ত হইতেছি, তাহা সেই ক্রমাবনতির সঙ্গে সঙ্গেই উদ্ভূত।

প্রত্যেক ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যে দুই শ্রেণীর লোক থাকে। এক শ্রেণী শিক্ষিত ও উন্নত, অপর শ্রেণী অশিক্ষিত অথচ ভক্তিতে নত। উচ্চ শ্রেণীর লোকেরা যখন দেখিতে পায় যে, তাহারা ধর্ম্মের যে সকল গূঢ়তত্ত্ব ও প্রকৃত জ্ঞান বিদ্যা ও জ্ঞানবত্তার দ্বারা আয়ত্ত করিতে সমর্থ হইয়াছে, তাহাদেরি সমধর্ম্মী অজ্ঞ লোকেরা অজ্ঞতা নিবন্ধন তাহা অনুভব করিতেছে না, তখনি তাহারা সমধর্ম্মী লোকদিগকে ধর্ম্মের সংকীর্ণতার মধ্য দিয়া প্রকৃত মূল-কেন্দ্রে পৌঁছাইবার জন্য নানাবিধ পন্থার সৃষ্টি করে, সে সকল সহজ ও সরল পথ সাধারণে অনুসরণ করে বলিয়াই উহা সর্ব্বত্র সহজে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে, এবং কালবশে আরও বিকৃত হইয়া অদ্ভুত অদ্ভুত ধর্ম্ম ও মতের সৃষ্টি করে। তান্ত্রিকতাপূর্ণ মহাযান মত, এইরূপেই ভারতবর্ষীয় বৌদ্ধগণের মধ্যে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। এই নিমিত্তই ভারতবর্ষের প্রায় প্রতি প্রান্তেই

প্রাচীন বৌদ্ধ তান্ত্রিকতাপূর্ণ মহাযানমতানুযায়ী নানাবিধ কল্পিত আকৃতিবিশিষ্ট বৌদ্ধমূর্ত্তি-সমূহ দেখিতে পাওয়া যায়।*

এ সকল রূপকমূর্ত্তি সমূহ এতদিন পর্য্যন্ত কাহারো মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারে নাই, এমন কি পুরাতত্ত্ব বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণও এ সকলের কোনও গুরুত্ব অনুভব করেন নাই। হিন্দুগণ কর্ত্তৃক পূজিত বলিয়া তাঁহারাও এতদিন পর্য্যন্ত এই সকল মূর্ত্তিকে কোনও অদ্ভুতাকৃতি হিন্দুর পৌরাণিক মূর্ত্তি মনে করিয়া আলোচনার অনাবশ্যক জ্ঞানে উপেক্ষা করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান সময়েও যে এই সকল পরিত্যক্ত মূর্ত্তিসমূহের বিশেষরূপে আলোচনা হইতেছে তাহা বলা যায় না।

আলো ও ছায়া জগতের স্বাভাবিক রীতি। যেখানে আলো সেখানে অন্ধকারকে থাকিতেই হইবে। একদিকে বৌদ্ধধর্ম্মের উজ্জ্বল জ্ঞান-তপনালোকে যেরূপ সুদূর চীন, জাপান প্রভৃতি আলোকিত হইয়া উঠিয়াছিল, আবার তেমনি ইহার একাংশ গাঢ়তম অন্ধকারে আবৃত ছিল। যুনচয়ঙের ভারতাগমনের পূর্ব্বেও যে ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম্মের এ সকল রূপক মূর্ত্তির পূজা ভারতবর্ষীয় বৌদ্ধদিগের মধ্যে প্রচলিত হইয়া উঠে, সে সময়কার প্রকৃত তথ্য অবগত হইতে হইলে এ সকল মূর্ত্তির সূক্ষ্ম আলোচনা ব্যতীত প্রাচীন অজ্ঞাত বিবরণ সমূহ জানিতে পারা অসম্ভব।

অবলোকিতেশ্বর বোধিসত্ত্ব মূর্ত্তি ভারতবর্ষীয় বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বিগণের মনঃকল্পিত দেবতা। প্রত্যেক ধর্ম্মের যেমন জ্ঞান ও কর্ম্ম এই দুইটী অঙ্গ আছে, তদ্রূপ বৌদ্ধধর্ম্মেরও দুইটী আছে, একটী নানাবিধ দার্শনিক মতানুযায়ীর সমষ্টি, দ্বিতীয়টী আনুষ্ঠানিক বা সাধারণ ধর্ম্ম। ভারতবর্ষীয় বৌদ্ধগণ বুদ্ধদেবপ্রবর্ত্তিত প্রথমোক্ত জ্ঞানধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য এবং সাধারণের নিকট উহার নিগূঢ়তত্ত্ব, সরল ও সহজ ভাবে প্রকাশ করিবার নিমিত্ত হিন্দুগণের পৌত্তলিকতার বহু দেব দেবীর পূজা প্রবর্ত্তিত করিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের একটি প্রশাখার সৃষ্টি করেন। বৌদ্ধধর্ম্মের মূর্ত্তিপূজার রহস্য সম্বন্ধে অন্যরূপ কল্পনা করিলেও বোধ হয় অসঙ্গত

---

* Nearly every village throughout the Buddhist Holy Land contains old Mahayana and Trantrick Buddhist Sculptures, and I have also seen these at most of the old Budhist sites visited by me in other parts of India. J. R. A. S. 1894—L. A. Waddell M. B. M. R. A. S.' s. article on The Inndian Buddhist Cult of Avalokita, p. 51.

হইবে না ধর্ম্মের পৌত্তলিকতাপ্রিয় জনসাধারণের মধ্যে শুষ্ক দার্শনিক মতের সমন্বয় করিয়া তাহার প্রতিষ্ঠা করা অসম্ভব বোধে, ঠিক্ সেই জলে জল মিশাইয়া অর্থাৎ হিন্দুধর্ম্মের পৌত্তলিকতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়া ধর্ম্মপ্রচারের কৌশল রূপে এই সকল মূর্ত্তির প্রবর্ত্তন করাই বৌদ্ধধর্ম্মের তদানীন্তন নেতৃবৃন্দের উদ্দেশ্য ছিল, নচেৎ বৌদ্ধধর্ম্মের মধ্যে মূর্ত্তিপূজা প্রবর্ত্তিত করিবার উদ্দেশ্য কি ?

এ সকল ধর্ম্মমত স্থূল দৃষ্টিতে পৌত্তলিকতা বলিয়া বিবেচিত হইলেও কিন্তু মূলতঃ সেই মহান্ সার সত্যের সহিত একই ভাবে শৃঙ্খলাবদ্ধ, যে মহান্ সত্য ও ধর্ম্ম আপনার মূল কেন্দ্রে অবিচলিত রহিয়া শূন্যাগার মধ্যেও এই দৃঢ় বিশ্বাসকে পোষণ করে যে ধর্ম্মশীল মানবের সহিত অজ্ঞেয় ও মহান্ বিশ্বপতির প্রত্যক্ষ যোগ হইতে পারে। এ কথাটা আরও পরিষ্কার করিয়া বলা যাক্। জগতের প্রত্যেক ধর্ম্মের মূল লক্ষ্য ঈশ্বর। কিন্তু তাঁহাকে উপলব্ধি করিবার জন্য বা তাঁহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইবার নিমিত্ত যেমন কতকগুলি ভিন্ন ভিন্ন মত ও যুক্তি বিদ্যমান, তেমনি জগতের প্রত্যেক ধর্ম্মের সার বা মহৎ শিক্ষা নির্ব্বাণ বা আত্মার সেই মহান্ শক্তির সহিত সম্মিলন। ইহা সকল ধর্ম্মেরই শ্রেষ্ঠ সাধনা। কিন্তু এই শ্রেষ্ঠ সাধনাকে আয়ত্ত করিতে জ্ঞান ও শিক্ষার প্রয়োজন। সেই শিক্ষা ও জ্ঞান অল্প সময় মধ্যে কাহারো পক্ষে আয়ত্ত করা সহজ-সাধ্য নহে বলিয়াই প্রত্যেক ধর্ম্মের মধ্যেই নানা প্রকার শাখা-প্রশাখা বিদ্যমান। এই শাখা-প্রশাখাগুলি প্রথম দৃষ্টিতে জ্ঞানবানের চক্ষে হাস্যাস্পদ বলিয়া বিবেচিত হইলেও কিন্তু মূলতঃ এক বৃন্তে দুইটী ফুলের ন্যায়, উভয়ে একই বৃক্ষমাতার স্নেহ-কোলে বর্দ্ধিত ও পুষ্ট। একটী পত্রাবরণমুক্ত সৌন্দর্য্যে ও সুরভিমাধুর্য্যে মনোহর, অপরটি এখনও পত্রাবগুণ্ঠন হইতে আপনাকে বিকাশ করিবার শক্তির জন্য পথ চাহিয়া আছে। অতএব সাকার ও নিরাকার হীনযান ও মহাযান, মূলতঃ একই লক্ষ্যে চলিয়াছে।

আবার উভয়ে একই কেন্দ্রে সীমাবদ্ধ। এই নিমিত্তই সাকার ও নিরাকার, দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদ সেই এক বিশ্বস্রষ্টা জগদীশ্বরকে পাইবার জন্য পাশাপাশি প্রবাহিত দু'টী নদীর ন্যায় সাগরে মিশিবার জন্য একটী একটু ঘুরিয়া এবং অপরটি একটু সরল পথে একটানা স্রোতে বহিয়া চলিয়াছে।

অবলোকিতেশ্বর মূর্ত্তির অর্চ্চনাও তদ্রূপ ভারতবর্ষীয় বৌদ্ধগণের দ্বারা বোধিসত্ত্বের শ্রেষ্ঠত্ব সর্ব্বসাধারণের মধ্যে সহজে প্রচারিত করিবার জন্য প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। অবলোকিতেশ্বর মূর্ত্তির গঠনের মধ্যে সূক্ষ্ম শিল্পকার্য্যের বাহাদুরীর সঙ্গে সঙ্গে কল্পনারও যথেষ্ট শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত হয়।

অবলোকিতেশ্বর মূর্ত্তি গুলি দুইহাত, চারিহাত, ছয়হাত, দশহাত, বারোহাত এমন কি সময় সময় সহস্র হস্ত সমন্বিতও দেখিতে পাওয়া যায়। কোন কোন অবলোকিতেশ্বর তিন বা একাদশ শীর্ষ বিশিষ্ট। যেমন শিবের পার্ব্বতী, বিষ্ণুর লক্ষ্মী, ইন্দ্রের শচী, তেমনি অবলোকিতেশ্বর দেবেরও এক শক্তি আছেন তাঁহার নাম তারা। এই শক্তিমূর্ত্তিই বৌদ্ধ তান্ত্রিকতারপরিচায়ক।

অবলোকিতেশ্বর সম্বন্ধে ডাক্তার আইটেল (Dr. Eitel) তৎপ্রণীত HandBook of Chinese Buddhism নামক গ্রন্থে, বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন। চীন ও জাপানে অবলোকিতেশ্বর দেব স্ত্রীমূর্ত্তিতে এবং তিব্বতে ও ভারতে পুরুষমূর্ত্তিরূপে অর্চ্চিত হইতেন। চীনদেশে অবলোকিতেশ্বর সম্বন্ধে একটী সুন্দর প্রবাদ প্রচলিত আছে। সেই গল্প বা প্রাচীন কাহিনীটি এই:—

অতি প্রাচীনকালে চীনদেশে এক রাজা ছিলেন তার নাম ছিল সুভর নাম্পো (Shubharyynpu)। ইনি আমাদের দেশের হিরণ্যকশিপুর ন্যায় দুর্দ্দান্ত প্রকৃতির নরপতি ছিলেন, এই রাজার গৃহে অবলোকিতেশ্বর দেবকন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার নাম হইল কোয়ানউইন (Kwanyin)। কোয়ান উইন রাজার তৃতীয়া কন্যা। বৎসরের পর বৎসর অতিবাহিত হইতে লাগিল, ক্রমে কোয়ান উইন বয়ঃপ্রাপ্তা হইলেন, রাজা বিবাহের পাত্রানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন, এদিকে কিন্তু মহাবিভ্রাট, কোয়ান উইন বিবাহ করিতে নারাজ। রাজা ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া কন্যাকে একটি মঠে (আশ্রমে) পাঠাইয়া দিলেন এবং আশ্রমের অধিবাসিনী রমণীগণের সর্ব্ববিধ নীচ কার্য্য সম্পাদনে ব্রতী করিলেন। তথাপিও কিন্তু কন্যার মত পরিবর্ত্তিত হইল না। রাজা ইহাতে আরও ক্রোধান্বিত হইলেন, তিনি কোয়ান উইনকে হত্যা করিবার জন্য জল্লাদের হস্তে অর্পণ করিলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, জল্লাদ কোয়ানউইনকে অসি দ্বারা আঘাত করিবামাত্রই তরবারিখানা সহস্র খণ্ডে চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া গেল—কিন্তু কোয়ান উইনের জীবননাশ দূরে থাকুক একটী কেশাগ্রও কম্পিত হইল না। রাজার ক্রোধ আরও বাড়িয়া গেল। তিনি কোয়ান উইনকে শ্বাসরোধ করাইয়া হত্যা করিতে অনুমতি প্রদান করিলেন। এবার তাহার মৃত্যু হইল। কিন্তু যমলোকে মহাবিভ্রাট। নরক স্বর্গে পরিণত হইল, যম মহা প্রমাদ গণিলেন, এ যে সৃষ্টি রসাতলে যায়, নিয়মশৃঙ্খলা কিছুই থাকে না। নরকে শৃঙ্খলা স্থাপনের জন্য যম কোয়ান উইনকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া দিলেন। একটী পদ্মদলোপরি নিঙ্গপোর (Ningpo) নিকটবর্ত্তী পোটলা (Potala) বা পুটুদ্বীপে তিনি নয়

বৎসর পর্য্যন্ত যমালয় হইতে পুনরুজ্জীবিত হইয়া বাস করিয়াছিলেন। কোয়ান উইনের কীর্ত্তিকলাপ দিন দিন চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হইতে আরম্ভ করিল, পীড়িতের পীড়ামুক্তি সমুদ্রের করাল কবল হইতে পথভ্রষ্ট নাবিকের জীবন রক্ষা প্রভৃতি নানাবিধ সৎকীর্ত্তিরাজী লোকের মুখে মুখে সর্ব্বত্র ঘোষিত হইতে লাগিল। এরূপ সময়ে কোয়ান উইনের পিতার দারুণ পীড়ায় সঙ্কার হওয়ায় কোয়ান উইন নিজের বাহু ছেদন করতঃ সেই মাংস দ্বারা ঔষধ প্রস্তুত করিয়া পিতার জীবনরক্ষা করিলেন। এইবার নির্দ্দয় পিতার হৃদয় দ্রবীভূত হইল। কন্যার এইরূপ মহত্ত্বের স্মৃতি রক্ষা করিবার জন্য তিনি ভাস্করকে কোয়ান উইনের একটী প্রস্তরগঠিত মূর্ত্তি প্রস্তুত করিবার আদেশ করিলেন। ভাস্কর রাজার আদেশ শুনিতে ভুল করিয়া সহস্র চক্ষু এবং সহস্র ভুজসমন্বিত এক মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া ফেলিল। কালবশে তাহাই বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বর মূর্ত্তিরূপে চতুর্দ্দিকস্থ জনসাধারণের ভক্তি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিল। কোয়ান উইনকে অবলোকিতেশ্বর অবতাররূপে প্রমাণিত করিবার জন্য চীনদেশবাসী বৌদ্ধগণ কোয়ান উইন অর্থে যে দেবতা ঊর্দ্ধ হইতে অধঃপানে দৃষ্টি করেন এবং যিনি লোকেশ্বর ও মানবের সর্ব্ববিধ শোক দুঃখের বিধান কর্ত্তা এবং দয়ার অবতার এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়া অবলোকিতেশ্বরের আভিধানিক বা প্রকৃতি ব্যুৎপত্তিগত অর্থের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়াছেন। জাপানেও বৌদ্ধেরা কোয়ান উইন দেবীকে অবলোকিতেশ্বরের অবতাররূপে অর্চ্চনা করিয়া থাকে। সেখানেও তিনি সহস্র হস্ত এবং সহস্র চক্ষু বিশিষ্টরূপে অঙ্কিত।

তিব্বত দেশে অবলোকিতকে চে-রি-সাই (che-re-si) বা দীপ্তনয়ন সম্পন্ন দেবতা কহে। আইটেল সাহেব বলেন যে "Avalokta is the first ancestor of the

E Eitel's Handbook of Chinese Buddhism and Three lectures on Buddhism, pt 123-131 and 23-8.

Tibetan Nation." তিব্বতিয়েরা কিন্তু ইহা বিশ্বাস করে না। তাহারা কিন্তু ডারউইনের সিদ্ধান্তানুযায়ী আপনাদিগকে বানরের বংশজাত বলিয়াই প্রকাশ করে। এ বানর— সাধারণ বানর নহে,—স্বয়ং অবলোকিতেশ্বর দেব বানরমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া এক রাক্ষসীর সহিত বাস করেন, তাহাতেই তিব্বতীয়দিগের উৎপত্তি।

তদ্দেশবাসিগণ অবলোকিতেশ্বরকে আমাদের বিষ্ণুর অবতারের ন্যায় মানবের শোকদুঃখ মোচনার্থ বোধিসত্ত্বের অবতাররূপে অর্চ্চনা করেন। য়ুয়ন চয়ঙের ভ্রমণকাহিনী পাঠে জ্ঞাত হই যে তিনি অবলোকিতেশ্বর দেবকে পুষ্পগুচ্ছ অর্পণ করিয়াছিলেন। অবলোকিতেশ্বরের

মূলমন্ত্র ওঁ মণিপদ্মে হুঁ (Om mani padme Hun) এবং বীজমন্ত্র হ্রীঃ, ইহা হৃদয় শব্দেরই রূপান্তর মাত্র।*

অবলোকিতেশ্বর সাধারণতঃ 'মহাকরুণা' এবং 'পদ্মপাণি' নামে অভিহিত হইয়া থাকেন মূর্ত্তির অর্চ্চনা ও অভ্যুদয় কোন্ সময়ে বৌদ্ধধর্ম্মে প্রথম প্রবেশলাভ করে, সে সময়ের নির্ণয় এখন পর্য্যন্ত হয় নাই। তবে কেহ কেহ অনুমান করেন যে রাজা কণিষ্কের সময় হইতেই অবলোকিতেশ্বর দেবের পূজার রীতি প্রবর্ত্তিত হয়। এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার মূল কারণ এই যে প্রথম খৃ: অং রাজা কনিষ্কের নামাঙ্কিত একটী অবলোকিতেশ্বর মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু তাঁহার পূর্ব্ব তারিখের কোনও মূর্ত্তি অদ্যাপি প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। আজ পর্য্যন্ত অবলোকিতেশ্বরের মোট ৮২টী মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। এই ৮২টী মূর্ত্তিই অবলোকিতেশ্বর বুদ্ধমূর্ত্তি বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন কোন কোন মূর্ত্তিতে তিনি বোধিসত্ত্ব দীপঙ্কর প্রভৃতি রূপে অঙ্কিত হইয়াছেন। † আমরা ৮২টী মূর্ত্তির উল্লেখ করিলাম তন্মধ্যে ক্যাম্ব্রিজ Bendall (বেণ্ডেল) এর পুস্তক তালিকার ১৬৪৩ সংখ্যক অতিরিক্ত পাণ্ডুলিপিতে এক· ত্রিশটী অবলোকিতেশ্বরের পরিচয় আছে। কলিকাতার A 15 সংখ্যক পাণ্ডুলিপিতে আরও দশটী অবলোকিতেশ্বরের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এ সকল মূর্ত্তির মধ্যে ৪২টী মূর্ত্তি নিম্নলিখিত স্থান সমূহ হইতে পাওয়া গিয়াছিল। কটাহ প্রদেশে দুইটী, কঙ্কনে চারিটী কোরত্র এক, গান্ধার ১, দক্ষিণাপথ ২, দণ্ডভুক্তি ১, নবেন্দ্র ১, নেপাল ২, পোতালক ২, মগধ ৫ মহাচীন ১, রাঢ়া ২, রাঢ় ১, বন্দীকোট ১, বরেন্দ্র ৩, কিরোরয়ণ ১, সমতট ৩, সিংহলদ্বীপ ২, সুবর্ণপুর ১। 'ললিত বিস্তর, বা বুদ্ধদেবের জীবনী গ্রন্থে অবলোকিতেশ্বর দেবের কোনও নামোল্লেখ না থাকিলেও তাঁহার অন্যান্য নাম, যেমন 'মহাকরুণা, 'ধরণীশ্বর-রাজ, প্রভৃতির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ললিত বিস্তর গ্রন্থ ২১১ খৃঃ অঃ চীন ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল। 'সাধারণ পুণ্ডরিক নামক অপর একখানা বৌদ্ধ গ্রন্থে কিন্তু অবলো-কিতেশ্বর সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ আছে। উক্ত পুস্তকে অবলোকিতেশ্বর দেব মহান্ বোধিসত্ত্বরূপে বর্ণিত হইয়াছেন। 'সাধারণ পুণ্ডরিক' গ্রন্থ ২৬৫ খৃঃ অঃ চৈনিক ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছিল।

---

* E. Eitel's Three lectures on Buddhism. pp. 123-137.

† Anderson's catalogue and handbook of Arch. collection, 1883 volumes.

খ্রীষ্টিয় চারিশত অব্দে প্রসিদ্ধ চৈনিক পরিব্রাজক ফাহিয়ান এবং সপ্তম খ্রীষ্টাব্দে য়ুয়নচয়ঙ ভারত পর্য্যটনে আগমন করিয়া অবলোকিতেশ্বর ও মঞ্জুশ্রী মূর্ত্তি বিশেষরূপ পূজিত হইতে দেখিয়াছেন। জ্ঞান ও বিধানের অবতার রূপে মহাযান গ্রন্থে মঞ্জুশ্রী দেব উল্লিখিত হইয়াছেন। তাঁহার আবাহন গীতিও গ্রন্থের প্রারম্ভেই লিপিবদ্ধ হইয়াছে। তিব্বত দেশীয় বৌদ্ধলামাগণের 'ত্রিমূর্ত্তি স্তোত্রে' মঞ্জুশ্রীর নাম সর্ব্বাগ্রে উচ্চারিত হইলেও কিন্তু তাঁহারা মঞ্জুশ্রী অপেক্ষা অবলোকিতেশ্বরকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচনা করেন। তাঁহাদের এই বিশ্বাসানুযায়ী ত্রিমূর্ত্তি মধ্যে অবলোকিতেশ্বরকেই মধ্যস্থ আসন প্রদান করিয়াছেন।

ডাক্তার বুকানন ও হেমিলটন সাহেবের বিহারের সার্ভেরিপোর্টে এবং প্রত্নতত্ত্ববিৎ কানিংহামের সার্ভেরিপোর্টের স্থানে স্থানে অবলোকিতেশ্বর দেবের নামোল্লেখ থাকিলেও তেমন বিস্তারিত কোনও বিবরণ উহাতে দেখিতে পাওয়া যায় না। ঐ সকল রিপোর্টের মন্তব্য পাঠে সহজেই অনুমিত হয় যে তাঁহারা অবলোকিতেশ্বর সম্বন্ধে বিশেষরূপে কোনও তত্ত্বানুসন্ধান করেন নাই। কানিংহাম ও বুকানন ব্যতীত Geog's Csoma Korosi নামক গ্রন্থে এবং সিফনার (Schiefner) ও Schlagin tweit's এর পুস্তকে অবলোকিতেশ্বর সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা দেখিতে পাওয়া যায়। তিব্বতদেশীয় জনসাধারণের বিশ্বাস দলুইলামা অবলোকিতেরই অবতার।

বৌদ্ধ পুরাণোক্ত এ সমুদয় দেবমূর্ত্তির আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে সহজেই মনে হয় যে এইরূপ মূর্ত্তিপূজার পদ্ধতি বৌদ্ধগণ হিন্দুদের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। হিন্দু আদর্শানুকরণে মূর্ত্তিপূজা বৌদ্ধ সমাজে গৃহীত হইলেও, উভয় সম্প্রদায়ের মূর্ত্তিগুলির গঠনে ও শিল্প নৈপুণ্যে বহু প্রভেদ বিদ্যমান। গঠনে ও শিল্পে উভয় মূর্ত্তিতে এত পার্থক্য যে একজন অনভিজ্ঞ ব্যক্তিও সে পার্থক্য অনায়াসে অনুভব করিতে পারে। অপর পক্ষে উভয়ের নামেরই বা কত প্রভেদ।

গ্রীশ, রোম প্রভৃতি পাশ্চাত্য দেশে যেমন দয়া, ধর্ম্ম ন্যায় পবিত্রতা, শান্তি, তৃপ্তি, সুখ প্রভৃতি মানবের গুণ ও প্রবৃত্তিগুলির রূপক মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়, তদ্রূপ বৌদ্ধধর্ম্মের এ সমুদয় মূর্ত্তিগুলিও কোন না কোন নৈতিক ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত। অবলোকিত, তারা, মঞ্জুশ্রী প্রভৃতিও এইরূপ ভাবেই অবতাররূপে পূজিত হইয়া আসিতেছেন। বৌদ্ধ-পুরাণ গ্রন্থে ১০৮টী রূপক মূর্ত্তির উল্লেখ থাকিলেও অতি অল্প কয়েকটীরই সন্ধান পাওয়া যায়। ডাক্তার ওয়াডেল (Waddel) সাহেব অবলোকিতেশ্বর অর্থে (Lord of the world) জগৎপতি বুঝায় বলিয়া তাঁহার সহিত আমাদের হিন্দু দেবতা প্রজাপতি অর্থাৎ

লোকপালনকর্ত্তা ব্রহ্মার সঙ্গে সৌসাদৃশ্য প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার মতে বৌদ্ধগণ ব্রহ্মার আদর্শানুকরণেই অবলোকিতেশ্বর দেবকে গঠন করিয়াছেন।*

ওয়াডেল সাহেবের এই যুক্তি আমরা গ্রহণ করিতে সম্মত নহি। এক হস্তে বিকশিত শতদল, এক হস্তে কমণ্ডলু, এক হস্তে আশীর্ব্বাদ প্রদান করিতেছেন বলিয়া ব্রহ্মার সহিত অনেক সাদৃশ্য বিদ্যমান থাকিলেও আমরা অবলোকিতেশ্বর দেবকে একমাত্র ব্রহ্মার আদর্শানুকরণে গঠিত বলিয়া মনে করি না। আইটেল সাহেবের যুক্তিই এ বিষয়ে সঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হয়। তিনি বলেন, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এই তিনটী হিন্দু দেবতার প্রত্যেকটির মধ্য হইতেই কিছু কিছু লইয়া অবলোকিতেশ্বর দেবের সৃষ্টি হইয়াছে। মূর্ত্তিগুলি পর্য্যবেক্ষণ করিলেও এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হইতে হয়। †

আমরা এখানে অবলোকিতেশ্বর দেবের কতকগুলি ভিন্ন ভিন্ন নাম ও তাহার ব্যাখ্যা প্রদান করিলাম।

১। মহাকরুণা—তিব্বতীয় নাম Thugs-rjschen-po। ইনি শ্বেতবর্ণ, একমুখ ও চতুর্হস্তবিশিষ্ট এবং দণ্ডায়মানভাবে নির্ম্মিত। তাঁহার প্রথম দক্ষিণ হস্তে বরমুদ্রা, দ্বিতীয় দক্ষিণ হস্তে জপমালা, প্রথম বাম হস্তে প্রস্ফুটিত শতদল, দ্বিতীয় বাম হস্তে কমণ্ডলু।

২। আর্য্য অবলোকিত—তিব্বতীয় নাম h phagsha-s pyanras-g zigs. ইনি শ্বেতবর্ণ এবং দ্বিভুজবিশিষ্ট।

---

* Avalokita's image was modelled after that of the Hindoo Creator, prajapati or Brahma ; and the same type may be traced even in the monstrous images of the later Tantrik period. This observation is important with reference to the original functions attributed to the god Avalokita as a Lokesvara or Lord of the World, and prajapti or Lord of animals' and active creator of the universe, both being titles of Brahma. Though the ordinary function of Avalokita is more strictly a preserver and defender like Vishnu, his image, excepting the presence of a lotus which is common to Brahma and many other Hindu gods, has nothing in common with that of Vishnu or did he seem to be in any way related to Surya or Solar myths."

J. R. A. S. of Bengal 1894, p. 57.

† Eitel's Three lectures on Buddhism.

৩। —দুঃস্বপ্ন নিবারক—হিন্দুগণ যেমন 'দুঃস্বপ্নে স্মর গোবিন্দ, অর্থাৎ দুঃস্বপ্ন দেখিলে গোবিন্দকে স্মরণ করিয়া থাকেন, তদ্রূপ বৌদ্ধগণও দুঃস্বপ্ন দেখিলে অবলোকিতেশ্বর দেবকে স্মরণ করেন। তিব্বতীয় নাম Mi-lam-n gen-pa dek-che। ইহার গাত্রবর্ণ শ্বেত—কিন্তু পরিধানে নীল বস্ত্র। ইনিও দ্বিভুজ। দক্ষিণ হস্তে শরণ মুদ্রা, বাম হস্তে শ্বেত শতদল। ইঁহার গাত্রে কোনও ভূষণ নাই—চুলগুলি চূড়ার মত করিয়া বাঁধা।

৪। অবলোকিত—অষ্টভীতিনিবারক মূর্ত্তি। তিব্বতীয় নাম—s Pyan-ras-g zigs n jigs-pa br gyad s kyobs.

৫। সিংহনাদ অবলোকিত বা গর্জ্জনকারী সিংহ। তিব্বতীয় নাম—s Pyan-ras-g zigs Seng-ges gra. সিংহনাদের গাত্রবর্ণ শ্বেত—এক মুখ এবং দুই বাহু। তিনি একটি শ্বেতবর্ণের সিংহের উপরে চন্দ্রের মত গোলাকার আসনে উপবিষ্ট। তাঁহার মুখ একটু দক্ষিণদিকে হেলানো, মস্তকে মুকুট। দক্ষিণ হাঁটু অর্দ্ধ উত্তোলিত, এবং তাহারি উপরে দক্ষিণ হস্ত রক্ষিত, বাম বাহু লম্বিত। গলায় যজ্ঞোপবীত, এবং লোহিতবর্ণের রেশমী বস্ত্র পরিহিত। ত্রিনেত্র, নয়নত্রয় নিম্নাভিমুখে নত। বামদিকে একটী প্রস্ফুটিত শতদল—মস্তকোপরি অমিতাভ বুদ্ধ ধ্যানাসনে উপবিষ্ট।

৬। সাগর জিৎ—বা সমুদ্রবিজয়ী। তিব্বতীয় নাম—s Pyan-ras-gzgs-r gyal-wa-rgya-mtsho. ইঁহার গাত্রবর্ণ লোহিত। ইনি চতুর্ভুজ। দুইটী হস্ত পরস্পর সংলগ্ন, নিম্নদিকের বাম হস্তদ্বয়ের একটীতে জপমালা এবং অপর হস্তে রক্ত পদ্ম। তিনি বজ্র পালঙ্কে অর্দ্ধোপবিষ্ট।

৭। চতুর্ভুজ—তিব্বতীয় নাম—s Pyan-ra-gzigs-zhal-gchigs-phy ag-bzhi (p. Che-re-sizhal Chik-chag-zhi) এই অবলোকিত শ্বেতবর্ণ, একমুখ এবং চতুর্হস্তবিশিষ্ট।

৮। ত্রিমণ্ডল অবলোকিতেশ্বর বা বিচারপতি অবলোকিতেশ্বর। তিব্বতীয় নাম—s Pyan-ras-gzigs-hjig-rten-dn g-phyug(-gtsa-hkhor gsum-pa (P. Che-re-si-jig-ten wang-Chuhatso-kho-rsum) ইঁহার গাত্রবর্ণও লোহিত।

ত্রিমণ্ডল অবলোকিতেশ্বরের দক্ষিণ হস্তে শ্বেতপদ্ম, বাম হস্তে আশীর্ব্বাদ প্রদানোদ্যত' পরিধানে মণি-রত্ন-খচিত বস্ত্র ও অলঙ্কার। ইনি দণ্ডায়মান ভাবে অবস্থিত। তাঁহার দক্ষিণ দিকে বজ্রপাণি, এবং বামদিকে হয়গ্রীব দণ্ডায়মান।

৯। ধর্ম্মেশ্বর বজ্র—তিব্বতীয় নাম—s Pyan-ras-g zigs-rdorjeclhes d bang (P—Che-re-si-derje chhe wang) ইঁহার গাত্রবর্ণ শ্বেত, মস্তকোপরি অমিতাভ। ইনি দক্ষিণ হস্ত দ্বারা বর প্রদান করিতেছেন—বাম হস্তের মধ্যম ও অনামিকা অঙ্গুলির দ্বারা একটি প্রস্ফুটিত কমল ধৃত, দক্ষিণ পদ সম্মুখের দিক প্রসারিত করিয়া ইনি পালঙ্কের উপর অর্দ্ধোপবিষ্ট। তাঁহার দক্ষিণ দিকে শক্তিরূপিণী তারা এবং বাম দিকে ত্রিকুটি। সম্মুখ ভাগে Vasudhara-g zhon-meu করাঞ্জলি করিয়া দণ্ডায়মান।

১০। শ্রীখেচর অবলোকিতেশ্বর।

তিব্বতীয় নাম—(s Pyan-ras-gzigs-dhal-iden-mkkha-spyod (P·Che-re-si-pal-den-kha-cho) ইঁহার গাত্রবর্ণ শ্বেত, একমুখ এবং দ্বিভুজ। দক্ষিণ হস্তে বর প্রদান করিতেছেন, বাম হস্ত দ্বারা একটী শতদল ধৃত, ফুলটি কর্ণ পার্শ্বে প্রস্ফুটিত। রেশমী বস্ত্র ও অলঙ্কারে ইনি সজ্জিত। ইঁহার দক্ষিণ দিকে হরিদ্বর্ণা তারা এবং বাম দিকে শ্বেতবর্ণা ত্রিকুটী। সম্মুখভাগে পীতবর্ণা বসুন্ধরা করযোড়ে দণ্ডায়মানা।

১১। ত্রিমণ্ডল অমোঘবজ্র মহাকরুণা। তিব্বতীয় নাম—Thugs-rje chhen-pe-don-yod-rdrov-gtse hkh or-gsum-pa P.—Thuk-je-cheh-bo-ton-dor-tso-Khorn sum। ইঁহার গাত্রবর্ণ শ্বেত। ইঁহারও দক্ষিণ হস্তে বর, বাম হস্তে কমল জপমালা, কমণ্ডলু ইত্যাদি। রেশমী বস্ত্রে এবং নানাবিধ অলঙ্কারে ইনি সুশোভিত। ইঁহার দক্ষিণ দিকে তারা মূর্ত্তি এবং বামদিকে ত্রিকুটী মূর্ত্তি।

১২। সুখবতী—তিব্বতীয় নাম Tib.—s Pyan-vas-gzigs. Su-Kha-wa-ti (P.—Che-re-si Sukha-wafi)

সুখবতী অবলোকিতের গাত্রবর্ণ শ্বেত এক মুখ এবং ছয় হস্ত। ইঁহার ছয় হস্তেও বর, কমল, যষ্টি, কমণ্ডলু প্রভৃতি আছে। ইনি দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। পরিধানে মণিরত্ন খচিত রেশমী বস্ত্র কুণ্ডল এলায়িত। তারা এবং ত্রিকুটী দক্ষিণে ও বামে দণ্ডায়মানা।

১৩। অমোঘ ভবৃত (Amogha Vavritha)

তিব্বতীয় নাম Tib.—s Pyan-ras-gzigs-don-yod-mchhod-painor-bu (P.—Che-re-si-ton-yod Chho-pai-norbu) ইঁহারও গাত্রবর্ণ শ্বেত এক মুখ ও দ্বাদশ হস্ত। ইনি মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান, দক্ষিণ পার্শ্বে বসুন্ধরা দেবী এবং বাম পার্শ্বে নাগরাজা নন্দ এবং উপানন্দ দ্বাদশ হস্তে কমল, বর. বেদ, শঙ্খ. কমণ্ডলু জপমালা ইত্যাদি বিদ্যমান। কণ্ঠে কণ্ঠমালা, মস্তকে মুকুট, পরিধানে মণি রত্ন খচিত রেশমী বস্ত্র, গলে যজ্ঞোপবীত।

এতদ্ব্যতীত খেচরপাণি প্রভৃতি আরও অনেক অবলোকিতেশ্বর মূর্ত্তি আছে।

অবলোকিতেশ্বর, মঞ্জুশ্রী এবং তারা দেবীর পূজা যে দীপঙ্করের সময়ও আমাদের দেশীয় বৌদ্ধগণের মধ্যে বিশেষ প্রচলিত ছিল তাহা দীপঙ্করের তিব্বতযাত্রা সম্বন্ধীয় বিবরণ পাঠ করিলেই জানিতে পারা যায়। যখন নাগৎসু (Nag-tcho) দীপঙ্করকে তিব্বতে লইয়া যাইবার নিমিত্ত তিব্বতীয় নরপতি কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া বিক্রমশিলায় আগমন করেন, সে সময়ে ভারতের সর্ব্বত্র, বিশেষতঃ বঙ্গদেশে অবলোকিতেশ্বর এবং তারা দেবীর পূজা বিশেষরূপে প্রচলিত ছিল। নাগৎসুর প্রমুখাৎ তাঁহাকে তিব্বতের নৃপতি তিব্বতে যাইতে অনুরোধ করিয়াছেন,—একথা দীপঙ্কর শুনিলে পর তাঁহার তিব্বত যাওয়া উচিত কি অনুচিত তৎসম্বন্ধে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের জন্য দেবী তারার নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন। অবশেষে তিব্বতের পথে যখন তুষারধবল হিমাদ্রিশৃঙ্গের অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্য দর্শন করিতে করিতে দীপঙ্কর অগ্রসর হইতেছেন, তখন আমরা তাঁহার মুখে শুনিতে পাই—'বাস্তবিক হিমবত অবলোকিতেশ্বর দেবের ধর্ম্মামতানুসরণকারীদের উপযুক্ত বাসস্থান।* ইহা দ্বারা কি প্রমাণিত হয় না যে অবলোকিতেশ্বর দেবের পূজা বহু প্রাচীনকাল হইতেই ভারতবর্ষীয় বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রবেশ লাভ করিয়াছিল ?

ওয়াডেল সাহেব খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর পূর্ব্বে কোনও অবলোকিতেশ্বর মূর্ত্তি প্রাপ্ত হ'ন নাই।

আমরা বিক্রমপুরে যে অবলোকিতেশ্বর মূর্ত্তিটি প্রাপ্ত হইয়াছি ইহা কতদিনের প্রাচীন তাহা নির্ণীত হয় নাই। তাহা না হইলেও ইহা যে বহুদিনের প্রাচীন তাহাতে সন্দেহ করিবার কি কোন কারণ আছে ? এ পর্য্যন্ত যে কয়টি অবলোকিতেশ্বর মূর্ত্তি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে তাহার কোনটির সহিতই এই মূর্ত্তিটির সম্পূর্ণরূপে সৌসাদৃশ্য বিদ্যমান নাই। অন্য কোন মূর্ত্তির মধ্যেই সর্প চিত্র দেখিতে পাওয়া যায় না, কিন্তু এই মূর্ত্তির শীর্ষোপরি সাতটী সর্প দেখিতে পাওয়া যায়। (১) অন্যান্য অবলোকিতেশ্বর মূর্ত্তির মধ্যে সর্প অঙ্কিত নাই বলিয়া এবং এইটীতে সর্প অঙ্কিত রহিয়াছে বলিয়া যে ইহা অবলোকিতেশ্বর মূর্ত্তি নহে, তাহা নয়, কারণ সর্পসমন্বিত অবলোকিতেশ্বর মূর্ত্তিও হয় এইরূপ বৌদ্ধ গ্রন্থাদিতে বহুল উল্লেখ আছে। (২) এই মূর্ত্তিটি উচ্চে আট ইঞ্চি, প্রস্থে ৩½ ইঞ্চি। শিরে কিরীট, গলে যজ্ঞো-

* It is, indeed, true that Himavat is the province of Avalokitasvara's religious discipline. Indian Pandits in the Land of Snow page 62, 63 by Rai Sarat Chandra Das Bahadur, C. I. E. p. 74.

পবীত ও কণ্ঠাভরণ, কর্ণে অদ্ভুতাকৃতি কর্ণভূষা, ত্রিনেত্র, মস্তকের উপর সাতটী সর্প ফণা ধরিয়া আছে। মস্তকের উপরিস্থিত সর্ব্ববৃহৎ মধ্যবর্ত্তী সর্পটির উপরে ধ্যানী অমিতাভ মূর্ত্তি। অমিতাভ পদ্মাসন করিয়া ধ্যান করিতেছেন, তাঁহার নয়নদ্বয় নিমীলিত। দ্বাদশ হস্তের একটী হস্ত ভগ্ন, সে হাতখানাও অভগ্ন ছিল কিন্তু ছোট ছোট ছেলেদের ক্রীড়নক রূপে অবলোকিতেশ্বর দেব বহুকাল বিরাজমান থাকায় তাহাদিগের অত্যাচারে একটী হস্ত বিসর্জ্জন দিতে হইয়াছিল। অবলোকিতেশ্বর দেব বিকশিত শতদলোপরি দণ্ডায়মান, তাহার দুই পার্শ্বে দুইটী পুরুষ মূর্ত্তি। সেই শতদলের নিম্নাংশে আবার দু'টি পদ্মকোরক, পদ্ম কোরকের উভয় পার্শ্বে দু'টি পুরুষ মূর্ত্তি, উভয়ে করযোড়ে হাঁটু গাড়িয়া অর্দ্ধোপবিষ্ট। ইহাদিগকে দেবযোনি বলিয়া অনুমতি হয়, কারণ পক্ষ রহিয়াছে। অবলোকিতেশ্বর দেবের পরিহিত বস্ত্র আজানুলম্বিত। তাঁহার সৌম্যশান্ত মুখশ্রী, নত নয়ন, হৃদয়ে ভক্তি ও শ্রদ্ধার উদ্রেক করে। দ্বাদশ খানা হস্ত দ্বাদশ প্রকার দ্রব্যাদি ধারণ করিয়া আছে। প্রথম দু'খানা হস্ত খোলা ভাবে প্রস্ফুটিত পদ্মের উপর স্থাপিত, বক্রী হস্তগুলিতে ক্রমান্বয়ে সিংহ, কচ্ছপ, গ্রন্থ, জপমালা, পদ্ম বেদ, গদা, ইত্যাদি ধৃত—সবগুলি পরিষ্কাররূপে বুঝিতে পারা যায় না। কৃষ্ণপ্রস্তরে নির্ম্মিত বলিয়া ইহার চিত্র ভাল হয় নাই।

(১) কিয়দ্দিবস হইল কলিকাতার মিউজিয়ামেও একটী দ্বাদশ হস্তবিশিষ্ট অবলোকিতেশ্বর মূর্ত্তি বেহার অঞ্চল হইতে আনীত হইয়াছে, সেটি সেদিন দেখিতে গিয়াছিলাম। এই মূর্ত্তিটি আমার সংগৃহীত মূর্ত্তিটি হইতে অনেক বড়, দ্বাদশ হস্ত, সর্পের ফণার নিম্নাংশ দৃষ্ট হয়, উর্দ্ধাংশ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। সম্পূর্ণরূপে আমার এই অবলোকিতেশ্বর মূর্ত্তির সঙ্গে মিলেনা, বহু পার্থক্য বিদ্যমান। এ মূর্ত্তিটির শীর্ষদেশ ও নিম্নাংশ ভগ্ন।

(2) Wassiljew "Der Buddhism 1860. Buddhism in Tibet by Schlagintweit, page 54.

আমরা এখানে 'কারণ্ড ব্যূহ হইতে অবলোকিতেশ্বর দেবের ধ্যানের উল্লেখ করিলাম, ধ্যানটি এই :—

"ওঁ নমো ভগবতে আর্য্যাবলোকিতেশ্বরায়। এবং ময়াশ্রুতং একস্মিন্ সময়ে ভগবান্ শ্রাবস্ত্যাং বিহরতিস্ম। জেতবনে অনাথপিণ্ডিকস্যারামে মহতাভিক্ষু সঙ্ঘেন......বোধিসত্ত্বৈ মহাসত্ত্বৈ তদ্যথা বজ্রপাণিনা জলপাণিনা চ বোধিসত্ত্বেন মহাসত্ত্বেন। জলপাণিনা বজ্রাসনে চ বোধিসত্ত্বেন।দ্বাদশপাণিনা চ বোধিসত্ত্বেন মহাসত্ত্বেন। জলপাণিনা বজ্রাসনেন চ বোধিসত্ত্বেন দ্বাদশপাণিনা চ বোধিসত্ত্বেন মহাসত্ত্বেন গুহাসনেন চ বোধিসত্ত্বেন। আকাশ

গর্ভেণ চ বোধিসত্ত্বেন মহাসত্ত্বেন অনপারিধুত্তেন চ বোধিসত্ত্বেন মহাসত্ত্বেন। পদ্মপাণিনা চ বোধিসত্ত্বেন মহাসত্ত্বেন। সমন্তভদ্রেন চ বোধিসত্ত্বেন মহাসত্ত্বেন ভৃকুটীযে দেন চ বোধিসত্ত্বেন মহাসত্ত্বেন।—"কারণ্ড ব্যূহ (ধ্যান) কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটির অমুদ্রিত কারণ্ড ব্যূহ গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি হইতে এই ধ্যানটি উদ্ধৃত করা গেল।

আমি বিক্রমপুরস্থ সোনারঙ্গ গ্রামে এক গোঁসাই বাড়ী হইতে এই মূর্ত্তিটি সংগ্রহ করিয়াছিলাম।

আজ এই মূর্ত্তি দৃষ্টে তাঁহাদিগকে মনে পড়ে, যাঁহারা ধর্ম্মের জন্য আপনাদিগকে সম্পূর্ণরূপে সংসারের বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন। কেমন শিল্পী তাঁহারা, যাঁহারা এমন করিয়া ক্ষুদ্র প্রস্তর খণ্ডের মধ্যে আরাধ্যের, মানসমোহন মূর্ত্তি গড়িয়া ভাস্করসৌন্দর্য্যে ও ভক্তির মাধুর্য্যে বিশ্বদেবতাকে ক্ষুদ্র মূর্ত্তির মধ্যেও অসীম শক্তিময় করিয়া প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সেই মহতী কল্পনা ও ভক্তিকে ধন্য।

এই অবলোকিতেশ্বর মূর্ত্তিটির ন্যায় এরূপ সুন্দর ও ক্ষুদ্র মূর্ত্তি এ পর্য্যন্ত আর কোথাও আবিষ্কৃত হয় নাই; ইহা সম্পূর্ণ রকমের নূতন মূর্ত্তি। ইনি কোন্ নামান্তর্গত অবলোকিতেশ্বর তাহাও এখন স্থির সিদ্ধান্ত করিতে পারি নাই। বিক্রমপুরের প্রাচীনত্ব, বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাধান্য ইত্যাদি কি এই অবলোকিতেশ্বর মূর্ত্তি দ্বারা প্রমাণিত হয় না?

এই অবলোকিতেশ্বর মূর্ত্তিকে দেখিতে দেখিতে আমার সেদিনের কথা মনে পড়ে, যেদিন বর্ত্তমানের শ্মশানসদৃশ রামপালের মধ্যে বৌদ্ধ যতিগণের মধুর কণ্ঠনিঃসৃত ধর্ম্মসঙ্গীতে চতুর্দ্দিক মুখরিত হইত, যেদিন শীলভদ্র, দীপঙ্কর প্রভৃতি মনীষিগণের দিগন্তবিশ্রুত জ্ঞানগরিমার বাণী সুদূর তিব্বত ও চীন হইতে বিদ্যার্থিগণকে আহ্বান করিয়াছিল। যাঁহাদের কীর্ত্তিগৌরব ইতিহাসের বক্ষে জীবিত রহিয়া আজ—আমাদিগকে আনন্দে উদ্ভাসিত করিতেছে, আজ সেই পুণ্যতীর্থ বিক্রমপুরের নগণ্য অধিবাসী আমি, আপনাদের নয়নসমক্ষে অবলোকিতেশ্বর দেবের মহিমা মণ্ডিত চিরসুন্দর মূর্ত্তি স্থাপিত করিয়া অতীত গৌরবকাহিনীর পুণ্যস্মৃতিতে আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিতেছি। আজ আমার নয়নসমক্ষে রামপালের শ্মশানদৃশ্য দূরে চলিয়া গিয়াছে, আজ দেখিতেছি সৌধমালাপরিশোভিত, উজ্জ্বল আলোক-কণাবিচ্ছুরিত নগরীর নাগরিক সমৃদ্ধি ও জনসজ্ঞের কলনাদের মধ্য দিয়া রামপালের সঙ্ঘারামে শত শত ভিক্ষুগণের মধুরকণ্ঠে অবলোকিতেশ্বর দেবের ধ্যানমন্ত্র ধ্বনিত হইতেছে "ওঁ পদ্মেমণি হুঁ। আর সেই একদিনের ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি-প্রাপ্ত, ভক্তগণের চির-আরাধ্য দেব অবলোকিতেশ্বর আপনার জড়দেহ লইয়া কালের বিজয়-গৌরব ঘোষণা করিতেছেন।

শীলভদ্র—আনুমানিক ৪৪৭ শকাব্দে এই মহাত্মা বিক্রমপুরস্থ রামপাল নগরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কোন কোন প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থে ইহাকে দণ্ডসেন বলিয়াও উল্লেখ করা হইয়াছে। ইনি তৎকালীন প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ সঙ্ঘারাম নালন্দার অধ্যাপক ছিলেন। য়ুয়ন চয়ঙের ভ্রমণ বৃত্তান্তে এই মহাত্মার পাণ্ডিত্যের বহুল উল্লেখ দৃষ্ট হয়। ১৩০১ সনের প্রথম সংখ্যায় "সাহিত্য পত্রে শ্রদ্ধাভাজন ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত কৈলাস চন্দ্র সিংহ মহাশয় একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। কৈলাস বাবু যথার্থই লিখিয়াছেন "হায় হতভাগ্য রামপাল ! তোমার বর্ত্তমান অবস্থা দর্শনে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। কিন্তু একদিন তোমার ক্রোড়ে তদানীন্তন বৌদ্ধ জগতের সর্ব্বপ্রধান পণ্ডিত শীলভদ্রের শৈশব জীবন অতিবাহিত হইয়াছিল। হায় হতভাগ্য বিক্রমপুর ! তুমি অদ্য প্রসন্নের নাম উল্লেখ করিয়া গৌরব করিয়া থাক ! কিন্তু জাননা, এহেন শত সহস্র প্রসন্ন যাঁহার শিষ্য শ্রেণীতে স্থান পাইবার জন্য লোলুপ হইত, সেই মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শীলভদ্র একদিন তোমার ক্রোড়ে পালিত হইয়াছিলেন।" প্রায় দেড়শত বৎসর বয়সে ইনি পরলোক গমন করেন।

চতুর্থ অধ্যায়।

গজারী বৃক্ষ... মূলগ্রন্থ ৫৯ পৃষ্ঠা।

গজারী বৃক্ষটির সম্বন্ধে নানাবিধ জনপ্রবাদ প্রচলিত আছে। ইহাকে হিন্দু মুসলমান প্রত্যেকেই দেবতা জ্ঞানে অর্চ্চনা করে। কথিত আছে, একবার এক ফকির এই বৃক্ষের একটী শিকড় কাটায় রক্ত বমন করিয়া মৃত্যু মুখে পতিত হয়। প্রতি বৎসর এখানে একটি মেলা বসে।

বাবা আদমের মস্‌জিদ... মূলগ্রন্থ ৬১ পৃষ্ঠা।

এই মস্‌জিদটির সম্বন্ধে অধ্যাপক ব্লকম্যান, কানিংহাম, আশুতোষ গুপ্ত, ওয়াইজ সাহেব টেইলার সাহেব প্রভৃতি অনেকেই আলোচনা করিয়াছেন, আমরা এখানে তাহাদের মন্তব্য সমূহ উদ্ধৃত করিয়াছিলাম।

আশুতোষ গুপ্ত বলেন, (১) the Masjid of Ba-A'dam or the masque Consecrated to the Mahamadan faquir of that name. It is a pretty large, strong, brick-built mosque * The bricks are of the same small size which characterize old Muhamadan architecture. The mosque has two massive stone pillars which are apparently anat-

ched from a Hindu temple and which tradition identifies as the guda's or clubs of Ballal Sen. It is in a ditapid dated state, but is worth preserving, in front which bears an Arabic inscription.

P. 22, J. R. A. S. 1889 Ashutosh Gupta—Ruins and Antiquities of Rampal.

অধ্যাপক ব্লকম্যান সাহেব তদীয় History and Geography of Bengal নামক গ্রন্থের ৭৬-৭৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন :—The masjid of Baba Adam has been a very beautiful structure, but it is now fast falling into pieces. Originally there were six domes, but three have fallen in. The walls are ornamented with bricks beautifully cut in the from of flowers and of *indicate* pntterns. The arches of the domes spring from sandstone pillar, 20 inches in diameter, evidenthy of Hindu workmanship. The pillars are eightsided at the base, but about 4 feet from the ground they became sixteen sided. The outside nicely ornamented with various patterns of flowers, in the centre of each is the representation of a chain supporting an oblong frame in which a flower is cut.

ডাক্তার Taylor সাহেব তৎপ্রণীত Topography of Dacca নামক গ্রন্থের ১০২ পৃষ্ঠায় এই মস্জিদ সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন যে "Within a couple of miles of Bullbarise, stads the tomb and mosque of Pir Adam, the Mussulman Caze, who first governed here. The latter is a tolerably large building ; the roof is supported by stone pillars which display a good deal of arbesque and ornamental work, forming in this respect a strìking contrast to the plain and unadorned tombs in the vicinity." সপ্তম অধ্যায়... ... মূ, গ্র, ১০৬ ।

রাজাবাড়ীর মঠ সম্বন্ধে মূল গ্রন্থমধ্যে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি এই মঠ সম্বন্ধে ডাক্তার ওয়াইজ সাহেব তদীয় বারভূইঞার অন্তর্গত চাঁদরায় ও কেদার রায় শীর্ষক প্রবন্ধে নিম্নলিখিত রূপ মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন ।—

"This Math is a four sided tower, twentynine feet square at the base. In the first thirty feet, the walls are ornamented with various patterned bricks in imitation of flowers. The middle of each face is raised and ribbed. The walls are clever but thick, and the bricks used in their construction are of peculiar shape. They are larger than those found in Mahaumedan buildings of the same age, being eight inches square, and one and a half thick, on the summit is a large sperical mass * * * This Mat'h was a shrine dedicated to shiv but as it is buried in the midst of dense Jungle and marses, it is rarely visited at the present day." J. R. A. S. P. 203, 1894.

এ অনেক দিন আগেকার কথা। এখন পদ্মা তাহার শীতল বক্ষে মাথা ডুবাইয়া নির্ব্বাণ লাভ করিবার জন্য অতি নিকটে আসিয়া মঠকে আহ্বান করিতেছে।

চাঁদ কেদার রায়ের বংশাবলী সম্বন্ধে বড়ই গোলযোগ। ১২৯১ সনের 'ভারতী' পত্রে শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয় চাঁদ কেদার রায়ের একটী বংশাবলী প্রদান করিয়াছিলেন। যাঁহারা যাঁহারা কেদার রায়ের বংশধর বলিয়া দাবি করেন, তাহাদের কথা মূল গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছি। আমাদের বিবেচনায় মূলচর গ্রাম নিবাসী স্বর্গীয় গুরুচরণ রায়, ও শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ রায় ভ্রাতৃদ্বয়ই রায় বংশের প্রকৃত বংশধর। তাঁহারা একবার গভর্ণেণ্ট কর্ত্তৃক অর্থ সাহায্য ও পাইয়াছিলেন। ইহাদের বংশাবলী গভর্মেণ্টের হস্তগত হওয়ার পর আর ইহাঁরা ফিরিয়া পান নাই।

ওয়াইজ সাহেব এ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন.—'After the death of Chand Rái and Kedar Rai nothing is known of the family. The elder branch it is said, became extinct, but the deseendendants of a younger son still survive, and reside at Mulchar, south of Munshigunj." বর্ত্তমান সময় ইঁহাদের অবস্থা নিতান্ত শোচনীয়।

কাচ্‌কীর দরোজা ... ... ১০৯।

এই গল্পটির সহিত রাজা বল্লালেরও নামোল্লেখ দৃষ্ট হয়, অতএব ইহা অনুমান করা অসঙ্গত নহে যে প্রথমে রাস্তাটি বল্লালসেনই তৈরী করেন, পরে কেদার রায় ও কতকাংশ

নির্ম্মাণ করেন, কাজেই প্রচলিত কাচ্কী মাছের জনপ্রবাদ উভয়ের উপরই আরোপিত হইয়াছে।

ইঁহার দুইনাম ছিল এক নাম রঘুরাম এবং অপর নাম রঘুনন্দন, কাজেই একই ব্যক্তির বিষয় বলিতে গিয়া কেহ রঘুনন্দন ও কেহ রঘুরাম নামে উল্লেখ করিয়াছেন।

এক সময়ে বিক্রমপুরে ও নিম্নবঙ্গের নানাস্থানে মগ ফিরিঙ্গিদের অত্যাচারে নিরীহ অধিবাসী বর্গের নিরাপদে বাস করা সুকঠিন হইয়া পড়িয়াছিল। ইহারা স্ত্রীলোকের সতীত্ব হরণ, ধনীর গৃহ লুণ্ঠন, বলবান ব্যক্তিগণকে ধরিয়া লইয়া যাইয়া দাসরূপে বিক্রী ইত্যাদি করিত। "কবিকণ্ঠহার প্রণীত" সদ্বৈদ্য কুলপঞ্জিকা পাঠে একটী শ্লোক জ্ঞাত হওয়া যায় যে।মগেরা একজন বৈদ্য জাতির লোককে ধরিয়া লইয়া গিয়াছিল। সেই শ্লোকটী এই ;—

মহেশ সেন ভর্ত্তুর্গোপীনাথাৎ সুতোঽভবেৎ।
চাটীগ্রাম মগৌনীতো বনাথঘচসুচরৈ।"।

এইগ্রন্থ ১০৭৫ শক (১৬৫৩ খ্রীঃ অঃ) রচিত।

মগদের দমনার্থ কেল্লাটি নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়া অদ্যাপি ইহা (মগের কেল্লা) নামে পরিচিত। ক্লে সাহেব তদীয় "Principal heads of the history and statistics of the Dacca division নামক গ্রন্থের ৩৫ পৃষ্ঠায় এই দুর্গ সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন, "To guard against the invasion of Mughs and Portuguse and other frontier tribes from Arracan Mirjumla built the several forts at the confluence of Luckhia and Delessery the ruin of which still remain. The principal of these are the forts of Hajigunj and Idrakpere."।

পূর্ব্বে এই দুর্গ ইছামতী নদীর তীরে অবস্থিত ছিল, এখন নদী প্রায় একমাইল দূরে সরিয়া গিয়াছে। এক সময়ে যে এই দুর্গটী বিশেষ দৃঢ় ছিল তাহা ইহার বর্ত্তমান ভগ্নাবশেষের মধ্য দিয়াও অনুভূত হয়।

ইঁহাদের সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা গিয়াছে। ডাক্তার ওয়াইজ লিখিয়াছেন, "They were Somajpati of their caste. and held the most prominent portion among the landholders of Vikrampur. Traditions states that they had 700 slaves attached to their establishment, that they gave away a great portion of the Pargannah in small taluqudars to Brahaman and other several of their grants are still recognised as indpendent Taluqs."

রাজবল্লভ ... ... ১৪৪।

আগারাজা নামক একব্যক্তি রাজনগর লুণ্ঠন করিয়া বহু অর্থ আত্মসাৎ করিয়াছিলেন বলিয়া জনপ্রবাদ প্রচলিত আছে।

নবম অধ্যায়।

প্রাচীন সাহিত্য ... ... ১৭৭।

আমার পরম স্নেহাস্পদ ভ্রাতা শ্রীমান মাধব লাল সেন বি, এ দ্বিজরামকৃষ্ণ নামক অপর একজন বিক্রমপুরবাসী প্রাচীন কবির 'সত্যনারায়ণ পাঁচালী, শীর্ষক একখানা গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া দিয়া বিশেষ উপকৃত করিয়াছেন, আমরা এখানে উক্ত গ্রন্থ হইতে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিলাম, ইহা হইতেই পাঠকবর্গ কবির ভাষার মাধুর্য্য এবং ছন্দের নূতনত্ব অনুভব করিতে পারিবেন। সাধুনন্দনের মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া তদীয় পত্নী বিলাপ করিতেছেন।

বলি হায় বিধিরে, হরি নিল নিধিরে,
আলি যায় হৃদি হেন দেখি।
বহু শোক জড়িতে, বিধাতার শাপেতে,
ভূমিতে পড়িতে ভগ্ন হইল।
হেনপতি সঙ্গ, দূরে গেল রঙ্গ,
হৈল রস ভঙ্গ কান্দিভারি।
জল মুহি দশনে হীন তনু-বসনে
ঘন ঘন দশন ওষ্ঠ কাটে।
হেমময় তনুতে, ধূসরিত বেণীতে,
যেন নব ভানুতে মেঘ শৈল।

মদন মুকুন্তে, কনক নিতম্বে,
পুরিত দণ্ডে দৈন্য পাইল ।'
জল বহে যোবনে, হীন তনু বসনে,
না দেখিয়া মদনে যেন রতি ।
মুক্তরুণ কপালে, ধোয় আঁখি সলিলে,
পয়োধর বিপুলে কুলবতী ।
ঢাকিছে চিকুরে মদন মুকুরে,
চান্দকি চকোরে ছন্ন কৈল ।''

দশম অধ্যায় ।

কামার থাড়া (স্বর্ণগ্রাম) গ্রাম নিবাসী 'সৌভাগ্য সোপান' ও যুবক বন্ধু প্রণেতা শ্রীযুক্ত প্রসন্ন কুমার দাশ গুপ্ত ও বজ্রযোগিনী নিবাসী নীতি-সংগ্রহ গ্রন্থ প্রণেতা কালী কিশোর গুহের নাম ভ্রমক্রমে মূলগ্রন্থে লিখিত হয় নাই ।

হাসাড়া গ্রাম নিবাসী স্বর্গীয় কালী কিশোর সেন মহাশয়ের জীবনী আলোচনার যোগ্য—ইনি স্বীয় বাসগ্রামস্থ উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের ব্যয় নির্ব্বাহার্থে বহু অর্থ দান করিয়া গিয়াছেন । শিক্ষার নিমিত্ত এইরূপ দান বিশেষ প্রশংসনীয় । আমরা তাঁহার জীবনী প্রকাশ করিতে না পারায় একান্ত দুঃখিত আছি । এতদ্ব্যতীত হরপাড়ানিবাসী পি. এম. গুহ, শ্যামসিদ্ধি নিবাসী ষ্ট্যাটুটারী সিবিলিয়ান নীলকণ্ঠ সরকারের নাম উল্লেখ যোগ্য ।